তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

ত্রয়োদশ কল্প।

প্রথম ভাগ।

[illegible]-১৮১৩ শক।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপর চিৎপুর রোড।

সম্বৎ ১৯৪৮। কলিগতাব্দ ৪৯৯২। ১ চৈত্র।

মূল্য ৪৲ চারি টাকা মাত্র।

ত্রয়োদশ কল্প
প্রথম ভাগ
বৈশাখ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬২।

৫৭৩ সংখ্যা। ১৮১৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী জয়জয়ন্তী—চৌতাল।

জীবন সঁপিনু আজ,
তোমারি করিতে কায;
তোমারি আশীষ পেয়ে
প্রেমেরি মহিমা গেয়ে
ঘুচাব বিরহ সাজ;
নয়নেরি জলে দেখিব যাহার
পাপতাপ ঝরে যায়,
ভাই ভাই বলে ডেকে লব তারে
আকুল মরম মাঝ।
ভ্রমিয়া অরণ্য সারা
আসিবে যে পথ হারা,
তোমারি অমৃত নামে
জুড়াব তাহারি প্রাণে ;—
বহিবে মিলন ধারা।
গাহিবে তখন বিশ্বচরাচরে
প্রেমেতে আপন হারা ;
অসীম সে প্রেম ধরিয়া জীবনে
ভাঙ্গিব মোহেরি কারা।

বর্ষশেষ ব্রাহ্মসমাজ।

বর্ষশেষ উপলক্ষে নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক পঠিত হয়।

প্রায়শ্চিত্ত।

আজ বৎসরের শেষ দিবস। আজ পুরাতন বৎসর অতীতের শ্মশান-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইবে ; নূতন বৎসরের জন্মদান করিয়া আজ পুরাতন বৎসর আপনার সুখ দুঃখের সহিত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তাই আজ আমরা পুরাতন বৎসরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য সাশ্রুনয়নে এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আজ আমরা এখানে নূতন বৎসরের জন্য আনন্দ প্রকাশ করিতে আসি নাই কিন্তু পুরাতন বৎসরের মৃত্যুর জন্য রোদন করিতে আসিয়াছি। মনুষ্যের জীবন সুখ ও দুঃখে গঠিত; হর্ষ ও শোকের বিচিত্র উপাদানে বিরচিত; সম্পদ ও বিপদে লালিত পালিত। কিন্তু আজ এই পুরাতন বৎসরের সমাধিমন্দিরে দাঁড়াইয়া সুখ, হর্ষ, সম্পদ্ সকলই ভুলিয়া গিয়াছি; কেবল দুঃখ শোক হৃদয়ে অধি-

রল ক্রন্দনধ্বনি জাগাইতেছে। এই শ্মশান ক্ষেত্রের প্রান্তরে দাঁড়াইয়া, শ্মশানের ভীষণতম সর্ব্বসংহারক চিতাগ্নি দেখিয়া কে আর হাস্যরসে মগ্ন থাকিতে পারে? কাহার হৃদয় না বিবেক ও বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ হইয়া আসে? কাহার অন্তরে না পরকালের ভীষণ রহস্যময় ভাব সবেগে আঘাত করিতে থাকে? একবার এই সম্বৎসরের সন্ধ্যাকালে দাঁড়াইয়া দেখ যে, আমাদিগের চারিপার্শ্বে মৃত্যুর পাশ কত প্রকারে জড়াইয়া আসিতেছে! একটী সুদীর্ঘ বৎসর কি বৃথায়ই কাটাইলাম! বৎসরের প্রারম্ভে কোথায় ভাবিয়াছিলাম যে সংসার মরুভূমিতে জীবন প্রদান করিয়া উর্ব্বর করিব; প্রেমবারি প্রদান করিয়া সরস করিব; শান্তিবীজ রোপণ করিয়া শস্যশ্যামল করিব—কিন্তু পারিলাম কৈ? একটী একটী করিয়া ৩৬৫ দিনই চলিয়া গেল কিন্তু আমার সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলাম কৈ? আজ দেখি জীবনের পরিবর্ত্তে শ্মশানের চিতাভস্ম আনিয়াছি; প্রেমাশ্রুর পরিবর্ত্তে শোকাশ্রু আনিয়াছি। জীবন ও প্রেম কোথায় ফেলিয়া দিয়াছি, তাহার কি কিছু ঠিক আছে? কি লইয়া সংসার মরুভূমিকে শস্যশ্যামল করিব? স্বয়ং জরা মৃত্যু ব্যধি দ্বারা অভিভূত হইয়া পরকে ভাল করিতে পারিব কি প্রকারে। সম্বৎসরের প্রারম্ভে যিনি আমাদিগের নিকট প্রেম ও জীবন জগতে বণ্টন করিয়া দিবার নিমিত্ত গচ্ছিত রূপে রাখিয়াছিলেন, আজ সম্বৎসরের শেষে সেই প্রেমদাতা পিতার নিকটে যাইয়া বলিতে হইবে যে "পিতা, তুমি যে আমাদিগকে অমৃত দিয়াছিলে, তাহার পরিবর্ত্তে মৃত্যু আনিয়াছি; তুমি যে জ্যোতি দিয়াছিলে, তাহার পরিবর্ত্তে অন্ধকার আনিয়াছি; তুমি যে পুণ্য দিয়াছিলে তাহার পরিবর্ত্তে পাপ আনিয়াছি।" ধিক্ আমাদিগকে। হায়, আমরা সমুদয় হারাইলাম, তবুও আমাদিগের চেতনা হইল না? আমাদিগকে দারুণ পাপযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে, তথাপি আমরা কি তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করিব না? ঔষধ প্রস্তুত থাকিলেও তাহা গ্রহণ করিব না? আমাদিগের যিনি পিতা, আমাদিগের যিনি মাতা, যিনি সখা, যিনি তপ্ত হৃদয়ের শান্তিবারি—তিনি যেমন শত শত শারীরিক ব্যাধির জন্য ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, সেইরূপ এই গুরুতর মানসিক পাপব্যাধির জন্যও ঔষধ রাখিয়াছেন। যিনি চন্দ্রতারকে থাকিয়া চন্দ্রতারককে নিয়মিত করিতেছেন, চন্দ্রতারক যাঁহার শরীর, চন্দ্রতারক যাঁহাকে জানে না; যিনি সূর্য্যের অভ্যন্তরে থাকিয়া সূর্য্যকে নিয়মিত করিতেছেন, সূর্য্য যাঁহার শরীর, সূর্য্য যাঁহাকে জানে না; আর যিনি আত্মার অন্তরে থাকিয়া আত্মাতে নিয়তই ধর্ম্মবুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন, আত্মা যাঁহার হিরণ্ময় কোষ, আত্মা যাঁহাকে জানে, তিনি যদি বিশ্বচরাচরকে নিয়মিত করিতে পারিলেন; তিনি যদি একটী কীট পর্য্যন্ত আহার প্রাপ্ত হইল কি না দেখিতে পারিলেন, তবে তিনি কি মনুষ্যের আত্মার মর্ম্মচ্ছেদী দাহযন্ত্রণা জানিতে পারিবেন না? এবং জানিয়া কি তাহার প্রতীকারক ঔষধের ব্যবস্থা না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? ইহা কল্পনাতে ও স্থান পাইবার যোগ্য নহে। এই দারুণ মর্ম্মদাহের ঔষধ অনুতাপ—অনুতাপ—যথার্থ হৃদয়ের অনুতাপ। এই অনুতাপই ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন। আমরা

দি আমাদিগের পিতামাতাকে অন্তরের হিত ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকি, তবে তাঁহার আদেশের বিপক্ষে কর্ম্ম করিতে আমাদের হৃদয়ে আঘাত লাগিবে না? যাইরূপ যে করুণাময়ের করুণায় আমরা জগতের অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিয়া এত আনন্দ উপলব্ধি করিতেছি; যাঁহার প্রসাদে পিতামাতাকে প্রাপ্ত হইলাম, তাঁহার আদেশের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া, যদি তাঁর সুন্দর নিয়মের মধ্যে বিঘ্ন আনয়ন করি, তবে আমাদিগের হৃদয়ে আরও কত না গুরুতর আঘাত লাগিবে! তাহা যদি না লাগিবে—তবে আমরা কৃতঘ্ন সন্তান—আমরা মনুষ্য নামের যোগ্য নহি; আমাদিগের নিস্তার নাই—কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ।

যিনি আমাদিগের দয়াময় পিতা, যিনি আমাদিগের করুণাময়ী জননী, তাঁর কাছে যদি পাপতাপে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হৃদয় লইয়া আমরা উপস্থিত হই এবং যদি ব্যাকুল-প্রাণে ডাকিয়া বলি যে "জননি, আমাকে মার্জ্জনা কর; আমি শতবার তোমার আদেশের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া পাপ করিয়াছি কিন্তু আর করিব না—তুমি আমাকে ক্রোড়ে লও; তুমি আমার হৃদয়ে শান্তি প্রদান কর;" যদি সেই অখিল মাতার নিকট এইরূপ কাতরভাবে একটী বারও প্রার্থনা করি, তখন প্রত্যক্ষ দেখিব যে তিনি আমাকে সহস্র মলিনতায় আবৃত থাকিলেও ক্রোড়ে না লইয়া থাকিতে পারিবেন না। এই কঠোর সংসার অরণ্যে যদি তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়া আমার লালন পালনের জন্য, আমাকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার প্রতিনিধি পিতামাতার হৃদয়ে এত স্নেহ, এত মমতা, এত ভালবাসা প্রেরণ করিলেন, তবে তিনি পিতার পিতা, মাতার মাতা হইয়াও কি আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন? তাঁহাকে ডাকিলে, তাঁহাকে প্রার্থনা করিলে তিনি কি না আসিয়া থাকিতে পারেন? সাধক যদি বাস্তবিক ব্রহ্মপিপাসায় আকুল হয়েন, ভক্তবৎসল ভগবান স্বয়ং আপনাকে দিয়াও তাঁহার তৃষ্ণা নিবারণ করেন।

পাপী ব্যক্তির পক্ষে অনুতাপই সেই নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মকে পাইবার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ সোপান। অনুতাপ ব্যতীত পাপের আর কি মহৌষধ হইতে পারে? ভারতের পুরাতন বহুদর্শী ঋষিগণ ইহা বুঝিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে পাপের পর অনুতাপ যেমন পবিত্রতার পথ খুলিয়া দিতে সক্ষম, এমন আর কিছুই নহে—শরীর শোষক যাগযজ্ঞও নহে কিম্বা কোন পুণ্যবান্ মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তিবিশেষও নহে। তাই তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন,

"কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈতৎ কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে নরঃ॥" মনু।

পাপ করিয়া তন্নিমিত্ত সন্তাপ করিলে সেই পাপ হইতে মনুষ্য মুক্ত হয়; এমত কর্ম্ম আর করিব না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে সে পবিত্র হয়। "মনুষ্য পাপেতে ক্রমে ক্রমে নিমগ্ন হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত না হয়, এই জন্য করুণাময় পরমেশ্বর পাপের সহিত যন্ত্রণাকে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যেমন শরীরে রোগ উৎপন্ন হইলেই শারীরিক যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, সেইরূপ আত্মাতে পাপ উৎপন্ন হইলেই আত্মার আনন্দ ও শান্তি তিরোহিত হয় এবং গ্লানি ও অশান্তি আত্মাকে ক্ষতবিক্ষত করে। ইহাই পাপানুষ্ঠানের দণ্ড। মনুষ্য এইরূপ আন্তরিক দণ্ডভোগ করিয়া অনুশোচনা করে এবং পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুণ্যপথে গমন করিতে উৎসুক হয়।

পাপকারী মনুষ্য যাহাতে আপনার বিকৃত অবস্থা জানিতে পারে, ঈশ্বর সেইরূপ চৈতন্য উদয় করিয়া দিবার নিমিত্ত দণ্ড দান করেন; দণ্ডাঘাতে চৈতন্যোদয় হইলেই অনুশোচনা উপস্থিত হয়; অনুতপ্ত হইলেই দণ্ডদানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল।" ইহা দেখিয়াও কি ঈশ্বর তাহার পূর্ব্বাপরাধ ক্ষমা করিবেন না? মনুষ্য যদি আর পাপাচরণ না করিয়া সাধুপথ অবলম্বন করে, তাহা হইলেও কি তাহার আত্মাতে পুনরায় পবিত্রতা ও শান্তি বর্ষিত হইবে না? অবশ্যই হইবে। আমরা আমাদের প্রতিজনের জীবনে ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছি। যদি দশ বৎসরের সময় একটী মিথ্যা কথা বলি এবং তজ্জন্য অনুশোচনা পূর্ব্বক ভবিষ্যতে আর কোন রূপ পাপাচরণ না করি, তবে যে ঈশ্বর প্রাণের প্রাণ সখার সখা, যে ঈশ্বরকে ভক্তমাত্রেই শরণাগতবৎসল বলিয়া জানে, তিনি কি সেই একটী পাপের জন্য শান্তিবারি আর একেবারে প্রদান করিবেন না? হৃদয় কি এই কথায় কখনও সায় দিতে পারে যে, যিনি অনন্ত প্রেমের আধার, সেই অমৃত স্বরূপকে ব্যাকুল অন্তরে ডাকিলেও দৈবাৎ মৃত্যুপাশের একটী রজ্জুতে পদার্পণ করিয়াছি বলিয়া তিনি আর আমার দুর্দশা দেখিবেন না? মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত করিয়া অমৃত দুয়ারে লইয়া যাইবেন না? হে দেব, হে পিতা, আমরা "শতবার পড়ি ভুলে" তুমি "শতবার লও তুলে"। তাই যদি না হইবে তবে তোমাকে পিতা বলি কেন? তবে তোমাকে করুণাময়ী জননী বলিয়া ডাকি কেন? তবে তোমাকে প্রাণের প্রাণ, সখার সখা বুঝিয়া কি প্রয়োজন?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই অনুতাপ অর্থাৎ ঈশ্বরের আদেশের বিপক্ষে কর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া, তাঁর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিচালক নিয়মের বিঘ্ন করিয়াছি বলিয়া যে তাঁর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা – তাঁর নিকটে আত্মনিবেদন করিয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা—ইহাকেই পাপের শ্রেষ্ঠতম ঔষধ বলিয়া ভারতের পুণ্যশ্লোক ঋষিগণ উত্তমরূপে বুঝিয়াছিলেন; তাঁহাদেরই হৃদয় হইতে জলদগম্ভীরস্বরে ধ্বনি উঠিল

"প্রায়শ্চিত্তানাশেষাণি তপঃকর্ম্মাত্মকানি বৈ।
যানি তেষাং অশেষাণাং ব্রহ্মানুস্মরণং পরম্॥"

বিষ্ণুপুরাণ।

ইহার ভাব এই যে প্রায়শ্চিত্তবিধি অনেক প্রকারই আছে কিন্তু তন্মধ্যে ব্রহ্মানুস্মরণই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ধন্য সেই ঋষি, যিনি অনুতাপের যথার্থ মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং যাঁহার মুখারবিন্দ হইতে এরূপ সুমধুর বাক্য নিঃসৃত হইয়াছে।

এখন এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে যদি আমাদের শাস্ত্রে অনুতাপই পাপের প্রধান ঔষধ বলিয়া পরিগণিত হইল, তবে আবার অন্যান্য প্রায়শ্চিত্তবিধি আসিল কি প্রকারে? ইহার উত্তরে এই মনে হয় যে, যতদিন ভারতবর্ষে ব্রহ্মনাম ঘোষিত হইত, যতদিন এখানে ব্রহ্মকৃপার মহিমা কীর্ত্তিত হইত, যতদিন এখানে ব্রহ্মজ্ঞান আলোচিত হইত, এবং যতদিন এখানে উপনিষদের প্রখর সূর্য্যালোক আর্য্যসন্তানের মোহান্ধকার বিদূরিত করিতে সমর্থ হইত, ততদিন অনুতাপই পাপের মহৌষধ বলিয়া পরিচিত ছিল; ততদিন পাপের প্রতীকারে কেবলমাত্র অনুতাপেরই একাধিপত্য ছিল। কিন্তু যখন ক্রমে দেব, উপদেব সেই দেবাধিদেব ব্রহ্মের স্থান অধিকার করিল; যখন পৌত্তলিকতার ঘোর অন্ধকার উপনিষদের সূর্য্যালোককে

আবৃত করিল, তখনই ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্ম-কৃপায় নির্ভর কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল! তৎপরিবর্তে যাগযজ্ঞ, শরীরশোষণ প্রভৃতি নানা প্রকার বাহ্যাড়ম্বরই পাপক্ষয়ের মহৌষধ বলিয়া তদানীন্তন শাস্ত্রের সংবাদ পত্রে ভূয়োভূয়ঃ বিজ্ঞাপিত হইতে লাগিল।

অজ্ঞাত-ইতিহাস ভারতবর্ষ বলিয়া আমি ইহা আনুমানিক কথা বলিতেছি না। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই ইহার যাথার্থ্য অবগত হওয়া যাইবে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মপুস্তকের একটী গানে কোন ব্রহ্মবাদী বলিতেছেন যে "হে প্রভু, তুমি বলি প্রার্থনা কর না, নইলে আমি দিতাম; তুমি দগ্ধমাংসের আহুতি ইচ্ছা কর না। অনুতপ্ত হৃদয়ই ঈশ্বরের নিকটে বলি-স্বরূপ; হে ঈশ্বর তুমি অনুতপ্ত হৃদয়কে কখনই ঘৃণা করিবে না।"* অনুতপ্ত-হৃদয় ব্রহ্মবাদী কি সুন্দররূপেই অনুতাপের ভাব প্রকাশ করিয়াছেন! আবার ব্রহ্মবাদী ঈশাও বলিলেন যে "অনুতাপ কর," (St. Matt IV. 17.) তিনি বুঝিয়াছিলেন যে আত্মগ্লানিই নরক এবং আত্মপ্রসাদই স্বর্গ; তাই পাপী মনুষ্যকে অনুতাপ করিতে অনুশাসন করিলেন; কারণ তাহা হইলেই অনুতাপের অমৃতবারিতে আত্মগ্লানি ধৌত হইয়া আত্মপ্রসাদের পবিত্র বিমল বায়ু প্রবাহিত হইবে। তাঁহার শিষ্যগণও এই অনুতাপের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন (The Acts III. 19.) যতদিন ব্রহ্মজ্ঞানের চর্চ্চা ছিল, যতদিন ব্রহ্মকৃপার উপর নির্ভর ছিল, ততদিন অনুতাপ—যথার্থ হৃদয়ের অনুতাপই আদৃত হইত! কিন্তু যখনই কোন রূপ উপধর্ম্ম কোন উপায়ে মনুষ্যদিগের হৃদয়ে মালিন্য স্তর নিক্ষেপ করিয়াছে, তখনই হয় দগ্ধাহুতি কিম্বা মনুষ্য-পূজা অথবা অর্থের বিনিময়ে প্রদত্ত ধর্ম্ম-যাজকদিগের দুএকটা বচনমাত্র পাপক্ষয়ের কারণ ও মুক্তির সোপান বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

এখন দেখিলাম যে, যেখানেই ব্রহ্ম-নাম, সেইখানেই অনুতাপের মহিমাগান। এক দিকে যেমন প্রভাত সূর্য্যের উত্থান-স্থান প্রাচ্যভূমি পাপক্ষয়ে শক্তি কীর্ত্তন করিয়াছে, অপরদিকে সেইরূপ অস্তমিত রবির পতনস্থান পাশ্চাত্যভূমিও অনুতাপ-কেই পাপ হইতে মুক্তির কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছে।

অনুতাপই পাপের শ্রেষ্ঠতম প্রায়শ্চিত্ত। কোন ধর্ম্মশাস্ত্র যদি যাগযজ্ঞ বা শরীর-শোষণকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া থাকেন, তাহা আমরা গ্রাহ্য করিব? যাগযজ্ঞ তো বহির্ব্বস্তু লইয়াই হয়; কিন্তু যেখানে আমাদের হৃদয় কাঁদি-তেছে সেখানে বহির্বস্তু তো দূরের কথা—স্বীয় শরীরের প্রতিও কিছুমাত্র লক্ষ্য থাকে না। তবেই দেখিতেছি যে যাগযজ্ঞ আমাদের প্রায়শ্চিত্ত হয় না; কেবল মন্দ কর্ম্মে লিপ্ত না থাকিয়া খেলায় মন দেওয়া হয় মাত্র। শরীরশোষণও পাপের প্রায়শ্চিত্ত নহে। যাঁহারা উপবাসাদির প্রতি অধিক আদর প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা এইভাবে করিয়াছেন যে ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করা অপেক্ষা মৃত্যুও ভাল; অতএব যদি পলে পলে শরীরের বিনাশ সাধন করিয়াও

---

* Thou desirest not sacrifice, else would I give it, thou delightest not in burnt offering. The sacrifices of God are a broken spirit; a broken and a contrite heart, O God, thou will not despise. (Ps LI. 16, 17.)

পাপ প্রবৃত্তি সকলের ধ্বংশ হয়—তাহাও ভাল। তবে কি সেই প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ বুঝিতেন না যে শরীরনাশের সঙ্গে যেমন অসৎপ্রবৃত্তির হ্রাস হয়, সেইরূপ সৎকার্য্য করিতেও অক্ষমতা জন্মে? ইহা বুঝিয়াই তাঁহারা বলিতেছেন

"বশে কৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
সর্ব্বান্ সংসাধয়েদর্থানক্ষিন্বন্ যোগতস্তনুম্॥"

যাহাতে শরীর ক্ষীণ না হয়, এমত উপায় দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত করিয়া সর্ব্বার্থ সাধন করিবেক। বিষয়-সুখ উপভোগ করিলেই অন্যায় কর্ম্ম হয় না। "চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞানোপার্জ্জন ও হস্তপদ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া লোকলোকান্তরগামী আত্মা জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত হইতে থাকিবে, এই জন্য পরমেশ্বর দুইপ্রকার ইন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার এমনি করুণা যে, তাহার সঙ্গে বিষয়সুখ আস্বাদন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে অনুমতি দিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় লাভের প্রধান উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া কেবল তাহার আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপ বিষয়-সুখের উপভোগেই নির্ব্বৃত হইয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই অপগতি প্রাপ্ত হয়।"

আবার যাঁহারা বলেন যে পাপী মনুষ্য ও ঈশ্বরের মধ্যে এক পুণ্যবান্ ব্যক্তিকে মধ্যবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিলে পাপীর পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি যে, আমি যদি পাপ করি, অপরে তাহার শাস্তি গ্রহণ করিবে কেন? ইহাই কি ন্যায় বিচার? তাই যদি হইত, তবে শতসহস্র ব্যক্তিকে মধ্যবর্ত্তী মানিলেও পাপ করিলে আমরাই স্বয়ং তাহার জন্য আত্মগ্লানি ভোগ করি কেন? পুণ্যের সময়ে আমরাই যেমন আত্মপ্রসাদ উপভোগ করি, পাপের সময়েও আমরাই তেমন আত্মগ্লানি ভোগ করি। তবে আর অপর ব্যক্তি আমাদের পাপ গ্রহণ করিলেন কিরূপে?

এতক্ষণ প্রায়শ্চিত্তের একটী অঙ্গ অনুতাপের বিষয় বলিয়া আসিলাম। প্রায়শ্চিত্তের অপর অঙ্গ পাপ হইতে বিরত হইয়া পুণ্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া। মনুষ্য কখনও চুপ করিয়া থাকিতে পারে না; হয় সে পুণ্যের পথে যাবে, নতুবা অপুণ্যের পথে যাবে; পুণ্যেও যাবে না, অপুণ্যেও যাবে না—একথা একেবারেই অসম্ভব। মনুষ্য কখনই নির্ব্বিকারচিত্তে, সংসারের সহিত একেবারেই নির্লিপ্ত ভাবে থাকিতে পারে না। এই জন্য যখনই অনুতাপাগ্নি পাপরাশিকে ভস্মীভূত করিয়া দেয়, তখনই মনুষ্যের পুণ্যপথে গমনই শ্রেয়ঃ। প্রায়শ্চিত্তের দুইটি অঙ্গের মধ্যে "অনুশোচনা ঈশ্বরের নিয়মানুসারে উপস্থিত হয়; অপর অঙ্গ মনুষ্যকে যত্নপূর্ব্বক সম্পাদন করিতে হইবে। সর্ব্বদা আপনাকে পরীক্ষা করিবেক এবং পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবেক ও পাপদ্বারা আপনার যাহা কিছু অনিষ্ট হইয়াছে পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা তাহার পরিহার করিবেক।" আমরা যে ঈশ্বরের প্রসাদে স্বাধীন ইচ্ছা পাইয়াছি, সেই স্বাধীন ইচ্ছার যেন অপব্যবহার না করি। আমাদিগের কর্ত্তব্য যে আমরা আপন ইচ্ছায় মঙ্গলের দিকে যাই এবং মঙ্গলের দ্বারা অমঙ্গলকে পৃথিবী হইতে দূর করিয়া দিই। আমাদিগের ইহা একটী শ্রেষ্ঠ অধিকার যে আমরা পশুদিগের ন্যায় প্রবৃত্তি মাত্রেরই বশবর্ত্তী না হইয়া, ভালমন্দ উভয়েরই পথ অনুসরণ না করিয়া ইচ্ছা করিলেই ভালর পথে যেতে পারি; ইচ্ছা করিলেই পাপের দুর্গন্ধের পরিবর্ত্তে পুণ্যের সুগন্ধ আনয়ন

করিতে পারি।" "পুণ্যং প্রাণান ধারয়তি পুণ্যং প্রাণদমুচ্যতে। পুণ্য জীবের প্রাণ ধারণ করেন, পুণ্য প্রাণদাতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। পুণ্যবান্ মনুষ্য ইহকালে পবিত্র কীর্ত্তিলাভ ও পরকালে উন্নত লোকে গমন করেন।"

আজ যখন এখানে আসিয়াছি—আজ যখন এই বৎসরের শেষ দিনে একত্র মিলিত হইয়াছি, তখন ঈশ্বরের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা না করিয়া যেন গৃহে প্রত্যাগমন না করি। তিনি যখন তাঁহার বিদ্রোহী সন্তানেরও বেদনা নিবারণ করেন, তখন এই যে তাঁহার ভক্তসমাজ—ইহাদিগের হৃদয়ের ক্রন্দন শুনিবেন না?

হে দয়াময় পিতা, অন্তর্যামী ভগবান্, তোমার চরণপ্রান্তে আজ আমরা পাপ-তাপে উত্তপ্ত হৃদয় উপহার আনিয়াছি—তুমি ইহা গ্রহণ কর। তুমিই জান সেই বৎসরের প্রারম্ভে তোমার নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন—তোমার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে তোমার আদেশের বিরুদ্ধে একপদও অগ্রসর হইব না, পাপের দিক দিয়াও যাইব না; কিন্তু হায়! আজ যে এই বৎসরের শেষ দিনে আসিয়াছি—আজ কি সেই বিশুদ্ধ হৃদয় আনিতে পারিয়াছি? না। কতবার পাপে নিমগ্ন হইয়া ছিলাম—কতবার তোমার আদেশের বিপক্ষে একপদের পরিবর্ত্তে দশপদ অগ্রসর হইয়াছিলাম। হে করুণাময়ী জননি, তোমার নিকটে আজ পাপদগ্ধ হৃদয় আনিয়াছি; তুমি আমাকে মার্জ্জনা করিয়া তোমার ক্রোড়ে তুলিয়া লও; তুমি সর্ব্বদাই আমার সম্মুখে প্রকাশিত থেকো। তোমার নিকট বারম্বার এই প্রার্থনা করি যে, তুমি আমাকে পাপ হইতে রক্ষা কর; পাপের বিন্দুমাত্র হৃদয়ে দেখা দিলে বজ্রের আঘাতে তাহা দগ্ধ করিয়া ফেলিও। তোমার প্রেমমুখ দেখিয়া আমার সমুদয় বিঘ্ন দূর হইয়া যাউক; আমার হৃদয় পবিত্র হউক। আমার হৃদয়ে তোমার শুভ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর—তোমার শুভ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার শিষ্যগণ।

সনাতন গোস্বামী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ সাধুর শরীরে সকল মহাগুণের সঞ্চার হয়। হে সনাতন! সংক্ষেপে বৈষ্ণব লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ কর। কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যবাদী, নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন, সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ, অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিতষড়গুণ, মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী, গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী এই সকল বৈষ্ণব লক্ষণ বলিয়া জানিবে। ভাগবতে দেবহূতিকে কপিলদেব বলিয়াছেন, সাধু ব্যক্তি সর্ব্বদুঃখসহনশীল, কারুণিক ও সকল প্রাণীর সুখদ; তাঁহার কেহ শত্রু নাই, তিনি শান্ত ও সরলস্বভাব এবং সুশীলতাই তাঁহার ভূষণ স্বরূপ। হে সনাতন! সাধুসঙ্গ হইতেই হরিভক্তির জন্ম হয়। ভাগবতের উপদেশ এই, পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন, মহৎসেবা সাধুসঙ্গই মুক্তির দ্বার, আর যোষিৎসঙ্গীদিগের সঙ্গই নরকের দ্বার। সেই সাধুরাই মহৎ, যাঁহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী, প্রশান্তচিত্ত, ক্রোধশূন্য, বন্ধুভাবাপন্ন ও সদাচার সম্পন্ন। সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য অসীম। ভাগবতে কথিত হইয়াছে;

"অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ।"
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাং॥

হে অনঘ ঋষিগণ! আপনাদিগকে এখন আত্যন্তিক মঙ্গলকর বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। এ সংসারে ক্ষণকালমাত্র সৎসঙ্গ লাভে ও মহানিধি লাভ হয়।

"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসম্বিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মণি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥"

সাধুজনের সহিত প্রকৃষ্টরূপে সঙ্গ হইলে, আমার বীর্য্য প্রকাশক হৃৎকর্ণরসায়ন কথা উপস্থিত হইয়া থাকে। তাহা শ্রবণ দ্বারা অপবর্গবর্ত্মস্বরূপ শ্রীহরিতে প্রথমতঃ শ্রদ্ধা তৎপরে রতি ও অবশেষে ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সনাতন! অসৎসঙ্গই অনর্থের মূল। অসৎসঙ্গ ত্যাগই বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ সদাচার। স্ত্রীসঙ্গীদিগকে অসাধু ও অভক্ত বলিয়া জানিবে।

"ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥"

রমণীসঙ্গ ও রমণীসঙ্গীদিগের সঙ্গ যেমন মোহ ও বন্ধনের কারণ, অন্যের সঙ্গ তেমন নয়।

"সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধি হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎ সঙ্গাৎ যাতি সংক্ষয়ং॥"

হে সনাতন! অসাধুসঙ্গে সত্য শৌচ দয়া সৎপ্রবৃত্তি বুদ্ধি লজ্জা শ্রী যশ ক্ষমা শম দম ঐশ্বর্য্য সকলি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

"তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষুচ॥"

যাহাঁরা অশান্ত, মূঢ়, খণ্ডিতাত্মা অর্থাৎ দেহেতে যাহাদের আত্মবুদ্ধি, যাহারা শোকের পাত্র এবং ক্রীড়ামৃগের ন্যায় যোষিগণের একান্ত অধীন; সেই সকল অসাধু জনের সঙ্গ করিবে না। ভক্ত বৈষ্ণব এই সকল দুঃসঙ্গ ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অসার কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া তৃণাদপি সুনীচ অকিঞ্চন হইয়া শ্রীহরির শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। সর্ব্বশক্তিমান, ভক্তবৎসল করুণাময় ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া পণ্ডিতগণ কখন অন্যের ভজনা করেন না। শরণাগত অকিঞ্চন ভক্তের লক্ষণ এই, ঈশ্বরসেবার অনুকূল বিষয় গ্রহণ ও প্রতিকূল বিষয় বর্জ্জন, 'ভগবান আমাকে রক্ষা করিবেন' এই বিশ্বাস, তাঁহার রক্ষিতৃত্বে আত্মসমর্পণ, তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধনে সুখ দুঃখ চিন্তা না করিয়া আত্ম নিক্ষেপ করা এবং তাঁহার শরণ বিষয়ে নিষ্ঠাযুক্ত মতি, এই ছয়টি শরণাগতের লক্ষণ। ভাগবতে ভগবান বলিয়াছেন;

"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়াস চ কল্পতে বৈ॥"

মরণশীল মনুষ্য যখন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার সেবাতে আত্ম নিবেদন করেন, তখন তিনি অমৃতত্বলাভ করিয়া মত্তুল্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির যোগ্য হয়েন।

"পূর্ব্ব আজ্ঞা বেদ ধর্ম্ম কর্ম্ম যোগ জ্ঞান।
সব সাধি শেষে এই আজ্ঞা বলবান॥
এই আজ্ঞাবলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয়।
সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয়॥
শ্রদ্ধাশব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণ ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়॥
শ্রদ্ধাবান জন হয় ভক্তি অধিকারী।
উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুসারী॥
শাস্ত্র যুক্তি শুনি পুনঃ দৃঢ় শ্রদ্ধা যাঁর।
উত্তম অধিকারী তিঁহ তরয়ে সংসার॥
শাস্ত্র যুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান।
মধ্যম অধিকারী সেও মহাভাগ্যবান॥

যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন।
ক্রমে ক্রমে তিঁহো ভক্ত হইবেন উত্তম॥
রতি প্রেম তারতম্যে ভক্তি তর তম।
একাদশ স্কন্দে তার করিয়াছে লক্ষণ॥
সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে॥
এই সব গুণ হয় বৈষ্ণব লক্ষণ।
সবকহা না যায় করি দিগ দরশন॥
কৃপালু অকৃত দোহ সত্য সার সম।
নির্দ্দোষ বদান্য মৃদু শুচি অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক শান্ত কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম নিরীহ স্থির বিজিতষড়্গুণ॥
মিতভুক অপ্রমত্ত মাদন অমানী।
গম্ভীর করুণ মৈত্র কবি দক্ষ মৌনী॥
কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তিঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ॥
অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥
এত সব হাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণের শরণ॥
ভক্তবৎসল কৃতজ্ঞ সমর্থ বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য॥
বিজ্ঞ জনের হয় যদি কৃষ্ণ গুন গান।
অন্য ত্যজি ভজে তাতে উদ্ধব প্রমাণ॥
শরণাগত অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্ম সমর্পণ॥
শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তাঁরে করে তৎকালে আত্ম সম॥

চৈ চঃ মধ্য খণ্ড ২২ অধ্যায়।

চৈতন্য বলিলেন হে সনাতন! সাধন-ভক্তি হইতেই মহাধন ভগবৎপ্রেম লাভ হয়। স্বভাবজাত স্বতঃসিদ্ধ ভাবগুলিকে হৃদয়ে উদ্দীপন করার নামই সাধন। ভগবৎপ্রেম নিত্যসিদ্ধ বস্তু, শুদ্ধান্তঃকরণে ভগবানের মহিমা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি দ্বারা হৃদয়ে সেই প্রেমরস উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। সাধন ভক্তি দুই প্রকার বৈধী ও রাগানুগা। স্বাভাবিক অনুরাগ নাই, অথচ শাস্ত্রের আজ্ঞায় যে ভজনা তাহাই বৈধী অর্থাৎ বিধিসিদ্ধ। গুরুপদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরু-সেবা, সদ্ধর্ম্মজিজ্ঞাসা, সাধুদিগের অনুগমন, তীর্থবাস, ভোগত্যাগ; নির্ব্বাহের অতিরিক্ত ভিক্ষা না করা, সেবা ও নামাপরাধ বর্জ্জন, অবৈষ্ণব সঙ্গত্যাগ, সাধুসহবাস শিষ্যবৃদ্ধি-বর্জ্জন, বহুগ্রন্থাভ্যাস বর্জ্জন, লাভক্ষতিতে সমজ্ঞান, শোকাদির অবশীভূততা, অন্য-দেবতা ও অন্যশাস্ত্রের অবজ্ঞা না করা, মনোবাক্যে প্রাণীমাত্রের উদ্বেগের কারণ না হওয়া, ও শ্রবণ কীর্ত্তন পরিচর্য্যা বিজ্ঞপ্তি আত্মনিবেদন প্রভৃতি সাধনভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ। কেহ বা এক অঙ্গ কেহবা বহু অঙ্গ লইয়া সাধন আরম্ভ করেন। এক অঙ্গ-সাধনেও অনেক ভক্ত সিদ্ধ হইয়াছেন। অম্বরীষাদি ভক্তগণ বহু অঙ্গের সাধন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহাতে নিষ্ঠা হইলে হৃদয়-নদীতে প্রেমের তরঙ্গ-লহরী ক্রীড়া করিতে থাকে। শাস্ত্রোক্ত এই সকল অঙ্গ সাধনের নাম বৈধী ভক্তি। শাস্ত্রআজ্ঞা মান্য করিয়া কমনাত্যাগ করত যাঁহারা বৈধী ভক্তিতে ঈশ্বরের ভজনা করেন, তাঁহারা দেবতা ঋষি ও পিত্রাদির ঋণ হইতে মুক্তি লাভ করেন। *

"এবে সাধন ভক্তি কহি শুন সনাতন।
যাহা হইতে পাই কৃষ্ণে প্রেম মহাধন॥

* "দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কৃত্যং।"

ভাগবত—একাদশ স্কন্ধ।

হে রাজন্! যিনি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কৃত্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে মুকুন্দের শরণাপন্ন হইয়াছেন; তিনি দেবতা ঋষি, প্রাণী, কুটুম্ব বা পিত্রাদি কাহারও নিকট ঋণী বা কাহারও কিঙ্কর নহেন।

শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ।
তটস্থ লক্ষণে উপজায় প্রেমধন॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥
এই ত সাধন ভক্তি দুইত প্রকার।
এক বৈধী ভক্তি, রাগানুগ ভক্তি আর॥
রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায়।
বৈধীভক্তি বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
বিবিধাঙ্গ সাধন ভক্তি বহুতবিস্তার।
সংক্ষেপে কহিরে কিছু সাধনাঙ্গ সার॥

… … …

চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব।

… … …

এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্টা হৈলে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ॥
এক অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ।
অম্বরীষাদি ভক্তের বহু অঙ্গ সাধন॥
কামত্যাগী কৃষ্ণভজে শাস্ত্র আজ্ঞা মানি।
দেবঋষিপিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী॥”

চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড ২২ অধ্যায়।

এইত বৈধীভক্তি সাধনের বিবরণ কহিলাম। রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ কহিতেছি শ্রবণ কর। রাগানুগা ভক্তি বিধি নিষেধ নিরপেক্ষ, কেবল রাগময়ী, এইজন্য বৈধী অপেক্ষা তাহা অতি প্রবলা। বৈধী ভক্তির উদ্দেশ্য এই যে, সাধনে স্বাভাবিক রুচি ও অনুরাগ না থাকিলেও শাস্ত্রবিধির অধীন হইয়া সাধন করিলে ক্রমে প্রকৃত প্রেমরসের উদ্দীপন হইবে; কিন্তু স্বাভাবিক রুচিতে অনুরাগ-পথে আত্ম সমর্পণই রাগানুগত ভক্তি। ইহাতে শুষ্ক বিধির অধীনতা বশতঃ সাধনে ক্লেশ বোধ হয় না, সুতরাং সহজেই পরমেশ্বরের প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই জন্য বিশুদ্ধ অনুরাগের পথে ঘৃণাস্পদ নিষিদ্ধ পাপাচারে মন নিমগ্ন হওয়া অসম্ভব। ভক্ত মোহবশতঃ যদি কখনও বিকর্ম্মে পতিত হয়েন, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত না করাইয়া ভক্তবৎসল হরি ভক্তের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে পবিত্র করেন। মাধুর্য্যরসের রসিক ব্রজবাসী জনেরই ইহাতে মুখ্য অধিকার। ইষ্ট বিষয়ে কি না অভিলষিত বস্তুতে স্বাভাবিক প্রেমময় গাঢ় তৃষ্ণা ও অনুরাগ ইহার স্বরূপ লক্ষণ। আর আবিষ্টতা তটস্থ লক্ষণ। রাগানুগত ভক্তিতে শাস্ত্রযুক্তির কোন অপেক্ষা নাই। যিনি এই স্বাভাবিক ভাবরসে মগ্ন হইয়া ভগবানে আত্ম সমর্পণ করেন, তাঁহার হৃদয়ে অচিরাৎ ভগৎপ্রীতি ও রতি অঙ্কুরিত হয়। এবম্বিধ ভক্তেরাই ভগবানকে আত্মবৎ প্রিয়, পুত্রবৎ স্নেহপাত্র, সখার ন্যায় বিশ্বাসভাজন, গুরুর ন্যায় উপদেষ্টা, বন্ধুর ন্যায় হিতকারী ও ইষ্টদেবতুল্য পূজনীয় জ্ঞান করিয়া এইরূপে সর্ব্বতোভাবে ভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন, সুতরাং কালচক্র হইতে তাঁহাদের কোন আশঙ্কা নাই। *

“বিধি ধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ।
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন॥
অজ্ঞানেও হয় যদি পাপ উপস্থিত।
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করেন না করে প্রায়শ্চিত্ত॥
জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
অহিংসা নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণ সঙ্গ॥
বিধি ভক্তি সাধনের কহিল বিবরণ।
রাগানুগা ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন॥
রাগানুগা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসী জনে।
তার অনুগত ভক্তের রাগানুগ নামে॥
ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগ স্বরূপ লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থ লক্ষণ কথন॥
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান॥

* ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধ ২৫শ অধ্যায়।

লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি।
শাস্ত্র যুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥
বাহ্য অন্তর ইহার দুইত সাধন।
বাহ্যে সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্ত্তন॥

... ...

এই মত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি।
কৃষ্ণের চরণে তার উপজয়ে প্রীতি॥
প্রেমাঙ্কুরে রতি, ভাব হয় দুই নাম।
যাহা হইতে বশ হন শ্রীভগবান॥
যাহা হইতে পাই কৃষ্ণের প্রেমরস ধন।
এই ত কহিল অভিধেয় বিবরণ॥

চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড ২২ অধ্যায়।

ক্রমশঃ।

নববর্ষ ব্রাহ্মসমাজ।

১ বৈশাখ সোমবার, ব্রাহ্মসম্বৎ ৬২।

যাঁহার মঙ্গল ইচ্ছায় সংবৎসর পরিবর্ত্তিত হইতেছে—ঋতু-চক্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে—সূর্য্যের উদয়াস্ত হইতেছে—এবং মনুষ্যের আত্মাতে জ্ঞানধর্ম্ম বিকসিত হইয়া অপরিবর্ত্তনীয় সত্য এবং মঙ্গলের প্রতি হস্ত প্রসারণ করিতেছে বৎসরের প্রারম্ভ মুহূর্ত্তে সেই মঙ্গলের আকর পরম দেবতাকে বার বার নমস্কার করি। আমরা সুখেই থাকি দুঃখেই থাকি; সম্পদেই থাকি বিপদেই থাকি—সকল সময়েই আমরা তাঁহারই মঙ্গল-ক্রোড়ে অবস্থিতি করিতেছি;—তিনিই আমাদের অন্ধকারের জ্যোতি—শোকতাপের শান্তিবারি—বিপদের কাণ্ডারী। তাই আমরা এই কল্যাণ মুহূর্ত্তে নূতন বৎসরের দ্বারোপান্তে কৃতাঞ্জলি-পুটে দণ্ডায়মান হইয়া প্রথমেই তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিতেছি—তিনি আমাদিগকে চিরজীবন তাঁহার মঙ্গলচ্ছায়ায় রক্ষা করুন।

সংসারের নামই পরিবর্ত্তন—কাল পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ধন জন জীবন পরিবর্ত্তিত হইতেছে,এই পরিবর্ত্তনের তুমুল বিভ্রান্তির মধ্যে আত্মার অভ্যন্তরে পরমাত্মার মুখ জ্যোতিই মঙ্গলের একমাত্র ধ্রুব তারা। তাঁহার মঙ্গল জ্যোতি অন্তরে প্রকাশিত হইলে সংসার-সমুদ্রের তুমুল কোলাহল তৎক্ষণাৎ নিস্তব্ধ হইয়া যায়, এবং মোহ-শোকের যবনিকা অপসারিত হইয়া গিয়া মনশ্চক্ষুতে দেবলোকের মহিমা প্রভাসিত হইয়া উঠে। ভগবদ্ভক্ত সাধু সজ্জনের নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক পবিত্র আত্মা হইতে দেবলোক দূরে অবস্থিতি করে না; যেখানে পরমাত্মার মুখ-জ্যোতি প্রকাশমান সেই খানেই পুণ্য লোক, সেইখানেই দেবলোক, সেখানেই মোক্ষধাম। ইহ লোকে বা পরলোকে সত্য সুন্দর মঙ্গল স্বরূপ পরমাত্মার জ্যোতির্ম্ময় সন্নিধানে যাঁহারা সুবিমল আনন্দে নিরন্তর ভাসিতেছেন,সেই জগৎবাসী অমৃতের পুত্র কন্যাগণের সহিত এক সঙ্গে মিলিয়া অদ্য আমরা আমাদের পরম-দেবতার মহিমা গানে, বিগত বৎসরের সমস্ত রোগ শোক পাপতাপ দূরে নির্ব্বাসিত করিয়া দিব এবং সম্মুখাগত বৎসরের প্রারম্ভে হৃদয়াভ্যন্তরে দিগন্তভেদী মঙ্গল-সোপানের মূল পত্তন করিব—তাই আমরা অদ্য এখানে সবান্ধবে সমাগত হইয়া সর্ব্বাগ্রে নিখিল মঙ্গল-বিধাতা পরমাত্মার প্রসাদ যাচঞা করিতেছি।

হে বিঘ্নবিনাশন পতিত পাবন জগতের পিতামাতা! তোমার অভয় মঙ্গল মূর্ত্তি আমাদিগের নিকট প্রকাশিত কর। সূর্য্যের জ্যোতিতে যেমন তুমি পৃথিবীকে জ্যোতিষ্মান কর, তেমনি তোমার আনন্দ জ্যোতিতে আমাদের আত্মাকে জ্যোতিষ্মান কর। অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যের

পথে লইয়া যাও—অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও—মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতের পথে লইয়া যাও—তুমি আমাদের নিকটে প্রকাশিত হও! তোমার সত্য জ্যোতি এবং মঙ্গল-জ্যোতিতে আমাদের বিষাদ অন্ধকার দূর করিয়া দেও—তোমার অমৃত বারিতে আমাদের পাপতাপ ধৌত করিয়া আমাদের মনঃ প্রাণ হৃদয়কে নবীভূত কর, তুমিই আমাদের আত্মার প্রাতঃসূর্য্য—তোমাকে আমরা বার বার নমস্কার করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সুখ।

সংসার-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কাহার না একবার মনে হয় কিসের আশায় ভাসিতেছি, আমার জীবন-তরীর লক্ষ্য কি, এবং কি ভাবে জীবনতরী চালাইলে সে লক্ষ্য সাধিত হয়। প্রকৃত পক্ষে যদিও এই সকল হৃদয়োদ্বেজক প্রশ্ন মনুষ্যজ্ঞানাতীত তবুও মনুষ্যজ্ঞানসাধ্য মীমাংসা দ্বারা জীবনের লক্ষ্য স্থির ও তদনুযায়ী কর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়া না লইলে জীবন-ভার নিরতিশয় দুর্ব্বহ হইয়া উঠে। সাত্বিক হৃদয়ে অনিসন্ধিৎসু হইয়া বিশেষ অনুধাবন করিলে উপলক্ষিত হয়, হৃদয়কে অক্ষয় সত্য ও অনন্ত সৌন্দর্য্যের দিকে ক্রমে অগ্রসর করাইয়া হৃদয়-নিহিত ঐশী শক্তিকে পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা স্বীয় শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি নিচয়ের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন ও তদ্দ্বারা পরকীয় বৃত্তি নিচয়ের উন্নতি সাধন চেষ্টাই জীবনের মূল লক্ষ্য। কিন্তু হৃদয়ের অন্তস্তম প্রদেশ তন্ন তন্ন করিয়া খুজিয়া দেখিলে ইহা ও স্পষ্টই অনুভূত হয় যে জীবনের এই উদ্দেশ্যের সহিত মানবের সুখ আশাও অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত আছে। আত্মা ও শরীর লইয়া মনুষ্য। আত্মার আকাঙ্ক্ষার সহিত শরীরের আকাঙ্ক্ষা এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট য আমরা আত্মার আকাঙ্ক্ষা শরীরের আকাঙ্ক্ষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া অনুভব করিতে পারি না। যদিও ইহা বেশ উপলব্ধি হয় যে হৃদয়-নিহিত ঐশীশক্তিকে হৃদয়ঙ্গম করিতে বা স্বীয় ও পরকীয় বৃত্তিনিচয়ের উন্নতি সাধন করিতে যায়—সুখের জন্য নহে—সুখই আমাদের মূল উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু ঐ মূল উদ্দেশ্যে যে আমাদের প্রকৃত সুখ নিহিত আছে এ কথা ঠিক। ঐশী শক্তিকে পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করা ও স্বীয় ও পরকীয় বৃত্তি সমূহের যথাযথ উৎকর্ষ সাধন করাই চরম লক্ষ্য বটে কিন্তু ইহার সহিত পূর্ণ পবিত্র অক্ষয় অনন্ত সুখ যেন মিশামিশী ভাবে আছে।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে গৌণ কল্পেই হউক বা মুখ্য কল্পেই হউক সংসারে সকলেই তরী চালাইতেছে সুখের আশায়। সুখ-সূর্য্যই মানব জগতের কেন্দ্র, মানব সতত সুখের জন্য উন্মত্ত। তরঙ্গিণীর তরঙ্গেরও ভঙ্গ আছে কিন্তু মানবের হৃদয়-তরঙ্গিণীতে সুখ-আশা-তরঙ্গের ভঙ্গ নাই, বিশ্রাম নাই। অবিশ্রান্ত ভাবে অবিরাম গতিতে এ তরঙ্গ চলিতেছে। একটী আশাতরঙ্গ হৃদয়ে মিলাইতে না মিলাইতে আর একটী আশাতরঙ্গ আসিয়া তাহার স্থান জুড়িয়া লইতেছে। যে সুখের জন্য মানবকুল এত আকুল সে সুখের স্বরূপ ও উপাদান কি এবং তাহার তৃপ্তি হয় কিরূপে ইহা সকলেরই চিন্তনীয়।

এ সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই। বহির্জগতে যেমন আলোক ও অন্ধকার অন্ত-

র্জগতেও তেমনি সুখ ও দুঃখ। "জোছনা ও যামিনীতে প্রণয় যেমন, তেমনী মিলিয়া এরা রোয়েছে দুজন" দুইটী এরূপ ভাবে জড়িত যে একটীর অভাবে অন্যটীর পূর্ণ বিকাশ হয় না। তাই একজন কবি গাহিয়াছেন 'নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে' আর এক জন বলিয়াছেন 'সুখের মুখেতে থাকে দুঃখের কালিমা,দুঃখের হৃদয়ে জাগে সুখের প্রতিমা'। সুখ দুঃখে নিত্য সম্বন্ধ। দুঃখ না ভুগিলে সুখ বুঝা যায় না। অমানিশির কালকাদম্বিনী না হেরিলে শরৎশশীর পূর্ণ শোভা পূর্ণরূপে হৃদয়ে অনুভূত হয় না। যে নিরবচ্ছিন্ন সুখের আশা করে তাহার ভাগ্যে সুখ ঘটে না। সুখের ধারণা এক এক ব্যক্তির এক এক রূপ। কেহ বলেন শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি নিচয়ের পূর্ণ বিকাশ ও সামঞ্জস্যই সুখ। কেহ বলেন সুখ দুঃখ অভাব লইয়া যাহার অভাব আছে এবং সেই অভাব যত্ন করিলেই পূর্ণ হয় সেই সুখী। অভাব থাকাও চাই পূর্ণ হওয়াও চাই তবেই সুখ। যার অভাব যে পরিমাণে পূর্ণ হয় সে সেই পরিমাণে সুখী। কেহ বলেন আমাদের হিতাহিতজ্ঞান যাহা করিতে বলে তাহা করিতে পারিলেই সুখ। কবি কাউপার বলিয়াছেন 'সেই প্রকৃত সুখী যে ইহজীবনেই পারত্রিক সুখের খানিকটা বুঝিতে পারে, যে শান্তিময় নিভৃত জীবন যাপনেই আপনাকে সুখী মনে করে * * * এবং বিশ্বাসের ফল যে পুণ্য ও পুণ্যের ফল যে শান্তি সেই পুণ্য ও শান্তি যাহাকে সুখের জন্য প্রস্তুত করে'। এরিষ্টটল্ বলিয়াছেন 'যাহা সত্য সেই পথে জ্ঞানকৃত কার্য্যকুশলতাই সুখ (conscious activity in the way of truth)। মনু বলেন যে স্বাধীন সেই সুখী "সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্ সর্ব্বমাত্মবশং সুখং"। জ্ঞানভাণ্ডার বেকন বলেন সেই সুখী যাহার 'স্বীয় পারদর্শিতানুযায়ী ব্যবসায় জুটে' (He is the happy man whose abilities sort with his vocation)। কেহ বলেন মনের অবিচলিত স্থৈর্য্যই প্রকৃত সুখ। এইরূপ সুখ সম্বন্ধে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন ধারণা। সুখের এই বিভিন্ন ধারণা চিরকালই থাকিবে, কেন না যাহার যেমন শিক্ষা তাহার সেইরূপ অভাব ও আকাঙ্ক্ষা এবং যাহার যে প্রকৃতির অভাব ও আকাঙ্ক্ষা তাহার সেই প্রকৃতির সুখের ধারণা। শিক্ষাভেদে আকাঙ্ক্ষাভেদ আবার আকাঙ্ক্ষাভেদে সুখভেদ। বিভিন্ন জনের বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা কাজেই বিভিন্ন প্রকার সুখের ধারণা। হৃদয়-নিহিত ঐশী শক্তির অস্ফুটালোক যে একবার মাত্র অনুভব করিয়াছে সে সেই আলোকের ক্রমিক বিকাশ অনুভব করিতে না পারিলে কোন মতেই সুখী হইতে পারে না কিন্তু যে এই ঐশী শক্তি অনুভব করে নাই সে ইহার সুখও বুঝে না, এ বিমলানন্দের অভাবও বুঝে না। এইরূপ যে একবার মানসিক চর্চ্চায় অনুরাগী হইয়াছে সে মানসিক উৎকর্ষ সাধন না করিয়া কোন ক্রমেই সুখী হইতে পারে না। পরন্তু যে কোন দিন মানসিক চর্চ্চায় অনুরাগী হয় নাই সে ইহার সুখ বা অভাব বুঝিতে একান্ত অসমর্থ। অজ্ঞতাই যেখানে সুখের, জ্ঞানী হওয়া সেখানে মূর্খতা এটা কেবল কবিকল্পনা মাত্রই। জ্ঞান-জনিত কোন অসুখও অজ্ঞানজনিত সুখাপেক্ষা শ্রেয়ঃ। এস্থানে বলা আবশ্যক যে সুখ অসুখের মধ্যে প্রকার ভেদ আছে। সুখ নানা প্রকারের, অসুখও নানা প্রকারের। জন ষ্টুয়ার্ট মিল সুখ দুঃখের মধ্যে গুণভেদ আছে বলিয়া স্বীকার করেন। আমরা নিজে

জীবনেও ইহা বেশ বুঝিতে পারি। একটী প্রকৃত দরিদ্রকে একটী মাত্র পয়সা দান করিয়া যে অতুল বিমল আনন্দ অনুভব করা যায়, নিজের বেশ-পারিপাট্যে সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াও সে অতুলনীয় আনন্দ অনুভব করা যায় না। দরিদ্রের দুঃখ মোচনে কেমন যে একটু উচ্চ প্রকৃতির সুখ আছে তাহা অনুভব করা যায় কিন্তু বর্ণনা করা যায় না। সুখ দুঃখের মধ্যে এই যে গুণভেদ আছে ইহা দ্বারাই উচ্চ প্রকৃতির দুঃখ নীচ প্রকৃতির সুখাপেক্ষা শ্রেয়ঃ বোধ হয়। এই জন্যই বলিতেছি জ্ঞানজনিত অসুখও অজ্ঞানজনিত সুখাপেক্ষা শ্রেয়ঃ।

এক্ষণে কথা হইতেছে সুখ অন্তরে না বাহিরে। মনে না শরীরে। একথা কেহই অস্বীকার করে না যে সুখ প্রধানতঃ মনে। কবি বলিয়াছেন 'সুখ দুঃখ মনের খনিতে'। হরিণ যেরূপ স্বীয় নাভিস্থিত কস্তূরীগন্ধে আমোদিত হইয়া সেই ঘ্রাণের অনুসন্ধানে চতুর্দ্দিক বিচরণ করে কিন্তু কোথায়ও পায় না মানবও সেইরূপ স্বীয় হৃদয়স্থিত সুখ বাহ্য সম্পদে অন্বেষণ করে ও পশ্চাৎ বিফল-মনোরথ হয়। পরন্তু সুখ দুঃখ শরীরের উপরেও নির্ভর করে। শরীর-বিজ্ঞান দ্বারা যখন এ পর্য্যন্ত প্রমাণ হইয়াছে যে শারীরিক বিঘটন দ্বারা মানসিক অবস্থার বিঘটন করা যায় তখন শরীরের সুখ দুঃখের উপর যে মনের সুখ দুঃখ সম্পূর্ণ নির্ভর করে এ কথা কে অস্বীকার করিবে।

এক্ষণে সুখের উপাদান কি কি তাহাই দেখিতে হইতেছে। সুখের প্রধান উপায় স্বাস্থ্য। শরীর ভাল না থাকিলে ইন্দ্রের অমরাপুরীও আমাদিগকে সুখ দিতে সমর্থ নয়। স্বাস্থ্য সুখই প্রধান সুখ। ইহার অভাবে সুখের অন্য কোন উপাদান আমাদিগকে সুখ দিতে পারে না। এই জন্য সকলেরই প্রথমতঃ স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা দেখা কর্ত্তব্য। যে সমাজ বা যে ধর্ম্ম এই স্বাস্থ্যের ব্যাঘাতক সে সমাজ ও সে ধর্ম্ম মনুষ্যের কলঙ্ক স্বরূপ।

নিজের স্বাস্থ্যই যে কেবল সুখের উপাদান তাহা নহে যাহাদিগকে লইয়া সংসার, যাহাদের মধ্যে সর্ব্বদা থাকিতে হইবে তাহাদের স্বাস্থ্যও আমাদের সুখের উপাদান। তাহাদের স্বাস্থ্য না থাকিলে আমাদের সুখের আশা কোথায়, কাজেই স্বীয় পরিবারের প্রতিবেশীর ও দেশের স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল থাকে তাহার জন্য আমাদের একান্ত চেষ্টা কর্ত্তব্য।

সুখের তৃতীয় উপাদান প্রেম। এই প্রেম ত্রিবিধ ঈশ্বরপ্রেম, মাতাপিতার প্রতি প্রেম, ও আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের প্রতি প্রেম। যাহাতে এই প্রেমের পূর্ণ বিকাশ ও পরিণতি হয় তাহার জন্য সকলেরই চেষ্টা কর্ত্তব্য। ঈশ্বরে প্রগাঢ় ভক্তি না থাকিলে ঈশ্বর-প্রেম সম্ভবে না। প্রেমময় ঈশ্বরে অবিচলিত বিশ্বাস সুখের একটী মূল উপাদান। আমি আজি সুখের চরম সীমাতে আছি কে জানে কল্যই আমি অকূল দুঃখ-সাগরে না ভাসিব। প্রেমময় ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকিলে নির্ভয় মনে শান্ত হৃদয়ে সংসার-জ্বালা সহ্য করা যায় না।

সুখের আর এক উপাদান আত্মার অবিনশ্বরত্বে অবিচলিত বিশ্বাস। আমার আত্মা অনন্তকালব্যাপী এ বিশ্বাস যদি না থাকে, তবে সুখী হইব কি রূপে। আমার আত্মা যদি 'জলবুদ্বুদ জলে উদয় জল হ'য়ে সে মিশায় জলে' তাহা হইলে সুখ হইবে কিরূপে। আমি ইহ জীবনে

পূর্ণ ও পবিত্র সুখে সুখী কিন্তু যখনই আমার মনে হয় এ সুখ তো আমার মৃত্যুর সঙ্গেই ফুরাইবে, তখন হৃদয়ে এক অননুভূতপূর্ব্ব দুঃখ আসিয়া সুখের ব্যাঘাত করে। ইহ জীবনে পূর্ণ সুখী হইতে হইলে আত্মার অমরত্বে দৃঢ় ও অবিচলিত বিশ্বাস থাকা একান্ত আবশ্যক।

পুণ্যের প্রভাবে পূর্ণ বিশ্বাসও সুখের একটী উপাদান।

সুখী হইতে হইলে মানুষকে নীচের দিকে তাকাইতে শিক্ষা করিতে হয়। যখনই স্বীয় অভাবের কথা মনে হয় তখন একটু মনে করা উচিত ইহা অপেক্ষা আরও কত কঠোর অভাব অন্যের আছে। যে জুতা কিনিতে অসমর্থ তাহার একবার খোঁড়ার দিকে তাকান কর্ত্তব্য। এরূপ শিক্ষা সুখের একটী উপায়।

সুখী হইতে হইলে আরও কতকগুলি বিষয়ের আবশ্যক জীবনে যাহা সম্ভবপর তাহা হইতে অধিক আশা না করা। মানসিক চর্চ্চায় অনুরাগী হওয়া এবং মনের স্থৈর্য্য শিক্ষা করা। মনকে উন্নতিপ্রবণ করা এবং ক্রমিক উন্নতিই সুখের একটী মূল এ বিশ্বাস দৃঢ় ভাবে হৃদয়ে সংস্থান করা। স্থিতি হইতে উন্নতির পথে যাইবার জন্য মনের যে গতি তাহার সামঞ্জস্য থাকা আবশ্যক।

উপরোক্ত সুখের উপাদান ও উপায়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া স্বীয় জীবনের মূল লক্ষ্যের দিকে যিনি ধাবিত হইতে পারেন তিনিই ইহ সংসারে সুখ পান। প্রকৃত সুখ এই সংসারে আছে। যে বলে সুখ আশা মরীচিকা মাত্র সে ভ্রান্ত। আমরা এখানে আর একটী মাত্র কথা বলিয়া প্রস্তাব শেষ করিব। জনষ্টুয়ার্টমিল স্বীয় জীবনে অনেক ভুগিয়া বলিয়াছেন এ সংসারে নিজের সুখের কথা না ভাবিয়া যে কেবল পরের সুখই মূল উদ্দেশ্য করিয়া খাটিতে পারে সেই প্রকৃত সুখ পায়, পরের সুখের জন্য খাটিলে আপনা হইতেই নিজ সুখ হয়। আর যে নিজের জন্য সতত লালায়িত সে প্রকৃত সুখ পায় না। আমরা সুখকে জীবনের মূল উদ্দেশ্য স্বীকার করি না, কাজেই জীবনের যাহা মূল উদ্দেশ্য তাহাকে লক্ষ্য করিয়া চলিলেই সুখ পাওয়া যাইতে পারে বিশ্বাস করি। পরকে সুখী করাও অবশ্য একটী নিজ সুখের প্রধান কারণ। এ কথা স্থির নিশ্চয় যে কেবল আত্মসুখান্বেষী সে এ সংসারে কখনই সুখ পায় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে পরকীয় বৃত্তি নিচয়ের উন্নতি সাধন চেষ্টাও জীবনের লক্ষ্য। কাজেই জীবনের মূল লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সুখান্বেষণ করিলেই ইহ সংসারে পবিত্র ও পূর্ণ সুখ পাওয়া যাইতে পারে।

পাঁচ ফুলের সাজি।

(৪র্থ সংখ্যা)

১। Bacon,—

But no pleasure is comparable to the standing upon the vantage ground of truth."

—কিন্তু অধিকতর সুবিধাজনক সত্য-ভূমির উপর দণ্ডায়মান থাকার তুল্য কোন সুখই নাই।

২। F. W. Newman,—

"To maintain a good consience before God, and not before man only, is the first condition of all spiritual progress."

—কেবল মনুষ্যের সমক্ষে না হইয়া, ঈশ্বরের সমক্ষে বিবেকের পবিত্রতা রক্ষা করাই সর্ব্বপ্রকার আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রথম প্রয়োজন।

৩। Goldsmith—,

"He who seeks only for applause from without, has all his happiness in another's keeping."

—যে কেবল (আত্মার) বাহির হইতে প্রশংসা চাহে, তাহার সকল সুখ অন্যের হস্তে থাকে।

৪। Carlyle,—

"Love of men can not be bought by cash-payment; and without love, men can not endure to be together."

—মনুষ্যের প্রেম নগদ মূল্য দিয়া ক্রয় করা যায় না; এবং প্রেম ব্যতীত মানুষ একত্রে অধিক কাল থাকিতে পারে না।

"But it is with man's soul, as it was with Nature: the beginning of Creation is—Light. Till the eye have vision, the whole members are in bonds"

—কিন্তু প্রকৃতির সম্বন্ধে যেরূপ ঘটিয়াছিল, মানুষের সম্বন্ধেও তাহাই, সৃষ্টির প্রারম্ভই জ্যোতি। যত দিন না নয়ন দর্শন করে, তত দিন সর্ব্বাঙ্গ শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিবে।

৫। R. W. Emerson,—

"A wise old proverb says, "God comes to see us without bell", that is, as there is no screen or ceiling between our heads and the infinite heavens, so is there no bar or wall in the soul where man, the effect, ceases, and God, the cause, begins. The walls are taken away."

—একটী জ্ঞানপূর্ণ পুরাতন প্রবচন আছে যে, "ঈশ্বর ঘণ্টা না বাজাইনাই (পূর্ব্ব হইতে সংবাদ না দিয়াই) আমাদিগকে দেখিতে আইসেন"; অর্থাৎ, আমাদের মস্তক এবং অনন্ত আকাশের মধ্যে যেমন কোন পর্দ্দা বা ছাদ নাই, সেইরূপ, যেখানে মনুষ্য, অর্থাৎ "কার্য্যের" শেষ, এবং ঈশ্বর বা "কারণের" আরম্ভ, সেই আত্মাতে, কোন অন্তরায় বা প্রাচীর নাই। (আত্মাতে) প্রাচীর সকল অপ্রবিত হয়।

৬। Keshub Chander Sen,—

"Faith is direct vision; it beholdeth God and it beholdeth immortality."

বিশ্বাস প্রত্যক্ষ দর্শন; উহা ব্রহ্মকে দর্শন করে এবং আত্মার অবিনশ্বরত্ব প্রত্যক্ষ করে।

"In time He is always *now*, in space always *here*."

কালেতে তিনি সর্ব্বদাই 'এখনই' (উপস্থিত), স্থানেতে তিনি সর্ব্বদাই 'এই স্থলে' (বর্ত্তমান)।

৭। Wordsworth,—

"The world is too much with us, late and soon
Getting and spending, we lay waste our powers."

—অত্যধিক সময়ই আমরা সংসার লইয়া ব্যস্ত থাকি, আমরা দিবানিশি অর্থোপার্জ্জন ও ব্যয় করিয়া আমাদের শক্তি সমূহ ক্ষয় করিয়া ফেলি।

৮। Cervantes,—

"Every one is the son of his own works."

—প্রত্যেকেই নিজ কর্ম্মের পুত্রস্বরূপ, অর্থাৎ প্রত্যেকের জীবন তাহার কর্ম্মফলজাত।

৯। Shakespear,—

Love thyself last; cherish those hearts that hate thee."

—আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প ভালবাসিবে; যাহারা তোমাকে ঘৃণা করে তাহাদিগকে প্রীতি করিবে।

১০। শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ,

—"এই আদর্শ অনুসারে (ব্রহ্মের ন্যায়) তোমরাও আপনাকে ভুলিয়া সংসারের মঙ্গলকর্ম্মে ব্রতী থাকিবে। তাঁহাতেই যুক্ত হইয়া সংসার-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। যাহা তাঁহার আদেশ বলিয়া জানিবে তাহা প্রাণপণে প্রতিপালন করিবে। যাহা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ বলিয়া জানিবে, তাহা বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে। তুমি যদি আপনাকে ভুলিয়া এইরূপে তাঁহার কার্য্য করিতে থাক, নিশ্চয় জানিও তিনি তোমাকে ভুলিবেন না।"

সেই অমৃত-স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া আমরা মৃত্যু-ভয় হইতে মুক্ত হই। সংসারেই মৃত্যু ভয়, সংসার পারে সেই অমৃতধাম।

——

তাঁহার প্রতি নির্ভর করিলে আমারদের নূতন জীবনের সঞ্চার হয়, তাহা হইলে আমারদের আত্মার আনন্দ ভাব আর কিছুতেই যায় না।

——

তাঁহাকে ছাড়িয়া আমারদের ধর্ম্মকার্য্য স্বার্থপরতা হইয়া পড়ে—আমারদের সুখভোগে কৃতঘ্নতা প্রকাশ পায়।”

——

১১। শাফেজ,—

“যাহার মন প্রেমেতে জীবিত,তাহার কখনও মৃত্যু নাই।

——

যখন তোমার দ্বারের ধূলি আমার নয়নের অঞ্জন, তখন এই দ্বার ছাড়িয়া কোথায় যাই বল?

——

যদি তুমি সংসার-পরিধির মধ্যে ঘূর্ণ্যমান হইতে থাক, তবে নিগূঢ় তত্ত্বের একটী কথাও জানিতে পারিবে না।

——

সংসার-পরিধি হইতে বাহির হও, এবং এখানে অন্ন অন্বেষণ করিও না, যেহেতু এই দুর্দ্দয় সংসার অতিথিকে সংহার করে।

——

গৃহপ্রতিষ্ঠা।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গৃহস্থের ধর্ম্ম। ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ। যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি গৃহস্থ হইবেন তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণ হইবেন এবং যে যে কর্ম্ম করেন তাহা পরব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন। পরব্রহ্মের দর্শনার্থে অরণ্যে যাইবার কোনো প্রয়োজন নাই, যেহেতু তাঁহার ক্রোড় সর্ব্বত্র প্রসারিত—অরণ্যেও যেমন গৃহেও তেমনি। গৃহেতেই মাতার স্নেহে এবং পিতার মঙ্গল আশীর্ব্বাদে মনুষ্য লালিত পালিত হয়,—গৃহেতেই মনুষ্য স্ত্রীপুত্র পরিবারে মিলিত হইয়া পিতৃসেবা দেব-সেবা অতিথিসেবা প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, গৃহই সকল কল্যাণের মূল প্রস্রবণ। পরম মঙ্গলময় সুহৃৎ পরমাত্মারই প্রসাদ-লব্ধ শ্রীসৌন্দর্য্য এবং কল্যাণে গৃহ নিয়তই সমুজ্জ্বল; তিনিই গৃহের পরম-প্রতিষ্ঠা। খিলান-মণ্ডলের চূড়া-গ্রন্থি স্থানান্তরিত হইলে যেমন তাহার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধূলিসাৎ হইয়া যায়—তেমনি গৃহ হইতে ঈশ্বরের আরাধনা নির্ব্বাসিত হইলে গৃহের আপাদ-মস্তক ভূমিসাৎ হইয়া যায়। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সংসারধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে—তাহা ছদ্মবেশী স্বার্থপরতা। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সংসার-কার্য্যে মনকে যতই নিমগ্ন করা যায়, ততই স্বার্থের কুহক-জালে জড়িত হইয়া পরমার্থ হইতে দূরে পড়িতে হয়। এরূপ হইলে ক্রমে নানা প্রকার মিথ্যা বিভীষিকা আসিয়া ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়া দণ্ডায়মান হয়—অন্তঃকরণের দুর্জ্জয় রিপু-সকল ঈশ্বরকে ঢাকিয়া ফেলিয়া অন্তরতম সুহৃদের ভান করে।

পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের পরিবর্ত্তে দুর্দান্ত রিপু সকলের পদতলে মনুষ্য-সমাজ কতদিন নিরাপদে টেঁকিয়া থাকিতে পারে? মরীচিকার বারিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া লোকে কতদিন প্রাণের পিপাসা নিবারণ করিতে পারে? আমাদের এই হতভাগ্য বঙ্গভূমিতে এইরূপ নানা প্রকার মিথ্যা বিভীষিকার পরিবর্ত্তে যতদিন না একমেবাদ্বিতীয়ং সত্য ঈশ্বরের

উপাসনা গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে—ততদিন কিছুতেই আমাদের মঙ্গল নাই।

অদ্যকার এই শুভ কার্য্যে বালির বাঁধের উপরে নহে—কিন্তু অটল ভিত্তিভূমির উপরে গৃহের মূল-পত্তন হইতেছে,—চিরন্তন পরম পিতার মঙ্গল আশীর্ব্বাদের উপরে এবং চিরন্তন পরম সুহৃদের মঙ্গল দৃষ্টির উপরে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে; তাঁহার ভক্তজনের গৃহ তিনি নিয়তই রক্ষা করেন; আমরা যেন তাঁহাকে গৃহ-মধ্যে প্রাণপণে রক্ষা করি। সম্পদের মায়া-জালে যেন তাঁহাকে বিস্মৃত না হই, বিপদের বিভীষিকায় যেন তাঁহাকে বিস্মৃত না হই! অর্থের প্রলোভনে যেন তাঁহাকে বিস্মৃত না হই—কাম ক্রোধের উত্তেজনায় যেন তাঁহাকে বিস্মৃত না হই। অগ্নি উপাসকেরা যেমন পুরুষানুক্রমে অগ্নিকে গৃহাভ্যন্তরে জাগাইয়া রাখে তেমনি আমরা যেন আমাদের চিরকালের আশ্রয় এবং চিরকালের সুহৃৎকে চিরকাল গৃহাভ্যন্তরে জাগ্রত করিয়া রাখি। অদ্য শ্রদ্ধাবান্ ভক্তিমান গৃহ-প্রতিষ্ঠাতা তাঁহার এই গৃহকে মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের উপাসনায় উৎসর্গ করিয়া দিবার জন্য আমাদিগকে এখানে সবান্ধবে একত্রিত করিয়াছেন—যিনি প্রতিষ্ঠাতার হৃদয়ে আসীন হইয়া তাঁহাকে এই শুভ বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন, প্রতিষ্ঠাতা এই গৃহকে তাঁহারই চরণে উৎসর্গ করিয়া দিতেছেন। ভক্তবৎসল বিশ্ববিধাতা এ গৃহের সর্ব্বথা মঙ্গল করুন।

সুশীলা দেবীর আদ্য শ্রাদ্ধে তাঁহার দেবরের প্রার্থনা।

হে বিশ্ব-পিতা অখিল-মাতা পরমেশ্বর! তোমার মঙ্গল ইচ্ছায় আমার স্নেহময়ী ভ্রাতৃজায়া এ লোক হইতে অবসৃত হইলেন। তোমারই শুভ সংকল্প সাধন করিবার নিমিত্ত তিনি আমাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এখানে আর আমরা তেমন স্নেহ-পূর্ণ মূর্ত্তি দেখিতে পাইব না; তেমন স্নেহ-গর্ভ আহ্বান আর শুনিতে পাইব না। আমরা এ জন্মের মত তাঁহার সেই অভয় ক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইলাম। তিনি তোমার মঙ্গল-ভাবের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়াই তোমার মাতৃভাব উপলব্ধি করিয়াছি। তিনি আমাদের সুখে সুখী হইতেন, আমারদের দুঃখে দুঃখ ভোগ কবিতেন। এক্ষণে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি তুমি তাঁহার সেই কোমল আত্মাকে আপন ক্রোড়ে রক্ষা কর। তাঁহাকে সংসারের পাপ তাপ হইতে উদ্ধার করিয়া তোমার শান্তি-নিকেতনে লইয়া যাও। আমাদের কৃতজ্ঞতা যেন চিরকাল তাঁহার প্রতি জাগরিত থাকে। তোমার প্রসাদে আমারদের এই বংশ যেন তোমার ধর্ম্ম-পথে চিরকাল অবস্থান করে। ওঁ মধু বাতা ঋতাযতে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্ন্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। মধু নক্তমুতোষসোমধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। মধুমান্নোবনস্পতির্ম্মধুমান্ অস্তু সূর্য্যঃ মাধ্বীর্গাবোভবন্তু নঃ। ওঁ নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যোনমঃ পিতৃপুরুষেভ্যঃ। ওঁ দাতারোনোভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ। শ্রদ্ধা চ নো মাভ্যগমৎ বহুদেয়ঞ্চ নোস্ত্বিতি। ওঁ নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যো নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যঃ।

শ্লোক সংগ্রহ।

বয়সঃ কর্ম্মণোঽর্থস্য শ্রুতস্যাভিজনস্য চ।
বেষবাগ্‌বুদ্ধিসারূপ্যমাচরন্ বিচরেদিহ॥

আপনার যেমন বয়স, যে রূপ কর্ম্ম যে পরিমাণ ধন যে প্রকার শাস্ত্রজ্ঞান ও যাদৃশ কুলাচার তদনুরূপ বেশভূষা বাক্য বুদ্ধি করিয়া ইহলোকে বিচরণ করিবেক।

বুদ্ধিবৃদ্ধিকরাণ্যাশু ধন্যানি চ হিতানি চ।
নিত্যং শাস্ত্রাণ্যবেক্ষেত নিগমাংশ্চৈব বৈদিকান্॥

বুদ্ধীন্দ্রিয়ের বৃদ্ধিকর ব্যাকরণাদি শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, বৈদ্যকাদি শাস্ত্র, ও বেদার্থের বোধক নিগমাদি শাস্ত্র সর্ব্বদা পর্য্যালোচনা করিবেক।

যথাযথা হি পুরুষঃ শাস্ত্রং সমধিগচ্ছতি।
তথাতথা বিজানাতি বিজ্ঞানঞ্চাস্য রোচতে॥

মনুষ্য যে যে শাস্ত্র উত্তম রূপে অভ্যাস করে, সেই সেই শাস্ত্রই উত্তম রূপে জানিতে পারে ও তাহার দ্বারা শাস্ত্রান্তরে জ্ঞান সম্যক্ প্রদীপ্ত হয়।

এতানেকে মহাযজ্ঞান্ যজ্ঞশাস্ত্রবিদো জনাঃ।
অনীহমানাঃ সততমিন্দ্রিয়েষ্বেব জুহ্বতি॥

কতিপয় যজ্ঞীয় শাস্ত্রবেত্তা গৃহস্থ এই পঞ্চবিধ মহাযজ্ঞের বাহ্যাড়ম্বর না করিয়া স্বীয় বুদ্ধীন্দ্রিয়েতেই জ্ঞানাদির সংযমন করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করেন।

বাচ্যেকে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণে বাচঞ্চ সর্ব্বদা।
বাচি প্রাণে চ পশ্যন্তো যজ্ঞনির্বৃত্তিমক্ষয়াং॥

ব্রহ্মবেত্তা কতিপয় গৃহস্থ বাক্যে ও প্রাণবায়ুতেই যজ্ঞের অক্ষয় ফল লাভ হয় জানিয়া সর্ব্বদাই অধ্যাপন ঈশ্বরের মহিমা গানাদি বাক্যে প্রাণ ও ধ্যান ধারণাদি প্রাণে বাক্য হোম করেন।

জ্ঞানেনৈবাপরে বিপ্রা যজন্ত্যেতৈর্ম্মখৈঃ সদা।
জ্ঞানমূলাং ক্রিয়ামেষাং পশ্যন্তো জ্ঞানচক্ষুষা॥

অপর কতিপয় ব্রহ্মবেত্তা ব্রাহ্মণ সতত ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা এই সমুদায় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহারা উপনিষৎ রূপ জ্ঞান চক্ষুসহকারে দেখিতে পান যে জ্ঞানই এই সকল যজ্ঞের মূল কারণ।

কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ।
ন তু নামাপি গৃহ্ণীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্যতু॥

পতি মৃত হইলে স্ত্রী পবিত্র পুষ্প ফল মূলাদি অল্পাহার দ্বারা দেহ ক্ষীণ করিবে কিন্তু ব্যভিচার বুদ্ধিতে পর পুরুষের নাম গ্রহণও করিবে না।

সমালোচনা।

ধর্ম্মসাধন—১ম ও ২য় খণ্ড। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

ব্রাহ্মসংগৎ সভা কর্ত্তৃক আলোচিত অনেকগুলি আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রসঙ্গ এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের জীবিতাবস্থায় এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ প্রচারিত হয়। সংগ্রাহক লিখিয়াছেন যে কেশব বাবুর হৃদয়ের বস্তু ইহাতে সংরক্ষিত আছে। এই পুস্তকে ঈশ্বরোপাসনা, মুক্তি, বৈরাগ্য, আত্মানুসন্ধান, আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করিবার উপায় ও সঙ্কেত প্রভৃতি অতি আবশ্যক ও নিগূঢ় বিষয়ের তত্ত্ব অতি বিশদ ও পরিপাটী রূপে বিন্যস্ত হইয়াছে।

সঙ্গত সভা যে সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, তৎ সমুদায় অবিসম্বাদিত রূপে গৃহীত হইবে এমত সম্ভাবনা নাই। আমরা একটী উদাহরণ দিতেছি। উমেশ বাবু লিখিয়াছেন "অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিদের ন্যায় ব্রাহ্মদের নির্দ্দিষ্ট পুস্তক উপদেষ্টা বা কোন বাহ্য অবলম্বন নাই। বিবেক বা ঈশ্বরের আদেশ আমাদিগের একমাত্র নেতা ও অভ্রান্ত শাস্ত্র। যাঁহারা এই আদেশ অস্বীকার করেন, তাঁহারা কিসের উপর দাঁড়াইবেন?" কিন্তু এই আদেশ সকলের হৃদয়ে সমান রূপে প্রতিভাত হয় না, এই নিমিত্ত তদ্বিষয়ে মতভেদ হইয়া থাকে। বাস্তবিক ঈশ্বরের আদেশ সচরাচর লোকে বুঝিতে পারে না। এই আদেশ সম্বন্ধে কেশব বাবু ও বলিয়াছেন যে ঈশ্বরের "গলা চিনা চাই, কিন্তু যে সে তাহা পারে না।" যাহাই হউক এই গ্রন্থের সর্ব্বাংশে আমাদের মতের মিল না হইলেও ইহাতে এমন সকল জ্ঞাতব্য বিষয় আছে যাহা পাঠ করিলে লোকের প্রকৃত উপকার হইতে পারিবে।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১।

মাঘ ও ফাল্গুন।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	১০১৮॥৶১৫
পূর্ব্বকার স্থিত	৩১০৭।/১০
সমষ্টি	৪১২৮ / ৫
ব্যয় ...	৭১১॥/০
স্থিত	৩৪১৬॥ ৫

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৩৮৪॥৶১৫

মাসিক দান

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরিয়া ঘাটা) ১৮১২ শকের ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত	১৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ রায়	১৬৲
" " আশুতোষ চৌধুরী	৫৲
" " মতিলাল পাল	৫৲
" " ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৲
" " গোকুলকৃষ্ণ সিংহ	২৲
" " লালবিহারী বড়াল	২৲
" " কেদারনাথ মিত্র	২৲
" " কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	২৲
" " ক্ষেত্রমোহন ধর	১৲
" " বনমালী চন্দ্র	১৲
" " রাধামোহন বসু	১৲
" " দীননাথ অধ্যেতা	১৲
শ্রীমতি সৌদামিনী দেবী	৫৲
" " ত্রৈলোক্যমণি দাসী	৫৲

এককালীন দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয় সমাজগৃহ সংস্কার জন্য সাহায্য	৩০০৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২০৲
" " ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়	৫৲
" " যোগেশচন্দ্র সরকার	৩৲
দানাধারে প্রাপ্ত	১৶১৫
বিবিধ আয়	৪॥০
	৩৮৪॥৶১৫

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১০১ ৶০
পুস্তকালয় ...	৬৫।৵১০
যন্ত্রালয় ..	২০৪৸০
গচ্ছিত ...	১১০৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৩৫৸০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ...	১১২৸৶৫
দাতব্য ...	৪৲
সমষ্টি	১০১৮॥৶১৫

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১৯৪৸ ৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১০৯৸/১৫
পুস্তকালয়	৪৩।৵৫
যন্ত্রালয়	১৯৬।/০
গচ্ছিত	৫০ ৶ ৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	/ ৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ...	১১২৸৶৫
দাতব্য	৪৲
সমষ্টি .	৭১১॥/০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

ত্রয়োদশ কল্প
প্রথম ভাগ
জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬২।

৫৭৪ সংখ্যা ১৮১৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বর্ষশেষ-চিন্তা।

দেখিতে দেখিতে সম্বৎসর কাল চলিয়া গেল। চন্দ্র সূর্য্যের উদয়াস্তে আবার আমরা নূতন বর্ষের অভিমুখীন হইতে চলিলাম। আমারদের সম্মুখে অনন্ত ভবিষ্যৎ, পশ্চাতে অতীতের সুখদুঃখময় কালস্রোত আমাদিগকে হর্ষ বিষাদে উৎফুল্ল ও বিপর্য্যস্ত করিয়া চলিয়া গেল। আমরা কালের ক্রীড়নক হইয়া ভাসিতে ভাসিতে নব-বর্ষের উপকূলে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, কোথায় গেলে অভয় কূল প্রাপ্ত হইব, তাহার কিছুই জানি না। সম্বৎসর কাল মধ্যে রোগের নিদারুণ আক্রমণে, শোকের হৃদয়ভেদী শেলাঘাতে হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, জানি না ভবিষ্যতের অতর্কিত ভয়বিপদ মুখব্যাদন পূর্ব্বক কখন্ আমারদের ক্ষুদ্র অস্তিত্বের বিলোপ সাধন করিবে।

সত্য সত্যই মনুষ্যের অবস্থা কি এমনই শোচনীয়। বাস্তবিক নিরবচ্ছিন্ন কষ্টক্লেশ ভোগ করিবার জন্যই কি মনুষ্যের পৃথিবীতে জন্ম। সত্যই কি তাহার উপরে এমন কি কেহ নাই, যিনি তাহাকে জ্বালা যন্ত্রণা, শোকমোহের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারেন? পথহারা দেখিয়া তাহাকে সৎপথে লইয়া যান? মনুষ্য কি সহায়সম্পত্তিবিহীন উদ্দেশ্যশূন্য দিশাহারা হইয়া চিরজীবন কাল পৃথিবীতে বিচরণ করিতে থাকিবে? সৃষ্টির ভূষণ হইয়াও সুখ ও আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া আজীবন শোক করিতে থাকিবে? তাহার উপরে কাহারও কি স্নেহদৃষ্টি নিপতিত হইবে না? মনুষ্যের সৃষ্টিতে স্রষ্টার মহান্ উদ্দেশ্য কি সংসাধিত হইবে না? মনুষ্যকে স্বাধীন করিতে গিয়া কি ঈশ্বরের লক্ষ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে? তিনি স্বাধীন মনুষ্য দ্বারা তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা কি কার্য্যে পরিণত করিবেন না? ইহা যদি সত্য হয় তবে আর সকলই মিথ্যা।

পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, যিনি জগৎকে সত্তাতে আনয়ন করিয়াছেন, যখন অন্ধকার অন্ধকারে আবৃত ছিল, তাহার মধ্য হইতে যিনি তেজঃপুঞ্জ সূর্য্যকে গগনের

মধ্যস্থলে স্থাপিত করিলেন, আবার যিনি সূর্য্যের অভ্যন্তরে থাকিয়া স্বমহিমায় সমস্ত জগতের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন, যাঁহার ইচ্ছাস্রোত বহমান থাকাতে পৃথিবী জলস্থলে, পর্ব্বত সাগরে, ওষধি বনস্পতিতে, ফলপুষ্পে পরিশোভিত হইল; যাঁহার ইচ্ছাতে স্থাবর জঙ্গম পশু পক্ষী, ভূচর খেচর পৃথিবীকে পরিপূরিত করিল, তাঁহার ইচ্ছাস্রোত কি এতকালপরে প্রতিরুদ্ধ হইল, যে তাঁহার স্নেহের ধন যত্নের সামগ্রী নরজাতি জ্ঞানবুদ্ধি, ধর্ম্মভাব ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া চারিদিকে হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছে। জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কি জগন্মন্দিরে বিরাজিত নাই। এ কথা যদি সত্য হয় তবে এই সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ভ্রাম্যমান গ্রহ-নক্ষত্র-সমন্বিত তাঁহার এই বিশাল রচনা অসম্বদ্ধ ধূলিকণায় পরিণত হইতে পারে! অমিততেজা সূর্য্য নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইতে পারে! এই বিশাল গগন অমাবশ্যার গাঢ় অন্ধকারে পরিপূরিত হইতে পারে! সৃষ্টির প্রাক্‌কালোচিত চিরস্তব্ধতা চারিদিকে বিরাজ করিতে পারে! কি ভয়ানক কথা!

যিনি পলকের জন্য সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র থাকিলে, জ্যোতিষ্কমণ্ডল নিষ্প্রভ হইয়া যায়, সমুদয় জগতের প্রলয়দশা উপস্থিত হয়, তিনি কি সৃষ্টি হইতে দূরে থাকিতে পারেন? তিনি সৃষ্টিকাল হইতে সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন; এবং পাছে সমুদয় লোক চূর্ণ হইয়া যায়, এজন্য তিনি সেতু স্বরূপ হইয়া সমুদয় ধারণ করিয়া আছেন। সৃষ্টিকার্য্যে যাঁহার অনুপম শক্তি, ফলমূলে যাঁহার পিতৃস্নেহ, ওষধি বনস্পতিতে যাঁহার মঙ্গলভাব, মেঘে যাঁহার মাতৃবাৎসল্য, তৃণশস্যে যাঁহার করুণা, বিশ্রামদায়িনী রজনীতে যাঁহার মমতা, জলে যাঁহার স্নিগ্ধ গম্ভীর ভাব, পর্ব্বতে যাঁহার সহিষ্ণুতা প্রতিফলিত রহিয়াছে; যিনি যাবতীয় জীবজন্তুর কাম্য বিষয় সকল যথা উপযুক্ত রূপে বিধান করিতেছেন, মনুষ্যকে প্রপীড়িত করা কি তাঁহার লক্ষ্য হইতে পারে? "মঙ্গল যাঁহার নাম মঙ্গল যাঁহার ধাম মঙ্গল যাঁহার কার্য্য যিনি মঙ্গল নিদান" মনুষ্যকে কষ্ট ক্লেশে নিক্ষেপ করা কি তাঁহার উদ্দেশ্য হইতে পারে? মঙ্গলই যাঁহার ব্রত, সৃষ্টির মর্ম্মে যাঁহার মঙ্গলভাব দীপ্তি পাইতেছে, যিনি অনন্ত মঙ্গল স্বরূপ, অমঙ্গল যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, যিনি জ্ঞানে প্রেমে সদ্ভাবে অনন্ত, তাঁহার উপরে যখন আমারদের বিশ্বাস যায়, তখনই আমরা বুঝিতে পারি, যাহা আমারদের দৃষ্টিতে অমঙ্গল, তাহা ঈশ্বরের নিকট মঙ্গলের রূপান্তর মাত্র; তিনি আপতপ্রতীয়মান অমঙ্গলের মধ্য দিয়া স্থায়ী মঙ্গলের পথ আমারদের সম্মুখে প্রমুক্ত করিয়া দিতেছেন। আমরা যদি সহিষ্ণুতা ও যত্ন সহকারে ঈশ্বরের ইচ্ছা পাঠ করিতে পারি, তবে আমারদের মধ্য হইতে শোকের উচ্ছ্বাস বিলাপ ক্রন্দন নিরাশা অনুৎসাহ তিরোহিত হইয়া যায়; এবং চারিদিক হইতে আনন্দের উৎস উৎসারিত হইতে থাকে। এই মর্ত্ত্যধামে থাকিয়াই আমরা সংসারপার অক্ষয় ব্রহ্মধামের দেববাঞ্ছিত সুখের আস্বাদন পাইতে পারি।

অতএব যিনি ব্রহ্মধামের যাত্রী, একমেবাদ্বিতীয়ং পরমেশ্বরের ভক্ত ও উপাসক, তিনি যেন ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে শিক্ষা করেন। বিশ্বাসই প্রীতির নিবাসভূমি। ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপে যদি আমারদের

বিশ্বাস না থাকে, সুখে দুঃখে যে অবস্থায় তিনি আমাদিগকে লইয়া যান, তাহাতেই আমারদের বাস্তবিক মঙ্গল হইবে, ইহা যদি সমুদয় হৃদয়ের সহিত ধারণ করিতে না পারি, তিনি আমারদের চিরসঙ্গী, স্ত্রী পুত্র পরিবারের হৃদয়বন্ধুর সহিত ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়তার বিরাম হইলেও যিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন না, তাঁহার উপরে যদি আমারদের নির্ভর না থাকে; তবে ঈশ্বরপ্রেমী ঈশ্বরের উপাসক বলিয়া পরিচয় দেওয়া বিড়ম্বনা। যদি এতটুকু বিশ্বাসের সহিত তাঁহার নিকট গমন করিতে না পারি, তবে আমারদের আরাধনা অসম্বদ্ধ প্রলাপ বাক্য। তবে আত্মোৎকর্ষ বিধান আত্মার উন্নতি উপাসকের লক্ষ্য নহে—ইহা একটা নিস্ফল অলীক পদার্থ মাত্র। যদি ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্ত প্রকৃত উপাসক প্রকৃত সাধু হইতে চাও, ঈশ্বরের হস্তে ধন প্রাণ মন সমুদয়ই সমর্পণ কর। যাঁহার হস্তে সমুদয় জগতের ভার, গ্রহ চন্দ্র তারকের ভার, আকাশ অন্তরীক্ষের ভার তাঁহার হস্তে তোমার ক্ষুদ্র ভার রাখিতে চাহ না!!! কি দর্প কি অহঙ্কার কি অভিমান!

পিতা! তুমি কি আমারদের এ বৃথা দর্প চূর্ণ করিবে না? মর্ত্ত্যের ধূলিকণা বলিয়া অনন্ত জগতের তুলনায় ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতর দেখিয়া আমাদিগকে অন্ধকারে এমনই আবৃত করিয়া রাখিবে। জগদীশ! তোমার কার্য্যের গূঢ় ভাব কে বুঝিতে পারে—তোমার কৌশলের মর্ম্মদেশ কে স্পর্শ করিতে পারে? ঐ যে সম্বৎসরকাল পরে সমস্ত পৃথিবী একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল; বর্ষকাল ঐ যে চলিয়া গেল, আমরা মৃত্যুর দিকে যে আবার একপদ অগ্রসর হইলাম। ঐ যে শোক দুঃখের প্রবল তরঙ্গ হইতে হৃদয় শান্তিলাভ করিতে না করিতে নবতর বিপদ ক্লেশের যবনিকা তোমার আদেশে আমারদের সম্মুখে উত্তোলিত হইবার উপক্রম হইতেছে। ঐ যে তুমি মৃতপ্রায় অসাড় আত্মার বলাধানের জন্য শোকতাপ বিঘ্ন বিপত্তিরূপ মৃতসঞ্জীবন ঔষধের ব্যবস্থা করিতেছ। ঐ যে সংসারের মোহমায়া হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আপনার "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং"রূপ প্রকাশ করিতেছ। সেই জন্য বুঝি সংসারের স্নেহের ধন আমারদের নিকট হইতে সরিয়া যায়।

যে সাংসারিক নির্য্যাতনে বিষয়ীর মোহবন্ধন ভগ্ন হইয়া যাইতেছে, বিষয়স্পৃহা দিন দিন খর্ব্ব হইতেছে, ধর্ম্মের দিকে ঈশ্বরের দিকে তাহার হৃদয়মন দিন দিন আকৃষ্ট হইতেছে, আবার সেই সাংসারিক সুখের বিপর্য্যয়ে—ঈশ্বর-প্রেমী ধর্ম্মাত্মা সাধু পুরুষের ধর্ম্মবল ক্রমিকই বর্দ্ধিত হইতেছে। ঈশ্বরের উপর নির্ভর ক্রমিকই অধিক হইতেছে। এ দিকে যতই বিপদের কশাঘাত ও সংসারসুখের খর্ব্বতা, শোক তাপের অত্যাচার, ততই ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষের ঈশ্বরেতে নির্ভরের আধিক্য। শিশু অন্য কর্ত্তৃক তাড়িত হইলে যেমন মাতৃক্রোড়কে ক্রমিকই দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিতে থাকে, তেমনি যতই ধর্ম্মাত্মার পরীক্ষা হইতে থাকে, ততই তিনি ঈশ্বরকে আত্মার আশ্রয়, সম্বল করিতে থাকেন। যিনি অমৃতধনে অধিকারী, স্বর্গীয় শান্তিতে যাঁহার আত্মা আপ্লাবিত, সাংসারিক বিপত্তি তাঁহার নিকট কি করিবে। যে বিপদ প্রেরণে সেই মঙ্গলময় পিতা পাপীর লৌহ কবাটাবৃত হৃদয়ের দ্বার ভগ্ন করিয়া তাহার মধ্যে ধর্ম্মের রশ্মি প্রেরণ করেন, আবার

সেই বিপদ-প্রেরণে পুণ্যাত্মাকে বলীয়ান্ তেজীয়ান করিতে থাকেন। পুণ্যাত্মার হৃদয় বিশ্বাসকবচে যতই সুরক্ষিত হইতে থাকে,ততই তাঁহার ঈশ্বর-প্রীতি পরিবর্দ্ধিত হয়, ততই তিনি যোগানন্দ প্রেমানন্দ উপভোগে দেবত্ব লাভ করিতে থাকেন।

জগদীশ! আমরা সম্বৎসর কাল নানা প্রকার ভয় বিপদ কষ্টক্লেশ সুখশান্তির মধ্য দিয়া আজ বর্ষশেষ রজনীতে তোমার দ্বারে আসিয়া পৌছিয়াছি। তোমার রাজ্যে রোগশোক জ্বালাযন্ত্রণার তীব্রতা নাই। তোমার দুর্ব্বল সন্তানগণকে প্রপীড়িত করিবার জন্য ইহারদের সৃষ্টি হয় নাই! তুমি তোমার শুভ লক্ষ্য সংসিদ্ধ করিবে, ধর্ম্মের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবে, সকলকে লইয়া প্রেমের পরিবার সংগঠিত করিবে, এই জন্যই ইহারদের সৃষ্টি! আমরা তোমার শুভসংকল্প বুঝিতে পারি না, এজন্য তোমার মঙ্গল-স্বরূপে দোষারোপ করি এবং আপনাকে মহাপাপে কলঙ্কিত করি। আর কেন, এখনই এখানে তোমার প্রেমের রাজ্য ধর্ম্মের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত কর, মর্ত্ত্যধামকে স্বর্গ-পদবীতে লইয়া যাও যে আমরা কৃতার্থ হই, তোমার নিকট ইহা আমারদের যোড়করে প্রার্থনা।

শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার শিষ্যগণ।

সনাতন গোস্বামী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, হে সনাতন! বেদাদি শাস্ত্রে সম্বন্ধ অভিধেয় ও প্রয়োজন কথিত হইয়াছে। সকল শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণই মুখ্য সম্বন্ধ, ভক্তিই একমাত্র অভিধেয়, এবং প্রেমই প্রয়োজন। সম্বন্ধ ও অভিধেয় ইতি পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে; সর্ব্বশাস্ত্রের প্রয়োজন স্বরূপ ভক্তিফল প্রেমের বিষয় অতঃপর বলিতেছি শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণ করিলে ভক্তিরসের জ্ঞান লাভ হইবে। শ্রীকৃষ্ণে গাঢ় রতি হইলেই তাহা প্রেমনামে অভিহিত হয়; এই প্রেমের লক্ষণ শ্রবণ কর। ভাগ্যক্রমে যদি কোন জীবের ভগবৎ বিষয়ে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই শ্রদ্ধাবান মানব সাধু সজ্জনের সঙ্গ লাভ করেন। সাধুসঙ্গের গুণে ভগবানের নামমাধুর্য্য শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে মতি হয়। এইরূপে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধনভক্তি দ্বারা সর্ব্বানর্থের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। অনর্থ নিবৃত্ত হইলে ভক্তিতে নিষ্ঠা হয়, নিষ্ঠা হইতে ভগবৎ মহিমা শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে রুচি জন্মিয়া থাকে এবং রুচি হইতে ক্রমে ভগবানে প্রচুর আসক্তি উপস্থিত হয়। এই আসক্তি হইতে চিত্তভূমিতে কৃষ্ণরতি অঙ্কুরিতা হয়। এই কৃষ্ণরতি গাঢ় হইলে প্রেম বলা যায়। এই সর্ব্বানন্দধাম প্রেমই সকল শাস্ত্রের প্রয়োজন স্বরূপ। যে ভাগ্যবান ব্যক্তির হৃদয়ে এই নবভাব ও নবপ্রীতির অঙ্কুর উদ্ভূত হয়, ভক্তিশাস্ত্র অনুসারে তাঁহার জীবনে এই সকল লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাকৃত ক্ষোভে তাঁহার ক্ষোভ বোধ হয় না, শ্রীহরির সম্বন্ধ ব্যতীত বৃথা কালক্ষয় তিনি বিষতুল্য জ্ঞান করেন। ভুক্তি সিদ্ধি ও ইন্দ্রিয়লালসা তাঁহার হৃদয়ে আর প্রতিভাত হয় না। ভক্ত সর্ব্বোত্তম হইয়াও আপনাকে অতিহীন জ্ঞান করেন, অহংকারের লেশমাত্রও তাঁহার জীবনে থাকিতে পারে না। ভগবৎ কৃপার প্রতি তাঁহার অটল বিশ্বাস। হরিগুণানুকীর্ত্তন ও হরিনামসুধা পান করিবার জন্য তিনি সমুৎকণ্ঠিত। যেস্থানে হরিলীলা প্রসঙ্গ হয়, সেই স্থানেই তিনি

বাস করেন। শ্রীহরিতে রতির এই সকল চিহ্ন ভক্ত জীবনে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

"এবে শুন ভক্তিফল প্রেম প্রয়োজন।
যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরস জ্ঞান॥
কৃষ্ণে রতি গাঢ় হইলে প্রেম অভিধান।
কৃষ্ণ ভক্তিরসের সেই স্থায়ীভাব নাম॥
এই দুই ভাবের স্বরূপ তটস্থ লক্ষণ। *
প্রেমার লক্ষণ এবে শুন সনাতন॥
কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধু-সঙ্গ করয়॥
সাধু সঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধন ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন॥
অনর্থ নিবৃত্তি হইলে ভক্তি নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে রত্যঙ্কুর॥
সেইভাব গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম॥
যাহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয়।
তাহাতে এতেক চিহ্ন সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়।
প্রাকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয়॥
কৃষ্ণ সম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়।
ভুক্তি সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায়॥
সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে।
কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি মানে॥
সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা প্রধান।
নাম গানে সদারুচি লয় কৃষ্ণ নাম॥
কৃষ্ণ গুণাখ্যানে হয় সর্ব্বদা আসক্তি।
কৃষ্ণ লীলা স্থানে করে সর্ব্বদা বসতি॥
কৃষ্ণ রতির চিহ্ন এই কৈল বিবরণ।"

চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যখণ্ড ২৩ অধ্যায়।

হে সনাতন! কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্ন সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর। যার চিত্তে ভগবৎপ্রেমের উদয় হয়, তাহার কথা-বার্ত্তা ব্যবহারাদি বিজ্ঞ ব্যক্তিও বুঝিতে পারে না, কেননা প্রেমিক ব্যক্তি প্রাকৃত ভাবের অতীত। এই প্রেম ক্রমশঃ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া স্নেহ মান প্রণয় রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাবে পরিণত হয়। ইক্ষুরস যেমন ক্রমশঃ গাঢ় ও নির্ম্মল হইয়া মিশ্রীতে পরিণত হয়, রতি প্রেমও সেই প্রকার ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া মধুরাস্বাদযুক্ত হয়।

অধিকারিভেদে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচ প্রকার রতিভেদ হয়। প্রেমই এই সকল রসের স্থায়ীভাব। ইহার সহিত বিভাব অনুভাব সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাবের মিলন হইলে প্রেমরসের অপূর্ব্বাস্বাদন হয়। বিভাব অর্থাৎ উদ্দীপনা দ্বিবিধ। আলম্বন ও উদ্দীপন। শ্রীহরিই আলম্বন ও বংশীনিনাদ অর্থাৎ হৃদয়কন্দরে নিরন্তর ভগবানের অজেয় আদেশ বাণীই উদ্দীপনা। অনুভাব অর্থাৎ মনের পূর্ণ একাগ্রতা প্রভৃতি সাত্ত্বিক ও নির্বেদ হর্ষাদি ব্যভিচারী ভাবের মিলনে প্রেমরস অতি মধুর ও চমৎকারজনক হইয়া থাকে।

হে সনাতন! পঞ্চম পুরুষার্থ * কৃষ্ণ-

---

* ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে রূপগোস্বামী ভাব ও প্রেমের এই লক্ষণ করিয়াছেন।

"শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মাপ্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥"

নির্ম্মল সত্ত্বগুণের দ্বারা বিশেষীকৃত আত্মাতে প্রেম সূর্য্যকিরণ সাম্যভাব ধারণ করিলে এবং রুচি প্রভাবে সাধকের চিত্ত মসৃণ হইলে তাহার নাম ভাব বলা যায়।

"সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥"

যাহাতে অন্তঃকরণ সম্যক্ প্রকারে মসৃণিত অর্থাৎ নির্ম্মলীকৃত হয়, যাহা 'মমত্বাতিশয়াঙ্কিত' অর্থাৎ অতিমাত্র মমতাযুক্ত এবং যাহা 'সান্দ্রাত্মা' কি না অতিশয় ঘণীভূত, এইরূপ ভাবকে পণ্ডিতেরা প্রেমা (প্রেম) বলিয়া থাকেন।

* ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফলের অতীত শ্রীহরিতে যে অহৈতুকী ভক্তি ইহার নাম পঞ্চম পুরুষার্থ এবং প্রেম মহাধন। ভাগবতে কথিত হইয়াছে।

"মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ং।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোহন্যৎকালবিপ্লুতং॥"

ভাগবত ৯ম স্কন্ধ।

যে সকল ভক্ত আমার সেবা করিতে সমুৎসুক

প্রেমধনের বিষয় সংক্ষেপে তোমাকে কহিলাম। অভক্তগণ ইহার রসাস্বাদন করিতে অক্ষম, ভক্ত ভিন্ন ভগবৎপ্রেমের আস্বাদন আর কেহই জানে না। পূর্ব্বে প্রয়াগে অবস্থানকালে তোমার ভ্রাতা শ্রীরূপকে রসতত্ত্বের বিচার করিয়া এই সকল বিষয় আমি শিক্ষা দিয়াছি। সনাতন! তুমি ভক্তিশাস্ত্র প্রচার কর, মথুরার লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার কর এবং বৈষ্ণব আচারের স্মৃতিশাস্ত্র প্রচার করিয়া জগতের উপকার কর। শ্রীচৈতন্য এই প্রকারে সনাতন গোস্বামীকে সকল বিষয় শিক্ষা দিয়া বলিলেন, শুষ্ক বৈরাগ্য ও শুষ্ক জ্ঞান বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবে।

"কৃষ্ণ প্রেমের চিহ্ন এবে শুন সনাতন॥
যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়।
তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়॥
প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥
যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ড সার।
শর্করাসিতা মিছরি শুদ্ধ মিছরি আর॥
ইহা যৈছে ক্রমে নির্ম্মল ক্রমে বাড়ে স্বাদ।
রতি প্রেমাদির তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ॥
অধিকারী ভেদে রতি পঞ্চ প্রকার।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর আর॥
এই পঞ্চ স্থায়ীভাব হয় পঞ্চরস।
যে রসে ভক্ত সুখী কৃষ্ণ হয় বশ।
প্রেমাদিক স্থায়ীভাব সামগ্রী মিলনে।
কৃষ্ণভক্তি রসরূপে পায় পরিণামে॥
বিভাব অনুভাব সাত্ত্বিক ব্যভিচারী।
স্থায়ীভাব হয় রস মিলে এই চারি।
দধি যেন খণ্ড মরিচ কর্পূর মিলনে।
রসালাখ্য রস হয় অপূর্ব্বাস্বাদনে॥
দ্বিবিধ বিভাব আলম্বন উদ্দীপন।
বংশী স্বরাদি উদ্দীপন কৃষ্ণাদি আলম্বন॥
অনুভাব স্মিত নৃত্য গীতাদি উদ্ভাস্বর।
স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক অনুভাবের ভিতর॥
নির্ব্বেদ হর্ষাদি তেত্রিশ ব্যভিচারী।
সব মিলি রস হয় চমৎকারকারী॥
পঞ্চবিধ রস, শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য।
মধুর নাম শৃঙ্গার রস সবাতে প্রাবল্য॥
শান্তরসে শান্তরতি প্রেম পর্য্যন্ত হয়।
দাস্যরতি রাগপর্য্যন্ত ক্রমেতে বাড়য়॥
সখ্য বাৎসল্য রতি পায় অনুরাগ সীমা।
সুবলাদ্যের ভাব পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা॥
... .
ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নায়ক শিরোমণি।
নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী॥
অনন্ত কৃষ্ণের গুণ চৌষট্টি প্রধান।
এক এক গুণ শুনি জুড়ায় ভক্তকাণ॥
অনন্তগুণ শ্রীরাধিকার পঁচিশ প্রধান।
যেই গুণের বশ হয় কৃষ্ণ ভগবান।
... .. .
এই মত দাস্যে দাস সখ্যে সখাগণ।
বাৎসল্যে পিতা মাতা আশ্রয় আলম্বন॥
এই রসাস্বাদ নাহি অভক্তের গণে।
কৃষ্ণভক্তগণ করে রস আস্বাদনে॥
সংক্ষেপে কহিল এই প্রয়োজন বিবরণ।
পঞ্চম পুরুষার্থ এই কৃষ্ণপ্রেমধন॥
পূর্ব্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে।
তোমার ভাই রূপে কৈল শক্তি সঞ্চারে॥
তুমিহ করিহ ভক্তি শাস্ত্রের প্রচার।
মথুরার লুপ্ত তীর্থের করিহ উদ্ধার॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব আচার।
ভক্তি স্মৃতি শাস্ত্র করি করিহ প্রচার॥
যুক্ত বৈরাগ্য স্থিতি সব শিক্ষাইল।
শুষ্ক বৈরাগ্য জ্ঞান সব নিষেধিল॥"

চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড ২৩ অধ্যায়।

তৎপরে সনাতন গৌরচরণে দীনভাবে নিবেদন করিলেন, আমি নীচ জাতি, নীচসেবা করিয়া পামরের অধীন হইয়াছি, ব্রহ্মার অগোচর যে সকল গভীর সিদ্ধান্ত আমাকে শিক্ষা দিলেন, আশীর্ব্বাদ করুন যেন তাহা আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পায়। পারাবারশূন্য অনন্ত গম্ভীর সিদ্ধান্তামৃতসিন্ধুর বিন্দুমাত্রও হৃদয়ঙ্গম করিতে আমার শক্তি নাই। পঙ্গুকে নাচাইতে যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে আমার

চিত্ত, তাঁহারা সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাইলেও গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না। কালে বিনাশশীল ভোগ্য বস্তু প্রভৃতির কথা আর কি।

মস্তকে শ্রীচরণ দিয়া আশীর্ব্বাদ করুন। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমভরে সনাতনের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, আমি যাহা কিছু উপদেশ দিলাম, তোমার হৃদয়ে তাহা স্ফূর্ত্তি লাভ করুক।

"তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত পুছিল।
ভাগবত সিদ্ধান্ত প্রভু সকল কহিল॥
... ...
তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
নিবেদন করে দন্তে তৃণ গুচ্ছ লঞা॥
নীচজাতি নীচ সেবী মুঞি সুপামর।
সিদ্ধান্ত শিক্ষাইলে সেই ব্রহ্মার অগোচর॥
মোর মন তুচ্ছ এই সিদ্ধান্তামৃতসিন্ধু।
মোর মন ছুঁইতে নারে ইহার এক বিন্দু॥
পঙ্গু নাচাইতে পার যদি হয় তোমার মন।
বর দেহ মোর মাথে ধরিয়া চরণ॥
মুঞি যে শিক্ষাইনু তোরে স্ফুরুক সকল।
এই তোমার বল হৈতে হবে মোর বল॥
তবে মহাপ্রভু তাঁর শিরধরি করে।
বর দিল এই সব স্ফুরুক তোমারে॥
সংক্ষেপে কহিল প্রেম-প্রয়োজন সংবাদ।
বিস্তারি কহন না যায় প্রভুর প্রসাদ।
প্রভুর উপদেশামৃত শুনে যেই জন।
অচিরাতে মিলয়ে তারে কৃষ্ণ প্রেমধন॥

চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড ২৩ অধ্যায়।

সনাতন পুনর্ব্বার গৌরচরণে নিবেদন করিলেন, শুনিয়াছি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট আত্মারাম শ্লোকের আঠারো প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার শুনিয়া আমার মন উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। কৃপা করিয়া যদি পুনর্ব্বার বলেন, শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হই। চৈতন্য বলিলেন, আমি বাতুল, কখন্ কি প্রলাপ বলিয়াছি, সার্ব্বভৌম তাহাই সত্য মনে করিয়াছেন। সহজে আমি কিছুই বুঝিতে পারি না, তোমার ন্যায় সাধুর সঙ্গগুণে যাহা কিছু মনে হইতেছে, বলিতেছি। এই বলিয়া চৈতন্য মহা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থাঃ অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থংভূতগুণোহরিঃ॥"*

ভাগবতোক্ত এই শ্লোকের একষট্টি প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন। এই সকল ব্যাখ্যাতে স্থূলতঃ ভক্তি সাধন ও সাধু সঙ্গের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্রী-হরির সেবা ব্যতীত সকল প্রকার ফল সঙ্কল্প পরিত্যাগ করত মোক্ষবাঞ্ছা পর্য্যন্ত কৈতব প্রধান† জানিয়া শুদ্ধভক্তিযোগে ভগবানের আরাধনা কর্ত্তব্য। ভক্তি বিনা অন্য সাধন অজাগল-স্তনের ন্যায় বৃথা। ভক্তিই পরম প্রবল, ভক্তিই সর্ব্বাকর্ষক সর্ব্বাহ্লাদক মহারসায়ন। ইহার গন্ধমাত্রে ভোগাভিলাষ মুক্তিকামনা ও সিদ্ধিসুখ পলায়ন করে। সৎসঙ্গ ভগবৎসেবা ভাগবৎ পাঠ নামজপ ও ব্রজভূমিতে বাস এই পঞ্চবিধ সাধনই প্রধান। ইহার মধ্যে

---

* যে সকল মুনি আত্মারাম অর্থাৎ যাঁহারা পরমাত্মাতে নিরন্তর রমণ করেন, এবং "নির্গ্রন্থাঃ" কিনা তত্ত্বজ্ঞান নিষ্পন্ন হওয়াতে যাঁহারা বিধি নিষেধ রূপ গ্রন্থের বহির্ভূত হইয়াছেন অথবা ক্রোধ অহঙ্কাররূপ হৃদয়গ্রন্থি হইতে যাঁহারা মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও শ্রীহরির মধুময় গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

ভাগবত ১ম স্কন্ধ ৭ম অধ্যায়।

† "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোহত্র পরমোনির্ম্মৎসরাণাং সতাং"।

ভাগবত ১ম স্কন্ধ।

মহামুনিকৃত ভাগবত শাস্ত্রে, নির্ম্মৎসর অর্থাৎ হিংসাদি রহিত সর্ব্বভূতবৎসল সাধুদিগের অনুষ্ঠেয় মোক্ষ পর্য্যন্ত ফলাভিসন্ধিরহিত পরমধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। 'প্রোজ্ঝিত' শব্দে 'প্র' উপসর্গ থাকাতে শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা অনুসারে মোক্ষাভিসন্ধি পর্য্যন্ত কৈতব বলিয়া বুঝিতে হইবে। "প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি কৈতবমিতি।" (শ্রীধর) "কৈতব" অর্থে ছল কপটতা। ভক্তিশাস্ত্রে মোক্ষবাঞ্ছাকে প্রধান কৈতব বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

"অজ্ঞানতমের নাম কহি যে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ কাম বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥
কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞান তমোধর্ম্ম॥"

চৈতন্য চরিতামৃত আদিখণ্ড প্রথম অধ্যায়॥

কোন একটি স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠিত হইলেই সুবুদ্ধি ব্যক্তির শ্রীহরিতে প্রেমোদয় হইয়া থাকে। ভক্তিপ্রভাবে শ্রীহরির গুণে আকৃষ্ট হইয়া ভক্তগণ সকল কামনা ত্যাগ করত হরিপদারবিন্দ আশ্রয় করেন। সংসারপথে ভ্রমণ করিতে করিতে যদি সাধুসঙ্গ লাভ হয় তবে যাগ যজ্ঞাদি সমুদায় কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া সেই সাধক কেবল শ্রীহরির ভজনা করেন। ভাগবতে কথিত হইয়াছে,

"সৎসঙ্গান্মুক্ত দুঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে বুধঃ।
কীর্ত্ত্যমানং যশো যস্য সকৃদাকর্ণ্য রোচনং॥"

ভাগবত ১মস্কন্ধ।

সাধুসঙ্গগুণে যিনি বিষয়রূপ দুঃসঙ্গ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন তিনি সাধুমুখে কীর্ত্ত্যমান রুচিকর ভগবানের যশঃকথা একবার মাত্র শ্রবণ করিতে পাইলে আর সৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। হে সনাতন! তোমার পবিত্র সঙ্গগুণে আমার হৃদয়ে এই সকল অর্থ স্ফূর্ত্তি লাভ করিল। সনাতন গৌরমুখে 'আত্মারাম' শ্লোকের বিবিধ তত্ত্বগর্ভ গভীর ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া বলিলেন, ভাগবতের গভীর তত্ত্ব আপনি ব্যতীত আর কে জানে? চৈতন্য বলিলেন, কেন আমার স্তুতি করিতেছ? ভাগবত শাস্ত্র আলোচনা করিলেই জানিতে পারিবে, প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রতি শ্লোক প্রতি অক্ষরে নানা অর্থ প্রকাশ করিতেছে। সনাতন! আমি একজন বাতুল, শ্লোকের ব্যাখ্যাতে যে সকল প্রলাপোক্তি করিলাম কে তাহা মান্য করিবে? আমার ন্যায় বাতুলেরাই ভাগবতের এবম্বিধ অর্থ বুঝিয়া থাকে।

"তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া।
পুনরপি কহে কিছু বিনয় করিয়া॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি তুমি সার্ব্বভৌম স্থানে।
এই শ্লোকের আঠার অর্থ করিয়াছ ব্যাখ্যানে॥
আশ্চর্য্য শুনিয়া মোর উৎকণ্ঠিত মন।
কৃপাকরি কহ যদি জুড়ায় শ্রবণ॥
প্রভু কহে আমি বাতুল আমার বচনে।
সার্ব্বভৌম বাতুলতা সত্য করি মানে॥
কিবা প্রলাপিলাম কিছু নাহিক স্মরণে।
তোমার সঙ্গ বলে যদি কিছু হয় মনে॥
সহজে আমার কিছু অর্থ নাহি ভাসে।
তোমা সবা সঙ্গ বলে যে কিছু প্রকাশে॥
একাদশ পদ এই শ্লোক সুনির্ম্মল।
পৃথক নানা অর্থ পদে করে ঝলমল॥
. .. .
হেতু শব্দে কহে ভুক্তি আদি বাঞ্ছান্তরে।
ভুক্তি সিদ্ধি মুক্তি মুখ্য এ তিন প্রকারে॥
এক ভুক্তি কহে ভোগ অনন্ত প্রকার।
সিদ্ধি অষ্টাদশ মুক্তি পঞ্চ বিধাকার॥
এই যাঁহা নাহি সেই ভক্তি অহৈতুকী॥
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী॥
ভক্তি শব্দের অর্থ হয় দশ বিধাকার।
এক সাধন প্রেমভক্তি নবপ্রকার।
রতি লক্ষণা প্রেম লক্ষণা ইত্যাদি প্রচার।
ভাবরূপা মহাভাব লক্ষণ রূপা আর॥
শান্ত ভক্তের রতি বাড়ে প্রেম পর্য্যন্ত।
দাস্য ভক্তের রতি হয় রাগ দশা অন্ত॥
সখা গণের রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত।
পিতৃ মাতৃ স্নেহ আদি অনুরাগ অন্ত॥
কান্তাগণের রতি পায় মহাভাব সীমা।
ভক্তি শব্দের এই সব অর্থের মহিমা॥
... .
সর্ব্বাকর্ষক সর্ব্বাহ্লাদক মহারসায়ন।
আপনার বেগে করে সর্ব্ব বিস্মরণ॥
ভুক্তি সিদ্ধি মুক্তি সুখ ছাড়ায় যার গন্ধে।
অলৌকিক শক্তির গুণে কৃষ্ণ কৃপায় বান্ধে॥
শাস্ত্র যুক্তি নাহি ইঁহা সিদ্ধান্ত বিচার।
এই স্বভাবগুণে যাতে মাধুর্য্যের সার॥
গুণ শব্দের অর্থ গুণ কৃষ্ণের অনন্ত।
সৎচিৎ রূপগুণ সর্ব্ব পূর্ণানন্দ।
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য কারুণ্য স্বরূপ পূর্ণতা।
ভক্ত বাৎসল্য আত্মা পর্য্যন্ত বদান্যতা॥
অলৌকিক রূপ রস সৌরভাদি গুণ।
কারও মন কোন গুণে করে আকর্ষণ॥

... .

পক্ষীমৃগ বৃক্ষলতা চেতনাচেতন।
প্রেমে মত্ত করি আকর্ষয়ে কৃষ্ণগুণ ॥
হরি শব্দে নানার্থ দুই মুখ্যতম।
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে প্রেম দিয়া হরে মন ॥
যৈছে তৈছে যোহি কোহি করয়ে স্মরণ।
চারিবিধ তাপ তার করে সংহরণ ॥ *
তবে করে ভক্তি বাধক কর্ম্ম অবিদ্যানাশ।
শ্রবণাদ্যের ফল প্রেমা করয়ে প্রকাশ ॥
নিজগুণে তবে হরে দেহেন্দ্রিয় মন।
ঐছে কৃপালু কৃষ্ণ ঐছে তাঁর গুণ ॥
চারি পুরুষার্থ ছাড়ায় হরে সবার মন।
হরি শব্দের এই মুখ্য করিল লক্ষণ ॥

... ...

সেই উপাসক হয় ত্রিবিধ প্রকার।
অকাম মোক্ষকাম সর্ব্বকাম আর।
বুদ্ধিমানের অর্থ যদি বিচারজ্ঞ হয়।
নিজকাম লাগি তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥
ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি পরম প্রবল ॥
অজাগলস্তন ন্যায় অন্য সাধন।
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান জন ॥
আর্ত্ত অর্থার্থী দুই সকাম ভিতরে গণি।
জিজ্ঞাসু জ্ঞানী দুই মোক্ষকাম মানি ॥
এই চারি সুকৃতি হয় মহাভাগ্যবান।
তত্তৎ কামাদি ছাড়ি হয় শুদ্ধ ভক্তিমান ॥
সাধুসঙ্গ কৃপা কিবা কৃষ্ণের কৃপায়।
কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধভক্তি পায় ॥
দুঃসঙ্গ কহি কৈতব আত্মবঞ্চনা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণে ভক্তি বিনা অন্যকামনা ॥
'প্র'শব্দে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামী করিয়াছে ব্যাখ্যান ॥
সকাম ভক্ত অজ্ঞ জানি দয়ালু ভগবান ॥
স্বচরণ দিয়া করে ইচ্ছার পিধান † ॥

সাধুসঙ্গ কৃষ্ণসেবা ভক্তির স্বভাব।
এতিনে সব ছাড়ায় করে কৃষ্ণে ভাব ॥

... ...

জ্ঞানমার্গে উপাসক দুইত প্রকার।
কেবল ব্রহ্ম উপাসক মোক্ষাকাঙ্ক্ষী আর ॥
কেবল ব্রহ্মউপাসক তিন ভেদ হয়।
সাধক ব্রহ্মময় প্রাপ্ত ব্রহ্মলয় ॥
ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে মুক্তি নাই হয়।
ভক্তিসাধন করে যেই প্রাপ্ত ব্রহ্মময় ॥
ভক্তির স্বভাব ব্রহ্মে করে আকর্ষণ।

... ...

গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্ম্মল ভজন ॥

... ...

কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ দোষ মায়া হৈতে হয়।
কৃষ্ণোন্মুখ ভক্তি হৈতে মায়ামুক্ত হয় ॥
ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি ভক্ত্যে মুক্তি হয়।
তবে মুক্তি পাইলে অবশ্য কৃষ্ণ ভজয় ॥

. ...

কৃষ্ণভক্ত দুঃখহীন বাঞ্ছান্তর হীন।
কৃষ্ণ প্রেম সেবাপূর্ণানন্দ প্রবীণ ॥

... ...

কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গে রতি বুদ্ধি পায়।
সব ছাড়ি শুদ্ধভক্তি করে কৃষ্ণ পায় ॥
সৎসঙ্গ কৃষ্ণসেবা ভাগবত নাম।
ব্রজে বাস এই পঞ্চ সাধন প্রধান।
এই পঞ্চ মধ্যে এক স্বল্প যদি হয়।
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয় ॥
উদার মহতী যার সর্ব্বোত্তমা বুদ্ধি।
নানাকামে ভজে তবু পায় ভক্তি সিদ্ধি ॥
ভক্তিপ্রভাব সেই কাম ছাড়াইয়া।
কৃষ্ণপদে ভক্তি করায় গুণে আকর্ষিয়া ॥

... ...

দেহরামী কর্ম্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিকাদি জন।
সৎসঙ্গে কর্ম্ম ত্যজি করয়ে ভজন ॥
তপস্বী প্রভৃতি যত দেহরামী হয়।
সাধুসঙ্গে তপ ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণ ভজয় ॥
দেহরামী সর্ব্বকাম সব আত্মারাম।
কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণ ভজে ছাড়ি সব কাম ॥

... .

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ পায়।
তবে সব ত্যজি সেও কৃষ্ণকে ভজয় ॥
একষষ্টি অর্থ এবে স্ফুরিল তোমার সঙ্গে।
তোমার ভক্তিবশে উঠে অর্থের তরঙ্গে ॥

---

* যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্‌বিষয়া ভক্তি রুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥'
ভাগবত—১১শ স্কন্ধ।

হে উদ্ধব! প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা যেমন কাষ্ঠ সকল ভস্মীভূত করে, সেইরূপ মদ্বিষয়া ভক্তি সমুদয় পাপ-রাশি বিনষ্ট করিয়া থাকে।

† পিধান শব্দের অর্থ নাশ। ইচ্ছার পিধান অর্থাৎ মোক্ষবাঞ্ছা পর্য্যন্ত নাশ করেন।

অর্থ শুনি সনাতন বিস্মিত হইয়া।
স্তুতি করে মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া॥
... ...
প্রভু কহে কেন কর স্তবন আমার।
ভাগবতের স্বরূপ কেন না কর বিচার॥
কৃষ্ণতুল্য ভাগবৎ বিভু সর্ব্বাশ্রয়।
প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানাঅর্থ কয়॥
প্রশ্নোত্তরে ভাগবতে করিয়াছে নির্দ্ধার।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার॥
চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড ২৪ অধ্যায়।

ক্রমশঃ

বৈদান্তিক মত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

নিবৃত্তা সা কথং ভূয়ঃ প্রসূয়েত প্রমাণতঃ।
অসত্যেবাবিশেষেঽপি প্রত্যগাত্মনি কেবলে॥

প্রমাণত নিবৃত্ত অবিদ্যা পুনরায় কিরূপে উৎপন্ন হইবে। অবিশেষ ও কেবল প্রত্যক্ আত্মায় সে থাকিতেই পারে না।

নির্ব্বিশেষ আত্মবোধ দ্বারা অবিদ্যা একবার নিবৃত্ত হইলেও আবার তাহা উৎপন্ন হইবে। পশ্চাৎ কর্ম্মাধিকারের হেতুসম্ভাবে কর্ম্মবিধি হউক? শুক্তি-তত্ত্ব-জ্ঞান হেতু অজ্ঞানের একবার নিবৃত্তি হইলেও তো সময়ান্তরে আবার সেই শুক্তিতে রজতভ্রম হয়? প্রত্যুত্তরে কহিতেছেন। অবিদ্যা প্রমাণত অর্থাৎ বেদ গুরু ও অনুভব দ্বারা নিবৃত্ত কি না প্রমাণাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে আবার কিরূপে জন্মিবে। মৃত ও ভস্মীভূত ভার্য্যা কি পুনর্ব্বার প্রসব করিবার জন্য জন্মিয়া থাকে? যদি বল একটি অবিদ্যার নিবৃত্তি হইল বটে কিন্তু অন্য একটীর উৎপত্তিতে বাধা কি? তদ্বিষয়েও বক্তব্য আছে। বল দেখি, এই উৎপত্তি অকারণ না সকারণ? অবশ্য, অকারণ বলিতে পার না; কারণ, অকারণ কার্য্যোৎপত্তিতে অতিপ্রসঙ্গ * দোষ পড়ে। আর যদি সকারণ বল তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই কারণ আত্মা না অনাত্মা? অবশ্য, আত্মা অবিদ্যান্তর উৎপত্তির কারণ হইতে পারে না। এক্ষণে এইটি প্রতিপন্ন করা যাইতেছে। মূল শ্লোকে আত্মার অবিশেষ ও কেবল এই দুই বিশেষণ আছে। 'অবিশেষ' বলাতে মূর্ত্তি প্রভৃতি কতিপয় বিশেষ না থাকিলেও তদতিরিক্ত অন্যও কোন বিশেষ হইতে পারে এজন্য 'কেবল' এই বিশেষণটীর প্রয়োগ। আবার 'কেবল' অর্থাৎ একাকী আত্মারও প্রযত্নাদি গুণযোগরূপ বিশেষের আশঙ্কা আসিতে পারে তন্নিবৃত্তির জন্য 'অবিশেষ' বিশেষণের প্রয়োগ। ফলত অবিশেষ ও কেবল এই দুইটীর এইরূপ ব্যাখ্যান ও ব্যাখ্যেয় ভাব বুঝিয়া লও। যাক্, অবিশেষ ও কেবল প্রত্যক্ আত্মায় অর্থাৎ সর্ব্বান্তর পরমার্থ বস্তুতে সেই অবিদ্যা থাকিতেই পারে না, কোনও মতে সত্তা লাভ করিতে পারে না। কারণ,অসহায় আত্মার অর্থাৎ কূটস্থের কর্ত্তৃত্ব-সঙ্গতি নাই। কর্ত্তৃত্বের অসদ্ভাবে অবিদ্যা আশ্রয়শূন্য হয়। সুতরাং স্বীকার্য্য কূটস্থে অবিদ্যা থাকিতেই পারে না। আর যদি তাঁর অবিদ্যান্তর সহায় স্বীকারও কর ইহাতে অন্যোন্যাশ্রয় † বা অনবস্থা‡ দোষ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। মূল শ্লোকে একটী অপি শব্দের প্রয়োগ আছে।

---

* অলক্ষ্যে লক্ষণ যাওয়াকে অতিপ্রসঙ্গ বলে। উৎপত্তির প্রসক্তি নাই অথচ তাহা স্বীকার করিতেছ এই দোষ।

† অবিদ্যা থাকিলে কর্ত্তৃত্ব থাকিবে আবার কর্ত্তৃত্ব থাকিলে অবিদ্যা থাকিবে। পূর্ব্বে যিনি আশ্রয় পরে তিনি আশ্রিত আবার পূর্ব্বে যিনি আশ্রিত পরে তিনি আশ্রয়। এইরূপ চক্রগতির ন্যায় উভয়ের আশ্রয় আশ্রিত ভাবের নৈরন্তর্য্যকে অন্যোন্যাশ্রয় বলা যায়। ইহা একটী দোষ।

‡ একটী অবিদ্যার নাশে আর একটী অবিদ্যা,

তদ্দ্বারা অন্য পক্ষ অর্থাৎ অনাত্মায় অবিদ্যান্তর উৎপত্তি খণ্ডিত হইতেছে। অনাত্মাতেও অবিদ্যার উৎপত্তি হইতে পারে না। অনাত্মা অবিদ্যার কার্য্য, সুতরাং কার্য্য যে অনাত্মা সে কিরূপে অবিদ্যার কারণ হইবে? আর তোমার শুক্তিকা-দৃষ্টান্তেও আমার বক্তব্য আছে। শুক্তিকাদিতে অবিদ্যা-শক্তি-ভেদের রজতাদি-বিক্ষেপরূপ উপাদানাংশেরই জ্ঞান দ্বারা নিবৃত্তি হয় কিন্তু তাদৃশ অনন্তশক্তিমৎ যে অজ্ঞান তাহা থাকিয়া যায়,তদ্বশাৎ ভ্রান্তির উদয় হইতে পারে। অতএব শুক্তিকা-দৃষ্টান্ত এস্থলে খাটে না §।

ন চেৎ ভূয়ঃ প্রসূয়েত কর্ত্তাভোক্তেতিধীঃ কথম্।
সদস্মীতি চ বিজ্ঞানে তস্মাৎ বিদ্যাঽসহায়িকা॥

সৎব্রহ্মই আমি এই জ্ঞান হইলে যদি পুনরায় অবিদ্যার উৎপত্তি না হয় তবে কর্ত্তা ভোক্তা ইত্যাকার বুদ্ধি কিরূপে হইবে। অতএব বিদ্যা অসহায়।

অবিদ্যার পুনরনুৎপত্তিতে কি ফল তাহাই বলিতেছেন। সৎই অর্থাৎ ব্রহ্মই আমি এইরূপ বিজ্ঞান কিনা বিশিস্ট জ্ঞান অর্থাৎ অপরোক্ষ অনুভব হইলে পরে যদি আর অবিদ্যার উদ্ভব না হয় তবে কর্ম্মাধিকারের হেতুভূত কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব বুদ্ধি কিরূপে উদ্ভূত হইবে, হইতেই পারে না। মূলে একটী 'চ' আছে। কর্ত্তৃত্বাদির বাস্তবত্ব-শঙ্কা নিবৃত্তির জন্য উহার প্রয়োগ। ফলত এই কর্ত্তৃত্বাদি যদি বাস্তব কিছু হইত তাহা হইলে বিদ্যা দ্বারা তাহার নিবৃত্তি হইতে পারিত না, কাজেই আত্মারও মুক্তির ব্যাঘাত ঘটিত। এক্ষণে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় নিরাসের উপসংহার হইতেছে। যখন বিদ্যা উৎপন্ন হইলে কর্ম্ম অসম্ভব হয় তখন অসহায় অর্থাৎ কর্ম্ম-নিরপেক্ষ—একমাত্রই বিদ্যা মুক্তি-হেতু ইহা সিদ্ধ হইল।

অত্যরেচয়দিত্যুক্তো ন্যাসঃ শ্রুত্যাঽতএব হি।
কর্ম্মভ্যো মানসান্তেভ্য এতাবদিতি বাজিনাম্॥
অমৃতত্বং শ্রুতং যস্মাৎ ত্যাজ্যং কর্ম্ম মুমুক্ষুভিঃ।

বিদ্যা কর্ম্ম-নিরপেক্ষ হইয়াই মুক্তির হেতু হইয়া থাকে যুক্তিবলে ইহা সমর্থিত হইল। এক্ষণে তদ্বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে 'সত্যং পরং পরং সত্যং' 'সত্যই পর, পরই সত্য' এইরূপ উপক্রম করিয়া, সত্য তপ প্রভৃতি মানসিক কর্ম্ম সকল শ্রেয়ঃসাধনতায় নির্দ্দেশ পূর্ব্বক পরে 'তানি বা এতান্যবরাণি তপাংসি' 'সেই এই সমস্ত তপস্যা অশ্রেষ্ঠ' এই বাক্যে তুচ্ছ-ফলত্বে তৎসমুদায়ের আবার নিন্দাবাদ করিয়া, 'ন্যাস-ইতি ব্রহ্ম' 'সন্ন্যাসই ব্রহ্ম' এই কথায় তত্ত্বজ্ঞানের অন্তরঙ্গভূত কর্ম্ম-সন্ন্যাসেরই প্রশংসা করা হইয়াছে। এখন বুঝ, নিন্দিত বিষয়ের হেয়ত্ব এবং প্রশংসিত বিষয়ের উপাদেয়ত্ব হেতু মুক্তির কর্ম্মাপেক্ষিতা থাকিলে সন্ন্যাসবিধি অসঙ্গত হয়। সুতরাং কর্ম্মসন্ন্যাস-সহকৃত আত্মজ্ঞানই যে মুক্তি সাধন শ্রুতির ইহাই মুখ্য তাৎপর্য্য। আর

তন্নাশে অপর একটী, এই রূপে অনন্ত অবিদ্যার প্রবাহ স্বীকারকে অনবস্থা বলে। ইহাও দোষ।

§ অবিদ্যাশক্তি দুই প্রকার। সে এক শক্তি দ্বারা বস্তু-স্বরূপকে আবরণ করে। ইহার নাম আবরণ-শক্তি। আর এক শক্তি দ্বারা বস্তুকে অন্যরূপে প্রতিভাসিত করে। ইহার নাম বিক্ষেপ-শক্তি। অবিদ্যা শুক্তিকাদিতে স্বীয় বিক্ষেপ-শক্তি দ্বারা রজত-ভ্রান্তি আনিয়াছিল। এই যে রজত-ভ্রান্তি ইহার উপাদানই বিক্ষেপ শক্তি। কারণ তৎপ্রভাবেই শুক্তিতে রজত-প্রতিভাস হয়। জ্ঞান দ্বারা এই উপাদানেরই—বিক্ষেপেরই নাশ হইতেছে কিন্তু মূল অনন্তশক্তিমৎ যে অজ্ঞান তাহা থাকিয়া যাইতেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে অজ্ঞানের পুনরুৎপত্তি সম্ভব। কিন্তু আত্মাতে স্বয়ং অবিদ্যাই প্রমাণাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইতেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে তাহার পুনরুৎপত্তি অসম্ভব। কাজেই শুক্তিকা দৃষ্টান্ত এস্থলে খাটিল না।

শ্লোকে একটী 'অতএব হি' শব্দের প্রয়োগ আছে। ইহার অর্থ জ্ঞান স্বফল দানে কর্ম্ম-নিরপেক্ষ এই হেতুই, এইরূপ বুঝিতে হইবে। এক্ষণে মুক্তি যে কর্ম্ম-নিরপেক্ষ তদ্বিষয়ে অন্যও শ্রৌত প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে। বাজসনেয়িদিগের উপনিষদে 'আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতং' 'আত্মা দৃষ্ট শ্রুত মত ও বিজ্ঞাত হইলে এই সমস্তই বিদিত হওয়া যায়' এই কথার অবতারণা করিয়া দুন্দুভ্যাদি দৃষ্টান্ত দ্বারা অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক উক্ত হইয়াছে 'উক্তানুশাসনাসি মৈত্রেয়ি এতাবদরে খল্বমৃতত্বং' 'হে মৈত্রেয়ি! তুমি অনুশিষ্ট হইলে এতাবতই মুক্তি!' এই শ্রুতিতে জ্ঞানেরই যে মুক্তি-সাধনতার অবধারণ দেখা গেল ইহাই তাহার কর্ম্ম-নিরপেক্ষিতার নিদর্শন; নচেৎ 'এতাবৎ' 'যাহা কহিলাম এতাবৎই মুক্তি' এই অবধারণার্থক বাক্যের কোনও সঙ্গতি থাকে না। আর 'অমৃতত্বস্য নাশাস্তি বিত্তেন' 'বিত্ত দ্বারা মুক্তির আশা নাই' তত্রোক্ত এই শ্রুতিও বিত্তসাধ্য কর্ম্মের মুক্তি-সাধনতার অভাবেরই জ্ঞাপক হইতেছে। আর একটী কথা, 'বিদ্যাঞ্চ অবিদ্যাঞ্চ' 'বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়কে জানিবে' অবশ্য এই জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়কে পূর্ব্বসিদ্ধান্তের বিরোধি মনে করিতে পার কিন্তু বাস্তব তাহা নহে। এই শ্রুতিতে যে বিদ্যা শব্দ আছে ইহার অর্থ দেবতোপাসন বিদ্যা বা জ্ঞান। সুতরাং এই জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ে কোনই বিরোধ আইসে না। যদি তুমি ইহা দেবতোপাসন বিদ্যা বলিয়া স্বীকার না কর তাহা হইলে 'অগ্নে নয় সুপথা' 'হে অগ্নি আমায় সুপথে লইয়া যাও' এই স্থলে অগ্নির নিকট এই যে পথভিক্ষা ইহার কোন সার্থকতা থাকে না! 'ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া' কর্ম্ম দ্বারা নয় প্রজা দ্বারা নয়, ধন দ্বারা নয়, একমাত্র ত্যাগ—কর্ম্মত্যাগ দ্বারাই অনেকে মুক্তি লাভ করিয়াছেন; কর্ম্মত্যাগই সকলের উৎকৃষ্ট মুক্তি সাধন; কর্ম্ম ত্যাগ দ্বারাই ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়; ইত্যাদি শাস্ত্রবলে কর্ম্মসন্ন্যাসসহ আত্মজ্ঞানই মুক্তিসাধন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অতএব সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু মুমুক্ষুর কর্ম্মত্যাগই শ্রেয়। এখন বুঝিয়া দেখ, যখন জ্ঞানলিপ্সুর সম্বন্ধে কর্ম্মনিষেধ তখন জ্ঞানীর পক্ষে তদ্বিষয়ে আর কি বক্তব্য আছে।

অগ্নিষ্টোমবদিত্যুক্তং তত্রেদমভিধীয়তে ॥

এই অর্দ্ধ শ্লোক পূর্ব্বোক্ত অর্দ্ধের সহিত অন্বিত। যিনি মুমুক্ষু তিনি কর্ম্মসন্ন্যাস পূর্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠ হইবেন যুক্তিবলে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া এখন পূর্ব্বোক্ত অগ্নিষ্টোম দৃষ্টান্ত উল্লেখ পূর্ব্বক দোষ প্রদর্শিত হইতেছে।

নৈককারকসাধ্যত্বাৎ ফলান্যত্বাচ্চ কর্ম্মণঃ।
বিদ্যা তদ্বিপরীতাঽতো দৃষ্টান্তো বিষমো ভবেৎ ॥

দোষ প্রদর্শিত হইতেছে। অগ্নিষ্টোমাদি কার্য্য বহু-কারক-সাধ্য অর্থাৎ নিয়ত হেতু দ্রব্য মন্ত্র তন্ত্রপ্রয়োগ সম্পাদ্য এই হেতু এবং উহার ফল বিভিন্নরূপ অর্থাৎ 'যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়া উপনিষদা বা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতি' 'যাহা বিদ্যা কিনা উপাসনা জ্ঞান ও শ্রদ্ধাদি দ্বারা কৃত হয় তাহাই বলত্তর' এই শ্রুতি বলে বিদ্যা বা উপাসনা-জ্ঞান দ্বারা অপেক্ষাকৃত বলবৎ ফলবিশেষ সম্ভব এই হেতুও কর্ম্ম সহকারি অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু বিদ্যা এইরূপ নহে। ইহা তদ্বিপরীত কিনা কর্ম্ম-স্বভাবের বিপরীত-স্বভাব। বিদ্যা বস্তুতন্ত্র ও প্রমাণপরতন্ত্র এবং নিরতিশয় মোক্ষই উহার

একমাত্র ফল, সুতরাং উহার সহকারি অপেক্ষা নাই। যখন কর্ম্ম ও বিদ্যার এই রূপ স্বভাবভেদ তখন অগ্নিষ্টোমের দৃষ্টান্ত বিষম অর্থাৎ দার্ষ্টান্তিকের অননুরূপ হইয়া পড়িল।

কৃষ্যাদিবৎ ফলার্থত্বাদন্যাকর্ম্মোপবৃংহণম্।
অগ্নিষ্টোমস্ত্বপেক্ষেত বিদ্যান্যৎ কিমপেক্ষতে॥

দৃষ্টান্তের বৈষম্যই প্রদর্শিত হইতেছে। অগ্নিষ্টোম সাতিশয় * কারণ উহার প্রক্রিয়া-বিশেষ-সাধ্য-ফলার্থিতা আছে। সে এই সাধ্য-ফলার্থিতা হেতু অন্য সহকারি কর্ম্ম অর্থাৎ বিহিত উদ্গীথাদি অঙ্গসংস্পৃষ্ট উপাসনাদি কর্ম্ম দ্বারা উপচয় অর্থাৎ বৃদ্ধিকে অপেক্ষা করে। কৃষি বাণিজ্যাদিতে ফলবৃদ্ধির নিমিত্ত সাধন-বিশেষের বৃদ্ধি আবশ্যক ইহা সুপ্রসিদ্ধ; অগ্নিষ্টোমকেও সেই রূপ বুঝিও। কিন্তু বিদ্যা নিরতিশয়-ফল অর্থাৎ স্বফলে অতিশয় কিনা অতিরিক্তকে অপেক্ষা করে না এই হেতু সে কোন্ সহকারি বস্তুকে অপেক্ষা করিবে।

প্রত্যবায়স্তু তস্যৈব যস্যাহঙ্কার ইষ্যতে।
অহঙ্কারফলার্থিত্বে বিদ্যেতে নাত্মবেদিনঃ॥

যাহার অহঙ্কার ইষ্ট হইতেছে তাহারই প্রত্যবায়। আত্মজ্ঞের অহঙ্কার ও ফলার্থিতা নাই।

তুমি কহিয়াছিলে 'অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম' 'বিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠানে প্রত্যবায় হয়' ইহাতেও বক্তব্য আছে। এই কর্ম্মের আমি কর্ত্তা, এই কর্ম্ম করিয়া এই ফল আমি ভোগ করিব ইত্যাকার অহঙ্কার অর্থাৎ অহংবুদ্ধি যাহার স্বাভাবিক রহিয়াছে সেই অধিকারীরই বিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠানে প্রত্যবায় হইবে। কিন্তু যিনি আত্মতত্ত্ববিৎ আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান-নিষ্ঠ তাঁহার ভোগ্য বিষয়ের অভাব বশতই অহঙ্কার ও ফলার্থিতা থাকিতেছে না। অতএব যখন অহঙ্কার ও ফলার্থিতারূপ নিমিত্তেরই অসদ্ভাব তখন কর্ম্মের অননুষ্ঠানে প্রত্যবায় তাঁহার আর কিরূপে ঘটিবে॥

তস্মাদজ্ঞানহানায় সংসারবিনিবৃত্তয়ে।
ব্রহ্মবিদ্যাবিধানায় প্রারব্ধোপনিষত্ত্বিয়ম্॥

অতএব সংসারোচ্ছেদকর অজ্ঞান-নাশ এবং ব্রহ্মবিদ্যা বিধানের নিমিত্ত এই উপনিষৎ আরব্ধ হইয়াছে।

অজ্ঞান-নাশের নিমিত্ত বিদ্যাই অপেক্ষিত কর্ম্ম নহে এই কথার অবতারণা করিয়া এতাবৎ গ্রন্থে কর্ম্মের নিজে বা জ্ঞান-সহকারিতাতেই হউক কোনওরূপে মোক্ষের প্রতি সাক্ষাৎ হেতুত্ব নাই ইহা প্রতিপাদন পূর্ব্বক প্রকৃত কথার উপসংহার করা হইতেছে। অজ্ঞানহানি অর্থাৎ অনাদি অজ্ঞান-নিরাস-সিদ্ধির জন্য অপেক্ষিত যে ব্রহ্মবিদ্যা তৎপ্রতিপাদনের নিমিত্ত এই উপনিষৎ বেদান্ত ভাগ আরব্ধ হইয়াছে। এস্থলে উপনিষৎশব্দ লক্ষণাবলে বেদান্তে প্রযুক্ত হইয়াছে।

সদেরুপনিপূর্ব্বস্য কিপি চোপনিষৎ ভবেৎ।
মন্দীকরণভাবাচ্চ গভাদেঃ শাতনাত্তথা॥

ভাল, তবে উপনিষৎ শব্দের মুখ্য অর্থ কি? এই প্রশ্নে ব্রহ্ম-বিদ্যাতে উহার শব্দবল প্রদর্শন পূর্ব্বক উহার ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ-বলেও কেবল ব্রহ্ম-বিদ্যাই যে মোক্ষহেতু তাহার সূচনা করিতেছেন। উপ ও নি এই দুই উপসর্গ-যোগে সদ ধাতুর উত্তর কিপ্ প্রত্যয়ে উপনিষৎ সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে বিশরণ, গতি ও অবসাদন এই তিনটী ধাত্বর্থ আছে। যাহারা মন্দবুদ্ধি তাহাদিগের জন্ম ও জরাদি শিথিল করিয়া দেয় এই জন্য উপনিষৎ;—ইহা বিশরণ অর্থে প্রযুক্ত। জিজ্ঞাসুর উপ অর্থাৎ

* অভাব পূরণকল্পে অতিশয় কিনা অতিরিক্তকে অপেক্ষা করে এই জন্য সাতিশয়।

সমীপে নিশ্চয়ই ব্রহ্ম প্রাপ্তি করিয়া দেয় এই জন্য উপনিষৎ ;—ইহা গত্যর্থে প্রযুক্ত। আর তত্ত্বজ্ঞদিগের জন্ম জরাদি নিশ্চয় নাশ করে এই জন্য উপনিষৎ ;—ইহা অবসাদন অর্থে প্রযুক্ত। এইরূপ সম্যক্ ধাত্বর্থ-যোগ-বলে বিদ্যাকেই উপনিষৎ বলিয়া বুঝিবে। আর বিদ্যার জন্য উদ্দিষ্ট বলিয়া গ্রন্থও উপনিষৎ। যেমন লাঙ্গল শস্যের জন্য উদ্দিষ্ট এই হেতু লাঙ্গলকে জীবন বলা যায় ইহাও সেইরূপ।

প্রতিষেদ্ধুমশক্যত্বান্নেতি নেতীতি শেষিতম্।
ইদং নাহমিদং নাহমিত্যদ্ধা প্রতিপদ্যতে॥

নেতি নেতি প্রকারে অর্থাৎ ইহা আমি নহি ইহা আমি নহি এই প্রকারে অবশেষিত প্রত্যগাত্মাকে প্রতিষেধ করা যায় না এই হেতু তিনি সাক্ষাৎ উপলব্ধ হইতেছেন।

তুমি বলিতেছ মুমুক্ষুর মোক্ষ-সাধন ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞানের নিমিত্ত বেদান্তের আরম্ভ। ভাল ; কিন্তু ইহাতে একটু কথা আছে। জ্ঞানোদয়ের নিমিত্ত বেদান্তের আরম্ভ তখন সঙ্গত হয় যদি জ্ঞানোদয় বস্তুটাই সম্ভব হয়। কিন্তু আত্মার সংসারিত্ব-সম্পাদক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সহিত যখন জ্ঞানের বিরোধ তখন তুমি শত সহস্র কথাতেও তাহা উৎপাদন করিতে পার না। আর এদিকেও দেখ, প্রত্যক্ষাদির সহিত কাহারও বিরোধ নাই, সুতরাং উহা বলবৎ এই হেতু এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের উপজীবি শাস্ত্র নিতান্তই দুর্ব্বল এই হেতু কথঞ্চিৎ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াও যদি এই প্রত্যক্ষসিদ্ধ সংসারকে বাধিত করে তবে এই প্রত্যক্ষের যে অনুভব তাহা প্রত্যগাত্মারও ব্রহ্মরূপত্বকে কেন না বাধিত করিবে। ইহার প্রত্যুত্তরে কহিতেছেন। “নেতি নেতি” ‘ইহা নহে ইহা নহে’ ইত্যাকারে সকল দৃশ্যের প্রতিষেধ হইলে যে আত্ম-তত্ত্ব অবশেষ থাকে, তাহা যে হেতু প্রতিষেধের অবধি বা সীমাভূত, প্রতিষেধকর্ত্তার স্বরূপ, এবং প্রতিষেধের সাক্ষী বা দ্রষ্টা রূপে অবস্থিত এই হেতু তাহার প্রতিষেধ হয় না, সুতরাং তাহা সাক্ষাৎ নিঃসন্দিগ্ধরূপে উপলব্ধ হয়। যদি বল কিরূপে তাঁহার উপলব্ধি হয় তাহা কথিত হইতেছে। আমি আত্মা, আমি এই দেহস্বরূপ নহি, আমি এই সকল ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ ও তাহার উপাদান অচেতন বা অজ্ঞান পর্য্যন্তও নহি ; কিন্তু আমি এই সমস্ত দেহেন্দ্রিয়াদির প্রকাশক অলুপ্ত-প্রকাশ, কূটস্থ ও অক্ষর, যাঁহাতে সমস্ত জগতের আশ্রয় অনভিব্যক্ত আকাশ ওতপ্রোত রহিয়াছে তিনিই আমি। এইরূপেই আত্মোপলব্ধি হয়। এক্ষণে বুঝ ইহা দ্বারা বিদ্যার অনুৎপত্তি শঙ্কা নিরাকৃত হইল। আর সমস্ত শ্লোকার্থ দ্বারা বুঝিতে হইবে প্রত্যক্ষাদি প্রত্যগাত্মার বাধক নহে।

অহং ধীরিদমাত্মোত্থা বাচারম্ভণগোচরা।
নিষিদ্ধাত্মোদ্ভবত্বাৎ সা ন পুনর্ম্মানতাং ব্রজেৎ॥

অহং বুদ্ধি ইদং আত্মা হইতে উত্থিত ও বাচারম্ভণগোচর, সে নিষিদ্ধ আত্মা হইতে উদ্ভূত বলিয়া প্রমাণত্ব লাভ করিতে পারে না।

আমি ব্রহ্ম এই জ্ঞান পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উৎপন্ন হইলেও টেঁকিতে পারে না, কারণ দেহেন্দ্রিয়াদিতে অভিমান অর্থাৎ আত্মবুদ্ধির নিরন্তর অনুবৃত্তি হইতেছে। এই প্রশ্নে কহিতেছেন, যে, এই দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি একে তো প্রমাণমূলক নহে ; তার উপর আবার ইহা বাধিত অর্থাৎ প্রমাণত নষ্ট বিষয়ের অনুবৃত্তি, সুতরাং ইহা আভাস এই হেতু ইহা জ্ঞানের প্রতিপক্ষ হইতে পারে না। এইরূপ অভিপ্রায়ে সিদ্ধান্ত

করিয়া এক্ষণে বেদোক্ত জ্ঞানেরই প্রাবল্য প্রদর্শিত হইতেছে। দেহেন্দ্রিয়াদি অনাত্মাতে যে আত্মবুদ্ধি তাহাকে অহংধী অর্থাৎ অহঙ্কার বলা যায়। সেই অহংধী অহংকর্ত্তার ইদং অংশ হইতে অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব অহঙ্কারের বাসনা-কবলিত অন্তঃকরণ রূপ ইদং আত্মা হইতে উত্থিত, অধ্যাসাত্মক। অহংধীর স্বরূপত এইরূপ দৌর্ব্বল্য প্রদর্শন পূর্ব্বক এক্ষণে বিষয়ভেদ বশতও তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। যাহা স্বতঃসত্তাহীন অথচ প্রত্যক্ষ-ব্যবহার-গোচর তাহাই বাচারম্ভণ। স্পষ্ট কথায় যাহা মিথ্যা জড় ও অনাত্মরূপ তাহা বাচারম্ভণ। এই বাচারম্ভণই ইদংধীর গোচর বা বিষয়। যখন এইরূপ হইতেছে এই হেতু অর্থাৎ 'নেতি নেতি' শাস্ত্র দ্বারা নিষিদ্ধ যে আত্মা তদুত্থিত এই হেতু আত্মযাথার্থ্য জ্ঞানের পর সেই ইদংধী আর কিছুতেই প্রমাণ হইতে পারে না। কারণ স্বপ্নাবস্থা-বিশেষজাত জ্ঞানের ন্যায় ইহা অবস্তু,অবস্তুজাত ও অবস্তু-বিষয়ক। অতএব বেদোক্ত জ্ঞানই প্রবল, অন্য নহে ইহাই সিদ্ধান্ত।

ক্রমশঃ।

প্রভাত চিন্তা।

ঈশ্বরের আহ্বান শ্রবণ কর।

বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর প্রতিদিন প্রভাতকালে তাঁহার সৃষ্টিকে জাগ্রৎ করিয়া তাঁহার মঙ্গল কার্য্যে কেমন নিয়োজিত করেন। তাঁহার আদেশে কনকময়ী উষা গাঢ় অনুরাগভরে মহোল্লাসে তাঁহার প্রেমকরুণাভা দিগন্তে বিস্তার করিয়া নব দিবসের সূচনা করে। জগৎপ্রাণ সমীরণ তাঁহার প্রীতি-সুধা বহন করিয়া মধুর মধুরতর রূপে প্রবাহিত হয়। বিহঙ্গকুল শশব্যস্তে স্ব স্ব আহারান্বেষণাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ও তৎসঙ্গে সঙ্গে প্রাণদাতার প্রতি নির্ভর-সূচক আনন্দ কোলাহল ব্যক্ত করিয়া ভক্তের প্রাণ মন হরণ করে। এ সময়ে প্রত্যেক বৃক্ষ লতা—তাহাদিগের প্রত্যেক পত্র পুষ্প ও ফল—বায়ু ও সূর্য্যালোকের সহিত মিলিত হইয়া স্ব স্ব জীবন ধারণের প্রয়োজন অবগত হইয়া যেন তাহার সিদ্ধির নিমিত্তে তৎপর থাকে। সূর্য্য দিঙ্মণ্ডল প্রকাশিত করিয়া উদ্যম ও স্ফূর্ত্তি সহকারে রেখামাত্র অতিক্রম না করিয়া স্বীয় স্রষ্টার নির্দ্দিষ্ট পথে ধাবমান হইতে থাকে। এ সময়ে হে মানব! তুমি কি জাগ্রৎ হইয়া আপনার কার্য্য কি তাহা প্রণিধান করিবে না? যিনি প্রত্যেক পুষ্পকে যেন নাম * ধরিয়া ডাকিয়া তাহার সুবাস ও সৌন্দর্য্য বিকীরণ দ্বারা স্বীয় স্বীয় জন্মের সফলতা সম্পাদন করিতে বলিতেছেন, তিনি কি তোমার অমরাত্মার উচ্চ ভাব ও নিয়তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া তোমাকে অদ্য জীবনপথে অগ্রসর হইতে বলিতেছেন না? বৃক্ষ সকল পৃথিবী হইতে রসাকর্ষণ দ্বারা জীবন ধারণ করিলেও যেমন তাহারা উন্নতি ও পুষ্টিবর্দ্ধন জন্য সূর্য্যরশ্মি ও বৃষ্টিবিন্দুর প্রত্যাশায় ঊর্দ্ধমুখে প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ তুমি সংসারে নিবদ্ধ থাকিয়া সংসারের কার্য্যে রত থাকিয়াও প্রেমসূর্য্য ও করুণাঘন প্রাণেশ্বরের দিকে তাকাইয়া তাঁহার প্রিয় কার্য্য বলিয়া সংসারকার্য্যে প্রবৃত্ত হও। তিনি অমৃত কিরণ দ্বারা তোমার হৃদয়ের প্রীতিপুষ্প প্রস্ফুটিত করিবেন, ও কৃপাবারি বর্ষণপূর্ব্বক তোমাকে শান্তি সুধাতে আপ্লা-

* "একে একে নাম ধরে ডাকিছেন বুঝি প্রভু—
একে একে ফুলগুলি তাই ফুটিয়া উঠিছে বনে।"
কবির গান।

বিত করিবেন। তাহা হইলে তুমি সংসারে অনাসক্তচিত্ত হইয়া তাঁহার প্রেম কর্ত্তৃক প্রণোদিত ও তাঁহার মধুর ভাবে পূর্ণ হইয়া সাংসারিক কর্ম্ম করিতে পারিবে। সংসার আমার নিজের এ রূপ ভাবে মুগ্ধ হইয়া কর্ম্ম করা তোমার উচিত নহে। যেহেতু এ সংসার তোমার নিজের নহে। এ সংসার ঈশ্বরের। তোমার ইহাতে কিছুই স্বত্ব নাই। ঈশ্বর তাঁহার অনির্দ্দেশ্য মঙ্গলাভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার জন্য তোমাকে এখানে দু দিনের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। তুমি বীজ রোপণ করিলে, মুকুল হইল, ফল ভোগ করিবার সময় ঈশ্বর হয় ত তোমাকে এখান হইতে অপসৃত করিলেন,

> যথা ক্রীড়োপস্করাণাং সংযোগবিগমাবিহ।
> ইচ্ছয়া ক্রীড়িতুঃ স্যাতাং তথৈবেশেচ্ছয়া নৃণাং॥
>
> ভাগবত ১। ১৩। ৩৮।

যেমন পুত্তলিকা ক্রীড়াকারী পুত্তলিদিগকে যথেচ্ছা সংযোগ ও বিয়োগ করে, সেই রূপ সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বর এতৎ সংসারের জনগণের পরস্পর মিলন ও বিচ্ছেদ আপন ইচ্ছানুসারে সম্পাদন করেন। অতএব কি শ্রমসাধ্য জীবিকা পরোপকার সাধন জ্ঞানোপদেশ প্রদান বা ঈশ্বরের ধর্ম্ম প্রচার যে কোন কার্য্যের ভার ঈশ্বর তোমাকে অদ্য দিয়াছেন "তিনি প্রভু, আমি ভৃত্য, যতদিন আমাকে এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবেন, ততদিন তাহা প্রাণপণে করিব" এইরূপ ঈশ্বরার্পিত বুদ্ধিতে সেই সকল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। তুমি এখানে প্রভুর যে কর্ম্ম করিবে তজ্জন্য তাঁহার নিকট ভৃতি পাইবে। সে ভৃতি কি? তাঁহার সহিত সহবাস, তাঁহার প্রেমানন সন্দর্শন, তাঁহার ইচ্ছার সহিত তোমার ইচ্ছার সম্মিলন, হৃদয়ে তাঁহার প্রসাদ সম্ভোগ ইত্যাদি। তুমি যদি স্বীয় ভৃতিতে সন্তুষ্ট না হইয়া সংসারের দিকে লালসার সহিত দৃষ্টিপাত কর, তাহা হইলে তোমার ভৃতি হইতে বঞ্চিত হইবে, আর যাহার জন্য তোমার হৃদয়ের বিক্ষেপ হইয়াছিল, সে বস্তুও হয় ত তোমার তীব্র যন্ত্রণার কারণ হইবে। মনে কর যদি কোন উদ্যানপালক ভৃত্য স্বীয় প্রভুর অগোচরে উদ্যানের ফল আত্মসাৎ করে, তবে কি সেই ভৃতি ও পাপার্জ্জিত ফল উভয় হইতে সে একেবারে বঞ্চিত হয় না?

হে সাধক! যদি অমৃত পথের পথিক হইতে চাও, তবে ঈশ্বরের আহ্বান বাণী শ্রবণ কর, তদনুযায়ী তাঁহাকে প্রাণ মন সমর্পণ কর, আপনাকে অকর্ত্তা ও ঈশ্বরকে কর্ত্তা জানিয়া তাঁহার অধীনে থাকিয়া সংসারে বিচরণ কর, যদি স্বীয় বাসনা দ্বারা পরিচালিত হও, তাহা হইলে তোমার কর্ম্মফলে আসক্তি হইবে, কর্ম্মের সিদ্ধি বা অসিদ্ধির প্রতি নির্ব্বিকারমনা হইতে পারিবে না। তোমার "আমিত্ব" ঘুচিবে না। তুমি শান্তি-সুখ পাইবে না। তোমাকে বাসনার "অশ্রু" পুনঃ পুনঃ ফেলিতে হইবে।

ক্রমশঃ।

পাঁচ ফুলের সাজি।

(৫ম সংখ্যা)

১। Marlowe,—

"He that loves pleasure, must for pleasure fall."

—যে সুখপ্রিয়, তাহাকে সুখের জন্যই পতিত হইতে হইবে।

২। ভগবদ্গীতা,—

"আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।

—যে (স্থিরচিত্ত) ব্যক্তির মধ্যে, পরিপূর্ণ অনুদ্বেল সমুদ্র মধ্যে নদ নদীর প্রবেশের ন্যায়, ভোগ সমূহ অল্পে অল্পে ও ধীরে ধীরে প্রবেশ করে, তিনিই শান্তি লাভ করেন; কিন্তু যিনি ভোগ কামনা করেন, তিনি শান্তি লাভ করেন না।

—

মৎকর্ম্মকৃৎ মৎপরমোমদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব॥"

—যিনি (আমারই) ঈশ্বরেরই কার্য্য করেন, ঈশ্বরই যাঁহার পুরুষার্থ, যিনি ঈশ্বরের ভক্ত, এবং আসক্তি বর্জ্জিত, কোন জীবের সহিত যাঁহার শত্রুতা নাই, হে পাণ্ডব! তিনিই (আমাকে)ঈশ্বরকে লাভ করেন।

—

৩। Toru Dutta,—

"That is true knowledge which can make
Us mortals, saint-like, holy, pure,
The strange thirst of the spirit slake
And strengthen suffering to endure.
That is true knowledge which can change
Our very natures, with its glow."

—তাহাই যথার্থ জ্ঞান, যাহা নশ্বর আমাদিগকে দেবতাদের ন্যায়, পবিত্র, ও নিষ্মল করিতে পারে, যাহা আত্মার অজ্ঞাত পিপাসা মিটাইতে পারে, এবং ক্লেশ সহ্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করে। তাহাই যথার্থ (পরা) বিদ্যা, যাহা আপনার জ্যোতি দ্বারা আমাদের প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিতে পারে।

—

৪। Parmenides,—

"The many are nought, the One is all."

—বহু কিছুই নহে, একই সকল।

—

৫। মনু,—

"ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষপহারিষু।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেদ্বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাং॥"

—যেমন সারথী স্বীয় রথের অশ্বগণকে বশ করিতে যত্ন করে, তদ্রূপ বিদ্বান ব্যক্তি মুগ্ধকর রূপ রসাদি বিষয় সমূহে বিচরণশীল ইন্দ্রিয়গণকে বশ করিতে যত্ন করিবেন।

—

৬। Geothe,—

"In your lives His laws obey
Let love your governed bosom sway—
Blessings to the poor canvey,
To God with humble spirit pray,
To Man his benefits display:
Act thus, and He, your Master dear,
Though unseen is ever near."—

—তোমাদের জীবনে তাঁহার নিয়ম পালন কর, প্রেম তোমাদের সংযত চিত্তকে চালিত করুক, দীন দুঃখীদিগের মঙ্গল সাধন কর, ঈশ্বরের নিকট বিনীত অন্তরে প্রার্থনা কর, তাঁহার মঙ্গল বিধান সকল মনুষ্যের নিকট প্রকাশ কর। এইরূপ কর, তবেই যিনি তোমাদের প্রিয় প্রভু, তিনি অদৃশ্য হইলেও সর্ব্বদাই তোমাদের নিকটে থাকিবেন।

—

৭। F. W. Newman,—

"Reverence is the beginning of true religion. He who reverences God is a religious man, and whatever his other ignorances or defects, is an accepted worshipper.

—ভক্তিই প্রকৃত ধর্ম্মের আরম্ভ। যিনি ভগবানকে ভক্তি করেন তিনিই ধর্ম্মিক, এবং যতই তাঁহার অন্য ভ্রম বা ত্রুটি থাকুক না কেন, তিনি একজন গণনীয় উপাসক।

—

"Self-despair joined with trust in God, is a beginning of vigorous spiritual life: Self-despair without hope from God is too awful to think of."

—ভগবানের উপর নির্ভর ও আত্ম-শক্তিতে নিরাশ জীবন্ত ধর্ম্ম জীবনের প্রারম্ভ। আত্ম-নির্ভরও নাই, তাঁহার উপরেও নির্ভর নাই, ইহা অতি ভয়ানক অবস্থা।

—

৮। রামকৃষ্ণ পরমহংস,—

—"তাঁহার প্রতি কিরূপ মন চাই? যেমন কৃপণের ধনে মন, তেমনি তাঁহাতে মন চাই।

সাধকের বল কি? বালকের ন্যায় সাধকের রোদন বল।

সিদ্ধ মনের কিরূপ অবস্থা? যেমন আলু প্রভৃতি সিদ্ধ হইলে কোমল হয়, তদ্রূপ সিদ্ধ মন কোমল হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে ঈশ্বরের বিষয় পাঠ করিয়া লোককে বুঝান, আর মানচিত্রে কাশী দর্শন করিয়া লোককে কাশী বুঝান একই কথা।

আত্ম-সমর্পণ করা অপেক্ষা সহজ সাধন আর নাই।

৯। Leighton,—

"Faith elevates the soul not only above sense and sensible things, but above reason itself."

—বিশ্বাস আত্মাকে যে কেবল ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় অপেক্ষা উন্নত করে তাহা নহে, উহা আত্মাকে বুদ্ধি হইতেও উন্নত করে।

১০। Rev. D. Coleridge,—

"There is small chance of truth at the goal where there is not a child-like humility at the starting post."

—শিশুর ন্যায় দীনতার সহিত চলিতে আরম্ভ না করিলে অবশেষে সত্য লাভের সম্ভাবনা অল্পই।

১১। Lalita-Vistara,—

"He is ever resplendent, who is free from sin, like an undorned child. The sinner is never beautiful."

—যিনি পাপমুক্ত, তিনি ভূষণহীন শিশুর ন্যায় চির জ্যোতির্ম্ময়। পাপী কখনই সুন্দর হয় না।

১২। Confucius,—

"To see what is right and not to do it, is want of courage."

—কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিয়া, তাহা না করা সাহসহীনতা মাত্র।

১৩। St Paul,—

"(For) To be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace.'

—(কারণ) ইন্দ্রিয়াসক্ত হওয়াই মৃত্যু; কিন্তু ধর্ম্মে রত হওয়া জীবন এবং শান্তি। (Romans. VIII. 6.)

১৪। St Mark,—

"Have faith in God, for whosoever shall say to this mountain, Be thou removed, and be cast into the sea; and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass:—he shall have whatever he saith. Therefore I say unto you, what thing soever ye desire, when ye pray believe that ye receive them, and ye shall have them." (Chap XI. 22-4)

—ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, কারণ যে কেহ এই পর্ব্বতকে (পর্ব্বতসদৃশ বাধা বিঘ্ন বা বিপদকে) বলিবে, তুমি অপসৃত হও এবং সাগর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হও, এবং মনো মধ্যে সন্দেহ করিবে না, কিন্তু সে যাহা অনুজ্ঞা করিতেছে তাহা ঘটিবে বিশ্বাস করিবে—সে যাহা চাহিবে তাহাই প্রাপ্ত হইবে। অতএব, আমি তোমা-দিগকে বলিতেছি, প্রার্থনা কালে যে কোন বস্তু কামনা কর না কেন, বিশ্বাস করিও যে তোমরা তাহা পাই-তেছ, তবেই তোমরা তাহা নিশ্চয়ই লাভ করিবে।

১৫। শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর,—

"আত্মার দ্বারা যে আত্মা বশীভূত হইয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু। আত্মাই নিয়ত বন্ধু, আত্মাই নিয়ত রিপু।

—যতই বিষয় ভোগ করিবে, বিষয়-তৃষ্ণা ততই বৃদ্ধি পাইবে। অতএব সন্তোষ অবলম্বন করিবে এবং প্রকৃত তৃপ্তিস্থান সংসারের অতীত জানিয়া সংসারের আসক্তি পরিত্যাগ করিবে।"

১৬। Keshub Chander Sen,—

"Faith is a new creation. It is the death of the flesh and the regeneration of the spirit."

—"বিশ্বাস এক নূতন সৃষ্টি। উহা ইন্দ্রিয়ের নাশ এবং আত্মার পুনর্জ্জীবন।

The progress of faith is to be gauged by its distance from the world."

—সংসার হইতে দূরত্ব অনুসারে বিশ্বাসের উন্নতির পরিমাণ করিতে হইবে।

——

১৭। Jeremy Taylor,—

"He that would willingly be fearless of death, must learn to despise the world : he must neither love anything passionately, nor be proud of any circumstance of his life."—

—যে ইচ্ছাপূর্ব্বক মৃত্যুভয়কে অতিক্রম করিতে চাহে, তাহাকে সংসারকে ঘৃণা করিতে শিখিতে হইবে। সে যেন কোন বস্তুকে মোহের সহিত ভাল না বাসে, বা জীবনের কোন বিষয়ের জন্য গর্ব্বিত না হয়।

——

১৮। Pope.—

"To be angry is to revenge the fault of others on ourselves."

—ক্রোধান্বিত হওয়া ও নিজের উপর পরের দোষের প্রতিশোধ লওয়া একই কথা।

——

১৯। Socrates,—

"(But) They who know very well what ought to be done, and yet do quite otherwise are ignorant and stupid." (Memorabilia of Zenophon)

—(কিন্তু) যাহারা কর্ত্তব্য বেশ বুঝে, অথচ তাহার অন্যথা আচরণ করে, তাহারা অজ্ঞ এবং মূঢ়।

——

২০। Thomas-a-kempis,—

"In truth, it is not deep talk that makes a man holy and just; but a virtuous life that makes him dear to God.

—বাস্তবিক, অধিক মুখের কথাতে মানুষকে পবিত্র এবং ন্যায়পরায়ণ করে না, কিন্তু সাধু জীবন মানুষকে ঈশ্বরের নিকট আদৃত করে।

——

I had rather feel compunction than know its definition."—

—আমি বরং অনুতাপের অর্থ বোধ করা অপেক্ষা উহা অনুভব করিব।

——

Vanity of vanities and all is vanity, beside loving God and serving Him alone."—

—অসার অসার, ঈশ্বর প্রীতি এবং কেবল তাঁহার সেবা ব্যতীত আর সকলই অসার।

——

২১। Mathew Arnold,—

"Resolve to be thyself, and know, that he Who finds himself loses his misery!

—তুমি তুমি হতে সঙ্কল্প কর; এবং জানিও যে, যে আপনাকে পায়, সে তাহার দুঃখ হারায়।

—

'Tis God Himself becomes apparent, when God's wisdom and God's goodness are display'd

For God of these His attributes is made."

—যখন ঈশ্বরের জ্ঞান এবং মঙ্গল ভাব প্রকাশিত হয়, তখনই তিনি স্বয়ং প্রকাশমান হন, কারণ ঈশ্বর তাঁহার এই স্বরূপ সমূহে গঠিত।

——

সংবাদ।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আদি ব্রাহ্মসমাজের পরিব্রাজকের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। নিম্নে তাঁহার ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের কার্য্য বিবরণ প্রদত্ত হইল।

৪টা ফাল্গুন রবিবার আদি ব্রাহ্মসমাজের মাসিক সমাজে তিনি বেদীর কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

৫ই সোমবার ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের কার্য্য করেন।

৯ই শুক্রবার বারিপুরে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারের জন্য গিয়াছিলেন।

১২ই সোমবার ভবানীপুরে গমন ও তথাকার সমাজে আচার্য্যের কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

১৩ই মঙ্গলবার ভবানীপুরে থাকিয়া কতিপয় বন্ধু বান্ধবের সহিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম আলোচনা করিয়াছিলেন।

১৫ই বৃহস্পতিবার
১৬ই শুক্রবার
১৭ই শনিবার } বালিগঞ্জে গমন ও নিকটবর্ত্তী ঢাকুরিয়া কসবা প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

১৮ই রবিবার বর্দ্ধমানে গমন ও তথাকার সমাজে বেদীর কর্ম্ম করিয়াছিলেন। ইঁহার সহিত শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তথায় গমন করিয়া-

ছিলেন। তিনি বৰ্দ্ধমান সমাজে একটী সারগর্ভ হৃদয়-গ্রাহী প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে ইনিই সঙ্গীত করেন। সভাতে ৫০।৬০ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদিগের অত্যন্ত উৎসাহ। শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশ-চন্দ্র সরকার এই সমাজের সম্পাদক। ইনি ঔ্যান্-পুর আদালতের একজন উকীল।

১৯এ সোমবার পরিব্রাজক মহাশয় ভবানীপুর সমাজে আচার্য্যের কার্য্য করেন।

২৩এ শুক্রবার মজীলপুরে শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ দত্ত মহাশয়ের বাটীতে গমন করিয়াছিলেন। তথায় বিবাহের বয়স লইয়া কথোপকথন হয়। মজীলপুর হইতে আসিবার সময় বহড়ু গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু নারায়ণ দাস চট্টোপাধ্যায় ও অপরাপর মহাশয় ব্যক্তি-দিগের সহিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মত লইয়া অনেক কথোপকথন হয়। এখানে আদি সমাজের মতাবলম্বী কএকটী লোক আছেন। তাঁহারা বিশেষ উৎসাহী।

২৬এ সোমবার ভবানীপুর সমাজের বেদীর কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

২৮এ বুধবার আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদীর কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

২রা চৈত্র রবিবার প্রাতঃকালে আদি ব্রাহ্মসমাজের মাসিক সমাজে তিনি বেদীর কার্য্য করিয়াছিলেন।

১০ই সোমবার ভবানীপুর সমাজে গমন ও তথায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

১১ই মঙ্গলবার ভবানিপুরে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করেন।

১৪ই শুক্রবার হরিসেনা সভায় গমন এবং তথায় ধর্ম্মালোচনা করেন।

১৬ই রবিবার হরিসেনা সভায় গমন ও ধর্ম্মালোচনা করেন।

১৭ই সোমবার ভবানিপুর সমাজে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৮ই মঙ্গলবার ভবানিপুরে থাকিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

২১এ শুক্রবার মজীলপুর বঙ্গবিদ্যালয়ে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার জন্য গমন করিয়াছিলেন।

২৩এ রবিবার সায়ংকালে বালিগঞ্জে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য গমন করিয়াছিলেন ও শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন-কুমার চৌধুরী মহাশয়ের সহিত ও অন্যান্য অনেকের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন।

২৪এ সোমবার ভবানিপুর সমাজে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

২৫এ মঙ্গলবার ভবানিপুরে থাকিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

২৭এ বৃহস্পতিবার কালিঘাটে ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচার জন্য গমন করেন।

২৯এ শনিবার ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার জন্য আর্য্য সমাজের লোকদিগের নিকট গমন করিয়াছিলেন।

৩০এ রবিবার প্রাতঃকালে নানা স্থানে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার জন্য গমন করিয়াছিলেন।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১।

চৈত্র।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	৯৭৯॥/১০
পূর্ব্বকার স্থিত	৩৪১৬॥ ৫
সমষ্টি	৪৩৯৬ /১৫
ব্যয় ...	৯৪৮ ৶১০
স্থিত	৩৪৪৭৸৶ ৫

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	২৯॥ ১৫

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ ধর	৫৲
" " রামলাল ঘোষাল	১৲
" " নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস	॥০

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশচন্দ্র সরকার দঃ তাঁহার পিতার পরলোক গমন কালীন দান	২০৲
দানাধারে প্রাপ্ত	১৲১৫
	২৯॥ ১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৯৭৸ ৫
পুস্তকালয় ...	১৮৯॥/০
যন্ত্রালয় ..	৩৫৬ /১০
গচ্ছিত ...	৯৩ /০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	১৮৩ ৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ...	৩০।৶০
সমষ্টি	৯৭৯॥/১০

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১০৪৲
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৫৬॥৶ ৫
পুস্তকালয়	১৯৸ ১০
যন্ত্রালয়	৩০৫।৶১০
গচ্ছিত	৪২৬ ৶০
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৫॥৶ ৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ...	৩০।৶০
সমষ্টি .	৯৪৮ ৶১০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীরমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

ত্রয়োদশ কল্প
প্রথম ভাগ
আষাঢ় ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭২।

৫৭৫ সংখ্যা | ১৮১৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

আমাদের আদর্শ ঈশ্বর।

২১ জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭২।

(শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিবৃত।)

আমরা দুর্ব্বল প্রাণী। চারিদিকে বিঘ্ন-বিপত্তির শ্রেণী দণ্ডায়মান। আমরা ভাবিয়া আকুল হইয়া পড়ি যে কোন্ পথে যাইব এবং কোন্ পথে যাইব না। মরুভূমির মাঝে যেমন শস্যশ্যামল খণ্ডভূমি পাওয়া যায় কিন্তু উষ্ট্র না হইলে সেখানে যাওয়া যায় না—অবশ্য দুই এক জন অন্বেষণ করিতে করিতে পৌঁছিতেও পারেন বটে; সেইরূপ এই সংসারের মাঝে সত্য আছে বটে—এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের মধ্যে, এই অধ্রুব জগতের মধ্যে ধ্রুব অপরিবর্ত্তনীয় এক "মহান্ প্রভুর্ব্বৈ পুরুষঃ" আছেন। কিন্তু আজ যে এই ভক্তজনের সমাগম হইয়াছে, ইহাঁদিগের মধ্যে কে অস্বীকার করিবেন যে এই ধ্রুব সত্যকে দেখাইয়া দিবার জন্য এক জন সুনিপুণ পথপ্রদর্শক আবশ্যক? আমাদিগের পথপ্রদর্শক—যাঁহাকে অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে, তিনিই স্বয়ং আমাদিগের আদর্শ লক্ষ্য—সেই একমাত্র শুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ পরমেশ্বর। আমরা এখন আর পরিমিত দেবতাবৃন্দের দ্বারা পরিতৃপ্ত হইতে পারিব না। মধুর রসের একবার আস্বাদন পাইলে কি মধুমক্ষিকারা আর তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে? আমরাও সেইরূপ জীবন্ত জাগ্রত দেবতাকে পাইয়া কি প্রকারে অচেতন কাষ্ঠ ধূলিরাশি লইয়া ক্রীড়া করিতে সক্ষম হইব? মনুষ্যের আত্মা অনন্তের দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে চায় এবং এই জন্য সে অনন্ত স্বরূপ পরব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে পারুক আর না পারুক, কল্পিত সীমাবদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তিতে কোনপ্রকারেই তৃপ্ত থাকিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানের কথা শুনিবেন না, যাঁহারা যুক্তির কথা গ্রাহ্য করিবেন না; যাঁহারা অন্তরে অনন্তস্বরূপের আভাস প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবেন না, তাঁহারাই অতৃপ্তির মধ্যে তৃপ্ত থাকেন। একটী প্রকাণ্ড শাল বৃক্ষ, তাহার অসংখ্য অভ্রভেদী ডালপালা লইয়া মুক্ত বাতাসে,

মুক্ত আকাশে কেমন খেলিতে থাকে। কিন্তু যদি ঐ শালবৃক্ষকে উৎপত্তির প্রথমাবস্থাতেই কোনও আবরণের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখা হইত, তাহা হইলে কি আর অভ্রভেদী শালবৃক্ষের সুমহান্ গম্ভীর দৃশ্য দেখিতে পাইতাম? তাহা হইলে দেখিতাম যে সেই অভ্রভেদী শালবৃক্ষের পরিবর্ত্তে একটী নিতান্ত বিকৃত শীর্ণকায় শালনামের অযোগ্য বৃক্ষ জন্মিয়াছে। এখানে বুঝিতে পারিতেছি যে একটী ক্ষুদ্র আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত করাতেই এরূপ বিকৃতি ঘটিয়াছে, কিন্তু আমরা নিজেদের আত্মা সম্বন্ধেও সেইরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক দেখি না কেন? একটু মনোযোগের সহিত দেখিলেই বুঝিতে পারি যে, যতই আমাদিগের আত্মাকে অনন্তের দিকে ছাড়িয়া দিব, যতই আমাদিগের আত্মাকে জ্ঞানে, ধর্ম্মে, প্রীতিতে, ভক্তিতে উন্নত করিতে থাকিব, ততই সেই মুক্তস্বভাবের দিন দিন সমীপবর্ত্তী হইতে থাকিব। একটা কথা চলিত আছে যে আমরা আপনাদের দোষের বেলায় অন্ধ থাকি কিন্তু পরের দোষ অনুসন্ধানে অত্যন্ত তৎপর হই—ইহা অতি যথার্থ; তাহা না হইলে একটী বৃক্ষ সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে থাকিয়া বিকৃত হইয়া গেল, বুঝিতে পারিলাম; আর আমাদিগের আত্মাও যে সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে থাকিলে বিকৃত হইয়া যাইবে, ইহা বুঝিতে পারি না কেন? ভগবদ্গীতাকার ইহা অতি পরিষ্কার রূপে বুঝিয়াছিলেন এবং অতি স্পষ্টরূপে বলিয়া গিয়াছেন।

"অন্তকালে চ মামেব স্মরণ্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্‌ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥"

ভং গীং ৮ম, ৫।

"যং যং বাপি স্মরণ্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্‌ভাবভাবিতঃ॥"

ঐ, ৮ম, ৫।

যিনি অন্তকালে আমাকে (ঈশ্বরকে) স্মরণ করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হন, ইহাতে সংশয় মাত্র নাই। হে কৌন্তেয়! যে ব্যক্তি অন্তকালে যে যে ভাব (দেবতাকে) তদ্গতচিত্তে স্মরণ পূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন, তিনি সেই দেবতার স্বরূপ প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মপিপাসুমাত্রেরই সেই সত্যং জ্ঞানমনন্তং পরব্রহ্মকেই আদর্শ স্থানে রক্ষা করা উচিত। পরমেশ্বরের অনন্ত সত্যভাবের, অনন্ত মঙ্গলভাবের, অনন্ত প্রেমের অনুকরণ করা আমাদিগের কর্ত্তব্য এবং অধিকার—ইহাতেই মানবের শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু এই অধিকার, এই শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করা নিতান্ত অল্পায়াসের কর্ম্ম নহে—কঠোর সাধনা আবশ্যক। কত স্বার্থত্যাগ আবশ্যক; সংসারের সহিত কত দারুণ সংগ্রাম আবশ্যক—এই সকল বিষয়ে যতটা সমর্থ হইব, ততই আমরা ঈশ্বরের জ্বলন্ত মঙ্গলভাব, জ্বলন্ত প্রেমভাব, সহজেই হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম হইব। আমাদিগকে পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে, যে, যখনই সেই বিদ্যুৎ পুরুষ বিদ্যুতের ন্যায় পলকের জন্যও অন্তরে দেখা দিবেন, তখনই তাঁহাকে হৃদয়ে রাখিয়া দিব—আর ছাড়িব না। কিন্তু প্রস্তুত হইয়া না থাকিলে, চক্ষু খুলিয়া সতর্ক হইয়া না থাকিলে, সেই বিদ্যুজ্জ্যোতি যে কখন্ আসিবেন, তাহা কি দেখিতে পারিব?—হয়তো আর সমস্ত জীবনে নাও দেখিতে পারি। এইখানে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী উপাখ্যান মনে পড়িতেছে। "ঐ

উপাখ্যানে আছে, ঈশ্বর (অলিঙ্গং অর্থাৎ নিরাকার ঈশ্বর) নারদকে বলিলেন যে আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার জীবনে একটীবার মাত্র দেখা দিই, সেই দর্শনে যদি সে মোহিত হইয়া আমাকে দৃঢ়চিত্তে অন্বেষণ করে ও যত্ন করে, তবে তাহার হৃদয়ে চির বিরাজিত হইয়া তাহাকে কৃতার্থ করি; তাহা না হইলে এ জন্মের মতন আমি অদৃশ্য থাকি।" প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনে অন্ততঃ একবার না একবার ধর্ম্মপিপাসা—ঈশ্বরকে জানিবার পিপাসা উপস্থিত হইবেই; সেই পিপাসা উপস্থিত হইলেই বিদ্যুৎপুরুষ একটী পলকমাত্র দেখা দেন এবং এই সময়ে যে ব্যক্তি যতটুকু পরিমাণে প্রস্তুত থাকেন, সেই ব্যক্তি ততটুকু পরিমাণে সেই বিদ্যুৎ পুরুষের বিদ্যুতাগ্নি গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হয়েন।

আমরা এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে আপনাকে উপযুক্তরূপে প্রস্তুত করিতে না পারিলে ঈশ্বরের বিমল জ্যোতি ধারণ করিতে পারিব না—ব্রহ্মসাধন এক প্রকার দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। কিন্তু আমরা কি দুর্ভাগ্য! আমরা জানিয়া শুনিয়াও প্রস্তুত হইতে চেষ্টা করি না—আমরা নিতান্ত অপূর্ণ ভ্রান্ত জীব! আমরা এখনও এতদূর সাধনা করিতে পারি নাই যে ব্রহ্মকে নয়নের সম্মুখে সর্ব্বদা অবস্থিত রাখিতে পারিব। এই কারণেই অনেকের মন অনেক স্থলেই ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে মহদাশয় ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ মনুষ্যদিগের প্রতি স্বতই ধাবিত হয় এবং তাঁহাদিগকে পৃথিবীর অতিরিক্ত দেবতা বোধে পূজা করিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করে। এই স্থলেই মতবিভেদ আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু একটুখানি সহজ বুদ্ধিকে আশ্রয় করিলেই ইহার মীমাংসা হইতে পারে। আমরা যখন মনুষ্যকে মনুষ্য বলিয়া জানিতেছি, তখন তাহাকে কি প্রকারে দেবতারূপে পূজা করিব? কি প্রকারে সেই মনুষ্যের নিকটে হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশ পর্য্যন্ত—যাহা কেবল ঈশ্বরেরই প্রাপ্য—অর্পণ করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হইতে পারে এবং অর্পণ করিয়াই বা কি ফল?

যাহা হউক মনুষ্যদিগকে দেবভাবে আদর্শ করিতে পারি না বলিয়া মনুষ্যভাবে গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র আপত্তির কারণ নাই। মনুষ্যশ্রেষ্ঠদিগকে মনুষ্যভাবে আদর্শ করিলে আমাদিগের কিছুমাত্র ক্ষতি নাই বরঞ্চ লাভই আছে। ঈশ্বরকে আমাদিগের পূর্ণ আদর্শ করিব; তাঁহার প্রত্যেক স্বরূপের নিকটবর্ত্তী হইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু যখনই মনুষ্যকে আদর্শ করিতে যাইব, তখন যেন অতি সাবধানে অগ্রসর হই; তখন যেন একবার অন্তশ্চক্ষে বুঝিয়া দেখি যে, আমরা যাঁহাকে আদর্শ করিতেছি; তিনি একজন মনুষ্য—তিনি পূর্ণ জীব নহেন, অপূর্ণ জীব; তাঁহার যেমন নানা গুণ আছে, তেমনি দোষও থাকিতে পারে। তাঁহার গতি যেমন কোন বিষয়ে পূর্ণতার দিকে ছুটিয়াছে, তেমনি আবার কোন বিষয়ে হয়তো অপূর্ণতার দ্বারা বদ্ধ রহিয়াছে। আমাদিগের এস্থলে কর্ত্তব্য এই যে, আমরা তাঁহার দোষ সকল পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার অপূর্ণতা সকল বর্জ্জন করিয়া হংসের ন্যায় গুণ গুলিই গ্রহণ করি; তিনি যে যে বিষয়ে পূর্ণতারদিকে অগ্রসর হইয়াছেন, সেই সেই বিষয়েই তাঁহাকে অনুসরণ করি। বুদ্ধদেব আপনার নির্ম্মল জীবনে, আত্মার অন্তরে যে

একটী বলবতী ধর্ম্মজিজ্ঞাসা আছে, তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় দিয়াছেন এবং আপনার জীবনকে ধর্ম্মজীবনে পরিণত করিবার ভাবও সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি তিনি মনুষ্য; তাঁহাকে সহস্রবার আদর্শরূপে চক্ষের সম্মুখে স্থাপন করিলেও পূর্ণ আদর্শ করিতে পারি না। তিনি যখন সংসারের চারিপার্শ্বে দুঃখরাশি বিপদরাশি দেখিয়া আপনার ধর্ম্মপিপাসা নিবৃত্তি করিবার জন্য স্বীয় পিতামাতা, নববিবাহিতা স্ত্রী ও নবজাত শিশুকে পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহার সেই অবস্থা স্মরণ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া যাই বটে, কিন্তু ইহা আদর্শ বলিয়া মনে করিতে পারি না। আমাদিগের আদর্শ তিনিই, "যিনি অতি ধীর গম্ভীর, আপনে আপনি স্থির"; যিনি সমুদয় হইতে নির্লিপ্ত ভাবে থাকিয়াও একটী সামান্য কীটানুকীটের পর্য্যন্ত আহার প্রদান করিতে ভুলেন না।

বুদ্ধদেব সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, আমাদের আরো নিকটবর্ত্তী চৈতন্যদেব সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া চৈতন্য সম্বন্ধে আরো বেশী একটু বলা যাইতে পারে যে, তিনি যেমন ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ভক্তি বিষয়ে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন, ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান বিষয়ে ততটা অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কর্ম্মের দিকে তাঁহার মন ততটা আগ্রহের সহিত ধাবিত হয় নাই; তাই তাঁহার ঈশ্বরের উপাসনা সম্বন্ধে অসম্পূর্ণতা রহিয়া গেল। আমরা চৈতন্যকে একেবারে কোন দেবতা কিম্বা কোন অভ্রান্ত গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। আমরা অবশ্য তাঁহার বিশ্বজনীন প্রেমকে আদর্শ করিতে পারি বটে কিন্তু তাঁহার দোষগুলিকেও গুণ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। আমাদের আদর্শ তিনিই, যিনি কেবল মাত্র "রসোবৈ" নহেন কিন্তু আবার

"ভয়াদ্ যস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"

যাঁহার ভয়ে, যাঁহার শাসনে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, যাঁহার শাসনে মেঘ, বায়ু এবং মৃত্যু অবধি সকলেই স্বীয় স্বীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে; তিনিই আমাদিগের অভ্রান্ত গুরু, তিনিই আমাদের দেবতা।

তবে মনুষ্যকে আদর্শ করিয়া কি ফল? ঈশ্বরই আমাদের প্রকৃত আদর্শ; কিন্তু কখন কখন মনুষ্য-শ্রেষ্ঠদিগকে আদর্শ করিয়া সেই পূর্ণ আদর্শের নিকটবর্ত্তী হইবার উপায় অবগত হই মাত্র। দেখিলাম যে নানক এক উপায়ে আপনাকে ধর্ম্ম পথে ঈশ্বরের পথে আনিয়াছেন; আমরাও চেষ্টা করিলে সেই উপায় গুলির অনেক উপায়ই আপনাদের লক্ষ্য সাধনে প্রয়োগ করিতে পারি। দেখিলাম যে রামমোহন রায় ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিবার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিলেন। ইহা দেখিয়া আমরাও সাহস পাইলাম যে ঈশ্বরের প্রীতিকামনায়, ধর্ম্মের জন্য একজন মনুষ্য—আমাদিগেরই মতন একজন মনুষ্য, আপনার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারে। তখন তিনি যে যে উপায়ে এরূপ নিঃস্বার্থ হইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, আমরা দৃষ্টান্ত বলে বলী হইয়া সেই সেই উপায় গুলি, সম্পূর্ণ সক্ষম হই বা না হই, আমাদের লক্ষ্য সাধনে প্রয়োগ করিতে অন্ততঃ চেষ্টা ও করিতে পারি। আমরা যে চেষ্টা করিতে পারি, তাহা নহে; আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য এই যে পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বরকে নিয়তই নয়নের সম্মুখে ধারণ করিয়া

ঋষিতুল্য মহাজনগণের প্রদর্শিত পথে চলিতে চেষ্টা করি। সে দিন—সে শুভদিন কবে আসিবে, যে দিন আমরা প্রত্যেকে সেই মঙ্গলময়ের নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়া ক্রমে তাঁহারই সন্নিহিত হইতে থাকিব।

এখন যদি বুঝিলাম যে সেই দয়াময় ভিন্ন আর আমাদের গতি নাই, তবে আর যেন বৃথা কালহরণ না করি। ধর্ম্মবিষয়ে কালহরণ করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।

"গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ।"

সর্ব্বদাই যেন মনে করিয়া থাকি যে মৃত্যু নিকটেই দণ্ডায়মান আছে। তাই বলি যে, আমরা এতদিন যদি বৃথা কাল নষ্ট করিয়া ঈশ্বরের পথে ধর্ম্মের পথে চলিতে চেষ্টা না-ও করিয়া থাকি, তবে আজ যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই যে ঈশ্বরকেই আদর্শরূপে রক্ষা করিয়া তাঁহারই আদিষ্ট পথে চলিতে থাকিব; আজ যেন আমরা প্রত্যেকে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি যে ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহাকেও পূজা অর্পণ করিব না।

হে করুণাময় পরমেশ্বর! তোমার শাসনে সূর্য্য চন্দ্র, দ্যুলোক ভূলোক, বিরোধে শূন্যে বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে; তোমার শাসনে দিন, রাত্রি, পক্ষ, মাস, ঋতু, সম্বৎসর সকলেই স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে। এই সকলে যেমন তোমার অতুলনীয় শক্তির প্রভাব অবগত হইতেছি, তেমনি তোমার অনুপম স্নেহও আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে অনুভব করিতেছি। তোমারি প্রসাদে পূর্ব্বপশ্চিমবাহিনী নদী সকল ধরণীকে শস্যশ্যামলা করিতেছে, সেই শস্যের দ্বারা আমরা জীবন ধারণ করিতেছি। তোমারি প্রসাদে আমরা পিতা মাতার স্নেহ যত্নে লালিত পালিত হইয়াছি; তোমারি প্রসাদে স্ত্রী পুত্র ভাই ভগিনী প্রভৃতি সকলের সুকোমল প্রেমভাব নিত্য নূতন ভাবে অনুভব করিতেছি। তোমা হইতে এ সকল জীবনের সুখ শান্তি লাভ করিয়াও তোমাকে কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিব না তো আর কাহাকে করিব?

"মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মামা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্ত অনিরাকরণং মেঽস্তু।"

হে পরমাত্মন্, তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ কর নাই, আমরা যেন তোমাকে পরিত্যাগ না করি; তুমি সর্ব্বদা অপরিত্যক্ত থাক, তুমি আমাদিগের কর্ত্তৃক সর্ব্বদা অপরিত্যক্ত থাক। আমরা দুর্ব্বল ভ্রান্ত জীব; তুমিই আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

চৈতন্য ও তাঁহার শিষ্যগণ।

সনাতন গোস্বামী ও সুবুদ্ধি রায়।

সনাতন বিনয় বচনে চৈতন্যচরণে নিবেদন করিলেন, প্রভু, আমাকে বৈষ্ণব স্মৃতি প্রচার করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু আমি আচারভ্রষ্ট হীন জাতি, সদাচার কিছুই জানি না, আমার দ্বারা কখনই ইহা সম্পন্ন হইবে না। আপনি এবিষয়ে উপদেশ দিয়া কৃতার্থ করুন। চৈতন্য বলিলেন, সনাতন, ভগবানের কৃপাতে তোমার অন্তরে সমুদায় তত্ত্ব প্রকাশিত হইবে। তথাপি সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি। প্রথমতঃ গুরু-আশ্রয়, গুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, গুরু শিষ্যের পরীক্ষা, মন্ত্রের বিচার, মন্ত্রের অধিকারী নির্ণয় ও দীক্ষা বিষয়ে লিখিবে। তৎপরে প্রাতঃকৃত্য শৌচ আচমন চন্দন-

মাল্যধারণ ও পঞ্চাশৎ উপচারে শ্রীহরির পূজা, নাম-মহিমা, নামাপরাধবর্জ্জন, বৈষ্ণব লক্ষণ, বৈষ্ণবনিন্দাপরিবর্জ্জন, অনিবেদিত ত্যাগ, সাধুসঙ্গ, অসৎসঙ্গত্যাগ প্রভৃতি সাধারণ সদাচার ও বৈষ্ণবাচার সকল পুরাণবচন প্রমাণ দিয়া লিপিবদ্ধ করিবে * আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলিলাম, তুমি যখন লিখিতে আরম্ভ করিবে, ভগবান সকল কথা তোমার হৃদয়ে প্রকাশ করিবেন। এই প্রকারে ভক্তবর শ্রীগৌরাঙ্গ সনাতনকে দুইমাস ধরিয়া প্রেম ভক্তি-রসের সিদ্ধান্ত সকল উপদেশ দিলেন। কবি কর্ণপূর স্বপ্রণীত চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে সনাতনের প্রতি গৌরচন্দ্রের এই সকল অনুগ্রহ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

অতঃপর চৈতন্যদেব নীরস কর্ম্মকাণ্ডের কোলাহলময় কাশীধামে দণ্ডীদিগের সঙ্গে ভক্তি প্রসঙ্গ করিয়া নীলাদ্রি গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। সনাতনকে বলিলেন, তোমার দুই ভাই শ্রীরূপ ও বল্লভ শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছেন, তুমি তথায় গিয়া তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হও। কন্থাকরঙ্গ-ধারী আমার কাঙ্গাল ভক্তগণ গমন করিলে যত্ন করিও। এই বলিয়া গৌরসুন্দর সকলকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া নীলাচল গমন করিতে উদ্যত হইলেন। মহাপ্রভুর বিরহ-চিন্তা সনাতনের অসহ্য হইল, কাতর স্বরে তিনি বলিতে লাগিলেন,

"দূত কহে সনাতন প্রভুকৃপা পাঞা।
পড়িয়া কান্দেন প্রভুর চরণ ধরিয়া ॥

---

* সমাজ প্রচলিত ফলশ্রুতিপূর্ণ বিবিধ কাম্য কর্ম্মের বাজনা বৈষ্ণব ধর্ম্মে নিষিদ্ধ। সুতরাং ভক্তিপথাবলম্বী সংসার কামনা-বিহীন বৈষ্ণবদিগের নিমিত্ত পৃথক স্মৃতি শাস্ত্রের আবশ্যক হইয়াছিল। যে সকল বৈষ্ণব কর্ম্মকাণ্ডের বাহ্য আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের বিশ্বাসানুরূপ গৃহ্য অনুষ্ঠান সকল অবলম্বন করিতে লাগিলেন, তাঁহারা ক্রমশঃ হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। প্রেম ভক্তি প্রভাবে জাতিভেদাদি লৌকিকাচার চৈতন্যানুচরদিগের মধ্যে অনেক পরিমাণে শিথিল হইতেছিল। এই সকল কারণে বৈষ্ণবেরা ক্রমশই পৃথক সম্প্রদায়ে পরিণত হইতেছিলেন। এই সকল ভেকাশ্রিত অর্থাৎ নিয়মপূর্ব্বক বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত বৈষ্ণবদিগের নিমিত্ত চৈতন্যদেব সনাতনকে বৈষ্ণব স্মৃতি প্রণয়ন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবগণ সাধারণ হিন্দুসমাজপ্রচলিত ক্রিয়া কলাপ অগ্রাহ্য করিয়া প্রেমভক্তিমার্গ অবলম্বন করায় শাক্ত ও হিন্দুসমাজভুক্ত অন্যান্য সাম্প্রদায়িকগণ বৈষ্ণবদিগকে ক্রিয়াহীন পতিত বলিয়া ঘৃণা করিতেন। শাক্ত বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব এদেশের একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ। এই ঘৃণা বিদ্বেষ এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে, উভয়ে উভয়ের ছায়াস্পর্শ করিতেও ঘৃণা বোধ করিতেন। বৈষ্ণবগণ গোঁড়ামির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া শাক্তের ব্যবহৃত পূজার উপকরণ বিল্বপত্রকে তেকড়কার পাতা ও জবাপুষ্পকে ওড়ফুল বলিতেন। শাক্তেরাও কম নহেন, তাঁহারা নিরীহ বৈষ্ণবগণকে নানা প্রকার বিদ্রূপ উপহাস করিয়া অপদস্থ করিবার অবসর অন্বেষণ করিতেন। বৈষ্ণবগণের সমাজবহির্ভূত আচার অনুষ্ঠান জাতিভেদের শিথিলতা ও শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারত্ব লইয়াই বিবাদের সূত্রপাত হয়। কালক্রমে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিস্তার হওয়ায় অনেকানেক শাক্ত মতাবলম্বী গৃহস্থ ব্যক্তি বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করায় এই বিবাদ ক্রমশঃ প্রশমিত হয়। গোস্বামীগণ নিতান্ত ইতর জাতিকেও মন্ত্রদিয়া শিষ্য করিতেন বলিয়া হিন্দু সমাজের হেয় ছিলেন। এই অসম্মান দূর করিবার জন্য তাঁহারা কুলীনদিগকে কন্যাদান করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ শাক্ত বৈষ্ণবগণ পরস্পর আদান প্রদান রূপ বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হওয়ায় বিদ্বেষ ভাব বিদূরিত হয়, এবং বৈষ্ণবগণ সাধারণ হিন্দু সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া পড়েন। গোস্বামীগণ অন্তরে যাগযজ্ঞ কাম্য কর্ম্মের বিরোধী হইয়াও সমাজরক্ষার জন্য বাহিরে তদনুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইলেন। এবং এই সময় হইতেই গোস্বামী ও অন্যান্য গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ সমাজভয়ে বৈষ্ণব সঙ্গতে প্রচ্ছন্নভাবে যোগদান করিতে লাগিলেন। এইরূপে হিন্দু সমাজে শাক্ত বৈষ্ণবের মিলন সঙ্ঘটিত হয়, এবং বৈষ্ণবভাব অনেক পরিমাণে সমাজ মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। যাহারা সমাজ ত্যাগ করিয়া ভেক গ্রহণ করিয়াছিল, যদিও তাহাদেরই জন্য সনাতন গোস্বামী হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে বৈষ্ণবের আচার প্রণালী বিধিবদ্ধ করেন, কিন্তু তাহা এক্ষণে আর কেবল বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বদ্ধ নাই। স্মার্ত্ত মতের ন্যায় হরিভক্তি বিলাসের মত "গোস্বামীমত" বলিয়া বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। এই বৈষ্ণব স্মৃতি স্বরূপ হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ সনাতন গোস্বামী প্রণীত।

"হরিভক্তি বিলাস গ্রন্থ কৈল বৈষ্ণব আচার।
বৈষ্ণবের কর্ত্তব্যের যাঁহা পাই সার ॥"

চৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্যখণ্ড।

কিন্তু সচারাচর যে হরিভক্তি বিলাস গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার রচয়িতা গোপালভট্ট গোস্বামী।

আজ্ঞা হয় চলি আমি শ্রীচরণ সহ।
সহিতে নারিব আমি তোমার বিরহ ॥
প্রভু কহে আগে যাঞা দেখ বৃন্দাবন।
পাছে নীলাচলে মোর পাবে দরশন ॥
বহুযত্নে সনাতনে মথুরা পাঠাঞা।
নীলাচল যাত্রা কৈলা আনন্দিত হঞা ॥"

চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক নবম অঙ্ক।

গৌরচন্দ্র রজনীযোগে নীলাচল উদ্দেশে বহির্গত হইলেন। চন্দ্রশেখর ~~আচার্য্য~~ তপন মিশ্র প্রভৃতি পাঁচজন শিষ্য তাঁহার অনুসরণ করিয়া কিয়দ্দূর গমন করিলে, তিনি সকলকে স্নেহবচনে প্রবোধ দিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বলিলেন, আমি ঝারি খণ্ডের আরণ্য পথে একাকী গমন করিব। যার ইচ্ছা হয়,ইহার পর আসিও।

তদনন্তর সনাতন রাজপথ ধরিয়া বৃন্দাবন অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এদিকে সনাতনের অনুসন্ধানার্থ রূপ ও বল্লভ বৃন্দাবন হইতে গঙ্গাপথে কাশী যাত্রা করিয়াছেন, সুতরাং পরস্পর সাক্ষাৎ হইল না। সনাতন মথুরাতে উপনীত হইলে ধ্রুবঘাটে সুবুদ্ধি রায়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। সুবুদ্ধি রায় পরম সমাদরে সনাতনকে গ্রহণ করিলেন। এখানে সুবুদ্ধি রায়ের বিষয়ে কিছু বলা যাইতেছে। এই সুবুদ্ধি রায় পূর্ব্বে গৌড়ের রাজা ছিলেন। সেই সময়ে সৈয়দ হুসেন সাহা তাঁহার কর্ম্মচারী ছিলেন। দীর্ঘিকা খনন কার্য্যে সৈয়দ হুসেনের কোন অপরাধ পাইয়া সুবুদ্ধি তাঁহাকে কশাঘাত করিয়াছিলেন। পরে হুসেন সাহা গৌড়ের রাজা হয়েন। হুসেন রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াও পুরাতন প্রভুর প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতেন; কিন্তু তদীয় ক্ষুদ্রহৃদয়া স্ত্রী স্বামীর প্রতি সুবুদ্ধি রায়ের কশাঘাত বিস্মৃত হয়েন নাই। অঙ্গের আঘাতচিহ্ন দেখাইয়া উক্ত নারী সুবুদ্ধির প্রাণদণ্ডের নিমিত্ত স্বামীকে প্ররোচিত করিতে লাগিল। হুসেন কিছুতেই স্বীকৃত না হওয়াতে সেই নারী বলিল তবে উহার জাতি মারিয়া দাও। হুসেন বলিলেন,জাতি নষ্ট হইলে রায় বাঁচিবেন না। শেষে স্ত্রীর বিশেষ অনুরোধে হুসেন সুবুদ্ধি রায়ের মুখে জল ছিটাইয়া দিলেন। জাতিভ্রষ্ট সুবুদ্ধি রায় বিষয় বিভব পরিত্যাগ করত বারাণসীতীর্থে উপনীত হইয়া তত্রত্য পণ্ডিতদিগের নিকট প্রায়শ্চিত্ত বিধান জিজ্ঞাসা করিলেন। শাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এই গুরুতর (?) পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তপ্ত ঘৃত ভক্ষণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে ব্যবস্থা দিলেন। শুষ্ক কর্ম্মকাণ্ড আশ্রয়ী পণ্ডিতদিগের উপদেশে ঘৃত ভক্ষণে আত্মহত্যা করা সুবুদ্ধি রায় সঙ্গত মনে করিলেন না। এই সময়ে বারাণসীতে চৈতন্যচন্দ্র বাস করিতেছিলেন। ভক্তগোষ্ঠীর ভক্তিপ্রসঙ্গ ও প্রেমবিগলিত হরিনাম সংকীর্ত্তনের প্রবল প্লাবনে কাশীর ন্যায় নীরস স্থানও সরসভাব ধারণ করিয়াছিল। সুবুদ্ধি রায় শ্রীচৈতন্যের বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। চৈতন্য বলিলেন,

"——ইঁহা হইতে যাহ বৃন্দাবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণ নাম সংকীর্ত্তন ॥
এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে ॥
আর কৃষ্ণ নাম লৈতে কৃষ্ণ স্থানে স্থিতি।
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি ॥"

চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য খণ্ড।

হে রায়! তুমি শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া নিরন্তর হরিনাম সংকীর্ত্তন কর। একনামে তোমার পাপদোষ নষ্ট হইবে, দ্বিতীয় নামে হরিচরণারবিন্দ লাভ করিবে, এবং তৃতীয় নামে কৃষ্ণসহবাসে স্থান পাইবে, ইহাই মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত বিধি।

ভক্তবর, চৈতন্যের আদেশ শিরোধার্য্য করত অযোধ্যা ও নৈমিষারণ্য পরিভ্রমণ করিয়া বৃন্দাবনে আসিলেন। এখানে আসিয়া সুবুদ্ধি রায় উৎকট বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন করিলেন। শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া মথুরার বাজারে বিক্রয় করেন। এক এক বোঝা কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া পাঁচ ছয় পয়সা মাত্র উপার্জ্জন হয়। তন্মধ্যে আপনি এক পয়সার চনক চর্ব্বণ করিয়া জীবন ধারণ করেন, অবশিষ্ট পয়সা দ্বারা দুঃখী বৈষ্ণব দেখিতে পাইলে ভোজন করান এবং বাঙ্গালি দেখিলে দধিভাত খাওয়ান ও তৈল মাখান। কিছু দিন পরে রূপ গোস্বামীর সঙ্গে তাঁহার মিলন হয়। পরে সনাতন গোস্বামীকে পাইয়া সুবুদ্ধি পরমানন্দে মগ্ন হইলেন। পরম বৈরাগী সনাতন সুবুদ্ধির স্নেহ যত্ন ভাল বাসিতেন না, তিনি একাকী হরিনাম করেন, আর প্রতি বৃক্ষমূলে প্রতিদিন নব নব কুঞ্জে দীন ভাবে ভ্রমণ করেন। শেষাবস্থায় রূপ ও সনাতন দুই ভাই শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেন। নিরন্তর হরিনাম কীর্ত্তন ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া দিন কাটাইতেন। চৈতন্যানুবর্ত্তী সাধকদিগের মধ্যে ইহাঁরা জ্ঞান বৈরাগ্য ও ভগবদ্ভক্তিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং ইহাঁরাই বিবিধ গ্রন্থ ও ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া এদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ সহায়তা করেন। বৃন্দাবনপ্রত্যাগত বৈষ্ণব সাধকগণকে চৈতন্য ও তাঁহার পারিষদগণ রূপ সনাতনের বিষয় সর্ব্বাগ্রে জিজ্ঞাসা করিতেন। ভক্তগণ বলিতেন, "তাঁহারা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া এক এক বৃক্ষমূলে এক একরাত্রি শয়ন করেন, কখন বা বিপ্রগৃহে স্থূলভিক্ষা, কখন বা দ্বারে দ্বারে মাধুকরী, কখন বা কেবল শুষ্ক চনক চর্ব্বণ করিয়া জীবন ধারণ করেন। পরিধানে ছিন্ন বহির্বাস মাত্র। হরিনাম সংকীর্ত্তন ও হরিনাম প্রসঙ্গে অষ্টপ্রহরই মগ্ন হইয়া থাকেন, চারিদণ্ড মাত্র নিদ্রা যান, তাহাও সকল দিন ঘটে না। শ্রীচৈতন্যের পবিত্র চরিত্র চিন্তা, বৃক্ষতলে নির্জ্জনে উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মগ্রন্থানুশীলন ও ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তাঁহারা কালাতিপাত করেন।" ভক্তগণের মুখে রূপ সনাতনের প্রশংসা শ্রবণ করিয়া চৈতন্য ও শিষ্যগণ পরমানন্দে মগ্ন হইতেন।

"মহাপ্রভুর ছিল যত বড় ভক্ত মাত্র।
রূপ সনাতন সবার কৃপা গৌরব পাত্র॥
কেহ যদি দেশে যায় দেখি বৃন্দাবন।
তাঁরে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ॥
কহ তাঁহা কৈছে রহে রূপ সনাতন।
কৈছে রহে কৈছে বৈরাগ্য কৈছে ভোজন॥
কৈছে অষ্টপ্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণ ভজন।
তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ॥
অনিকেতন দুঁহে রহে যত বৃক্ষগণ।
একেক বৃক্ষের তলে একেক রাত্রি শয়ন॥
বিপ্রগৃহে স্থূল ভিক্ষা কাঁহা মাধুকরী।
শুষ্ক রুটী চানা চিবায় ভোগ পরিহরি॥
করোয়া মাত্র হাতে কাঁথা ছিঁড়া বহির্বাস।
কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ নাম নর্ত্তন উল্লাস॥
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন চারিদণ্ড শয়নে।
নাম কীর্ত্তন প্রেমে সেহ নহে কোন দিনে॥
কভু ভক্তিরস শাস্ত্র করয়ে লিখন।
চৈতন্য কথা শুনে করে চৈতন্য চিন্তন॥
এই কথা শুনি মহান্তের মহা সুখ হয়।
চৈতন্যের কৃপা যাঁহা তাঁহা কি বিস্ময়॥"

চৈঃ চঃ মধ্যখণ্ড ১৯ পরিচ্ছেদ।

"তবে চলি গেলা গোসাঞি শ্রীবৃন্দাবন॥
অলৌকিক অসম্ভব গোসাঞির প্রেম।
বৈরাগ্যের সীমা আর অপতিত নেম॥
মূর্ত্তিমান মহাতেজ সমুদ্র গম্ভীর।
শাস্ত্রান্তগা পৃথিবীর মধ্যে একধীর॥
প্রতিদিন এক এক বৃক্ষতলে বাস।
প্রতিদিন পরিক্রমা নাহিক আলস॥
বৃক্ষতলে থাকি সদা গ্রন্থানুশীলন।
অলক্ষ্যে করেন পরিক্রমা বৃন্দাবন॥"

ভক্তমাল গ্রন্থ দ্বিতীয়মালা।

পৌরাণিক উপাখ্যান।

মহাত্মা পাণ্ডবগণ কোন সময়ে বিপ্রবর্গে পরিবৃত হইয়া কাম্যবনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণমহিষী সত্রাজিৎরাজকুমারী সত্যভামা পাণ্ডবদিগের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া প্রেমপ্রফুল্লহৃদয়ে পাণ্ডবকুললক্ষ্মী দ্রৌপদীর সহিত বিবিধ বিচিত্র কথা প্রসঙ্গে সুখাসীন হইলেন। অনন্তর সত্যভামা প্রিয়বাদিনী যাজ্ঞসেনীকে নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্রৌপদি! তুমি কি প্রকার প্রিয় ব্যবহার দ্বারা লোকপালসদৃশ বিচিত্রবীর্য্যশালী মহামতি পাণ্ডবগণকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছ? হে শোভনে! পাণ্ডুনন্দনেরা তোমার প্রতি কখন ক্রোধ প্রকাশ করেন না, সুমিষ্ট প্রিয় বাক্যে সততই তোমার সন্তোষ বিধান করেন, সর্ব্বদা তোমার বশংবদ ও মুখাপেক্ষী হইয়া থাকেন, ইহার কারণ কি? তুমি কি কোনপ্রকার ব্রতচর্য্যা তপস্যা অথবা হোম যাগ মন্ত্রৌষধ দ্বারা তাঁহাদিগকে এতাদৃশ বশতাপন্ন করিয়াছ? হে সখি! যাহাতে কৃষ্ণ আমার একান্ত অনুরাগিণী হন, তুমি এরূপ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে সুখী কর।

মহাভাগা দেবী দ্রৌপদী বলিলেন, সত্যভামে! তুমি আমাকে নিন্দিত অসাধ্বী স্ত্রীগণের আচরণ কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? তুমি বুদ্ধিমতী ও কৃষ্ণের প্রিয়মহিষী হইয়া ঈদৃশ প্রশ্ন করিতেছ ইহাই আশ্চর্য্য! ইতর স্ত্রীলোকেরাই মন্ত্রৌষধ প্রয়োগ করিয়া স্বামীকে বশীভূত করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে। স্বামী, ভার্য্যার এই ঘৃণিত অভিপ্রায় অবগত হইবামাত্র গৃহস্থিত সর্পের ন্যায় ভার্য্যা হইতে অতিমাত্র উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। যেহেতু মন্ত্রকর্ম্মপরায়ণ স্ত্রীগণ মন্ত্রপ্রবাদে বিশ্বাস করিয়া স্বামীর প্রতি বিষপ্রয়োগেও কিছুমাত্র শঙ্কিত হয় না। শত্রুগণ এই সুযোগে শত্রুতা সাধন করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়। পাপস্বভাবা মন্দভাগিনী পত্নীদিগের এই দুর্ব্ব্যবহারে পুরুষেরা নানা প্রকার রোগযুক্ত হইয়া বিনষ্ট হইয়া থাকে। হে সত্যভামে! মন্ত্রকর্ম্ম দ্বারা স্বামী কখন বশীভূত হন না। সুশীলতা ও প্রিয় আচরণ দ্বারা স্বামীর হৃদয় অধিকার করা যায়। আমি পাণ্ডবগণের প্রতি যেরূপ আচরণ করি তৎসমুদায় তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর।

আমি কাম ক্রোধ অহঙ্কার পরিবর্জ্জন করিয়া সর্ব্বদা প্রফুল্লমনে যত্নপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের পরিচর্য্যা করিয়া থাকি। আমি চিত্তকে সংযত করিয়া দর্প ও ঈর্ষা শূন্য হইয়া নিয়তই স্বামীগণের শুশ্রূষা করি। আমি কখন অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করি না। কুৎসিত স্থানে অবস্থান কি কুৎসিত ভাবে উপবেশন ও গমন আমি সর্ব্বথা ঘৃণা করিয়া থাকি। দেব মনুষ্য গন্ধর্ব্ব ধনবান রূপবান মহাসৌন্দর্য্যশালী অলঙ্কৃত যিনিই হউন, স্বামীগণ ব্যতীত আমি অন্য পুরুষকে কখন অভিলাষ করি না। স্বামীগণ অস্নাত অভুক্ত ও অসুপ্ত থাকিতে আমি কখন স্নান ভোজন ও শয়ন করি না। স্বামী কোন স্থান হইতে গৃহে আগমন করিবামাত্র আমি প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক আসন ও জল প্রদান করিয়া তাঁহার অভিনন্দন করি। আমি গৃহ এবং গৃহসজ্জা ও ভোজ্য দ্রব্য সকল পরিষ্কৃত করিয়া রাখি, ধনধান্যাদি যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করি। নিয়ত আলস্য ত্যাগ করিয়া স্বামীর অনুকূল আচরণ করি। আমি দুঃশীল স্ত্রীগণের কখন অনুসরণ

করি না। স্বামীর সঙ্গে আমোদ ও পরিহাসের স্থল ভিন্ন কখন হাস্য করি না। আমি সর্ব্বদা দ্বারদেশে উপস্থিত হই না, আবর্জ্জনাময় স্থানে কি গৃহসন্নিহিত উপবনেও বহুক্ষণ অবস্থান করি না। অতিশয় হাস্য, অতিশয় লোভ ও ক্রোধের বিষয় সকল পরিত্যাগ করিয়া স্বামীগণের সেবাকার্য্যে রত থাকি। হে যশস্বিনী! স্বামীর বিচ্ছেদ আমার অসহ্য। কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনার্থ স্বামী যখন স্থানান্তরে গমন করেন, তখন আমি অনুলেপনাদি পরিবর্জ্জন করিয়া ব্রতচারিণী হইয়া অবস্থান করি। স্বামী যে পান ভোজন ভালবাসেন না, আমি কখনও তাহা ব্যবহার করি না। আমি সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহাদের উপদেশের অনুবর্ত্তন করি এবং বেশ ভূষাতে অলঙ্কৃত হইয়া স্বামীর প্রিয় ও হিতকর কার্য্যে তৎপর থাকি। গৃহধর্ম্ম সম্বন্ধে ও আত্মীয় কুটুম্বগণের প্রতি সদাচরণ বিষয়ে আমি যেরূপ উপদেশ পাইয়াছি, যত্নসহকারে তাহাতে আপনাকে নিযুক্ত করি। হে বরাঙ্গনে! আমার বিবেচনায় পতিকে আশ্রয় করাই স্ত্রীলোকের একমাত্র সনাতন ধর্ম্ম। স্ত্রীলোকেব পতিই দেবতা, পতিই একমাত্র গতি, পতির বিপ্রিয়াচরণ কখনই কর্ত্তব্য নহে। আমি অশন ভূষণ বা শয়নে কখনই স্বামীগণকে অতিক্রম করি না। আমি সর্ব্বতোভাবে সংযতেন্দ্রিয় হইয়া সাবধানতা ও উদ্যমশীলতা প্রভাবে এবং গুরুশুশ্রূষা দ্বারা স্বামীগণের প্রণয়ভাগিনী হইয়াছি। আমি আর্য্যা কুন্তী দেবীকে নিত্যকাল পান ভোজন বসন ভূষণ দ্বারা পরিচর্য্যা করিয়া থাকি। আমি কখনও তাঁহার নিন্দা করি না এবং বসন ভূষণ ভোজনাদিতে তাঁহাকে অতিক্রম করি না। পূর্ব্বে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের ভবনে আট সহস্র ব্রাহ্মণ অষ্টাশীতিসহস্র স্নাতক বিপ্র যাঁহাদের প্রত্যেকের প্রতি ত্রিশজন দাসী নিযুক্ত ছিল, এবং এতদ্ভিন্ন অপর দশ সহস্র ঊর্দ্ধরেতা যতি প্রতিদিন পান ভোজন আচ্ছাদন প্রাপ্ত হইতেন সেই সকল ব্রহ্মবাদী বিপ্রগণকে আমি প্রতিদিন ভোজ্য পান বসন দিয়া অর্চ্চনা করিতাম। মহারাজের মাল্যাভরণভূষিতা নৃত্যগীতকলাভিজ্ঞা শত সহস্র দাসী ছিল। তাহাদের প্রত্যেকের কি নাম, কাহার কি প্রকার রূপ, ও কে কি কার্য্য করে বা না করে, সবই আমি বিদিত ছিলাম। যখন যুধিষ্ঠির রাজত্ব করিতেন, সেই সময়ে তাঁহার এক লক্ষ দাস দাসী সর্ব্বদা অতিথিসেবায় নিযুক্ত থাকিত, আমিই তাহাদের সংখ্যা ও নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতাম। অন্তঃপুরে যে সকল ভৃত্য থাকিত, এমন কি মেষপাল ও গোপালগণের কৃতাকৃত কর্ম্ম সমুদায় আমি জানিতাম। আমি আয় ব্যয় সম্বন্ধে সমুদায় বৃত্তান্তই অবগত ছিলাম। পাণ্ডবেরা আমার প্রতি আত্মীয় কুটুম্ববর্গের যাবতীয় ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে দৈবকার্য্যে রত হইতেন। এই প্রকারে ক্ষুৎপিপাসা সহ্য করিয়া নিরন্তর স্বামীগণের সেবাতে নিযুক্ত থাকিয়া দিবারাত্রি অতিবাহিত করিয়া থাকি। আমি চিরদিন সকলের শেষে শয়ন করিয়া সকলের অগ্রে শয্যাপরিত্যাগ করত গৃহকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকি। হে কল্যাণি! ইহাই আমার বশীকরণ, ইহা ব্যতীত ভর্ত্তাকে বশীভূত করিবার অন্য সাধন আমি জানি না। আমি অসৎ স্ত্রীলোকের ন্যায় অন্যায় আচরণ করি না এবং করিতে অভিলাষও রাখি না। সত্যভামা, বরাঙ্গনা শোভনা কৃষ্ণার ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ ও হৃদয়ঙ্গম

করিয়া লজ্জিত হইয়া বলিলেন, হে কৃষ্ণে! আমি তোমাকে সখিসমুচিত উপহাসচ্ছলে যাহা বলিয়াছি, তজ্জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

দ্রৌপদী বলিলেন, স্বামীর চিত্ত আকর্ষণের প্রকৃষ্ট উপায় তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। পতির তুল্য দেবতা ইহলোকে আর কিছুই নাই। স্বামীর প্রসাদেই সন্তান সন্ততি বস্ত্রালঙ্কার ভোগসুখ মহতী কীর্ত্তি সকলপ্রকার কাম্যবস্তুই লাভ হয়। অতএব তুমি এরূপ সৌহৃদ্য ও প্রেম দ্বারা কৃষ্ণের সেবা কর, যাহাতে তিনি জানিতে পারেন যে তিনি তোমার অতীব প্রীতিভাজন। তাহা হইলেই তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। দ্বারদেশে ভর্ত্তার স্বর শ্রবণমাত্র দণ্ডায়মান হইয়া সম্ভাষণ পূর্ব্বক আসন ও জল দিয়া তাঁহার পূজা করিও। কোন কার্য্যের নিমিত্ত স্বামী দাসীকে আদেশ করিলে তুমি স্বয়ং তাহা সম্পন্ন করিবে। স্বামী তোমার নিকটে যে কোন কথা বলেন, গোপনীয় না হইলেও তাহা প্রকাশ করিও না, কেন না তোমার সপত্নী সেই কথা তাঁহাকে বলিয়া দিলে তোমার প্রতি তাঁহার বিরাগ উপস্থিত হইতে পারে। যে সকল ব্যক্তি তোমার স্বামীর আত্মীয় অনুরক্ত ও হিতকারী, তাঁহাদিগকে তুমি বিবিধ উপায়ে পান ভোজনাদির দ্বারা সৎকার করিবে। আর যাহারা তাঁহার বিপক্ষ, অহিতকারী ও দ্বেষ্য, তাহাদের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখিবে না। অন্য পুরুষের সন্নিধানে আমোদে মত্ত না হইয়া, অনবধানতা পরিত্যাগ করিয়া নিজের অভিপ্রায় সংযম পূর্ব্বক মৌন হইয়া থাকিবে। কুমার প্রদ্যুম্ন ও শাম্বের সহিতও তুমি নির্জ্জনে সম্ভাষণ করিও না। পতিপরায়ণা পুণ্যবতী সৎকুলকামিনীগণের সঙ্গেই যেন তোমার সখ্য হয়। উগ্রস্বভাবা, প্রমত্তা, অতিভোজনশীলা, চৌর্য্যনিরতা চপলস্বভাবা নারীদিগকে সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। এইরূপে তুমি স্বামীর আরাধনা করিয়া যশ সৌভাগ্য ও স্বর্গ লাভ কর। দ্রৌপদীর বাক্যাবসানে সত্যভামা তাঁহাকে স্নেহালিঙ্গন করিয়া বিদায় হইলেন।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব।

প্রথমতঃ দেখা যাউক আমাদিগের সম্মুখে যে জড় জগৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে উহার আদি আছে কি না? যদি এরূপ অনুমান করা যায়, ইহার আদি আছে, তাহা হইলে অবশ্যই এরূপ এক সময় ছিল যে সময় একটী মাত্র পরমাণুরও অস্তিত্ব ছিল না, সর্ব্বত্র কেবল এক মহাশূন্য বিরাজ করিত। কিছুকাল মহাশূন্য থাকিয়া এবং তাহার পরিবর্ত্তন হইয়া যদ্যপি জড়ের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে স্বতঃই এই পরিবর্ত্তনের কারণ কি জানিবার জন্য ইচ্ছা হয় এবং এই পরিবর্ত্তনের কোন একটী বিশেষ কারণ থাকা আবশ্যক। বিনা কারণে অর্থাৎ আপনা আপনি কোন একটী পরিবর্ত্তন সাধিত হয় আমরা এ কথায় বিশ্বাস করিতে পারি না, সুতরাং জড়ের আদি আছে বিশ্বাস করিলে জড়ের স্রষ্ঠার অস্তিত্বেও বিশ্বাস করা স্বতঃসিদ্ধ। কেন না জড়ের স্রষ্টা না থাকিলে জড়েব আবির্ভাব হইবার পূর্ব্বে সর্ব্বত্র যে এক মহাশূন্য বিরাজমান ছিল, তাহাই অপরিবর্ত্তিত ভাবে বিরাজ করিত, তাহার পরিবর্ত্তন অসম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ যদ্যপি এরূপ অনুমান করা যায় জড়ের আদি নাই, উহা অনাদি

কাল হইতে রহিয়াছে তাহা হইলে জড় স্বয়ম্ভু ও অনাদি (first cause) হইয়া পড়ে। উহা কোন সময়ে জাত হয় নাই চিরকালই বর্ত্তমান রহিয়াছে ইহা বলিতে হয়। যদ্যপি জড় অনাদি হয়, তাহা হইলে উহা স্বাধীন, নিরপেক্ষ, দেশে ও কালে অনন্ত ও অখণ্ড এক মহাশক্তি হওয়া আবশ্যক। কারণ যে বস্তু অন্য কোন বস্তুর উপর নির্ভর না করিয়া আপন শক্তিতেই বর্ত্তমান থাকিতে পারে, তাহা সকল স্থানে ও সকল সময়ে থাকিবেক, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। কোন বিশেষ স্থানে অথবা সময়ে তাহার সত্তার বিকাশ হয়, অন্য স্থানে ও সময়ে তাহার অভাব হয়, এরূপ হইতে পারে না। কারণ সময় ও স্থানের স্বকীয় কোন শক্তি না থাকায় স্বয়ম্ভু অনাদি মহাশক্তির সত্তা কোন প্রকারেই প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে না তাহার সত্তাস্রোত অপ্রতিহত থাকিবেক। সময় ও স্থান পাইলেই ইহার বিকাশ না হইয়া থাকিতে পারে না। অনাদি শক্তি দেশে ও কালে অনন্ত ইহা আমাদিগের আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সহজ জ্ঞান। আমরা যখন কাল ও স্থানের (Time and space) বিষয় চিন্তা করি আমরা উহাদিগকে অনন্ত বলিয়া জ্ঞান করি। উহাদিগের অন্ত আছে ইহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। এক্ষণে জড় অনাদি হইলে কিরূপে দেশে ও কালে অনন্ত হইবে আমরা বিশ্বাস করি তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। অনাদি বস্তুর দৃষ্টান্তই হইতে পারে না, তথাপি বোধসৌকর্য্যার্থে দুই একটী দৃষ্টান্ত গঠন করা যাউক। যদ্যপি দশ বারটী দ্বীপের অধিবাসীগণ তাহাদিগের দ্বীপ সকলে এরূপ একটী ঘটনা দেখে এবং তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট হইতে ও শুনিতে পায় যে সর্ব্বদাই তাহাদিগের দ্বীপ সমূহে বৃষ্টি পতিত হয় এবং বৃষ্টি পতনের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া কোন কারণ দেখিতে না পায়, তবে তাহারা বিনা কারণে বৃষ্টি পতিত হয় দেখিয়া সহজেই বিশ্বাস করে যে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও বিনাকারণে বৃষ্টি পতিত হয়। সেইরূপ যদি অন্য দশ বারটী দ্বীপের অধিবাসীগণ তাহাদিগের দ্বীপ সমূহে এরূপ দেখে ও তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট হইতেও শুনিতে পায় যে বিনা কারণে সর্ব্ব সময়ে তাহাদিগের দ্বীপ সকলে আলোক থাকে, তাহা হইলে তাহারাও বিশ্বাস করে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও বিনা কারণে আলোক থাকে। কারণ বিশ্বরাজ্যে আমরা শক্তির বিকাশ প্রণালী সর্ব্বত্র একই প্রকার দেখিতেছি। দশ বারটী স্থানে কিছুকাল ধরিয়া বিনা কারণে অর্থাৎ আপনা আপনি বৃষ্টিপতন অথবা আলোক প্রকাশ দেখিলে অন্যান্য স্থানেও বিনা কারণে অর্থাৎ আপনা আপনি বৃষ্টি পতন অথবা আলোক প্রকাশ হয়, আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে বাধ্য। আবার আমরা কোন শক্তিকেই পরিমিত বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। অগ্নির দাহিকা বরফের শীতলতা প্রভৃতি যে সকল শক্তির কার্য্য আমরা সতত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি তাহারা অন্য কোন শক্তির যোগে পরিবর্ত্তিত না হইলে সকল স্থানে ও কালে বর্ত্তমান থাকিতে ও কার্য্য করিতে পারে ইহা আমরা বিশ্বাস করি। কোন এক শক্তি দ্বারা আমরা যদি একটী মাত্র পরমাণু সৃষ্টি করিতে পারি তাহা হইলে সেই শক্তি দ্বারা আমরা অনন্ত পরমাণু সৃষ্টি করিতে পারি, ইহা আমাদিগের বিশ্বাস।

এক্ষণে দেখা যাউক জড় অনন্ত কি

না? জড় যে অন্তবিশিষ্ট ক্ষুদ্র পদার্থ ইহা সহজেই প্রমাণিত হয়। বিশ্ব মধ্যে যখন অগণ্য গ্রহ নক্ষত্র আপন আপন কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে, নদীস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, জীবগণ গমনাগমন করিতেছে তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে জড় পদার্থ সমূহ দিবানিশি আপন আপন স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে। আবার বিশ্ব মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন শূন্য স্থান না থাকিলে জড় পদার্থের স্থান পরিবর্ত্তন অসম্ভব। যেহেতু স্থান-অবরোধকতা জড়ের একটী বিশেষ ধর্ম্ম। বিশ্ব মধ্যে যখন নিরবচ্ছিন্ন শূন্য স্থান অর্থাৎ জড় পদার্থের অভাব আছে সপ্রমাণ হইল, তখন জড় যে অনন্ত নহে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে জড় অনাদি হইলে ইহা স্থানে ও কালে অনন্ত ও অখণ্ড একটী বস্তু হওয়া আবশ্যক কিন্তু বস্তুতঃ ইহা বিপরীত ভাবাপন্ন হইতেছে, সুতরাং জড় অনাদি হইতে পারে না। ইহা অবশ্যই অন্য কোন অজড় অনন্ত মহাশক্তির অধীন ও সাপেক্ষ।

বৈদান্তিক মত।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।)

পূর্ব্ববুদ্ধিমবাধিত্বা নোত্তরা জায়তে মতিঃ।
দৃশিরেকঃ স্বয়ং সিদ্ধঃ ফলত্বাৎ স ন বাধ্যতে॥

পূর্ব্ব-বুদ্ধিকে বাধিত না করিয়া উত্তর বুদ্ধি জন্মে না। দৃশি অদ্বিতীয় স্বয়ংসিদ্ধ, ফলত্ব হেতু তিনি বাধিত হন না।

পৌর্ব্বাপৌর্য্য থাকিলে পূর্ব্বদৌর্ব্বল্য প্রকৃতিসিদ্ধ এই ন্যায়ে কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-বুদ্ধি প্রথম উৎপন্ন হইলেও পরবর্ত্তী ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞান দ্বারা তাহার বাধ হইয়া থাকে; এক্ষণে ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। যেমন শুক্তির অজ্ঞান জন্য অর্থাৎ শুক্তিজ্ঞানের অভাব হেতু যে রজত-বুদ্ধি হইয়াছিল তাহাকে বাধিত বা নষ্ট না করিয়া পরে শুক্তি-বুদ্ধি উৎপন্ন হয় না; সেইরূপ কর্ত্তৃত্বাদি বুদ্ধিকে অগ্রে বাধিত বা নষ্ট না করিয়া পরে আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। অতএব যেটির অগ্রে প্রসক্তি হইয়াছে বাধের তন্নিষেধ-স্বভাবতা হেতু আর পূর্ব্বকালে পর-প্রসক্তির অভাব হেতু পূর্ব্ববটী দ্বারা পরের বাধ হয় না কিন্তু পরের দ্বারা প্রসক্ত পূর্ব্বটীরই বাধ হয়। শাস্ত্রের পদার্থবোধে শব্দ সম্বন্ধে মানান্তরের অর্থাৎ শাব্দ প্রমাণ ও প্রত্যক্ষের অপেক্ষা থাকিলেও বাক্যার্থবোধে তাহার অপেক্ষা থাকে না। পদার্থবোধেও ব্যবহার মাত্রেরই অপেক্ষা থাকে এই হেতু আর পূর্ব্ববুদ্ধি অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাদি বুদ্ধির ব্যবহাররূপ অংশের উত্তর আত্মজ্ঞান দ্বারা বাধ হয় না এই হেতুও উপজীব্য-বিরোধ ঘটে না*। এক্ষণে বেদান্তোক্ত আত্ম-জ্ঞানই একান্ত অবাধিত বলিয়া তত্ত্ব-জ্ঞাপক ইহা কথিত হইতেছে। ব্রহ্মাত্মাকার অন্তঃকরণ-বৃত্তিতে প্রতিফলিত অপরোক্ষ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ স্ফূর্ত্তিকে দৃশি বলা যায়। সেই দৃশি এক কিনা অপরের অভাবে উপলক্ষিত অর্থাৎ অদ্বিতীয় এবং স্বয়ংসিদ্ধ কিনা পরনিরপেক্ষ সত্তাস্ফূর্ত্তিমৎ। তিনি বাধিত হন না। উক্ত বিশেষণেরই দ্বারা বুঝা যায় তিনি বাধের অযোগ্য। ফলত্ব হেতুও তিনি বাধের অযোগ্য। ফল কখন বাধিত হয় না। কারণ, ফল সর্ব্বজ্ঞানসাধারণ এবং তাহার প্রকাশ যাবদীয় ব্যবহারেরই হেতু হইতেছে। তুমি ব-

* উত্তর আত্ম-জ্ঞান দ্বারা পূর্ব্ব কর্ত্তৃত্বাদির বাধ হয় ইহার তাৎপর্য্য এই কর্ত্তৃত্বনিষ্ঠ যে সত্যতা জ্ঞান তাহারই বাধ বা নাশ হয় কিন্তু প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারের নাশ হয় না। সুতরাং শাস্ত্র-বিরোধ ঘটিতেছে না।

লিতে পার ব্রহ্ম নিত্যসিদ্ধ তথাপি তাঁহাকে ফল বলা হইল কেন? ফল বলিলে পূর্ব্বে যাহা অসিদ্ধ ছিল তাহারই সিদ্ধি বুঝাইয়া দেয়। ইহার মীমাংসা এইরূপ;—বিষয়াকার বৃত্তিতে ব্রহ্মের অভিব্যক্তিকে ফল বলা যায়। সুতরাং ব্রহ্মসম্বন্ধে এই ফলত্ব উপচারিক, তদ্দ্বারা তাঁহার নিত্যসিদ্ধতার বিরোধ হয় না।

ইদং বনমতিক্রম্য শোকমোহাদিদূষিতম্।
বনাৎ গান্ধারকো যদ্বৎ স্বাত্মানং প্রতিপদ্যতে॥

কোন গান্ধারদেশবাসী যেমন বন হইতে স্বগৃহ প্রাপ্ত হয় সেইরূপ এই শোকমোহাদি-দূষিত বনকে অতিক্রম করিয়া স্বীয় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বেদান্তবাক্য দ্বারা ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞানের অনুৎপত্তি শঙ্কা নাশ এবং উৎপন্ন জ্ঞানের প্রাবল্য প্রতিপাদন পূর্ব্বক পূর্ব্ব-প্রবৃত্ত প্রত্যক্ষাদি দ্বারা বাধের শঙ্কা দূর করিয়া, এক্ষণে সেই জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে এই আকাঙ্ক্ষায় পদার্থ-পরিশোধন দ্বারা তৎসিদ্ধি হয় এইটী শ্রৌত দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন। এই শরীরই বনস্থানীয়। ইহা ব্যাঘ্রতস্করাদিবৎ রাগ দ্বেষ শোক মোহাদি দ্বারা নিরন্তর আক্রান্ত। এই শরীর-বনকে অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ আচার্য্য হইতে দিক্‌মাত্র—কেবল দিক্‌টী অবগত হইয়া, অন্বয়-ব্যতিরেক আলোচনা-যোগে পদার্থ-শুদ্ধি সম্পাদন দ্বারা * অনাত্মতা হেতু দেহাদিকে পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বানুস্যূত অবাধিত স্বীয় আত্মাকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম ইত্যাকার জ্ঞানে ব্রহ্মকে অবগত হয়।

* ভ্রান্তি জ্ঞানে যে আত্মা দেহাদিতে অন্বিত আছেন তত্ত্ব-জ্ঞানে তাঁহাকে সেই দেহাদি হইতে ব্যতিরেক—পৃথক করাকে পদার্থ-শুদ্ধি বলে। অর্থাৎ আত্ম-পদার্থ যেন কতকগুলি আবর্জনার মধ্যে ছিল তাহাকে ঝাড়িয়া বাছিয়া লওয়াই পদার্থ শুদ্ধি।

মনে কর, কোন গান্ধারদেশবাসী পুরুষ বদ্ধচক্ষু হইয়াই তস্কর কর্তৃক নীত ও মহাবনে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। পরে সে বন্ধনমুক্তির প্রয়াসে সেই বন-মধ্যে ঘোর আর্ত্তনাদ করিতেছে। এই অবসরে কোন দয়াশীল আসিয়া তাহার বন্ধন মোচন পূর্ব্বক তাহাকে স্বদেশের পথ দেখাইয়া দিল। তখন সেই পণ্ডিত ও মেধাবী গ্রাম হইতে গ্রামান্তর অবগত হইয়া যেমন বন হইতে স্বদেশ প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ এই সংসারীকেও অবিদ্যা রাগাদিরূপ তস্করেরা মিথ্যাজ্ঞানরূপ পট দ্বারা তদীয় বিবেক-দৃষ্টি আচ্ছাদন পূর্ব্বক স্বদেশ হইতে দেহারণ্যে তাহাকে আনিয়াছে। পরে ঐ ব্যক্তি বন্ধনমুক্তির প্রয়াসে পর্য্যটন করিতে করিতে একদা কোন করুণাপরবশ ব্রহ্মবিৎ আচার্য্যকে প্রাপ্ত হয় এবং তৎকর্ত্তৃক তাহার মিথ্যাদৃষ্টি-পট উন্মোচিত এবং স্বদেশ ব্রহ্মপথের সম্বন্ধে প্রতিবোধিত হইলে সে অন্বয়-ব্যতিরেক সাহায্যে স্বয়ং যাইতে যাইতে স্বীয় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ঈশ্বরশ্চেদনাত্মা স্যান্নাসাবস্মীতি ধারয়েৎ।
আত্মা চেৎ ঈশ্বরোঽস্মীতি বিদ্যা সাঽন্যানিবর্ত্তিকা॥

ঈশ্বর যদি অনাত্মা হন তাহা হইলে মুমুক্ষু আমি ব্রহ্ম এরূপ ধারণা করিতে পারেন না। আর যদি আত্মা হন তাহা হইলে আমি ঈশ্বর এরূপ ধারণা করিতে পারেন। সেই বিদ্যা যাহা অবিদ্যা নিবৃত্তি করে॥

এই যে ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদিত হইল ইহাতে প্রকাশমান ব্রহ্মকে প্রত্যক্ আত্মা হইতে ভেদে না অভেদে প্রতীতি করিতে হইবে? 'দ্বা সুপর্ণা' 'দুই পক্ষী এক বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছেন' এই শ্রুতিতে উভ-

য়ের ভেদ এবং 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' 'এই আত্মাই ব্রহ্ম' এই শ্রুতিতে অভেদ নির্দ্দেশ আছে। এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য শ্রৌত প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রুত্যর্থকে স্পষ্ট করিতেছেন। যিনি জগৎকারণ রূপে উপলক্ষিত ঈশ্বর এবং পরমাত্মা সত্য জ্ঞান অনন্ত ও আনন্দস্বরূপ তিনি যদি আত্মা হইতে ভিন্ন অর্থাৎ বাহ্য বস্তুবৎ বিষয়ভূত বা পরোক্ষ হন তাহা হইলে মুমুক্ষু 'আমি ঈশ্বর' এইরূপ জ্ঞান করিতে পারিতেন না, অর্থাৎ আত্মাকে যথার্থত উপলব্ধি করিতে পারিতেন না। না পারিলে 'তৎ ত্বমসি' 'তুমি সেই ব্রহ্ম' ইত্যাদি শ্রুতি-বিরোধ হয়। 'আত্মেতি রূপং গচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি' 'রূপকে পাওয়ায় এই জন্য আত্মা' এই ন্যায়েরও অর্থ থাকে না। ঈশ্বরই আত্মা এবং তাহাই আমি, অন্য কিছুই নহে, মুমুক্ষু যদি এইরূপ জানেন তাহা হইলে শ্রুতি ও ন্যায় রক্ষা পায়। তাহাই বিদ্যা যাহা ভেদাকার ঘুচাইয়া জীব ব্রহ্মের ঐক্য স্থাপন করে এবং যাহা অন্য অবিদ্যার নিবর্ত্তক অর্থাৎ সমূল সংসারের উন্মূলক হয়। 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি' 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হন' 'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি' 'ব্রহ্ম হইয়াই ব্রহ্মকে পায়' ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মজ্ঞানের ব্রহ্মত্বলাভরূপ ফল দৃষ্ট হয় এই হেতু এবং ভেদপক্ষে যে বস্তু একটী স্বতন্ত্র পদার্থ রূপে স্থিত সে অন্য একটী বস্তু হইতে পারে না অথবা সে স্বয়ং নষ্ট হইয়া অপর একটী বস্তু হইতে পারে না এই হেতু ঐক্যজ্ঞানই ফলবৎ। ফলত ঐক্যেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, ভেদে নহে। অতএব যখন ভেদজ্ঞানের ফলত্ব নাই দেখা যায় এই হেতু এবং 'অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ' 'অন্য ইনি অন্য আমি এইরূপে যিনি দেখেন তিনি ব্রহ্মকে জানেন না' শ্রুতিতে এইরূপ ভেদ-দর্শনের নিন্দাবাদ আছে এই হেতু ভেদ-জ্ঞাপক শ্রুতি সমূহ অনাদি-অবিদ্যা-কল্পিত ভেদের জ্ঞাপকমাত্র, বাস্তব ভেদে উহাদের তাৎপর্য্য নাই এইরূপই বুঝিতে হইবে।

> আত্মনোঽন্যস্য চেৎ ধর্ম্মা অস্থূলত্বাদয়ো মতাঃ।
> অজ্ঞেয়ত্বেঽস্য কিং তৈঃ স্যাদাত্মত্বে হ্যন্যধীহ্নুতিঃ॥

আত্মা হইতে ভিন্ন ঈশ্বরের যদি অস্থূলত্বাদি ধর্ম্ম ইষ্ট হয় তাহা হইলে এই ঈশ্বর অনাত্মভূত বলিয়া অজ্ঞেয় হইলে মুমুক্ষুর অস্থূলত্বাদি শ্রৌত ধর্ম্মে আর কি প্রয়োজন। আর ঈশ্বরের আত্মত্ব স্বীকার করিলে স্থূলত্বকৃশত্বাদি বুদ্ধি নষ্ট হয়।

ইহা দ্বারাও শ্রুতির অভেদে তাৎপর্য্য প্রদর্শিত হইতেছে। প্রত্যগাত্মা হইতে ভিন্ন ঈশ্বরের যদি অস্থূলত্বাদি ধর্ম্ম ইষ্ট হয় তাহা হইলে এই ঈশ্বর অনাত্ম স্বরূপত্ব হেতু অজ্ঞেয় হইলে মুমুক্ষুর অস্থূলত্বাদি শ্রৌত ধর্ম্ম দ্বারা আর কোন্ কার্য্য হইবে? কিছুই নয়। কারণ, আমি স্থূল আমি কৃশ ইত্যাদি স্বগত ভ্রান্তির তো আর নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু যখন অস্থূলত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট ঈশ্বরই আমি এই জ্ঞান হয় তখন সেই ঈশ্বরেরও আত্মত্ব হওয়াতে প্রত্যগাত্মার নিজের উপর গৃহীত মোহমূলক কৃশত্ব স্থূলত্বাদি বুদ্ধির নিবৃত্তি বা বাধসিদ্ধিরূপ ফল হয়।

> মিথ্যাধ্যাসনিষেধার্থং ততোঽস্থূলাদি গৃহ্যতাম্।
> পরত্র চেৎ নিষেধার্থঃ শূন্যতাবর্ণনং হি তৎ॥

অতএব মিথ্যা অধ্যাস নিষেধের নিমিত্ত অস্থূলাদি বাক্যকে গ্রহণ কর। প্রত্যগাত্মা হইতে ভিন্ন স্থলে নিষেধার্থ যদি ইহাকে স্বীকার করিয়া লও তাহা হইলে নিশ্চয় তাহা শূন্যতা বর্ণন হইয়া দাঁড়ায়।

'কস্মিন্ আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ'

"কাহাতে এই আকাশ ওতপ্রোত হইয়া আছে?" এই কার্য্য কারণাত্মক জগতের আশ্রয় প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে অগ্রে অক্ষর পুরুষকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পরে মধ্যে 'এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি 'এই পুরুষের শাসনে হে গার্গি' এই শ্রুতি দ্বারা তিনি জগতের ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। অনন্তর 'অদৃষ্টং দ্রষ্টৃ' 'অদৃষ্ট কিন্তু দ্রষ্টা' ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার স্বভাব কীর্ত্তন করিয়া পরিশেষে বলা হইল 'তস্মিন্ নু খলু অক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ' 'হে গার্গি এই অক্ষর পুরুষেই আকাশ ওতপ্রোত হইয়া আছে' এইরূপ উপক্রম ও উপসংহারে সমগ্র ব্রাহ্মণ শ্রুতির ঈশ্বরপরতা অবধারিত দেখা যায়। তথায় 'নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃশ্রোতৃমন্তৃ বিজ্ঞাতৃ' "ইহা ব্যতীত অন্য কেহ দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা ও বিজ্ঞাতা নাই" এই বাক্য দ্বারা দ্রষ্টৃত্বাদি স্বভাব-বিশিষ্ট প্রত্যগাত্মার অক্ষর ব্রহ্ম হইতে অভেদ নির্ণীত হইয়াছে। অতএব যখন ঈশ্বর ও আত্মার অভেদেই শাস্ত্রতাৎপর্য্য তখন এই অস্থূলাদি বাক্যকে প্রত্যগাত্মার অধ্যস্ত স্থূলাদি ধর্ম্মের নিষেধপর বুঝিতে হইবে। এক্ষণে এই অভিপ্রায়েই কহিতেছেন। অতএব অজ্ঞানমূল যে মিথ্যা অধ্যাস তন্নিষেধ অর্থাৎ তন্নিবৃত্তির নিমিত্ত প্রত্যগাত্মার বিশেষণত্বে এই অস্থূলাদি বাক্যকে গ্রহণ কর। ইহার বৈপরীত্যে দোষ আশঙ্কা করিতেছেন। আর এই অস্থূলাদি বাক্যকে আত্মা হইতে পর কিনা আত্মা হইতে ভিন্ন অর্থাৎ অনাত্মা ঈশ্বরে স্থূলত্ব-নিষেধক বলিয়া যদি স্বীকার কর তাহা হইলে এই বাক্যটী নিশ্চয় শূন্যতা বর্ণন হইয়া দাঁড়ায়। দেখ, যাহা আত্মা হইতে পর অর্থাৎ আত্মেতর তাহা জড়। জড়েরই এই স্থৌল্যাদি ধর্ম্ম। ঈশ্বর যদি অনাত্মা অর্থাৎ জড় হইলেন আর এই বাক্যটী যদি তাঁহার স্থূলত্বাদি জড় ধর্ম্মের নিষেধক হইল তাহা হইলে ঈশ্বরের ঈশিত্ব না থাকা * হেতু বাক্যটী কেবল নিষেধপর বৈ আর কি দাঁড়ায়। অতএব যাহাতে অস্থূলাদি ধর্ম্ম আছে তাহাকে অনাত্মা বলা যাইতে পারে না। যিনি ঈশ্বর স্বীকার করিবেন তিনি তাঁহাকে আত্মা বলিয়া জানিবেন।

বুভুৎসোর্যদি চান্যত্র প্রত্যগাত্মন ইষ্যতে।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্র ইতি চানর্থকং বচঃ॥

যদি তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু প্রত্যগাত্মার অন্যত্র স্থূলত্বাদি ধর্ম্ম নিষেধ অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে অপ্রাণ অমনা শুভ্র ইত্যাদি বাক্য অনর্থক হইয়া দাঁড়ায়।

প্রত্যগাত্মার অন্যত্র অর্থাৎ ঈশ্বরে যদি স্থূলত্বাদি প্রতিষেধ স্বীকার কর তাহা হইলে অপ্রাপ্তের প্রতিষেধ ও নিষ্ফল হয় এই বলিয়া দোষান্তর প্রদর্শিত হইতেছে। প্রত্যগাত্মার আত্মতত্ত্বজ্ঞানেচ্ছুর কিনা সংসারী আত্মার অন্যত্র অর্থাৎ ঈশ্বরে যদি দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মন ও তৎধর্ম্ম-নিষেধ স্বীকার কর তাহা হইলে অপ্রাণ ও অমনা ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অনর্থক নিষ্প্রয়োজন হইয়া যায়, কারণ ঈশ্বরে প্রাণাদির প্রসক্তি নাই। আর দৃষ্ট বিষয়েরই প্রতিষেধ হইয়া থাকে। যখন ঈশ্বরে প্রাণাদি দৃষ্ট হয় না তখন তাহার আর প্রতিষেধ কিরূপে সম্ভবে।

অহংপ্রত্যয়বীজং যদহংপ্রত্যয়বৎস্থিতম্।
নাহংপ্রত্যয়বদ্দৃষ্টং কথং কর্ম্ম প্রবোধতি॥

অহংপ্রত্যয়বীজ অহংপ্রত্যয়বৎ সন্তুঃ-

---

* শ্রুতিতে এই কার্য্যকারণাত্মক জগতের ঈশিতা এই জন্য ঈশ্বর এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। এই ঈশিত্বকে অবশ্য ভাবাত্মক বলিতে হইবে। এই ভাবাত্মক ধর্ম্মের সহিত শূন্যত্বের কিরূপে সামানাধিকরণ্য হইতে পারে।

করণে স্থিত কর্ম্ম নাহংপ্রত্যয়বহ্নিতে দগ্ধ হইলে আর কিরূপে প্ররোহিত হইবে।

ভাল, তুমি বলিলে ঈশ্বরের সহিত অভেদে আত্মাকে জানাই মোক্ষসাধন কিন্তু তাহা ঘটিতে পারে না, কারণ সঞ্চিত অনেক কর্ম্মের সদ্ভাব আছে, আর কর্ম্ম থাকিলে তাহার ফলও অবশ্যম্ভাবী। এই কর্ম্ম ও কর্ম্মফলই মোক্ষসাধনের প্রতিবন্ধক। এই আপত্তিতে কহিতেছেন। অহং কিনা আমি এই প্রত্যয় অর্থাৎ অহঙ্কার—অনাত্মাতে আত্মাভিমান অর্থাৎ অজ্ঞান যে কর্ম্মের বীজ এবং আত্মা যাহাতে অহং ইত্যাকারে প্রতীত হয় সেই সাভাস অন্তঃকরণে যে কর্ম্ম সঞ্চিত তাহা আমি কর্ত্তা নহি ভোক্তা নহি কিন্তু ব্রহ্মই আমি ইত্যাকার প্রমাণ-জনিত প্রত্যয়রূপ বহ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে আর কিরূপে পুনর্ব্বার অঙ্কুরিত হইয়া ফলোন্মুখী হইবে। এই বিষয়ে শ্রুতি ও স্মৃতি উদাহৃত হইতেছে। 'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।' 'ব্রহ্মদর্শন হইলে মুমুক্ষুর সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হয়।' 'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।' হে অর্জ্জুন, জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্ম্ম ভস্মসাৎ করে'। ফলত জ্ঞানোদয় হইলে বিরোধিতা হেতুই মূল অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, অজ্ঞানের নিবৃত্তিতে অজ্ঞান-কার্য্য অন্তঃকরণও নিবৃত্ত হন, অন্তঃকরণের নিবৃত্তিতে আশ্রয়াভাবে কর্ম্মও থাকিতে পারে না সুতরাং সঞ্চিত কর্ম্ম দ্বারা মুক্তির প্রতিবন্ধকতা কিরূপে সম্ভবে।

প্রার্থনা।

যখন পাপ আসিয়া মানুষের স্কন্ধে চাপিয়া বসে, তখন আর তাহার জ্ঞান থাকে না। পাপের যে বলবতী মোহিনী শক্তি আছে, তদ্দ্বারা সে মনুষ্য-হৃদয়-নিহিত কুপ্রবৃত্তি-সকলকে উত্তেজিত করিয়া বল পূর্ব্বক প্রমোদেচ্ছা-স্রোতে মানুষকে ভাসাইয়া লইয়া যায় এবং জ্যোতির দিকে তাকাইতে না দিয়া একেবারে মৃত্যুর অন্ধকার-কূপে তাহাকে ডুবাইয়া ফেলে। মানুষ পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেই যে কুকার্য্যকে পরম রমণীয় বা পরম কল্যাণীয় জ্ঞানে বিবেকের শত শত অনুরোধকে তুচ্ছ করিয়া তৎসাধনে প্রবৃত্ত হয়, সেই কু-কার্য্য সম্পাদনের পর মুহূর্ত্তেই অনুশোচনা রূপ তীব্র অগ্নি-দাহে দগ্ধ হইয়া হায় হায় করিতে থাকে। কু-কার্য্য সাধন করিবার সময়ে মানুষের কু-কার্য্যের প্রতি কু এই জ্ঞান থাকে না, তাই মানুষ তাহা করিয়া ফেলে। মানুষের জ্ঞান তখন অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইয়া যায়, বিবেকরূপ দিব্য-চক্ষু মুদিত হয় এবং অমার্জ্জিত আত্মার বল সঙ্কুচিত হইয়া দুর্ব্বলা শুনীর ন্যায় পাপ-পরাক্রম-ভয়ে অন্তর্ব্বিবরে প্রবিষ্ট হয়। পাপের রূপ মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায়, তাই আমরা তাহাকে আলিঙ্গন দিবার পূর্ব্বে চিনিয়া উঠিতে পারি না। হে ঈশ্বর, কি শারীরিক, কি আধ্যাত্মিক সকল প্রকার পাপাচরণ করিবার পূর্ব্বে আমাদিগকে তাহা বুঝিবার শক্তি দিয়া জাগ্রৎ কর। নাথ, তোমার নিকট আমাদিগের সতত এই প্রার্থনা হউক—

ব্রহ্মন্ নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাস্তে নম উক্তিং বিধেম।

"হে মহান্! ধর্ম্মধন লাভের জন্য আমাদিগকে সুপথ দিয়া লইয়া চল। হে দেব, আমাদিগের সমস্ত পাপেরই তুমি জ্ঞাতা, আমাদিগের সংস্পর্শ হইতে কুটিল

পাপকে পৃথক্ কর তোমাকে বারম্বার প্রণাম করি।" পাপ মানুষকে দরিদ্র করে, লোক মধ্যে ঘৃণিত করে, শোকগ্রস্ত করে, রুগ্ন ও জীর্ণ করে এবং অবশেষে তাহাকে মৃত্যুর ক্রোড়ে চির নিদ্রায় নিদ্রিত করিয়া চলিয়া যায়।

খাসিয়া জাতি।

হিন্দুস্থানের মধ্যে অনেক জাতির বাস। তন্মধ্যে কোল, ভীল, নাগা, ভুটু, লেপ্চা, খাসিয়া ও সাঁওতাল প্রভৃতি বহুবিধ অসভ্য জাতি আছে। যে সকল জাতি সভ্যতার অভিমান করে, কোন কোন অসভ্য জাতির সহিত তুলনায় নীতি সম্বন্ধে তাহারা উৎকৃষ্ট নহে।

ভারত-নিবাসী অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে খাসিয়া জাতিকে নানা প্রকারে উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। ইহারা যে জ্ঞানের দ্বারা প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া বিদ্যুতের সহায়তায় দূরবর্ত্তী স্থানের সংবাদ লাভ করিতেছে, অথবা ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া নানা দেশে গতায়াত করিতেছে, অথবা জড় জগতের নানা বিবরণ জানিয়া জ্ঞানগর্ব্বে স্ফীত হইয়াছে বলিয়া সকল জাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট তাহা নহে। চরিত্র ও হৃদয় সম্বন্ধে ইহারা উৎকৃষ্ট, জ্ঞান ও বুদ্ধিতে নহে। ইহারা দরিদ্র হইলেও ইহাদের মধ্যে নীতির যথেষ্ট আদর দেখিতে পাওয়া যায়।

খাসিয়া দেশ।

বঙ্গদেশের ঈশান কোণে আসাম দেশ। খাসিয়া পর্ব্বত আসামের অগ্নি কোণে। খাসিয়া দেশ আসামের অন্তর্ভূত। খাসিয়া গিরি হিমগিরির একটি শাখা নহে। ইহাদের দেশ অতি সুন্দর। তথায় প্রায় সম্বৎসরই বর্ষার সঞ্চার। পৃথিবীর সকল স্থান অপেক্ষা চেরাপুঞ্জী নামক স্থানে বর্ষার আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য স্থানের এক বৎসরের বর্ষার পরিমাণ অপেক্ষা চেরাপুঞ্জীর এক সপ্তাহের বর্ষার পরিমাণ অধিক। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বর্ষার আধিক্য হেতু খাসিয়াদিগকে অস্বাস্থ্য জনিত কোন ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। ইহারা সর্ব্বদা বর্ষার জলে ভিজিয়া কাজ করে।

শিলং ইহাদের রাজধানী। যদিও ইহারা ইংরাজের অধীন তথাচ স্থানে স্থানে প্রজা-মনোনীত এক একজন খাসিয়া রাজা আছে। খাসিয়াগণ পূর্ব্বে অতিশয় দুর্দ্দান্ত ছিল, কিন্তু এক্ষণে ইহারা শান্তস্বভাব হইয়াছে। খাসিয়া প্রদেশের উৎপাদিকা শক্তির আধিক্য সত্ত্বেও প্রচুর শস্য জন্মে না। ইহাদের আহারীয় তণ্ডুল প্রভৃতি ইহাদের দেশেই উৎপন্ন হয়। খাসিয়া গিরিতে প্রচুর পরিমাণে কমলা লেবু ও প্রস্তরজাত চূণ জন্মে। তাহা দ্বারা অনেকেই জীবিকা উপার্জ্জন করে।

খাসিয়াদের আকার।

ইহারা দেখিতে মঙ্গোলীয় জাতির ন্যায়। ইহারা শ্মশ্রুল নহে কিন্তু মুখে শ্মশ্রুর কিছু কিছু চিহ্ন আছে। ইহাদের আকার কিছু গোল, নাসিকা ছোট, শরীর দৃঢ় ও কর্ম্মক্ষম। ইহারা শ্বেতকায়। ইহাদের স্ত্রীলোকগণ দেখিতে বড় সুশ্রী। ইহাদের সৌন্দর্য্য চরণে। জঙ্ঘার নিম্ন অংশ গোল, সুশ্রী ও বলপ্রকাশক হইলে ইহাদের সৌন্দর্য্যের চূড়ান্ত হইল।

খাসিয়াদের বেশ।

অধুনা ইহারা ধুতি, পিরাণ, ও চাদর ব্যবহার করে। ইহাদের স্ত্রীলোকদের বেশ অতি সুন্দর। খাসিয়াগণ যুদ্ধের সময় একটি দীর্ঘ জামা, মহিষ ছালের অথবা পিত্তলের ঢাল, তরবারী, তীর প্রভৃতি লইয়া যুদ্ধ করিত। ইহারা তীরে বিষ মাখাইয়া পশু বধ করে, কিন্তু সে তীর মনুষ্যের প্রতি প্রয়োগ করে না। ইহারা বস্ত্র বুনিতে জানে না ও ইহাদের মধ্যে শিল্পাদির তত উন্নতি নাই, সেই জন্য ইহাদিগকে অন্য জাতির নিকট বস্ত্র ক্রয় করিতে হয়।

খাসিয়াদের আহার।

ইহারা আমিষ-প্রিয়। ইহারা শূকর মাংস খাইতে বড় ভালবাসে ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি প্রায় সকল জন্তুরই মাংস ভক্ষণ করে। ইহাদিগকে সর্ব্বভুক বলা যাইতে পারে। ইহাদের দেশে শাক সবজী অধিক জন্মে না, সুতরাং ইহারা মাংসের অতিরিক্ত পক্ষপাতী। ইহারা মাংসের সহিত দাল ও দুই এক প্রকার তরকারী দিয়া ভাত খায়। ভোজের সমারোহে দুই একটী তরকারী হইলেই যথেষ্ট হইল। ইহারা সুন্দররূপে দ্রব্য পাক করিতে জানে না। ইহারা মাংস, শাক প্রভৃতি প্রায় সকল দ্রব্যই অর্দ্ধ সিদ্ধ করিয়া খায়। ইহারা মশলা বা তৈলের ব্যবহার করে না। ইহারা দুগ্ধ বা ঘৃতও ব্যবহার করে না। ইহারা সতত তাম্বূল চর্ব্বণ করিতে বড় ভালবাসে; সুতরাং তাম্বূলের সরঞ্জম সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। কোন ব্যক্তি ইহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে

গেলে ইহারা তাহাকে চূণের সহিত একটি পান ও সুপারী প্রদান করে। ইহাদের দন্তগুলি তাম্বূল রাগে রঞ্জিত। ইহাদের সংস্কার আছে যে, কুকুর ও বাঙ্গালী-দেরই শ্বেত দন্ত থাকে।

খাসিয়াদের ভাষা।

অতি পূর্ব্বে ইহারা লেখা পড়া কিছুই জানিত না। খৃষ্টীয় পাদ্রিগণ ইহাদিগকে ইরাজী ভাষা শিক্ষা দেন। অধুনা খাসিয়া ভাষাতে দুই চারখানি পুস্তক রচিত হইতেছে। সম্প্রতি খাসিয়া ভাষাতে 'ব্রহ্মসঙ্গীত' প্রকাশিত হইয়াছে। অন্য কোন ভাষার সহিত ইহাদের ভাষার ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের ভাষা শুনিতে অতি মধুর এবং উচ্চারণ সানুনাসিক। এই খাসিয়া ভাষায় কোন ব্যাকরণ নাই।

খাসিয়াদের সভ্যতা।

ইহারা পূর্ব্বে নিতান্ত অসভ্য ছিল। এখন ইংরাজদিগের সংমিলনে সভ্য হইয়াছে। কি স্ত্রী, কি পুরুষ প্রায় সকলেই কিছু না কিছু শিক্ষা লাভ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে সামান্য রূপ শিক্ষিতই অধিক কিন্তু উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের সংখ্যা অতি বিরল। কয়েক জন মাত্র উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া ইংরাজের অধীনে কর্ম্ম করিতেছেন।

ইহাদের মধ্যে ক্রমশই শিক্ষার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু দারিদ্র্য নিবন্ধন ইহারা উচ্চ শিক্ষা হইতে বঞ্চিত। কয়েকজন খাসিয়া যুবক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতেছেন। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা পশম ও সূচীকার্য্য করে। ইহাদের অধিকাংশ লোকই শ্রমজীবী।

খাসিয়াদের আচার ব্যবহার।

ইহারা সর্ব্বদাই আমোদ লইয়া থাকে। জনকয়েক একত্রিত হইলে আনন্দের ধ্বনিতে পর্ব্বত গুহা প্রতিধ্বনিত হয়। ফলত ইহাদের বাসস্থান আনন্দের আলয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। খাসিয়া স্ত্রীলোকেরা পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী হয়েন। অন্যদেশে যেমন পুত্রই ধন পায়, খাসিয়াদের মধ্যে সেরূপ নহে। তাহাদের কন্যাগণ পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করে। খাসিয়া দেশে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য অধিক; এমন কি বিবাহ হইলে বর ভৃত্যের ন্যায় পত্নীগৃহে আইসে। স্ত্রীলোকদের স্বাধীনতা এবং সম্মানও যথেষ্ট আছে। ইহারা পাঁচটি মাত্র কড়ি দিয়া বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে। খাসিয়া রমণীগণ পুরুষ অপেক্ষা অনেক সুবিধা উপভোগ করে। পুত্র কন্যার উপর পিতার অপেক্ষা মাতারই অধিক দাবী দাওয়া থাকে। ইহাদের মধ্যেও অনেক ভিন্ন ভিন্ন জাতি এবং সম্প্রদায় আছে। কাহারও মৃত্যু হইলে মৃতদেহ স্বেচ্ছামত সময়ে দাহ করিবার নিমিত্ত রাখিয়া দেওয়া হয়। তদুপলক্ষে অনেক হাট বাজার ও নৃত্য গীতাদি করিয়া মহা সমারোহে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহ করে। স্থানে স্থানে প্রোথিত প্রস্তর খণ্ডগুলি ইহাদের সমাধির চিহ্ন বলিয়া বোধ হয়।

খাসিয়াদের ধর্ম্ম।

ইহারা নিরাকার ঈশ্বর ও প্রেতাত্মা বা ভূতে বিশ্বাস করে। ইহারা প্রেতাত্মাদিগকে রোগ, শোকও অমঙ্গলের কারণ মনে করে। ইহাদিগের বিশ্বাস যে এই প্রেতাত্মা বা ভূতেরা গিরিগুহায় লুকাইয়া থাকে। ফলত ইহারা ভূতদিগকে অধিক সম্মান করে। ডিম্ব ভাঙ্গিয়া ভূতগণকে উপহার দেয়। ইহারা ডিম্বের অবস্থা দেখিয়া ভূতেরা সন্তুষ্ট হইল কি না তাহা বুঝিতে পারে। রোগের চিকিৎসা না করাইয়া তাহার শান্তির জন্য ইহারা সেই ভূতগণকে ডিম্ব নিবেদন করিয়া দেয়। এমন কি কোন সম্ভ্রান্ত লোক একদা ৪৫৲ টাকার ডিম্ব এইরূপ একটী কার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাহাতে খাসিয়া পর্ব্বত এক প্রকার ডিম্ব শূন্য হইয়াছিল। ইহারা মনে করে যে, এইরূপ উপহার দ্বারা উপদেবতা বা ভূতগণকে সন্তুষ্ট করা যায়। যদিও ইহারা অপৌত্তলিক এবং এক ঈশ্বরের পূজা করে তথাচ ইহারা তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধ। এখন ইহাদের মধ্যে অনেকে কিঞ্চিৎ ইংরাজি শিক্ষা লাভ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। অনেকে ইংরাজদিগের পরিচ্ছদের অনুকরণ করিতেছে।

কিন্তু আনন্দের বিষয় এই যে, আজ কাল একটু স্রোত ফিরিয়াছে। যাহারা একেশ্বরবাদের বিমল আলোক লাভ করিতেছে, তাহারা আর দেশীয় বা বিদেশীয় কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিতেছে না। তাহারা প্রকৃত পথে উঠিয়াছে এবং পূর্ব্ব ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সারাংশ গ্রহণ করিতেছে। এই অসভ্য জাতির এই মহা পরিবর্ত্তনের মূল পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। মহর্ষির করুণ হৃদয় ইহাদের জন্য কাতর। তাঁহার কৃপায় সেই দুরতর অসভ্য নিবাসে রজনীর অন্ধকারের মধ্যে উষালোক ফুটিয়া উঠিতেছে। সেই তত্ত্বজ্ঞান বিহীন জাতির মধ্যে 'সত্যম্‌জ্ঞানমনন্তম্‌, প্রচারিত হইতেছে, গুহানিহিত ধ্যাননিরত ঋষিগণের

গম্ভীর 'সত্যমজ্ঞানমনন্তম্' ধ্বনীর সহিত তত্রত্য নরনারীর মধুর কণ্ঠস্বর মিলিত হইয়াছে এবং নিস্তব্ধ সমাহিত পর্ব্বতমালাও যেন যুগনিদ্রার অবসানে মানবগণের সহিত বিশ্বপালকের উপাসনায় যোগ দিয়াছে।

অধ্যক্ষ সভার নির্দ্ধারণ অনুসারে এবার ইহা পত্রিকার অভ্যন্তরেই গৃহীত হইল।

NOTICE.

We hope that the Brahmos following the principles of the Adi Brahmo Somaj will classify themselves as Hindu Brahmos in the coming Census, which takes place on the 26th February next. The following correspondence which took place between the Secretary to the Adi Brahmo Somaj and Mr. C. J. O' Donnell Superintendent of Census Operations, Bengal.

Robindra Nath Tagore.
Secretary.

The following petition was sent to the Census Commissioner:—

Sir,

With reference to the instructions issued by you as to the tabulation of all Brahmos as non-Hindus and the explanation there-of to the effect that the members of the Adi Brahmo Somaj are to be classed as Brahmos, not Hindus, and the Adi Brahmo Somaj is to be given as the sect to which they belong. I have the honour to inform you that the members of the Adi Brahmo Somaj are really Hindus as will appear from the speech of Sir Fitz James Stephen on the Civil Marriage Act (see the supplement to the *Gazette of India* Jan. 1872 P 70 etc.) They differ from the general body of Hindus in this one respect that they do not worship images and are pure Theists.

Under these circumstances, I beg you will be good enough to issue further instructions modifying those already issued and directing the classification of the members of the Adi Brahmo Somaj as Theistic Hindus.

I have the honour to be
Sir,
Your most obedient Servant,
Robindra Nath Tagore,
Secretary.

In reply to the above petition, the following letter was received from Mr, C. J. O'-Donnell

No. 292. C.

FROM

C. J. O'DONNELL, ESQ.,
SUPERINTENDENT OF CENSUS OPERATIONS
BENGAL,

TO

Babu Rabindra Nath Tagore.
Dated Calcutta the 13th January, 1891.

Sir

With reference to your letter No. 93 of the 9th instant. I have the honour to say that there is no intention to tabulate and compile Adi Somaj Brahmos as non-Hindus. For the purposes of statistics, however, it has been found necessary to distinguish ordinary Hindus from Theistic Hindus and the only simple way of accomplishing this end in the vernacular language of these provinces is to instruct enumerators to enter the former as Hindus and the latter as Brahmos.

2. As the census begins in less than 48 hours from the time I am writing this letter I hope you will agree with me that it is practically impossible to issue further instructions at this period You may, however, rely on me to see that your co-religionists appear as Hindus in the Census compilations.

I have the honour to be,
Sir,
Your Most Obedient Servant,
C J, O'Donnell,
Superintendent of Census
Operations, Bengal

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৯ সোমবার রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় ভবানীপুর ঊনচত্বারিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক। মহাশয়েরা যথা সময়ে ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়া উপাসনা করিবেন।

১ আষাঢ়
১৮১২ শক।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র চৌধুরী।
সম্পাদক।

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের অন্তরায়।

(শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিবৃত।)

আজ আমি আপনাদিগের এই উৎসব-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি। অনেক দিন হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দেখিতাম যে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে এবং আপনাদিগের সাদর নিমন্ত্রণ পত্রও প্রাপ্ত হইতাম। কিন্তু আজ আমি আপনাদিগের উৎসবে যথার্থরূপে যোগদান করিতে পারিয়া কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। আপনাদিগের উৎসবের একটী প্রধান অঙ্গ বক্তৃতার ভার আমি গ্রহণ করিয়াছি। আমি নিতান্তই ক্ষুদ্র—বয়সে যেমন অল্প, সকল বিষয়েই তেমনি অল্প। ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে অতি অল্পই অগ্রসর হইয়াছি—আপনার স্বার্থ বলিদান করিতে পারি নাই; আপনার মান অপমান বিসর্জ্জন দিতে পারি নাই। আমা হইতে কত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এখানে উপস্থিত আছেন। কিন্তু তথাপি আমি যে এখানে আসিয়াছি তাহা বক্তৃতা করিবার জন্য নহে—কেবল নিজের আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিবার জন্য। ব্রাহ্মসমাজের কিছু কার্য্য করিতে পারায় আমার যে আনন্দ হইয়াছে, তাহাই আজ এই উৎসবের দিনে এখানকার বন্ধুগণের সহিত উপভোগ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি।

এই ভবানীপুর ব্রহ্মমন্দির দেখিলেই ইহার সংস্থাপকদিগের কথা মনে আইসে। আমি যে সেই মহাত্মাদিগকে দর্শন করিয়াছি তাহা নহে; তাঁহাদিগের বিষয় এত শুনিয়াছি যে, তাহাতে আমার এক প্রকার দেখাই হইয়াছে। প্রথমেই মনে পড়ে পরলোকগত কাশীশ্বর মিত্রের কথা। এখানে উপস্থিত সভ্যদিগকে আমি আর অধিক কি বলিব? তাঁহারা সকলেই জানেন যে, এই সমাজসংস্থাপন বিষয়ে তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। এমন কি, তিনি উপাসনার দিবস প্রতি জনের গৃহে গৃহে গমন করিয়া সকলকে পবিত্র ধর্ম্মের কথা শুনিবার জন্য আহ্বান করিতেন। এই মহাত্মা ব্যক্তি অনেক

দিন অতীত হইল উন্নত লোকে গমন করিয়া দেবতাগণের সহিত সেই "প্রথম নাম ওঁকারের" মহিমাগান করিতেছেন। আমাদিগের গান শুনিবার জন্য আর তিনি এখানে নাই। কিন্তু তবু তাঁর উদ্দেশে আমরা আজও শোক প্রকাশ করিতেছি। পরলোকগত হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত শম্ভুনাথ উভয়েই এই ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন বিষয়ে সহায় ছিলেন। প্রথম যখন হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্ম করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার বিশেষরূপ উৎসাহ ছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে এখানে সুন্দর উপদেশ দিতেন; তাঁহার বক্তৃতায় ব্রাহ্মসমাজ অনেক উপকার লাভ করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের সহিত জানাইতে হয় যে তাঁহার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি ধর্ম্মের জন্য সে উৎসাহ রাখিতে পারেন নাই। পণ্ডিত শম্ভুনাথের অচল সত্যনিষ্ঠা, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ সহায় ছিল। আরও একজন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির নিকট এই ব্রাহ্মসমাজ ঋণী আছেন—তিনি হয়তো এখানে উপস্থিত—তিনি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি এখন পরমেশ্বরের কৃপায় দীর্ঘজীবি হইয়া তাঁহার রোপিত বৃক্ষের সুশীতল ছায়া ও ফললাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন—আপনার শ্রমকে সার্থক মনে করিতেছেন। বলিতে কি, ধর্ম্মদান করিয়া যে সুখ তদপেক্ষা আর কিসে অধিক সুখী হওয়া যাইতে পারে?

"ভূমিদানাৎ পরং নাস্তি বিদ্যাদানং ততোঽধিকং।"

ভূমি দানের পর আর দান নাই কিন্তু বিদ্যাদান আরও পুণ্যজনক। কিন্তু যে ধর্ম্মের জন্য জগতের লোক সকল উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠে, যে ধর্ম্মের আধার ঈশ্বরকে পাইবার পিপাসা প্রতি জনের হৃদয়ে অন্ততঃ একবার না একবার তীব্রভাবে ঝঙ্কার দিয়াছে; যাহার জন্য কত লোকে জগতের তুচ্ছ সুখ দুঃখকে, তুচ্ছ ধনজন মান অপমানকে পদাঘাত করিয়াছে—তথাপি ধর্ম্মের অন্বেষণ না পাইয়া শান্তি লাভ করিতে পারে নাই, সেই ধর্ম্মপ্রচারের যিনি সহায়তা করেন, তিনি যে পবিত্র সুখ উপলব্ধি করেন, সে সুখের কাছে আর কি সুখ আছে?

এখানে উপস্থিত অনেক ব্যক্তিরই স্মরণ হইতে পারে যে, কতিপয় উন্নতচেতা ব্যক্তি আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্কে তত্ত্ববোধিনী সভার ন্যায় এই ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্কে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম দিগদিগন্তে বিস্তার করিবার জন্য সত্য-জ্ঞান-প্রচারিণী সভা সংস্থাপন করেন। তাঁহারা কেবল এই স্থানে সভা স্থাপনা করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। তাঁহাদিগের উৎসাহ তখন এমনি প্রদীপ্ত ছিল যে তাঁহারা, যাহাতে পল্লীগ্রামের কুটীরবাসী পর্য্যন্ত পবিত্র অধ্যাত্মধর্ম্মের উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন, তাহার জন্য বেহালায় সেই সভার শাখারূপে নিত্যজ্ঞানসঞ্চারিণী সভা নামে একটী সভা স্থাপন করেন। এই উৎসাহী উদ্যমী ব্যক্তিদিগের মধ্যে আমার দুই জনের নাম স্মরণ হইতেছে—শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবকুমার বসু। ধন্য তাঁহাদের উৎসাহ! তাঁহাদিগের পরিশ্রমে না জানি ব্রাহ্মসমাজের কত উপকার সাধন হইয়াছে। আজ যদি ব্রাহ্মদিগের অন্তঃকরণে সে উৎসাহ, সে ঈশ্বরপরায়ণতা, সে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যসাধনের ভাব জাগরূক থাকিত, তাহা হইলে কি আজ ব্রাহ্মসমাজের এরূপ দুরবস্থা দেখিতে হইত? যদি প্রত্যেক

ব্রাহ্ম, প্রত্যেক ব্রহ্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তি প্রাণপণে যথাসাধ্য, ফলদাতা ঈশ্বরের হস্তে ফলদানের ভার ন্যস্ত করিয়া, তাঁর করুণার উপর নির্ভর করিয়া, বিন্দু পরিমাণেও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে যত্নবান্ হইতেন, তাহা হইলে হয়তো আজ দেখিতে পাইতাম যে, কোথায় বঙ্গদেশ, কোথায় পঞ্জাব, কোথায় বম্বে মাদ্রাজ, সকল দেশের সকল লোকে, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি বিদ্বান্, কি অবিদ্বান্, সকলেই সমস্বরে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এর জয়ঘোষণা করিতেছে। তাহা হইলে আজ হয়তো দেখিতে পাইতাম যে সমুদয় ভারতবর্ষ ভ্রাতৃসৌহার্দ্যবন্ধনে বদ্ধ হইয়া আত্মার পরিত্রাণের নিমিত্ত একপ্রাণে সমস্বরে সেই বিশ্বপিতা 'পাবনং পাবনানাং' পরমেশ্বরকে ডাকিতেছে।

কিন্তু আজ কাল কি দেখিতেছি! আজ কাল যেন ব্রাহ্মদিগের অন্তরে সেরূপ উৎসাহ নাই, সেরূপ উদ্যম নাই। কি এক বিষময় নিরুৎসাহের ভাব যেন ব্রাহ্ম সাধারণের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে। ভাবিয়া দেখিলে ইহার কতকগুলি কারণ সহজেই বুঝা যাইতে পারে। প্রথমতঃ যাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা তাঁহাদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে একপ্রকার অবহেলা প্রদর্শন করেন; তাঁহারা স্বীয় কর্ত্তব্যের গুরুতর ভার সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করেন না। তাঁহারা ইহা বুঝেন না যে যখনই ব্রাহ্ম নাম গ্রহণ করিয়াছেন, তখনই একটা কঠিন দায়িত্ব আপনাদিগের স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়াছেন। এই ভাবটী যতদিন কেহ অন্তরে স্থান না দিবেন, ততদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের আশা দুরাশা মাত্র। অনেকে মনে করেন যে যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে—কিন্তু তাহা ঠিক নহে। অবশ্য স্বীকার করি যে, অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে কাল্পনিক দেবদেবীর উপাসনাই এই বঙ্গদেশে এবং সমুদয় ভারতবর্ষে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; রাজা রামমোহন রায় সেই সময়ে প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় উত্থিত হইয়া স্বীয় পাণ্ডিত্য ও প্রতিভাবলে অকাট্য শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তি সমূহ প্রদর্শন করিয়া সর্ব্বপ্রকার উপধর্ম্মকে একেবারে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাতেই কি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের কার্য্য পর্য্যবসিত হইয়াছিল? তাহা নহে। উপধর্ম্ম যদি বা দূর হইল, পাপপুণ্যের একাকার-ভাব-প্রবর্ত্তক নীরস শুষ্ক যে অপ্রকৃত বেদান্ত মত, তাহাই আসিয়া উপধর্ম্মের স্থান অধিকার করিল। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় পূজ্যপাদ মহর্ষি এই শুষ্ক অপ্রকৃত প্রচলিত বেদান্তমতকে নিরস্ত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং ঈশ্বরের প্রতি প্রীতির স্রোত, তাঁহার প্রতি নির্ভরের ভাব ব্রাহ্মসাধারণের হৃদয়ে জীবন্ত করিয়া তুলিলেন। কিন্তু ইহার পরে আমাদিগের জন্যও অনেক কার্য্য অবশিষ্ট আছে। জ্ঞানের যুগ গিয়াছে, প্রীতির যুগ গিয়াছে; এখন কর্ম্মের যুগ আসিয়াছে। রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান প্রচার করিয়া সকলকে চেতনা প্রদান করিলেন; পূজ্যপাদ মহর্ষি সাধারণের হৃদয়ে ব্রহ্মপ্রীতি জাগ্রত করিয়া দিয়া সকলকে ব্রহ্মের পথে আর এক পদ অগ্রসর করিয়া তুলিলেন। এখন আমাদিগকে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া দেখাইতে হইবে যে, আমরা ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মপ্রীতি হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছি। ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে

গেলেই পূর্ব্ব হইতে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মপ্রীতি হৃদয়ে প্রবেশ করা আবশ্যক। আমাদিগের এই বর্ত্তমান সময়ে জ্ঞানযুগ ও প্রীতিযুগ যেন কেন্দ্রীভূত হইয়া কর্ম্মযুগে পরিণত হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন এই যে,ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তব্য কি আর অবশিষ্ট আছে। দু-একটি দৃষ্টান্তের দ্বারাই বুঝান যাইতে পারে যে এখনও বহুল কর্ত্তব্য অবশিষ্ট আছে। আমি অনেক দিবস পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র থাকিয়া যেটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে এই মনে হয় যে সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে ধর্ম্মের প্রতি একপ্রকার গরলপূর্ণ তাচ্ছীল্যভাব প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আমাদের কি প্রাণপণ কর্ত্তব্য নহে যে তাঁহাদিগের হৃদয় হইতে সেই প্রকার ভাব সকল উন্মূলিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ধর্ম্মের পবিত্রতা মুদ্রিত করিয়া দিই? এখানে যাঁহারা উপস্থিত আছেন, তাঁহারাও বেশ জানেন যে বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ ধর্ম্মের ভাব অপেক্ষা অধর্ম্মের ভাবই অধিকতর লাভ করেন। যখন চারিদিকে এইরূপ দুষ্ট সমীরণ বহিতেছে, তখন কোন্ পিতা আপনার সন্তানগণকে প্রকৃত ধর্ম্মের শিক্ষা না দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? এইখানেই ব্রাহ্মসমাজের একটী প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম পড়িয়া রহিয়াছে—ভবিষ্যৎ বংশকে অধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিতে হইবে; ব্রাহ্মসমাজ প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা দিবার একটী সুপ্রশস্ত স্থান। ধর্ম্ম যাহাতে বংশানুক্রমে চির প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহার উপায় করা আমাদিগের একটী অপরিহার্য্য কর্ম্ম, কারণ ধর্ম্ম না থাকিলে সমাজ থাকিতে পারে না এবং অন্য কোন প্রকার শুভকর্ম্মই সম্পাদিত হইতে পারে না; "ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ" ধর্ম্মকে রক্ষা করিলে ধর্ম্ম ও আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। ভবিষ্যৎ বংশকে অধর্ম্ম হইতে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলে কেবল উপদেশের দ্বারা সেরূপ সুফল প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারিবে না, এবিষয়ে দৃষ্টান্ত চাই। প্রত্যেক ব্যক্তিকে যথার্থ ব্রহ্মপরায়ণ হইতে হইবে; প্রীতি ভক্তির সহিত সকল কার্য্যে সেই অখিল মাতা বিশ্বপিতা পরমেশ্বরকে স্মরণ করিতে হইবে। যে পরিবারের প্রতিজনের হৃদয়ে এরূপ ধর্ম্মভাব প্রবেশ লাভ করে, সে পরিবার কি সুখের পরিবার! এবং সে পরিবারের মধ্যে যদি কোন সুকুমারমতি বালক থাকে, তবে সে কি অন্তরে নীরব থাকিতে পারে? তাহার হৃদয় কি ধর্ম্মের পবিত্র ভাবে, ধর্ম্মের জীবন্ত ভাবে মগ্ন হইতে শিক্ষা না পাইয়া থাকিতে পারে?

ছাত্রদিগের মধ্যে এইরূপ ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধার সঙ্গে সঙ্গে আর একটী ভয়ানক ভাব প্রবেশ লাভ করিতেছে—তাহা জড়বাদ। প্রসঙ্গত, একটী তর্ক সহজ বুদ্ধিতে উপস্থিত হইতেছে—আমি আহার করিবামাত্রই, আমার ইচ্ছা হউক বা না হউক, পরিপাক হইতে আরম্ভ হইবে, ইহার বেলায় আমার ইচ্ছা কোনরূপে কার্য্যকরী হয় না; আর কোন সৎকর্ম্ম বা অসৎকর্ম্ম করিবার কালেই আমার ইচ্ছা সম্পূর্ণ স্বাধীন! এইরূপ উপযুক্ত সময়ে ইচ্ছার স্বাধীনতা, উপযুক্ত সময়ে ইচ্ছার পরাধীনতা—ইহা কি কখনও জড় অণুসমূহের সংহতি মাত্রের কার্য্য হইতে পারে? যিনি স্বয়ং চেতনাবান্ এবং যিনি "চেতনং চেতনানাং" চেতনাবিশিষ্ট জীবগণের চেতয়িতা, ইহা কি তাঁহার কার্য্য না হইয়া যাইতে পারে? অতি পুরাকালে, যখন সমস্ত জগৎ অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত ছিল,

যখন কেবলমাত্র ভারতীয় আর্য্য ঋষিদিগের হৃদয়ে ব্রহ্মবিদ্যা নূতন প্রস্ফুটিত হইতেছিল,সেই পুরাতন বৈদিক কালে বিশ্বামিত্র ঋষি এই ভাবটী সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন; তিনিই বলিয়াছেন যে "ত্রিলোক প্রসবিতা পরম দেবতার জ্ঞানশক্তি ধ্যান করি, যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন"। এই জড়বাদ "বিষকুম্ভং পয়োমুখং"; আমার ন্যায় অল্পবয়স্ক অনেকেরই দেখিয়াছি যে এই জড়বাদের কু-যুক্তি সকল প্রথম প্রথম অতি সুন্দর বলিয়া প্রতীতি হয়, কিন্তু যখন এই কালফণীর আশ্রয়ে থাকিয়া তাহারা ক্লেশ হইতে ক্লেশে, দারিদ্র্য দুঃখ হইতে দারিদ্র্য দুঃখে নিপতিত হয়, তখন তাহাদিগের চেতনা হয়; তখন তাহারা বুঝিতে পারে যে ধর্ম্মের রাজ্যে না থাকিলে আর নিস্তার নাই। এই জড়বাদের গতিরোধ করা ব্রাহ্মসমাজের আর একটী অতি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। একটী ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার এই ত উপযুক্ত সময়। প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সঙ্গে এক একটী ব্রহ্মবিদ্যালয় থাকাও নিতান্ত আবশ্যক। প্রত্যেক পিতার কর্ত্তব্য যে স্বীয় সন্তানদিগকে সেই বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া তাহাদিগের ধর্ম্মশিক্ষার সুবন্দোবস্ত করেন। এই ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্কে পূর্ব্বে একটী ব্রহ্মবিদ্যালয় ছিল; শুনিয়াছি পূজ্যপাদ মহর্ষি প্রভৃতি কয়েক সাধু ব্যক্তি নিয়মিত রূপে এখানে উপদেশ দিতেন। এই উপদেশ শুনিতে এমন কি অনেকে দূরস্থান হইতেও পদব্রজে আগমন করিতেন, ইহা ভাবিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। এই ব্রহ্মবিদ্যালয়ে কিরূপ উপকার হইয়াছে, তাহা ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। এই বিদ্যালয়ে মহর্ষির প্রদত্ত উপদেশ গুলি * অতি সহজ বোধ্য এবং বালকদিগের পক্ষে ঠিক উপযুক্ত।

ব্রহ্মবিদ্যালয় তো দূরের কথা। এই ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধার কালে, এই জড়বাদের কালেও এরূপ একটী ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া কোন্ সাধু ব্যক্তির হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া না উঠে। আমি ধন্যবাদ প্রদান করিবার উপযুক্ত পাত্র নহি, নচেৎ এই সমাজের বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়কে অন্তরের সহিত শত শত ধন্যবাদ দিতাম—ইঁহারই যত্ন ও চেষ্টায় আজ আমরা সকল ভক্ত জনে মিলিত হইয়া আমাদিগের সমবেত প্রীতি গ্রহণ করিবার জন্য সেই পরমেশ্বরকে আহ্বান করিতে সক্ষম হইয়াছি; তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক আমরা ধন্য হইয়া গৃহে প্রতিগমন করিব।

এইখানে পরলোকগত মহেশচন্দ্র চৌধুরীর কথা স্মরণ হইতেছে। তিনি আপনার জীবনকে যথার্থ ব্রাহ্ম জীবনে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে কর্ম্মে মিথ্যা কথা, মিথ্যা ব্যবহার ছাড়িয়া দুই পা-ও চলা যায় না বলিয়া সাধারণ লোকের বিশ্বাস, সেই কর্ম্মে তিনি আপনার সত্যবাদিতা, আপনার ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে হারাইয়া এই ব্রাহ্মসমাজ একটী প্রধান আশ্রয়স্তম্ভ হারাইয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহার আত্মাকে উন্নত হইতে উন্নততর লোকে লইয়া যাউন।

* এই উপদেশ গুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া আদি ব্রাহ্মসমাজে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত আছে।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের একটী অন্তরায়ের কথা বলিয়াছি তাহা ব্রাহ্মগণের স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা প্রদর্শন। এইবারে আর একটী অন্তরায়ের কথা বলিব—তাহা এই যে, অনেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ বুঝেন না। স্বেচ্ছাচারিতা কখনও স্বাধীনতা নামের যোগ্য হইতে পারে না। স্বাধীনতার অর্থ আপনার অধীনতা, যেটী ভাল সেইটী করিতে সক্ষম হওয়া এবং যেটী মন্দ সেইটী ত্যাগ করিতে সক্ষম হওয়া। কিন্তু ভালমন্দের অবিচারে ব্যবহার করাই স্বাধীনতার অপব্যবহার। প্রকৃত ধর্ম্মবুদ্ধি যে বিষয়ে উপদেশ প্রদান করে, সেই বিষয়ই আমাদের প্রতিপাল্য এবং তাহাতেই আমাদিগের স্বাধীনতা। ব্যক্তিগত মত সময়ে সময়ে ধর্ম্মবুদ্ধির বিরোধীও হইতে পারে। এই ব্যক্তিগত মত ও প্রকৃত ধর্ম্মবুদ্ধি এক ও অভিন্ন ভাবে সময়ে সময়ে চিন্তিত হয় বলিয়া স্বাধীনতার অর্থ বিপরীত হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার অপব্যবহার ঘটে।

আবার আরও দেখিতে হইবে এই যে, কতকগুলি কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে বলিয়া যে সকলগুলিই একই সময়ে করিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। সত্য দুই প্রকার, এক নির্ব্বিশেষ সত্য, আর এক বিশেষ সত্য। মাধ্যাকর্ষণের বলে সকল বস্তুই পড়িয়া যায়, এই একটী নির্ব্বিশেষ সত্য; কিন্তু এটী পড়িতেছে, কি ওটী পড়িতেছে, কি কোন বিরোধী বলের দ্বারা রক্ষিত হওয়াতে এই বস্তুটী পড়িতেছে না—এই সকল হইল বিশেষ বিশেষ সত্য। কর্ত্তব্যও সেইরূপ দুইপ্রকার, এক নির্ব্বিশেষ কর্ত্তব্য, আর এক বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্য। শরীর অসুস্থ হইলে গুরুপাক দ্রব্য আহার নিষেধ, এইটী হইল অসুস্থ শরীরের পক্ষে নির্ব্বিশেষ কর্ত্তব্য; কিন্তু এই জিনিসটী খাওয়া উচিত, কি ওই জিনিসটী খাওয়া উচিত—এইগুলি তাহার বিশেষ কর্ত্তব্য। আমাদিগের ব্রাহ্মসমাজেরও কর্ত্তব্য দুই প্রকার। ঈশ্বরের উপাসনা—ঈশ্বরবোধে অন্য কোন সৃষ্ট বস্তুর আরাধনা না করা—কোন গৃহকর্ম্মে, কোন অনুষ্ঠানে, ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্ট বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ না করা, সত্যকথা বলা প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের নির্ব্বিশেষ কর্ত্তব্য কর্ম্ম, অর্থাৎ এই কর্ম্মগুলি ব্রাহ্মমাত্রেরই সকল অবস্থায়, সকল দেশে এবং সকল কালে করা কর্ত্তব্য। আর সমাজসংস্কার, রাজনীতি সংস্কার, এইরূপ কতকগুলি কর্ম্ম দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এইগুলি সাধন করিবার সময়ে দেশকাল পাত্রাপাত্র বিবেচনা পূর্ব্বক করিতে হইবে।

প্রত্যেক জাতীয় সমাজই কতকগুলি জাতীয় মঙ্গলজনক বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। সেই বন্ধনগুলিকে আমরা যদি রক্তের উষ্ণতা প্রযুক্ত অবিবেচনার সহিত সহসা পরিত্যাগ করিয়া, এদেশের পক্ষে অনুপযোগী হইলেও আপাত রমণীয় বলিয়া বিদেশীয় সমাজ নিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করি, তবে তাহাতে আমাদের কেবল মাত্র যে মূর্খতা প্রকাশ পায় তাহা নহে, প্রত্যুত তাহাতে সমাজের ঘোর অনিষ্ট সাধন করা হয়। এই হিন্দু সমাজের মধ্যে যদি এমন কোন নিয়ম থাকে, যাহা এক্ষণেই পরিত্যাগ না করিলে এই মুহূর্ত্তেই উৎসন্নদশা ঘটিতে পারে, তবে তাহা অবশ্য অবিলম্বেই পরিত্যজ্য। কিন্তু যদি এমন কোন নিয়ম থাকে, যাহা এই মুহূর্ত্তে পরিত্যাগ না করিলে সমাজ একে-

বারে উৎসন্ন যাইবে না, অথচ তাহা পরিত্যাগ করিলে সমাজের মঙ্গল হইতে পারে, তবে সে নিয়মটী ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করাইতে হইবে। ইহাও করিতে হইবে সমাজের অভ্যন্তরে থাকিয়া এবং সমাজের অভ্যন্তরস্থিত বলের দ্বারা। বিদেশীয় সমাজনিয়ম যদি প্রবেশ করাইবার নিতান্ত আবশ্যক হয়, তাহা অতি সাবধানে করিতে হইবে—সহজে একদেশীয় সমাজনিয়ম অপর দেশীয় সমাজে প্রবেশ করান উচিত নহে—তাহাতে কুফল প্রসব করে। আমাকে এত কথা বলিতে হইল, তাহার কারণ এই যে, কতকগুলিন ব্রাহ্ম-বন্ধু ভ্রমক্রমে সমাজসংস্কার প্রভৃতি দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলিকে প্রথম শ্রেণীতে স্থান দিয়া ও তৎসঙ্গে কতকগুলি বিদেশীয় রীতিনীতি সমাজ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া আপনাদিগের উপর সমস্ত হিন্দু-সমাজের বিদ্বেষ আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহারা ইহাকে সুলক্ষণ মনে করিতে পারেন, কিন্তু আমি ইহাকে তত বিশেষ মঙ্গলজনক বলিয়া মনে করি না—বরঞ্চ সময়ে সময়ে আমার অত্যন্ত শঙ্কা আসিয়া উপস্থিত হয় যে, জাতির সার্ব্বভৌমিকতা আনয়ন করিতে গিয়া বৈষ্ণবদিগের ন্যায় "ব্রাহ্ম" নামে আর একটী বিশেষ জাতি সংগঠিত হয়। এরূপ অভিনব জাতি উৎপন্ন হইলে, দূরদর্শী সাধু ব্যক্তিগণ ঐতিহাসিক প্রমাণের দ্বারা দেখিতে পাইবেন যে সমাজ মধ্যে আর এক বিষ-বীজ রোপিত করা হইবে—মঙ্গল কোথায় পলায়ন করিবে—অমঙ্গলের স্রোতই বৃদ্ধি পাইবে।

আদি ব্রাহ্মসমাজ এই সকল ভবিষ্যৎ বিপদের সন্ধান পাইয়া পূর্ব্ব হইতেই সাবধানে চলিতেছেন। এই কারণেই আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে শাস্ত্রসঙ্গত হিন্দু অপৌত্তলিক অনুষ্ঠান পদ্ধতি বাহির হইয়াছে। ইহাতে বিদেশীয় ভাবের কোন সংস্পর্শই নাই। পূজ্যপাদ মহর্ষি, পুরাতন ঋষিদিগের পথ অনুসরণ করিয়াই এই অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রচার করিয়াছেন। আমাদিগের কর্ত্তব্য যে আমরা যে সমাজে বাস করিতেছি, যে সমাজের মঙ্গল-চ্ছায়ায় এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছি, এত ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছি, সেই সমাজের আচার ব্যবহার সকল রক্ষা করিয়া চলি—কেবল পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করিয়া। তবে যাহা নিতান্ত পরিত্যাগের উপযুক্ত হইবে, তাহা যেন ধীরে ধীরে পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করি—যেন সেই একটুখানি মন্দ পরিত্যাগ করিতে গিয়া সমুদয় সমাজের মর্ম্মগ্রন্থি সমূহ ছিন্নভিন্ন করিয়া না ফেলি।

ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নত ভাব সকল আমরা যদি হৃদয়ে গ্রহণ করিতে না পারি, তাহা হইলে এই স্থানেই তাহারা বিরাম লাভ করিবে না। ঈশ্বরের নিত্য মঙ্গল ইচ্ছা যে, জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি হউক। এই জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি নিত্যকাল হইতেছে এবং হইবে। একজন না গ্রহণ করিল, অপর একজনে গ্রহণ করিয়া আরও উন্নতি করিবে। ফরাসি বিপ্লব হইয়া গেল—কারণ ফরাসি জাতি সাম্যভাবের মহামন্ত্র লাভ করিয়াও হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিল না—তাহার অপব্যবহার করিয়া বসিল। কিন্তু সেই বিপ্লবের পর হইতে ইউরোপীয় জগৎ সংপূর্ণ নূতন ভাবে সংগঠিত হইল। একজাতির কাছে সাম্যভাব উপস্থিত হইল, সে জাতি গ্রহণ করিতে পারিল না—অপর দশ জাতি তাহাকে আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিল। সেইরূপ আমরা

যদিও এই পবিত্র ধর্ম্ম হস্তামলকের ন্যায় প্রাপ্ত হইয়াও উদাসীন হইয়া রহিয়াছি, তথাপি ঈশ্বরের নিত্য মঙ্গল ইচ্ছার বিরাম নাই। ব্রহ্মজ্ঞান এখন সমস্ত ভারতবর্ষকে পুনরায় সেই পুরাতন কালের ন্যায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। আমরা যদিও ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান বিষয়ে তত উৎসাহের সহিত যোগ দিতেছি না, কিন্তু মফঃস্বলে অনেকগুলি "সনাতন হিন্দুধর্ম্ম প্রচারিণী" প্রভৃতি নামধারী সভা অনুষ্ঠানগুলি অপৌত্তলিক ভাবে চালাইতে চেষ্টা করিতেছেন। ধন্য হে পরমেশ্বর, তুমিই ধন্য; ইহাতে তোমারই অপার করুণা প্রকাশ পাইতেছে।

হে পরমাত্মন্! তুমি যে কত উপায়ে আমাদিগকে তোমার পথে লইয়া যাইতেছ, আমরা তাহা সকল সময়ে বুঝিতে পারি না। আমরা কত সময়ে জানিয়া শুনিয়াও তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে গমন করি—আমরা মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হই; কিন্তু আবার যেই চেতনা পাইয়া অমৃতের পিপাসু হইয়া আসি, তখনই তুমি রাশি রাশি অমৃতবারি প্রদান করিয়া আমাদিগের দগ্ধ হৃদয়কে শীতল কর। হে বলদাতা! আমাদিগের আত্মায় এ প্রকার বল দাও যে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আমাদিগের প্রতি কর্ম্মে, প্রতি অনুষ্ঠানে তোমাকেই আহ্বান করিতে পারি; সমাজের ভয়েই হউক, কি পরিবারের ভয়েই হউক, কি সমস্ত জগতের ভয়েই হউক, কোন প্রকার ভয়েই যেন তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া, তোমার অবমাননা করিয়া, তোমারি সৃষ্ট বস্তু সকলকে তুমি বলিয়া আরাধনা করিতে না হয়—এ প্রকার সাহস দাও, বল দাও—হৃদয়কে বজ্রের ন্যায় দৃঢ় করিয়া দাও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ঈশ্বরের উপাসনা।

(ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবে আচার্য্যের উপদেশ।)

আমরা আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিলে আপনা-হইতেই এইরূপ উত্তর পাই যে, পরমাত্মার উপাসনাই আমাদের জীবনের পরম পুরুষার্থ।

পরম পুরুষার্থ কাহাকে বলে? যাহাতে মনুষ্যের সমগ্র আত্মা চরিতার্থ হয় তাহাই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ।

কিসে মনুষ্যের সমগ্র আত্মা চরিতার্থ হয়?

সুস্বাদু অন্নপানীয় দ্বারা আমাদের ভোগ লালসা চরিতার্থ হইতে পারে, কিন্তু আমাদের আত্মার সহিত সে সকল বস্তুর কি সম্পর্ক? সম্পর্ক কেবল এইটুকু যে, আমরা নিয়ম-মত অন্নপানীয় সেবন না করিলে আমাদের শরীর রুগ্ন হয়; শরীর রুগ্ন হইলে মন চঞ্চল হয়; মন চঞ্চল হইলে ঈশ্বরেতে উপাসকের মন বসে না এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনেও সাধকের হস্তপদ সরে না। ফল কথা এই যে, ভৃত্যবর্গের সাহচর্য্য ব্যতিরেকে আত্মা একাকী সংসারের কোনো কার্য্যই নির্ব্বাহ করিতে পারে না। ভৃত্য-বর্গ কাহারা? না প্রধান অমাত্য মন এবং সেই প্রধান অমাত্যের অধীনস্থ কর্ম্মচারী দশ ইন্দ্রিয়—সবশুদ্ধ একাদশ জন। এই একাদশ ভৃত্যের জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য অন্ন-পানীয় প্রভৃতি নানাবিধ বহির্ব্বস্তুর আয়োজন-কার্য্য আত্মার পক্ষে অবশ্য-কর্ত্তব্য তাহাতে আর ভুল নাই—কিন্তু ভৃত্যবর্গেরই জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তাহা অবশ্য-কর্ত্তব্য, আত্মার নিজের জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য নহে। আত্মার জীবিকা-নির্ব্বাহের উপ-

করণ স্বতন্ত্র;—পরমাত্মার নিগূঢ় তত্ত্ব সকলই আত্মার অন্ন এবং তাঁহার মৃত-সঞ্জীবনী প্রেম-সুধাই আত্মার পানীয়।

ভোগ-লালসা একরূপ ক্ষুধা, প্রেম-স্পৃহা আর-একরূপ ক্ষুধা; ভোগ-লালসা উদরের ক্ষুধা, প্রেমস্পৃহা হৃদয়ের ক্ষুধা। অন্ন-পানে যেমন উদর পরিতৃপ্ত হয়, স্ত্রী পুত্রাদির মুখ দর্শনে তেমনি চক্ষু পরিতৃপ্ত হয়, তাঁহাদের কথা-শ্রবণে কর্ণ পরিতৃপ্ত হয়, তাঁহাদের মঙ্গল দর্শনে এবং মঙ্গল শ্রবণে মন পরিতৃপ্ত হয়;—এ সমস্তই সত্য—কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—আত্মার সহিত তাহার কি সম্পর্ক? আত্মার সহিত সংসারের প্রথম সম্পর্ক এই যে, গৃহস্থ ব্যক্তি স্ত্রীপুত্র বন্ধুবান্ধবে পরিবেষ্টিত থাকিলে তাঁহার মন ঠাণ্ডা থাকে; মন ঠাণ্ডা থাকিলে ঈশ্বরেতে মনঃ সমাধান তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য হয়; আর, সেই সঙ্গে ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনে তাঁহার প্রবৃত্তি এবং সামর্থ্য জন্মে। আত্মার সহিত সংসারের দ্বিতীয় সম্পর্ক এই যে, গৃহ এবং পার্শ্ববর্ত্তী সমাজ ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনের নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্র;—ন্যায়ার্জ্জিত বিত্ত দ্বারা যথাক্রমে এবং যথা নিয়মে পরিবার প্রতিপালন, বন্ধু বান্ধবের উপকার সাধন এবং জন সমাজের হিতসাধন—ইহারই নাম সংসার-ধর্ম্ম; আর, গৃহ এবং সমাজ এই সংসার-ধর্ম্মের সাধন-ক্ষেত্র। আত্মার সহিত সংসারের তৃতীয় সম্পর্ক এই যে, সংসার-প্রীতি যদিচ বিপথগামী হইলে তাহা ঈশ্বর-প্রীতির ব্যাঘাত জন্মায় কিন্তু সুপথে থাকিলে তাহা ঈশ্বর-প্রীতির তেমনি পোষকতা করে। সংসার দুইরূপ—ঈশ্বরের আবরণ এবং ঈশ্বরের প্রতিকৃতি; পাপ-সংসার ঈশ্বরের আবরণ, পুণ্য-সংসার ঈশ্বরের প্রতিকৃতি। সংসার-প্রীতিও দুইরূপ—ঈশ্বরকে ঢাকিয়া সংসার-প্রীতি এবং ঈশ্বরকে ডাকিয়া সংসার-প্রীতি; প্রথমটি অবৈধ প্রীতি, দ্বিতীয়টি বৈধ প্রীতি। অবৈধ সংসার-প্রীতি ঈশ্বর-প্রীতির যেমন প্রতিকূল, বৈধ সংসার-প্রীতি ঈশ্বর-প্রীতির তেমনি অনুকূল। যাঁহাদের সংসার পুণ্য-সংসার এবং যাঁহাদের প্রীতি বৈধ প্রীতি, তাঁহারাই ঈশ্বরকে উদ্দেশ করিয়া মুক্ত প্রাণে বলিতে পারেন যে, "এক ভানু অনন্ত কিরণে উজলে যেমতি সকল ভুবন, তোমার প্রীতি হইয়ে শতধা বিরচয়ে সতীর প্রেম জননি হৃদয়ে করে বসতি!"

সংসার যত দিন আছে ততদিন তাহা আত্মার ধর্ম্মক্ষেত্র,—কিন্তু কত দিন! মৃত্যু আসিয়া যখন আত্মার পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া দেয়, তখন সংসারই বা আত্মার কে, আর, আত্মাই বা সংসারের কে? আত্মা চিরস্থায়ী—সে চায় চিরস্থায়ী প্রেম; ক্ষণস্থায়ী প্রেমে আত্মার কি হইবে? ক্ষণস্থায়ী সংসার দিয়া চিরস্থায়ী আত্মাকে ভুলাইয়া রাখিতে যাওয়া সমুদ্রে অর্ঘ্যদান মাত্র।

সংসার যেমন ক্ষণস্থায়ী, মনুষ্যের মনোবৃত্তি সকলও তেমনি ক্ষণস্থায়ী। দিনরাত্রি সন্ধ্যা যেমন চক্রবৎ পরিবর্ত্তন করিতেছে, আমাদের মনের বৃত্তি-সকলও সেইরূপ চক্রবৎ পরিবর্ত্তন করিতেছে। বৃত্তি-শব্দের অর্থই হ'চ্চে—বৃত্তের ন্যায় পুনঃপুনঃ আবৃত্তি—ঘুরিয়া ফিরিয়া যাতায়াত। বাহিরে দিন রাত্রি এবং অন্তরে মনোবৃত্তি উভয়েই উভয়ের সঙ্গে লয় তান মিলাইয়া পুনঃপুনঃ আবর্ত্তিত হইতেছে। বহির্জগতে যখন রাত্রি আগমন করে, অন্তর্জগতে তখন নিদ্রা আগমন করে; বহির্জগতে যখন চন্দ্রমা অস্তমিত হইয়া

অরুণ-সারথি আবির্ভূত হয়, অন্তর্জগতে তখন নিদ্রা ভাঙিয়া গিয়া ধ্যান আবির্ভূত হয়; বহির্জগতে যখন প্রভাত অস্তমিত হইয়া মধ্যাহ্ন দিবা আবির্ভূত হয়, অন্তর্জগতে তখন ধ্যান ভাঙিয়া গিয়া কর্ম্ম চেষ্টা আবির্ভূত হয়; এইরূপে নিদ্রা চিন্তা এবং চেষ্টা বৃত্তের ন্যায় একে একে আবর্ত্তিত হয়; আর, বৃত্তের ন্যায় আবর্ত্তিত হয় বলিয়াই উহারা প্রধানতঃ বৃত্তি শব্দের বাচ্য; মনের অন্যান্য বৃত্তি ঐ তিনটি মূল-বৃত্তিরই শাখা পল্লব; যেমন, কল্পনা স্মৃতি যুক্তি চিন্তার শাখা-পল্লব; প্রযত্ন উদ্যম অধ্যবসায় চেষ্টার শাখা-পল্লব; আলস্য অবসাদ বিলাস নিদ্রার শাখা-পল্লব। সংসার কেবল এই সকল ক্ষণস্থায়ী মনোবৃত্তির অন্ন যোগাইতেই পটু; চিরস্থায়ী আত্মার অন্ন যোগানো সংসারের সাধ্যাতীত। যাহাই হউক্, মনোবৃত্তি সকল আত্মার নিকটতম ভৃত্য—তাহাদিগকে বশে আনয়ন করিয়া উপযুক্তরূপে পরিচালনা করিতে না পারিলে, আত্মা যে-কার্য্যের জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছে তাহার কিছুই সে ভাল করিয়া সমাধা করিতে পারে না। পরমাত্মার নিভৃততম সত্য সুন্দর মঙ্গল-রাজ্যই আত্মার চরম গম্য-স্থান; কিন্তু নীচেকার তিনটি সোপান-পংক্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া সেখানে পৌঁছানো অতীব সুদুষ্কর; তিনটি সোপান-পংক্তি কি? না শরীর-পোষণ, সংসার-নির্ব্বাহ এবং মনোবৃত্তি-সকলের যথোপযুক্ত পরিচালনা। ভগবদ্‌গীতা তাই সাধককে এইরূপ উপদেশ দিতেছেন

"যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥

যুক্ত যাঁহার আহার-বিহার, যুক্ত যাঁহার কর্ম্ম-চেষ্টা, যুক্ত যাঁহার নিদ্রাজাগরণ, দুঃখবিনাশক যোগ তাঁহারই কেবল হয়; অর্থাৎ যদি সকল দুঃখের মহৌষধি স্বরূপ যোগে সিদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তবে যুক্তরূপে আহার বিহার করিবে, যুক্তরূপে কর্ম্মচেষ্টা করিবে, যথা সময়ে নিদ্রা যাইবে এবং যথা সময়ে জাগরণ করিবে। শরীর মন এবং সংসার তিনেরই মঙ্গল একটি-মাত্র বিষয়ের উপরে নির্ভর করে; সেটি এই যে, মনোবৃত্তি-সকলকে সুনিয়মে নিয়মিত করা।

সংসারের কীট হইয়া যাঁহারা সংসারে লিপ্ত থাকেন, মনোবৃত্তি সকলকে যথা-নিয়মে নিয়মিত করা তাঁহাদের কার্য্য নহে। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ বিশেষ মনোবৃত্তি যে পরিমাণে চরিতার্থতা লাভ করে, সেই পরিমাণে সেই সেই ব্যক্তির অন্যান্য মনোবৃত্তি অন্নাভাবে শুকাইয়া যাইতে থাকে। বাণিজ্য-ব্যবসায়ের পদে সর্ব্বান্তঃকরণ বিক্রয় করিয়া যাঁহারা স্বর্ণ রজত ভিন্ন আর কোনো কিছুরই আস্বাদ জানেন না এবং ক্রেতা বিক্রেতা ভিন্ন আর কাহাকেও চেনেন না, তাঁহাদের যে কিরূপ শোচনীয় কাষ্ঠ দশা, তাহা সকলেরই জানা আছে। গীতবাদ্যের পদে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিলে লোকে যে অন্যান্য বিষয়ে কিরূপে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, নগর পল্লীতে তাহারও দৃষ্টান্তের অভাব নাই। সংসারের অভ্যন্তরস্থিত সকল বিষয়েরই সম্বন্ধে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, তাহার কোনটিরই সমগ্র অনুশীলনে সমগ্র আত্মা চরিতার্থ হইতে পারে না; চরিতার্থ হইবার মধ্যে কেবল মনের বিশেষ বিশেষ শাখা বৃত্তিই চরিতার্থ হয়। বাণিজ্য ব্যবসায়ের অনুশীলনে ধনাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয়, যুদ্ধ-ব্যবসায়ের অনুশীলনে

যশঃস্পৃহা চরিতার্থ হয়, অপব্যয়ের অনুশীলনে ভোগস্পৃহা চরিতার্থ হয়। এই সকল পৃথক্ পৃথক্ শাখা-বৃত্তির চরিতার্থতা স্বতন্ত্র, আর সমগ্র আত্মার চরিতার্থতা স্বতন্ত্র;—দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সমগ্র আত্মার চরিতার্থতার যদি কোনো পথ থাকে, তবে সে পথ এক কেবল পরমাত্মার উপাসনা—তা ভিন্ন তাহার দ্বিতীয় পথ নাই। পরমাত্মার উপাসনা কি? না তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন।

শ্রদ্ধাতে ফল কি হয়? না ধ্রুব নিষ্ঠা এবং অপরাজিত শান্তি; এক রকমের ক্রীড়া পুত্তলিকা আছে—তাহাকে যেমন করিয়াই আছড়াইয়া ফেল না—কিছুতেই তাহা ধরাশায়ী হইবে না; ভূতল স্পর্শ করিবা মাত্রই তাহা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে; সেইরূপ, ঈশ্বরেতে যাঁহার শ্রদ্ধা অটল তিনি সহস্র আঘাত খাইলেও তাঁহার মাথা হেঁট হয় না; সংসার-তরঙ্গের অধীর তাড়নায় তাঁহার মনোনৌকা সহস্র এপাশ ওপাশ করিলেও তাহা জল-মগ্ন হয় না—কিয়ৎ পরেই তাহা স্থির-ভাবে সোজা হইয়া দাঁড়ায়।

ভক্তিতে ফল কি হয়? না আত্মার পরম আরোগ্য—পাপ তাপ হইতে নিষ্কৃতি। হৃদয়কে যদি সর্ব্বদা সরস পবিত্র এবং নিষ্কলঙ্ক রাখিতে চাও, তবে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে ঈশ্বরেতে আত্মসমর্পণ কর, তাঁহার অমোঘ প্রসাদ-বারিতে তোমার সমস্ত পাপতাপ ধৌত হইয়া যাইবে—হৃদয় সরস নবীন এবং শিশুর ন্যায় অকৃত্রিম হইবে।

প্রীতিতে কি ফল হয়? জীবাত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে আবরণ-শূন্যতা। ঈশ্বর-প্রীতি একরূপ অলৌকিক অগ্নি, তাহা পরমাত্মার সহিত আত্মাকে গলাইয়া তন্ময়ীভূত করিয়া দেয়। সে অগ্নির কণামাত্র পাইলে জীবের কিছুই আর প্রাপ্তব্য অবশিষ্ট থাকে না। সংসারের সহিত আত্মার যত কিছু সম্বন্ধ—সমস্তই ক্ষণস্থায়ী মনোবৃত্তি-সকলের মধ্যদিয়া; এ কেবল পরোক্ষ সম্বন্ধ; আত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কেবল পরমাত্মারই সঙ্গে। পরমাত্মা সমগ্র আত্মাকে পূর্ণ করিয়া আত্মাতে স্বপ্রকাশ এই সত্যটি যখন আমরা আত্মাতে উপলব্ধি করি, তখন এটাও সেই সঙ্গে উপলব্ধি করি যে আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যস্থলে কোনো প্রকার শাখা-মনোবৃত্তির ব্যবধান স্থান পাইতে পারে না। জ্ঞানের এই সত্যটিকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষরূপে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া সমগ্র আত্মার সহিত পরমাত্মার সহবাস উপভোগ করাই ঈশ্বর-প্রীতির পরম রমণীয় দেবস্পৃহনীয় ফল।

সাধকের অন্তঃকরণে যদি কোনো প্রকার বাধা বিঘ্ন না থাকে, তবে ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি হইতেই ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য-সাধন অনর্গল উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে; নচেৎ ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য-সাধন সাধকের সবিশেষ প্রযত্ন-সাপেক্ষ। বাধা বিঘ্ন কি? না অন্তঃকরণের পশু-বৃত্তি—কাম ক্রোধ দ্বেষ হিংসা লোভ মোহ। সাধক কঠোর প্রযত্ন-সহকারে ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনে রত থাকিলে, ঐ সকল বাধা বিঘ্ন মন হইতে আপনিই সরিয়া পড়িতে থাকে;—এইরূপ করিয়া মন যখন স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় নির্ম্মল হয়—তখন পরমাত্মার স্বপ্রকাশ জ্যোতি সূর্য্য-কিরণের ন্যায় তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয়।

ঈশ্বরোপাসনার প্রথম ফল সমগ্র আত্মার চরিতার্থতা-জনিত অনুপম আনন্দ।

দ্বিতীয় ফল কর্ত্তব্য সাধনে উৎসাহ এবং সামর্থ্য ; আর, কর্ত্তব্য সাধন করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ। তৃতীয় ফল পরম করুণাময় পরমেশ্বরের প্রদত্ত বৈধ সুখ এবং পরি-শোধক দুঃখ উপভোগ করিয়া সন্তোস-লাভ। চতুর্থ ফল ভ্রাতায় ভ্রাতায় মিলিয়া আধ্যাত্মিক প্রেমের আনন্দ উপভোগ ; এই চতুর্থ ফলটি ঈশ্বরের একটি জাজ্বল্যমান করুণার চিহ্ন ; সময় উপস্থিত হইলে—এক এক ভক্তিরসার্দ্র এবং প্রেমাগ্নিময় উন্নত আত্মা পার্শ্ববর্ত্তী অনেকানেক আত্মাতে ভক্তি-রসামৃত সঞ্চার করেন এবং প্রেমাগ্নি ধরা-ইয়া দেন ; আর, তাহার গুণে ক্রমে যখন একই পরমাত্মার জ্যোতিতে অনেক আত্মা জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠে এবং একই পর-মাত্মার প্রসাদামৃত-সিঞ্চনে অনেক আত্মা প্রাণ পাইয়া উঠে, তখন বহু সংখ্যক আ-ত্মার পরস্পর ভ্রাতৃবন্ধন দৃঢ় হইয়া পৃথি-বীকে স্বর্গ করিয়া তুলে। এইরূপ আমরা দেখিতেছি যে, ঈশ্বরকে আমরা হৃদয়ে পাইলে আমাদের কোনো আনন্দেরই অনটন থাকে না; আমাদের অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই আনন্দের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের অন্ত-শ্চক্ষে সত্যের আদর্শ হইয়া বিরাজ করি-তেছ—প্রেমের জ্বলন্ত উৎস হইয়া আমা-দের হৃদয়ে আসিয়া বসতি কর ; সেখানে তোমার অধিষ্ঠান হইলে চিরজীবন তোমাকে আমরা পূজা করিয়া জীবন সার্থক করিব, তোমার আশ্রয়ে নির্ভর করিয়া ভয়াবহ সংসার-সাগর অকুতোভয়ে তরিয়া যাইব—তোমার প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া তোমার অমৃতধামে যাত্রা করিব—তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাদের এই অন্তরতম বাসনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

স্ত্রীস্বাধীনতা ও মনু।

ব্যবহার গ্রন্থের মধ্যে মনুসংহিতাই প্রাচীন। ইদানীং খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বাপর ধরিয়া এতদ্দেশীয় যে সমস্ত গ্রন্থের জন্ম-কোষ্ঠি প্রস্তুত করা হইতেছে তৎপ্রমাণে বলিতেছি না কিন্তু এই সংহিতার ললাট-পট্টে যে সমস্ত উজ্জ্বল রেখাপাত রহিয়াছে তদ্দৃষ্টেই অনুমান হয় ইহা বহু প্রাচীন। যাঁহারা একটু নিবিষ্ট চিত্তে এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা দে-খিতে পাইবেন যে, যখনএই ভারতে পূর্ব্ব কল্পের কুৎসিত রীতি পদ্ধতি সকল জন-সমাজে এক প্রকার নির্ব্বিবাদে চলিতেছে এবং ধর্ম্মানুমোদিত সদাচার ও সদ্ব্যবহার সকল অল্পে অল্পে প্রসর লাভ করিবার উপক্রম করিতেছে সেই সন্ধিক্ষণেই মনুর জন্ম। ফলত এই গ্রন্থে এমন অনেক কুপ্রথার উল্লেখ আছে যাহা শুনিবামাত্র মনে ঘৃণার উদ্রেক হইয়া থাকে। যদিও মনু ব্যবহার কাণ্ডে তাহার কোনটী গ্রহণ ও কোনটী এককালে বর্জ্জন করিয়াছেন কিন্তু যে সকল জঘন্য প্রথার আশু পরি-বর্ত্তন অসম্ভব, কালে উন্মূলিত হইবার জন্য তিনি অতি তীব্র ভাষায় সেই গুলির উপর ঘৃণার বীজ নিক্ষেপ করিয়াছেন। ফলত সমাজসৃষ্টি মনুর বহুপূর্ব্বে হইলেও তিনি যে ইহার আভ্যন্তরিক আবর্জনা সকল দূর করিয়া ইহাতে নূতন আকার ও নূতন প্রাণ সঞ্চার করেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহা দ্বারাই প্রমাণ হয় মনু কত প্রাচীন। পুরাতত্ত্ববিদেরা বলেন যখন পৃথিবীর অ-ন্যান্য জাতি প্রকৃতির শৈশব দোলায় প্রসুপ্ত তখন ভারত ধর্ম্ম সদাচার ও সভ্য-তায় সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়াছেন। ফলত এই জাগরণের মূল মনুর তুমুল ভেরী-

নিনাদ। কারণ তিনিই সর্ব্বপ্রথমে পূর্ব্ব-প্রচলিত সকল প্রকার কুরীতির বিরুদ্ধে উত্থিত হন এবং ধর্ম্মনিকষে পরীক্ষিত সামাজিক সুব্যবস্থা সকল স্থাপন করেন। ইহতেই বুঝ মনু কত প্রাচীন।

এই মাত্র বলিলাম যে সমস্ত সামাজিক কুপ্রথা পূর্ব্বকল্প হইতে চলিয়া আসিতেছিল তন্মধ্যে যাহা সহজসাধ্য মনু তাহার এককালে উচ্ছেদ এবং যাহার উন্মূলন কালসাপেক্ষ তাহা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। এই কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য মনুস্মৃতিতে অনেক বিষয় থাকিলেও আমরা নিদর্শনস্থলে নিয়োগ * ও স্ত্রীস্বাধীনতাকে গ্রহণ করিলাম। এখন দেখা যাক্ এই দুইটী কোন্ সময় হইতে প্রচলিত এবং ইহার মধ্যে কোনটীর বর্জ্জন ও কোনটীর গ্রহণে মনুর অভিপ্রায় কি।

তিনি বলেন যখন রাজা বেণ সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর সেই সময় হইতেই এই সমস্ত দূষিত প্রথা প্রশ্রয় পাইয়াছিল। ঐ কামোপহত অধাম্মিক এই সমস্ত বর্ণসঙ্করকর কার্য্যের প্রবর্ত্তক। এখন মনু যে বেণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ইনি কে ও কোন্ সময়ে ইহাঁর উৎপত্তি তাহা স্থির হইলে সহজেই প্রমাণ হইবে নিয়োগ ও স্ত্রীস্বাধীনতার মূল ভারতের কত গভীরে প্রোথিত ছিল। পৌরাণিক প্রমাণে দেখা যায় এই বেণের পুত্র মহারাজ পৃথু। পৃথিবী নাম এই পৃথু হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ইনি দেশভেদে ভাষা স্থাপন ও কৃষিকার্য্যের সূত্রপাত করিয়া যান। ইহাতেই প্রমাণ হয় ইহাঁর পিতা বেণের কাল ভারতের মৃগয়া বা পাশুপাল্যের কাল। মনুষ্য কার্য্যকরী বুদ্ধির সম্যক্ বিকাশ না হওয়ায় মৃগয়া ও পশুপালন দ্বারা দিনপাত করিত। ফলত তাহা অসভ্যাবস্থা। তখন সমাজ নামমাত্র, প্রেম স্বাধীন এবং পুত্র জননীর। মনু বলেন নিয়োগ ও স্ত্রীস্বাধীনতা প্রভৃতি যাবদীয় বর্ণসঙ্করকর কুৎসিত প্রথা এই বেণের কাল হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সুতরাং এই গুলি ভারতের অসভ্য ও বর্ব্বরদিগের প্রথা। তজ্জন্যই মনু বিদ্বেষ দৃষ্টিতে ইহাকে পশুধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। *

মনু শিষ্টাচারবিরুদ্ধ হইলেও প্রজাবৃদ্ধির অনুরোধে যদিও নিয়োগটী নিষেধ করেন নাই কিন্তু অনেক যুক্তি তর্ক দ্বারা স্ত্রীস্বাধীনতার বিশেষ অপকারিতা দেখাইয়া এককালে ইহা রহিত করিয়া যান। † তিনি বলেন এই কুৎসিত প্রথা যত অনর্থের মূল। এককালে ইহার উন্মূলন না হইলে জনসমাজ ছারখার হইয়া যাইবে। তাই তিনি বজ্রনাদে বলিয়া উঠিলেন 'ন স্ত্রীস্বাতন্ত্র্যমর্হতি' স্ত্রীলোক স্বাধীনতা পাইবে না। কন্যাকালে পিতা ইহাকে রক্ষা করিবে, যৌবনে ভর্ত্তা ইহাকে রক্ষা করিবে, বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র ইহাকে রক্ষা করিবে। যে পুত্র ভর্ত্তার অবিদ্যমানে মাতার রক্ষক না হয় সে নিন্দনীয়। মনু অরক্ষিতা পুত্রের প্রতি এই শাসন বাক্যে এই বুঝাইলেন যে বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্য সকল অবস্থাতেই স্ত্রীকে কখন স্বাধীন

* স্বক্ষেত্রে পরকীয় বীজে উৎপাদন।

* অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্ম্মো বিগর্হিতঃ।
মনুষ্যাণামপি প্রোক্তো বেণে রাজ্যং প্রশাসতি।
স মহীমখিলাং ভুঞ্জন্ রাজর্ষিপ্রবরঃ পুরা।
বর্ণানাং সঙ্করং চক্রে কামোপহতচেতনঃ।

† বৃহস্পতি কহিয়াছেন উক্তো নিয়োগো মনুনা নিষিদ্ধঃ স্বয়মেবতু। মনু নিয়োগ বলিয়াছেন আবার স্বয়ং নিষেধও করিয়াছেন। ফলত নিয়োগের বিধি দিয়া তৎসম্বন্ধে এত কঠোর নিয়ম করিয়াছেন তাহা আলোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয় উহা সম্পূর্ণ নিষেধ। টীকাকার গোবিন্দরাজ মনুর গূঢ় অভিপ্রায় বুঝিয়াই বলিয়াছেন নিয়োগাদনিয়োগপক্ষঃ শ্রেয়ান্, অনিয়োগই উৎকৃষ্ট। কিন্তু কুল্লুক ভট্টের তাহা সহ্য হয় নাই। তিনি অনিয়োগ যুগ বিশেষ ব্যবস্থা বলিয়া উক্ত টীকাকারের মত অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

করিবে না। মনুর ন্যায় সমাজতত্ত্বদর্শী বোধ হয় অদ্যাপি কেহ জন্মে নাই। তিনি সমাজের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছিলেন লোকের ঐহিক ও পারত্রিক যা কিছু মঙ্গল স্ত্রীলোকই তাহার মূল। গৃহীর এই বিরাট সমৃদ্ধি যাহার অধীন তাহাকে সম্যক্ সংযত করা চাই। তাই তিনি কহিলেন অতি সামান্য প্রসঙ্গ হইতেও স্ত্রীকে বিশেষরূপে রক্ষা করিবে। স্ত্রী অরক্ষিতা হইলে পিতৃ ও ভর্তৃ উভয়কুলেরই শোকের কারণ হয়। অতএব ভর্তৃগণ যতই দুর্ব্বল হউক না স্ত্রীরক্ষা একটী পরম ধর্ম্ম জানিয়া তদ্বিষয়ে একান্ত যত্ন করিবে। এখন বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত সামান্য প্রসঙ্গ অর্থে কি উদ্দিষ্ট তাহা বুঝিতে কাহারও বাকি নাই। পরেই তিনি আরও স্পষ্ট কথায় কহিতেছেন, যিনি যত্ন পূর্ব্বক ভার্য্যাকে রক্ষা করেন তিনি স্বীয় সন্ততি, শিষ্টাচার, অন্বয়, স্বধর্ম্ম ও আপনাকে রক্ষা করেন। মনু স্ত্রীকে স্বাধীন করিতে কেন নিষেধ করিলেন এই স্থানে তাহার বিশেষ কারণ দর্শাইতেছেন। তাঁহার ঐ কথা গুলি বোধসুলভ হইবার জন্য একটু ব্যাখ্যা আবশ্যক। প্রথমত, অসঙ্কর বিশুদ্ধ সন্তান জন্মিলে আপনার সন্ততি রক্ষা হয়। মনু যে বর্ণ ও বর্ণধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার মূল উদ্দেশ্য সামাজিক উন্নতি। এই সন্ততিরক্ষার নিয়মে পুরুষপরম্পরাগত সৎ গুণ সকল রক্ষিত হইয়া সেই মহান উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়। অতএব যিনি বংশের ও সমাজের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন তিনি এই সর্ব্বোচ্ছেদকর ভীষণ সাঙ্কর্য্য হইতে সাবধান হইবেন। আমাদের এই বিশাল জাতিরূপ মহাবৃক্ষের মূল অতীতের যে কত গভীর গর্ভে প্রসারিত, পৃথিবীতে এই আদিম জাতির উচ্ছেদ না হইয়া আজিও যে প্রবাহ চলিতেছে তাহার নিদান এই অন্বয় বা পিতৃপিতামহের বংশরক্ষা। দূরদর্শী মনু স্ত্রীস্বাধীনতা লোপ করিয়া সেই অন্বয় রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, পুত্রের নিকট পিতার ঔর্দ্ধদেহিক যদি কিছু প্রাপ্য থাকে তাহা বিশুদ্ধ সন্তানেই সম্ভবে; এই জন্য কহিয়াছেন যিনি আপনাকে রক্ষা করিতে চান তিনি স্ত্রীকে রক্ষা করিবেন। তৃতীয়ত, দোষস্পৃষ্টা স্ত্রীসত্ত্বে ভর্ত্তার আধানাদি ধর্ম্মে আদৌ অধিকার থাকে না। সুতরাং স্ত্রীকে রক্ষা করিলে স্বধর্ম্মই রক্ষিত হয়। আর স্ত্রীরক্ষা যার পর নাই সভ্যতা এই জন্য তদ্দ্বারা শিষ্টাচারই রক্ষা পায়। এখন বুঝা গেল স্ত্রীর স্বাধীনতা থাকিলে ধর্ম্মলোপে পরকাল এবং বংশলোপে ইহকাল উভয়েরই ক্ষতি। তাই ধর্ম্মপ্রাণ মনু আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি বজ্রনাদে বলিয়া উঠিলেন 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি'।

পরে তিনি নিজের যুক্তি আরও বিশদ করিবার নিমিত্ত বিজ্ঞানের আশ্রয় লইয়াছেন। লোকের মনে এমনও আশঙ্কা হইতে পারে যে, উৎপত্তিকল্পে ক্ষেত্রই প্রধান, বীজ অপ্রধান, তবে সন্ততিলোপ কেন হইবে। এই ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য কহিলেন, পতি শুক্ররূপে ভার্য্যাতে প্রবেশ পূর্ব্বক গর্ভভূত হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। জায়ার এইই জায়াত্ব যেহেতু পতি পুনরায় তাহাতে জন্মগ্রহণ করেন। স্ত্রী যেরূপ পুরুষকে ভজনা করে তাহার পুত্র ঠিক তদনুরূপ হয়। * অতএব প্রজাবিশুদ্ধির নিমিত্ত যত্ন সহকারে স্ত্রীকে রক্ষা করিবে।

* বীজ বিচারস্থলে কথিত হইয়াছে উৎপত্তি রূপবর্ণ প্রভৃতি বীজগত চিহ্নেরই সহিত হইয়া থাকে। মনে কর, গ্রীষ্ম বর্ষাদি কালে ফালকৃষ্ট ক্ষেত্রে যে জা-

মনু এইরূপ স্ত্রীরক্ষার উপকারিতা দেখাইয়া পরে কহিয়াছেন, কেহ বলপূর্ব্বক স্ত্রীকে রক্ষা করিতে পারে না। অতএব বক্ষ্যমাণ এই সমস্ত উপায়ে উহাদিগকে রক্ষা করা আবশ্যক। ভর্ত্তা অর্থসংগ্রহ ও অর্থের ব্যয়েও উহাদিগকে নিয়োগ করিবে। দ্রব্য সামগ্রীর শুদ্ধি, স্বদেহ শুদ্ধি, গৃহদেবতার সেবাকার্য্য, অন্নপাক, এবং শয্যা আসন ও কুণ্ড কটাহাদি গৃহোপকরণ সমূহের পর্য্যবেক্ষণে ব্যাপৃত রাখিবে। আপ্তকারী পুরুষ কর্ত্তৃক গৃহে অবরুদ্ধ হইলেও স্ত্রী অরক্ষিতা কিন্তু যে আপনাকে আপনি রক্ষা করে বস্তুত সেইই সুরক্ষিতা।

কার্য্যাসক্তি অবশ্যই কুপ্রসক্তি নিবারণের একটী উপায়। মনের ধর্ম্মই এই যে, সে একটা কিছু অবলম্বন না করিয়া থাকিতে পারে না। দৈহিক শ্রমের অবসাদ যেমন একটি ফল তেমনি মনঃপ্রসাদও তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল। যেখানে এই শ্রমটীর অভাব তথায় আশুতৃপ্তিকরী কুপ্রবৃত্তি সকল সহজে প্রসর পায়। এই জন্য মনু স্ত্রীলোককে সাংসারিক সকল কার্য্যে স্পষ্ট কথায় সকল বিষয়ের কর্ত্তৃত্বে নিয়োগ করিয়াছেন। স্ত্রীলোক মাত্রেরই স্বভাব যে, সে সংসারের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা হইয়া থাকে। সে চায় যে, প্রভু হইতে ভৃত্য পর্য্যন্ত তাহার পদানত ও মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। মনুর এই বিধান তাহার এই সঙ্কীর্ণ স্বভাবের সম্পূর্ণই অনুকূল। কিন্তু মনুর মন ইহাতেও তৃপ্ত হইল না। তিনি দেখিলেন ধর্ম্মবলে সংযত না হইলে সকল বিধানই নিষ্ফল। তাই বলিলেন, যে আপনাকে আপনি রক্ষা করে বস্তুত সেইই সুরক্ষিতা। স্ত্রীলোককে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বুঝাইয়া দেও, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের ফল দেখাইয়া দেও তুচ্ছ প্রলোভনে তাহার হৃদয় আর টলিবে না এবং সহস্র অবরোধ যাহা না করিতে পারে সে স্বয়ং সহজে তাহা করিবে। ফলত ধর্ম্মপ্রাণ মনুর মনের কথা এই যে,ধর্ম্ম দ্বারা সংযমই স্ত্রীলোকের মুখ্য সংযম। সেই জন্য উপায় নিরূপণের উপসংহারে তাহারই উপদেশ করিয়াছেন। *

পরে তিনি যে সমস্ত কারণে স্ত্রীলোক দুঃশীল হয় সেইগুলি এক একটি করিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। মদ্যপান, দুর্জনসঙ্গ, পতিবিরহ, যথেচ্ছ ভ্রমণ, অসময়ে নিদ্রা ও পরগৃহবাস এই ছয়টী স্ত্রীলোকের দুঃশীলতার কারণ। অতএব সাবধান এই সকল দোষ যেন ইহাদিগকে স্পর্শ না করে। পুংলালসা, চলচিত্ততা ও নৈসর্গিক অস্নেহ এই কএকটী কারণে ইহারা সযত্নে রক্ষিত হইলেও ভর্ত্তাকে অতিক্রম করে। শয়ন, উপবেশন, বেশবিন্যাস, কাম, ক্রোধ, কুটিলতা, পরহিংসা ও কুকার্য্য এই

তীয় বীজ উপ্ত হয় অঙ্কুর সর্ব্বাংশে সেই বীজেরই অনুরূপ হইয়া থাকে। এইরূপ অন্বয়-মুখে বীজের প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়া আবার ব্যতিরেক-মুখে তাহাই দেখাইতেছেন। এই ভূমি তরু গুল্ম লতাদির যোনি কিন্তু বীজ মৃৎরূপ প্রভৃতি কোনও যোনিগত ধর্ম্মকে স্ববিকার অঙ্কুর কাণ্ডাদি অবস্থাতে ভজনা করে না। বপন করিলাম আম্র-বীজ জন্মিল জম্বীর বৃক্ষ এরূপ হইতেই পারে না। সুতরাং বীজেরই প্রাধান্য।

* এই স্থলে প্রসঙ্গ-সঙ্গতি না থাকিলেও একটা কথা বলিয়া রাখি, যে গৃহে বিধবা আছে তাহার পুন বিবাহের ব্যবস্থা না করিয়া মনু যে সমস্ত উপায়ে স্ত্রীরক্ষা করিতে বলিয়াছেন তাহা অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়। এই সমস্ত উপায়ের মধ্যে আমরাও আর দুই একটী সংযোগ করিতে চাই। বিধবাকে যেমন গৃহের আয় ব্যয় প্রভৃতি সকল বিষয়ের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী করিয়া রাখিবে সেইরূপ বালক বালিকাদিগের প্রতিপালনের ভার,পূজনীয় ধার্ম্মিক অতিথির সৎকারভার এবং দ্বারস্থ কাণখঞ্জ প্রভৃতি ভিক্ষুকদিগের ভিক্ষাভার তাহারই হস্তে অর্পণ করিবে। ইহা দ্বারা স্নেহ দয়া প্রভৃতি কোমল মনোবৃত্তিগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া তাহাদিগকে সংসারমায়ায় আবদ্ধ ও সৎপথে অটল রাখিতে পারিবে।

সমস্ত লইয়াই সর্ব্বদা ইহারা কালক্ষেপ করে। অতএব পুরুষ ইহাদিগের বিধাতৃবিহিত এইরূপ স্বভাব জানিয়া ইহাদের রক্ষায় একান্ত যত্নবান হইবে।

মহাজ্ঞানী মনু এই যে স্ত্রীচরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন ইদানীন্তনেরা ইহা শুনিবামাত্র নিঃসন্দেহ শিহরিয়া উঠিবেন। কিন্তু মনুর কথা! একটু ধীরতার সহিত আলোচনা করা আবশ্যক। তিনি স্ত্রীচরিত্র এইরূপ উল্লেখ করিয়া ইহার নিদান কি স্থির করিয়াছেন অগ্রে তাহা দেখ। তৎপরে বুঝিও তাঁহার বাক্যের কোনও অর্থ আছে কি না। তিনি কহিতেছেন, স্ত্রীলোকের কোন সংস্কার নাই,ধর্ম্মপ্রমাণ শ্রুতিস্মৃতিতে অধিকার নাই, পাপাপনোদক মন্ত্রজপ নাই, ফলত ইহারা নিতান্তই মিথ্যা পদার্থ। মনু যে কলুষিত স্ত্রীচরিত্রের এই নিদান স্থির করিয়াছেন এস্থলে তাহার একটু বিশ্লেষণ আবশ্যক। সংস্কারের কার্য্য এই যে নিষিদ্ধবর্জ্জন ও বিহিতসেবনে দেহমনের একটা অবস্থান্তর আনয়ন। ভাব, আমার ধর্ম্মদীক্ষা হইল। এই দীক্ষার দিন হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম নিষিদ্ধ পানাহারে আর আপনার অধোগতি সাধন করিব না এবং আত্মোন্নতির নিমিত্ত দিনরাত্রিবিভাগে এই কএকবার ভগবানের আরাধনা করিব। এই নিয়মে চলিয়া কিছু দিনের মধ্যে আমার নিশ্চয়ই সর্ব্বাঙ্গীণ একটা পরিবর্ত্তন হইবে। সে পরিবর্ত্তনে দুষ্প্রবৃত্তি বা পাপস্পৃহা থাকে না। স্ত্রীলোকের এই ভাবান্তরসম্পাদক সংস্কারেরই অভাব। সংস্কারের অভাবে অন্তঃকরণ নির্ম্মল ও পবিত্র হয় না। কাজেই তাহাদের পাপপ্রবৃত্তি স্বভাবতই বলবতী হইয়া থাকে। দ্বিতীয়ত, স্ত্রীলোকের ধর্ম্মপ্রমাণ শ্রুতিস্মৃতিতে আদৌ অধিকার নাই। ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ ও উপদেশবলেই লোকের স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। সে সেই আলোকে কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য বুঝিয়া লইতে পারে এবং আত্মসংযমে যত্নবান্ হয় কিন্তু স্ত্রীজাতির সে সুবিধা নাই। * তৃতীয়ত, পাপাচরণ পূর্ব্বক তীব্র বিষজ্বালায় প্রাণ কাতর হইলে যে সমস্ত মন্ত্রে ঈশ্বরের প্রসন্নতা প্রার্থনা করা যায় স্ত্রীলোকের সেই পাপাপনোদক মন্ত্রই নাই। এরূপ বিপাকের অবস্থায় তাহাদের মন যে কাম ক্রোধ ঈর্ষা দ্বেষের বিলাসক্ষেত্র হইয়া থাকিবে তাহা সম্পূর্ণই সম্ভব। পাঠক! এখন বুঝিলে মনুর বর্ণিত স্ত্রীচরিত্রের নিদান কি?

* যে শিক্ষায় ধর্ম্মজ্ঞান ও চরিত্রগঠন হয় পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের সে শিক্ষা ছিল। ঋকমন্ত্রে বিশ্ববারা অপালা প্রভৃতি এমন কতকগুলি স্ত্রীলোকের নাম দৃষ্ট হয় যাঁহারা ব্রহ্মচারিণী হইয়া ধর্ম্মশিক্ষা ও জ্ঞানশিক্ষায় উন্নত ও লোকসমাজে পূজিত হইয়া ছিলেন। মনুই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন পুরাকল্পে স্ত্রীলোকের উপনয়ন হইত। ফলত অতি পূর্ব্বকালে স্ত্রীলোক উপনীত হইয়া যে জ্ঞান ধর্ম্ম শিক্ষা করিত বেদাদি প্রাচীন শাস্ত্রে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু উত্তর কালে তাহা রহিত হইয়াছিল। কেন যে রহিত হয় তাহারও বিশিষ্ট কারণ আছে। দেখিতে পাওয়া যায় স্ত্রীলোক মাত্রেই প্রায় বিলাসপ্রিয়। এইটী যেন ইহাদিগের বিধাতৃবিহিত স্বভাব। এখনকার শিক্ষা যেমন কণ্ঠস্থ না হয় বুদ্ধিস্থ করিলেই আপদ চুকিয়া যায় তখন কিন্তু ঠিক্ ইহার বিপরীত ছিল। শিক্ষাকে সর্ব্বতোভাবে চরিত্রস্থ করিতে হইত। বেদাধ্যয়নের সঙ্গে ব্রত অবলম্বন করিবার অর্থ আর কিছুই নহে কেবল শিক্ষাকে চরিত্রস্থ করা। অবশ্য ইহা কিছু কঠিন ব্যাপার। ইহাতে পদে পদে মনকে সংযত করা চাই। বোধ হয় স্ত্রীজাতির মধ্যে দুই একটি ব্যতীত কেহই তাহা পারিয়া উঠিত না। বিষয়ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির উদ্দাম গতিকে কেহই নিরোধ করিতে পারিত না। শিক্ষাস্রোত বন্ধ হইবার যেমন এই একটি কারণ তেমনি আরও কএকটি আছে। তখনকার শিক্ষা অপেক্ষাকৃত ব্যাপক কাল ধরিয়া চলিত। নচেৎ শিক্ষা ও ব্রত সম্পূর্ণ হইত না। স্ত্রীলোক এই ব্যাপক কাল যদি শিক্ষাই করে তবে সে শ্রীরূপে গার্হাস্থ্যে কবে বিরাজ করিবে। কারণ এদিকে তাহার দ্বাদশেই যৌবনের প্রারম্ভ এবং অধিক বয়সে সন্তান প্রসবও অতি কষ্টকর। বোধ হয় পূর্ব্বে এই সমস্ত হেতুতে স্ত্রীলোকের উচ্চ শিক্ষা সম্পূর্ণ রুদ্ধ হইয়া যায়।

কিন্তু স্ত্রীচরিত্র এইরূপ তীব্র ভাষায় সমালোচনা করিয়া নিশ্চয়ই মনুর মনে আশঙ্কা হইয়াছিল, বুঝি আমার এ কথা জনসমাজে তত আদৃত হইবে না। তাই তিনি ভয়ে ভয়ে আপনাকে সমর্থন করিবার জন্য সর্ব্বাদৃত বেদের আশ্রয় লইয়া কহিতেছেন, স্ত্রীর ঈদৃক স্বভাবের পরিচায়ক অনেকানেক শ্রুতি পঠিত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে একটী উদ্ধৃত করিতেছি, শুন। কোনও পুত্র মাতার মানস ব্যভিচার অবগত হইয়া কহিতেছে আমার মাতা পাতিব্রত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরগৃহ প্রবেশ করিয়া যে পর পুরুষের প্রতি স্পৃহাবতী হইয়াছিলেন পিতা এই সঙ্কল্প-দোষদুষ্ট মাতৃরজ শোধন করুন। এই বেদমন্ত্রই স্ত্রীলোকের দুঃশীলতার নিদর্শন। যে স্ত্রী মনে মনেও ভর্ত্তার অপ্রিয় চিন্তা করে পুত্রের পক্ষে মাতার সেই মানস ব্যভিচারের ইহাই শোধন মন্ত্র*। যাক্‌, মনু তো শ্রুতিপ্রমাণে নিষ্কৃতি পাইলেন কিন্তু সমস্যাটি কিছু গুরুতর হইয়া উঠিল। বাস্তবিকই কি মনুর মতে স্ত্রীচরিত্র ঐরূপ জঘন্য। যিনি কহিয়াছেন স্ত্রীতে ও শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাই, যথায় স্ত্রী পূজিত হন দেবতারাই তথায় পূজিত হইয়া থাকেন; তিনিই আবার বলিতেছেন এই জাতিটা মিথ্যা পদার্থ ও নরকের কীট। এখন একটু ভাল করিয়া দেখিলেই এইরূপ বৈষম্যের অর্থ পাওয়া যাইবে।

মনুর অভিপ্রায় স্ত্রীস্বাধীনতারূপ চিরাচরিত কুপ্রথার বিলোপ সাধন। তিনি বেশ বুঝিয়া ছিলেন জনসমাজে সুনীতি সদাচার ও ধর্ম্মব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে স্ত্রীরক্ষা ও তন্নিবন্ধন প্রজাশুদ্ধি আবশ্যক। কিন্তু স্ত্রীজাতি স্বাধীন থাকিলে ইহা আদৌ সম্ভবিতেই পারে না। কারণ ইহাতে পদে পদেই সর্ব্বসংহারক সাঙ্কর্য্যের আশঙ্কা আছে। এই আশঙ্কা যে অমূলক নয় তিনি স্ত্রীচরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া অতিদুঃখের সহিত তাহাই দেখাইলেন। পরে সুশিক্ষা ও ধর্ম্মজ্ঞানের অভাবে চরিত্রগত উচ্ছৃখলতা যে একান্তই দুর্নিবার লোকের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া তাহা বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। ইহাতেও যদি না বুঝিয়া থাক তবে বেদপ্রমাণে বুঝ, এই বলিয়া কষ্টের সহিত স্ববাক্য সমর্থন করিতে গিয়াছেন। তিনি অবশ্য জানিতেন সকল স্ত্রীই যে এইরূপ জঘন্য প্রকৃতির তাহা নহে। যদি তাই বুঝিতেন তবে স্ত্রীতে ও শ্রীতে কিছুই ইতর বিশেষ নাই স্ত্রীজাতির প্রতি এইরূপ সম্মানের কথা তাঁহার লেখনীমুখে কখনই নিঃসৃত হইত না। তিনি জানিতেন এই জাতির মধ্যে যেমন দেবী আছেন তেমনি দানবী আছেন। কিন্তু সামাজিক নিয়মের অনুরোধে উচ্চ শিক্ষা ও উন্নত ধর্ম্মজ্ঞান না থাকায় দেবী অপেক্ষা দানবীর সংখ্যাই উহাদের মধ্যে অধিক। মনুর অভিপ্রায় ঐহিক ও পারত্রিক ঘোর অনিষ্টকর সাঙ্কর্য্যের সর্ব্বাঙ্গীন উচ্ছেদ। এই উদ্দেশে যে বিধি

---

* পাপ ত্রিবিধ, কায়িক বাচিক ও মানসিক। কিন্তু এদেশীয়েরা মানস পাপকে যেমন ভয় করিতেন এমন আর কুত্রাপি দেখা যায় না। ফলত সঙ্কল্পেই পাপের জন্ম। পরে কায়মনে অভিব্যক্তি। এই সংকল্প স্থানকে পবিত্র রাখিতে পারিলে পাপদোষ আসিতে পারে না। এই জন্য পূর্ব্বে মানস পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইত। এস্থলে প্রসঙ্গত একটী পৌরাণিক কবির কথা মনে পড়িল। তিনি কামনাশের ইচ্ছায় কামকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,

কাম জানামি তে মূলং সঙ্কল্পাদধিজায়সে।
নাহং সঙ্কল্পয়িষ্যামি অতস্ত্বং ন ভবিষ্যসি।

কাম! আমি তোমার মূল জানি, তুমি সঙ্কল্প হইতে জন্ম গ্রহণ কর, আমি আর সংকল্প করিব না কাজেই তুমিও আর জন্মিবে না। মহাকবির এই মহোক্তি কামনাশের যে প্রকৃত মহৌষধ তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

ব্যবস্থিত হইবে তাহা নির্ব্বিশেষে ব্যাপক হওয়া চাই। নচেৎ সমাজ-সঙ্ক্ষোভ দুর্নিবার হইয়া উঠিবে। বোধ হয় এই অলঙ্ঘনীয় কারণেই মনু স্ত্রীচরিত্র একসূত্রে গাঁথিয়া গিয়াছেন। এবং ইহাতে লোকের আস্থা স্থাপনের জন্য নিজের যুক্তিতর্ক যথেষ্ট হইলেও বেদপ্রমাণের আশ্রয় লইয়া এই বুঝাইয়াছেন স্ত্রীলোককে কখনই স্বাধীন করিও না।

পরেই তিনি ভাবিলেন, কি করিলাম! মন্দটাই স্ত্রীজাতির বিধাতৃবিহিত স্বভাব এই কথায় অনেকেই তো ইহাদের প্রতি এককালে বিমুখ হইয়া পড়িবে। এখন উপায়! তাই তিনি বলিতেছেন, স্ত্রী যাদৃক গুণবৎ ভর্ত্তার সহিত বিবাহ বিধানে সংযুক্ত হয় তাদৃক গুণই তাহার হইয়া থাকে। সাধু সংযোগে সাধ্বী হয় এবং অসাধু সংযোগে অসাধ্বী হয়। যদিচ মন্দটাই স্ত্রীজাতির বিধাতৃবিহিত স্বভাব কিন্তু তোমার সংযম থাকিলে সেও সংযতা হইবে। নিজে চরিত্রবান হও সেও চরিত্রবতী হইবে। অন্যথায় কোনও রূপ শুভাশা করিও না। এই বলিয়া তিনি ভর্ত্তৃগুণে গুণবতী অক্ষমালার উদাহরণ দিয়া স্ববক্তব্যের উপসংহার করিয়াছেন।

নদীতে ঝড় ও নাস্তিকের ঈশ্বর-প্রবোধ।

একদা ভ্রমিতে হইল বাসনা,
কৃষক-বসতি—নদীর চর,
মনের উল্লাসে পূরিতে কামনা,
চলিনু সাহসে করিয়া ভর।

বহিছে নীরবে ধীরে প্রবাহিনী,
প্রশান্ত মূরতি হেরিনু তার,
সুনীল গগনে খেলে সৌদামিনী,
মাঝে মাঝে কাল মেঘের ভার!

গভীর নিস্তব্ধ দেখিয়া প্রকৃতি,
ছাড়িল নাবিক তরণী তার,
তরঙ্গিনী মাঝে আসিনু ঝটিতি,
অধীর হইনু ধরিতে পার।

নামানি ভজন নামানি পূজন,
নামানি ভুবনে বিভুর স্থিতি,
নামানি ঈশ্বর—জগত-কারণ,
নাহিক তাহাতে ভাবনা ভীতি।

সহসা জলদ ছাইল গগন,
ক্রমশঃ বাড়িল পবন-গতি,
দেখিতে দেখিতে আকার ভীষণ,
ধরিল নদীর তরঙ্গ অতি।

হেরিয়া প্রচণ্ড তরঙ্গ নদীর,
মানসে কতই হইল ভয়,
দেখায় ভীষণ প্রকোপ সমীর,
চলিতে সাহস নাহিক হয়।

কাঁপিল মেদিনী মাতিল তটিনী,
ভাঙ্গিল সমুচ্চ তরুর শির,
রোষিল গর্জ্জিয়া কল-কল্লোলিনী,
ভাঙ্গিল হুঙ্কারে বিদারি তীর।

ভাবিনু প্রলয় আসিল তখনি,
ছাইল কত ভীষণ লহরী,
ডগমগ করি কাঁপিছে তরণী,
যেনরে পবন নাচায় তরী।

ডুবুডুবু নৌকা তরঙ্গ-আঘাতে,
হৃদয় আকুল পাইয়া ত্রাস,
চমকে পরাণ চপল প্রভাতে
ত্যজিনু হায়রে জীবন-আশ!

আকুল ব্যাকুল হইয়া তখন,
ভাসিতেছিলাম নয়ন-জলে,

করিছে অশনি ভীম গরজন,
মেঘের কপালে আগুণ জ্বলে !

হেরিয়া হুতাশ হইল মানসে,
ভাবিলাম বুঝি গেলরে প্রাণ !
সহসা আকাশে চাহিনু সাহসে,
কারে যেন মন করে সন্ধান !

যবে ঊর্দ্ধে মন হইল ধাবিত,
কাতরে ডাকিনু "করহে ত্রাণ,"
বিপদ-সমুদ্রে হইনু পতিত,
সপিনু "তোমায" সাধের প্রাণ।

শুনিয়ে এহেন কাতর বচন,
স্বর্গ হতে যেন হইল ধ্বনি,—
"ক'রনা হে ভয়, ক'রনা রোদন,"
"রক্ষিব তোমার জীবন-মণি"।

অমনি ঝড়ের প্রকোপ তখন,
তাঁহার আজ্ঞায় হইল হ্রাস,
নদীর তরঙ্গ, নীরদ-গর্জ্জন,
তড়িত ছটার হইল নাশ।

হেরিয়া নদীর প্রশান্ত মূরতি,
হুতাশ উদাস হইল গত,
বিপদ হইতে লভিনু মুকতি,
মানসে আনন্দ হইল কত !

ভাবিয়া এহেন অপূর্ব্ব ঘটনা,
ঘুচিল আমার নাস্তিক ভাব !
দূর হলো মোর অলীক ধারণা,
ঈশ-তত্ত্ব-জ্ঞান করিনু লাভ।

স্বতই প্রবৃত্তি জাগিল অন্তরে,
ডাকিতে প্রাণেশ দয়ার নিধি,
যাঁর নামে তরি বিপদ-সাগরে,
জগত্ত পালিছে তাঁহার বিধি।

ক্ষম হে ঈশ্বর ! অনাথ-শরণ,
তুমি তো বিপদ-সাগর-ভেলা,
কাঁদিছে জীবন তোমার কারণ,
ভুলিয়ে তোমায় ক'রেছি হেলা।

বৃথায় জীবন করিনু যাপন,
হৃদয় তাপিত হতেছে মোর !
ভ্রমে ও তোমায় করিনি স্মরণ,
ক'রেছি কতই কলুষ ঘোর !

তথাপি হে নাথ দয়ার সাগর,
কখনো পামরে কুপিত নও !
বিপাকে পড়িলে করুণা বিতর,
অবোধ ভাবিয়া সকল সও !

বালক যেমন করিলে রোদন,
না হেরি তাহার জননী মুখ,
কোলে তারে তেই করিলে তখন,
কতই শিশুর জনমে সুখ !—

শুনিয়া শিশুর রোদন তখন,
স্নেহেতে প্রসারি কোমল করে,
কোলে তুলি লন প্রাণের রতন,
সুধান কতই মধুর স্বরে !

তেমন হেনাথ স্নেহের আধার,
দেখা'লে করুণা নদীর মাঝ,
শুনিয়া করুণ বচন আমার,
অধম সন্তানে বাঁচা'লে আজ !

নাশিতে আমার আতঙ্কা যখন,
বাড়া'লে তোমার অভয়-কোল,
অমনি তোমার ভয়েতে তখন,
কমিল ঝড়ের ভীষণ-গোল।

হিতবাদী হইতে উদ্ধৃত।

সমাজ সংস্কারের প্রকৃত পদ্ধতি।

(হর্বর্ট স্পেন্সরের মত)

ইংরাজদিগের কার্য্যপ্রণালীর এই একটী বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় যে তাহাদের আচার-ব্যবহার, প্রথা

কিম্বা বিশ্বাসে কোন গোল বাধিলে তাহারা রফা পূর্ব্বক মিটাইয়া ফেলে। যে কোন মনুষ্য-সমাজ বৃদ্ধি ও উন্নতির পথে ক্রমশই অগ্রসর হইতেছে, রফা-পদ্ধতি তাহার পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক। এই সকল সমাজের প্রচলিত মত হয় ত একরূপ—সামাজিক ব্যবস্থা হয়ত অন্যরূপ—পরস্পরের সহিত মিল হয় না—অনেক সময়ে অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। তাহা ত হবেই; কেন না, এই সকল সমাজের অবস্থা ক্রমাগত পরিবর্ত্তন হইতেছে এবং এই অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত ব্যবস্থারও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ক্রমাগত চলিতেছে। পুরাতন সমাজ হইতেই নূতন সমাজ প্রসূত হয়, সুতরাং পুরাতন সমাজের ভাব ও প্রথা কতক কতক নূতন সমাজে থাকিয়া যায়—যত দিন না নূতন সমাজ ভালরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় ততদিন সে সকল ভাব ও প্রথা সম্পূর্ণ উপযোগী না হইলেও হঠাৎ সে সমাজ হইতে অন্তর্হিত হয় না। কাজেই লোকের মতের সঙ্গে ব্যবহারের অনৈক্য হইয়া পড়ে।

সমাজের কাজ কোনও প্রকারে চালান চাই। নূতন সমাজ ঠিক প্রস্তুত না হইলে পুরাতন সমাজকে ছাড়া যায় না—তাহাকে রাখিতেই হয়। তবে কিনা, ক্রমাগত জোড়াতাড়া দিতে হয়। তাই বলি, রফা-নিষ্পত্তিই স্বাভাবিক উন্নতিনিয়মের অপরিহার্য্য চির সহচর।

আজ কালের রাজনীতি-সংস্কারক, ধর্ম্ম-সংস্কারক, সমাজ-সংস্কারকেরা এই সত্যটিকে বড় আমল দখল দেন না। অন্যায় অত্যাচার নিবারণে ও ভ্রম সংশোধনে তাঁহাদের এতদূর আগ্রহ, পুরাতন প্রথা ও পুরাতন ভাবের কুফলের প্রতিই তাঁহাদের স্থির দৃষ্টি, তাহার চিন্তাতেই তাঁহাদের মন এতদূর অধিকৃত—যে পুরাতন প্রথা ও পুরাতন ভাব হইতেই যে সকল সুফল প্রসূত হইয়াছে তাহার প্রতি তাঁহারা একেবারেই অন্ধ। এক হিসাবে বলিতে গেলে, এই এক-দেশ-দর্শিতা কতকটা আবশ্যক। সকল বিষয়েই শ্রমবিভাগ চাই; আক্রমণ করাই যাঁহাদের কায, তাঁহাদের এমন করিয়া আক্রমণ করা চাই যাহাতে ফল হয়—কাজেই তাঁহারা যে বিষয়ের প্রতি আক্রমণ করিবেন তাহার অনিষ্টকারিতা তীব্ররূপে তাঁহাদের অনুভব করা আবশ্যক। পক্ষান্তরে যাঁহারা আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্রতী—ভাল করিয়া নিজপক্ষ সমর্থন করিতে হইলে যে বিষয়ের সমর্থন করিবেন তাহার ঔৎকর্ষ একটু বেশি মাত্রায় হৃদয়ঙ্গম করা তাঁহাদের আবশ্যক। এই এক-দেশদর্শিতা অবশ্যম্ভাবী—কাজেই সহিয়া থাকা ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা যে দুঃখের বিষয় নহে তাহা বলা যায় না।

ব্যক্তির সমষ্টি লইয়াই সমাজ। কোন সমাজের অন্তর্ভূত ব্যক্তিবর্গের যেরূপ প্রকৃতি ও গুণ হয় তদনুসারেই সেই সমাজের গঠন ও অনুষ্ঠান সকল নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। সমাজান্তর্গত ব্যক্তিবর্গের প্রকৃতি সারবান না হইলে সেই সমাজের স্থায়ী ও সারবান পরিবর্ত্তন কখনই হইতে পারে না। (সমাজের বাহির হইতে কোন উৎপাত আসিয়া যদি পরিবর্ত্তন করে সে আলাদা কথা)। সুতরাং ইহা সহজেই উপলব্ধি হয় যে, কোন সমাজে হঠাৎ বহুল পরিবর্ত্তন আনয়ন করিলে কোন কাজ হয় না।

উন্নতির পক্ষাবলম্বীরা যদি ইহা বুঝেন, যে ব্যবস্থাগুলি সমাজে আপাততঃ প্রচলিত তাহা যদিও অসম্পূর্ণ তথাপি কতকটা বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী এবং উন্নতির প্রতিরোধীরাও যদি ঐ কথা বুঝেন যে লোকের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়া গেলে তৎপ্রসূত ব্যবস্থাগুলি জোর করিয়া রক্ষা করা বাঞ্ছনীয় নহে—তাহা হইলে উন্নতি-পক্ষাবলম্বীদিগের আক্রমণের উগ্রতা কমিয়া যায় এবং প্রতিপক্ষদিগের আত্ম-সমর্থনের তীব্রতা হ্রাস হয়। তাড়াতাড়ি কোন উন্নতি হয় না—সকলই সময়ের অপেক্ষা করে। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। শিশু অল্প অল্প বাড়িতে বাড়িতে অনেক কাল পরে তবে পরিপক্কাবস্থা প্রাপ্ত হয়—সমাজও অল্প অল্প পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া নিম্নতর ধাপ হইতে ক্রমশঃ উচ্চতর ধাপে উত্থিত হয়। প্রকৃতির গতি যদি চিন্তা করিয়া দেখ তাহা হইলেও দেখিতে পাইবে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিয়া জমিয়া জমিয়া তাহা হইতে বিপুল ব্যাপার সকল ক্রমশঃ উৎপন্ন হইতেছে। এক বৎসর কালের মধ্যে যে সকল শক্তির অস্তিত্বই অনুভব করা যায় না সেই সকল শক্তির প্রভাবে আমাদের এই পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ গঠিত হইয়াছে—ইহার অসংখ্য প্রাণিপুঞ্জ কত যুগ যুগান্তর হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ বিকশিত হইয়াছে তাহা আমরা মনেও ধারণা করিতে পারি না। সেইরূপ মনুষ্য-সমাজে কোন স্থায়ী পরিবর্ত্তন হইবার পূর্ব্বে কত অসংখ্য চিন্তা, কত অসংখ্য ভাব, কত অসংখ্য কার্য্য সমাজের মধ্য দিয়া বিচরণ করিতে থাকে তাহার ঠিকানা নাই। উন্নতির এই স্বাভাবিক পদ্ধতিকে সংক্ষেপ করা অসম্ভব—যথাযোগ্য ধৈর্য্যসহকারে ইহার মধ্য দিয়া চলিতেই হইবে। আমাদের জানা উচিত আমরা প্রত্যেকে সমাজের উন্নতির জন্য অতি অল্প কাজই করিতে পারি কিন্তু যে টুকু করিতে পারি তাহা যেন ভাল করিয়া করি। আমরা যদি আমাদের সকল কাজে কর্ম্মীর উদ্যম উৎসাহের সহিত জ্ঞানীর প্রশান্ত ভাব মিশ্রিত করি তবেই আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ত্রয়োদশ কল্প
প্রথম ভাগ
ভাদ্র ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬২।

৫৭৭ সংখ্যা। ১৮১৩ শক.

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

প্রার্থনা।

(মহিলা রচিত।)

দরশন দাও মোরে—ওহে পতিত পাবন—
সদাই বিপথগামী, বাসনাতে অচেতন;
কত-না প্রতিজ্ঞা করি, তোমারে হৃদয়ে ধরি,
রাখিব না সংসারের পরে বৃথা আকিঞ্চন—
কিন্তু ওহে দয়াময়, সকলি যে বৃথা হয়;
পলে পলে যায় বল মায়া মোহে অনুক্ষণ।
কাটিয়ে মায়ার ডোর, তোমাতে হইব ভোর
সেই বল দাও প্রভু—বৃথা এ বন্ধন।
আর যে যাব না নাথ, আমি যে অতি অনাথ,
তোমা বিনা শান্তিদাতা আছে আর কে এমন?
চারিদিকে হাহাকার
তায় হৃদি অন্ধকার,
যদি পাই তিলাশ্রয়
পলেক না তাও রয়।

চুট্‌কি গল্প।

(বালকের রচিত)

(১)

স্যাটেনুফ নামক এক ফরাষিস সেনাপতি স্কুলে গিয়া এক বালককে বলিলেন হে বালক! ঈশ্বর কোথায় আছেন যদি তুমি বলিতে পার তাহা হইলে আমি তোমাকে একটি কমলা লেবু দিব। তাহাতে ঐ বালক বলিল—"ঈশ্বর কোথায় নাই যদি তুমি বলিতে পার তাহা হইলে আমি তোমাকে দুইটি কমলা লেবু দিব।"

(২)

সাইমনাইডিস নামক গ্রাক কবিকে এক ব্যক্তি বলিলেন—"ঈশ্বরের স্বরূপ কি বলিতে পারেন? তাহাতে তিনি বলিলেন দুই দিন আমায় সময় দাও। দুই দিন পরে বলিলেন চারি দিন, তার পরে আট দিন, তার পর ষোল দিন, তার পর এক মাস। একমাস পরে বলিলেন যতই আমি এবিষয় চিন্তা করি ততই কঠিন বোধ হয়। অতএব আমি কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার শিষ্যগণ।

শ্রীরূপের নীলাদ্রি গমন।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, সনাতন গোস্বামী চৈতন্য প্রভুর নিকট বিদায় লইয়া

বৃন্দাবনধামে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই রূপ গোস্বামী কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমকে সঙ্গে লইয়া সনাতনের উদ্দেশে গঙ্গাপথে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রয়াগে আসিয়া সনাতনের বৃন্দাবন গমন সংবাদ অবগত হইলেন। তৎপরে কাশীতে উপনীত হইয়া তপনমিশ্র ও চন্দ্রশেখর আচার্য্য প্রভৃতির সহিত মিলিত হইলেন। সনাতনের প্রতি প্রভুর অনুগ্রহ ও প্রেমভক্তি-তত্ত্ব শিক্ষার বিষয় অবগত হইয়া এবং কাশীবাসী দণ্ডী পরমহংসদিগের মুখে চৈতন্য প্রভুর মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া রূপ অতিমাত্র আনন্দ লাভ করিলেন। কাশীতে কিছুদিন অবস্থিতি করত তাঁহারা গৌড় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গৌড়ে উপনীত হওয়ার পর অনুপমের পরলোক প্রাপ্তি হয়। এই সময়ে গৌরচন্দ্র নানা-তীর্থ পর্য্যটন করিয়া নীলাচলে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। বঙ্গদেশের ভক্তগণ এই সংবাদ পাইবামাত্র চৈতন্য চরণ দর্শনের জন্য নীলগিরি গমন করিতে লাগিলেন। অনুপমের মৃত্যুর পর রূপ কিছুদিন বঙ্গদেশে অবস্থিতি করিয়া নীলাচল গমন করেন। ইতিপূর্ব্বে বৃন্দাবন ধামে অবস্থান কালে রূপ গোস্বামী কৃষ্ণ-লীলা নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। নাটকের কিয়দংশ অর্থাৎ মঙ্গলাচরণ ও নান্দীশ্লোক বৃন্দাবনেই লিখিত হইয়াছিল। গৌড় হইতে রূপ গোস্বামী নীলাচল আসিবার কালে সত্যভামাপুর নামক কোন গ্রামে এক রাত্রি বিশ্রাম করেন। এইখানে রূপ রাত্রে স্বপ্ন দেখেন যেন এক দিব্যরূপধারিণী রমণী আসিয়া বলিলেন, আমার নাটক পৃথকরূপে রচনা করিবে। স্বপ্নের কথা মনে মনে বিচার করিয়া রূপ এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-লীলা ও একত্রে লিখিবার সংকল্প করিয়াছি, এই জন্য সত্যভামা দুই লীলা স্বতন্ত্ররূপে লিখিবার জন্য আদেশ করিলেন। তদনন্তর রূপ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে সমাগত হইয়া হরিদাসের আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। হরিদাস নীচজাতি যবন, এইজন্য জগন্নাথপুরীতে থাকিতেন না, শ্রীক্ষেত্রের অনতিদূরে নির্জ্জন স্থানে একটি সামান্য কুটীরে হরিনামরসে নিমগ্ন থাকিতেন। * চৈতন্যদেব প্রতিদিন হরিদাসের কুটীরে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে ভগবৎপ্রসঙ্গে মগ্ন হইতেন। গৌরচন্দ্র রূপকে আলিঙ্গন করিয়া কুশল প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর গৌর রূপ গোস্বামীর সঙ্গে নিত্যানন্দ অদ্বৈত প্রভৃতি বঙ্গদেশীয় ও উড়িষ্যাবাসী ভক্তগণের পরিচয় করিয়া দিলেন। রূপ বিনয়ে অবনত হইয়া ভক্তগণের চরণবন্দনা করিলেন। রূপের নিরভিমান গভীর জ্ঞান ও বিনয়াবনত ভক্তিভাব সন্দর্শন করিয়া ভক্তগণ পরম প্রীতি লাভ করিলেন।

এই সময়ে রূপ নাটক রচনাতে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা ও পুরলীলা পৃথক ভাবে লিখিবার কথা বোধ হয়

* হরিদাস ও রূপ সনাতন আপনাদিগকে নীচ জাতি জ্ঞান করিয়া জগন্নাথমন্দিরে গমন করিতেন না, তাঁহারা শ্রীক্ষেত্রের বহির্দ্দেশে অবস্থান করিতেন। সনাতন ও রূপ নীলাচলে গিয়া হরিদাসের আশ্রমেই বাস করিয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে যিনি যখন নীলাচলে থাকিতেন, চৈতন্যদেব প্রতিদিন আসিয়া তাঁহার সহিত সাধন ভজন প্রেমালাপে কিছুক্ষণ যাপন করিতেন।

"হরিদাস ঠাকুর শ্রীরূপ সনাতন।
জগন্নাথ মন্দিরে এই নাযান তিনজন॥
মহাপ্রভু জগন্নাথের উপলভোগ দেখিয়া।
নিজ গৃহে যান এই তিনেরে মিলিয়া।
এই তিন মধ্যে যবে থাকে যেই জন।
তারে আসি আপনে মিলে প্রভুর নিয়ম॥"

চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যখণ্ড ১ ম পরিচ্ছেদ।

চৈতন্য অবগত হইয়াছিলেন; একদিন গৌর বলিলেন,

"কৃষ্ণকে বাহির নাহি করিহ ব্রজ হইতে।
ব্রজছাড়ি কৃষ্ণ কভু নাযান কাঁহাতে॥" *

দুই লীলা স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করিবেন রূপের এই ইচ্ছা ছিল, এক্ষণে শ্রীচৈতন্যের সম্মতি পাইয়া উৎসাহিত হইলেন, এবং পৃথক পৃথক নান্দীপ্রস্তাবনা লিখিয়া লীলা-ভেদে বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নামে সংস্কৃত ভাষায় দুইখানি নাটক লিখিতে লাগিলেন। রূপ গোস্বামী কেবল বিষয় বিরাগী হরিভক্ত সাধু ও সংস্কৃতশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন তাহা নহে, তিনি একজন প্রতিভাশালী কবি। এই সকল গ্রন্থে তাঁহার ভাবমাধুর্য্য, পদলালিত্য ও স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি অতি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

একদিন হরিদাসের আশ্রমে বসিয়া রূপ নাটক লিখিতেছেন, এমন সময়ে চৈতন্যদেব সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং কি পুঁথি লিখিতেছ?' বলিয়া লিখিত পুস্তকের একটি পাতা টানিয়া লইলেন। প্রথমতঃ রূপের হস্তাক্ষরের প্রশংসা করিয়া চৈতন্য বিদগ্ধ মাধবের এই শ্লোকটি পড়িতে লাগিলেন।

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে।
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং॥
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং।
নোজানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥"

---

* বৈষ্ণবদিগের মতে কৃষ্ণ দুইজন। যদুবংশ সম্ভূত কৃষ্ণ আর নন্দনন্দন কৃষ্ণ। বৈষ্ণবেরা গোপেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণকেই মাধুর্য্যভাবে ভজনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে নন্দনন্দন কৃষ্ণ ব্রজভূমি পরিত্যাগ করিয়া কখন অন্যত্রে গমন করেন না। প্রমাণ স্বরূপে তাঁহারা লঘুভাগবতামৃতধৃত এই যামল বচন উল্লেখ করেন।

"কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতি॥"

বৈষ্ণব টীকাকার বলেন, "যঃ কৃষ্ণো যদুসম্ভূতঃ স বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য মথুরায়াং গচ্ছতি। যো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণঃ স বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং কচিৎ ন গচ্ছত্যেব।" এই কথার সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য বৈষ্ণবাচার্য্যেরা বলেন যে, যৎকালে বসুদেব কংসের কারাগার হইতে কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে নন্দালয়ে লইয়া যান, সেই সময়ে বসুদেবের ক্রোড় হইতে কৃষ্ণ যমুনাসলিলে পড়িয়া গিয়াছিলেন। বসুদেব ব্যাকুল হইয়া অন্বেষণ করিবামাত্র কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু এবারে চতুর্ভুজ ও চূড়াধারী কৃষ্ণ নহেন, ইনি দ্বিভুজ মুরলীধর মূর্ত্তি। বৈষ্ণবদিগের মতে এই দ্বিভুজ মুরলীধর পীতাম্বর নন্দনন্দন কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, গোলোকধামে গোপ গোপীদিগের সঙ্গে তাঁহার যে মাধুর্য্যলীলা তাহা অনাদি অন্তহীন ও নিত্য। অদ্যাবধি জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মপুরে সেই নিত্যলীলা অবিশ্রাম তরঙ্গায়িত হইতেছে। প্রপঞ্চময় বৃন্দাবন-লীলা এই অপ্রকট নিত্যলীলার বাহ্য বিকাশ মাত্র। এই মাধুর্য্যময়ী নরলীলা প্রকটন জন্য স্বয়ং ভগবানের যে অবতরণ, তাহাই পূর্ণাবতার। তদ্ব্যতীত অসুর সংহার ও যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন নিমিত্ত যুগাবতার এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ সাধনার্থ ব্রহ্মাবিষ্ণু রুদ্ররূপে শ্রীহরির গুণাবতার প্রভৃতি উক্ত পূর্ণ পুরুষের অংশ শক্তি মাত্র। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্মের অসংখ্য শক্তি বিশ্বসৃষ্টিতে অবতীর্ণ হইয়া সৃষ্টিলীলা রক্ষা করিতেছে, সুতরাং অবতারও অসংখ্য। কিন্তু লোক সকলকে শুদ্ধভক্তি শিক্ষা দিয়া নির্ম্মল প্রেমের অধিকারী করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

"অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহমাস্থিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ শ্রুত্বা যৎ তৎপরোভবেৎ॥"
(ভাগবত।)

ভগবান ভূত সকলকে কৃপাদানের জন্য লীলাছলে ইহলোকে দেহধারণ করেন, তিনি মানব দেহ ধারণ করিয়া মানবোচিত লীলা করেন, যাহা শ্রবণ করিয়া মনুষ্য তাঁহাকে শ্রেষ্ঠজ্ঞান করিয়া তাঁহাতে রত হয়। এই পূর্ণাবতাররূপ নরলীলা প্রকটনজন্য ভগবান স্বতন্ত্র দেহ ধারণ না করিয়া, যুগাবতার কালে তদীয় অংশ স্বরূপ ক্ষীরোদশায়ী নারায়ন দেবকীগর্ভে শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইলে সেই দেহে আবির্ভূত হইয়া ব্রজধামে প্রেমলীলা প্রকটিত করিয়াছিলেন। অপিচ ভগবানের পূর্ণাবতার কালে অংশাবতার যুগাবতার প্রভৃতি সকলেই সেই বিগ্রহে আসিয়া মিলিত হয়। পূর্ণতম স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের পূর্ণাবতার সময়ে অর্থাৎ বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপর যুগের শেষে পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর ভুভারহরণ নিমিত্ত যুগাবতারের কাল উপস্থিত হওয়ায় উভয়ে একত্রে অবতীর্ণ হইয়া নরলীলা প্রকটন ও যুগধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এইজন্য বৈষ্ণব মতে যিনি যুগাবতার, তিনি যদুবংশোদ্ভব ও ভগবানের অংশ; আর চিদ্বৃন্দাবনস্থ নিত্য লীলাবিহারী স্বয়ং ভগবান নন্দনন্দন কৃষ্ণ প্রাকৃত বৃন্দাবনে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য ও মধুর ভাবের নির্ম্মল ভক্তি প্রবর্ত্তিত করিয়াই অন্তর্দ্ধান হইয়াছিলেন, তিনি কখনও বৃন্দাবন পরিত্যাগ করেন নাই। যদুকুলোদ্ভূত অংশাবতার কৃষ্ণই বৃন্দাবন হইতে মথুরা গমন করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ এই দুইটি বর্ণ যে কি পরিমাণ অমৃত দিয়া গঠিত হইয়াছে তাহা জানি না। যখন ইহা রসনাতে নৃত্য করিতে থাকে, তখন আরও বহুরসনা লাভ করিতে ইচ্ছা হয়, যখন কর্ণরন্ধ্রে অঙ্কুরিতা হয়, তখন অর্ব্বুদ সংখ্যক কর্ণ পাইবার জন্য স্পৃহা জন্মে, এবং চিত্তপ্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইলে সমুদায় ইন্দ্রিয়ব্যাপার ইহার নিকট পরাস্ত হইয়া যায়। এই মাধুর্য্য-রস-সিঞ্চিত হরিনাম-মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক অপূর্ব্ব শ্লোক পাঠ করিতে করিতে প্রেমরসময় গৌরচন্দ্র প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। হরিদাস উল্লাসে নৃত্য করিতে করিতে বলিলেন, শাস্ত্র ও সাধুমুখে নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু এমন সুধামাখা নাম-মহিমা কখনও শুনি নাই।

আর এক দিন গৌরসুন্দর, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য রায় রামানন্দ ও স্বরূপ প্রভৃতি ভক্ত পণ্ডিতগণে পরিবৃত হইয়া রূপের সন্নিধানে আসিলেন। গৌরের মুখে রূপের প্রশংসা আর ধরে না, সমস্ত পথ ভক্তগণ সমীপে রূপের গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। ভক্তবৃন্দসহ প্রভুকে দেখিয়া রূপ ও হরিদাস সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া তাঁহাদিগকে পিঁড়ার ওপরে বসাইলেন এবং আপনারা ভূমিতলে উপবিষ্ট হইলেন। চৈতন্য প্রভু বলিলেন, রূপ! সেই অমৃতময় শ্লোক আবার পড়। রূপ গোসাঞি বিনয়ে অধোবদন, লজ্জাতে পড়িতে না পারিয়া মৌনভাব অবলম্বন করিলেন। শেষে গৌরের পুনঃপুনঃ অনুরোধে বিদগ্ধমাধব নাটকের সেই শ্লোক আবার পাঠ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নামমাহাত্ম্যযুক্ত কবিত্ব রসপূর্ণ শ্লোকের রসাস্বাদন করিয়া রামানন্দ প্রমুখ ভক্তগণ আনন্দ ও বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া বলিতে লাগিলেন, এমন মধুময় নামমহিমা আমরা কখন শুনি নাই। রায় রামানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন,

> "—কোন্ গ্রন্থ কর হেন জানি।
> যাহার ভিতরে এই সিদ্ধান্তের খনি।"

স্বরূপ গোস্বামী রামানন্দকে নাটকের পরিচয় অবগত করিলে, রায়ের অনুরোধে রূপ বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নাটকের স্থানে স্থানে পাঠ করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। প্রথমতঃ বিদগ্ধ মাধবের নান্দীশ্লোক পাঠ করা হইল।

> "সুধানাং চান্দ্রীণামপি মধুরিমোন্মাদদমনী
> দধানা রাধাদিপ্রণয়ঘনসারৈঃ সুরভিতাং।
> সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গমবিষম সংসার সরণী
> প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরিলীলাশিখরিণী।"

যাহাতে সুধাংশুর সুধামাধুর্য্যশালিতার গৌরব দমিত হইয়াছে, এবং যাহা রাধাদির প্রণয়রূপ কর্পূর সংযোগে সৌগন্ধ্য ধারণ করিয়াছে, সেই হরিলীলা-শিখরিণী অর্থাৎ হরিলীলারূপ মধুরাস্বাদযুক্ত পানীয় তোমার সন্তাপ-বর্দ্ধক অতিদুর্গম সংসার-রূপ-পথ-পর্য্যটন-জনিত তৃষা নিবারণ করুক। এই রূপে প্রেমোৎপত্তি, পূর্ব্বানুরাগ, বিকার চেষ্টা, ভাব ও প্রেমের লক্ষণ ইত্যাদি যে রসের যেরূপ প্রেমরসাভিষিক্ত কবিত্বময় শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, রূপ গোস্বামী নাটকের মধ্যে মধ্যে পাঠ করিয়া ভক্তগণকে তাহা শুনাইতে লাগিলেন। পূর্ব্বকথিত দুইখানি নাটকের নান্দীতে রূপ গোস্বামী ইষ্টদেব বন্দনার যে শ্লোক রচনা করেন, চৈতন্যের ভয়ে তিনি তাহা পাঠ করিতে সঙ্কুচিত হইলেন। এই দুই শ্লোকে আপন ইষ্টদেব শ্রীচৈতন্যের বর্ণনাচ্ছলে চৈতন্যাবতারের আভাস প্রদান করা হইয়াছিল। ঈশ্বরাবতার রূপে বর্ণনা ত দূরের কথা শ্রীচৈতন্য আপনার সামান্য প্রশংসাও সহ্য করিতে পারিতেন না। তৃণ

হইতে নীচ ও নিরভিমান হইয়া হরিনাম করাই চৈতন্যের ধর্ম্ম। কেহ তাঁহার অন্যায় প্রশংসা করিলে তিনি বিষ্ণু স্মরণ পূর্ব্বক কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া মহা বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। এই কারণে উক্ত শ্লোক আবৃত্তি করিতে রূপ গোস্বামী নিরতিশয় সঙ্কুচিত হইলেন। রূপের লজ্জা ও সং-কোচ দেখিয়া চৈতন্য বলিলেন, বৈষ্ণ সমাজে গ্রন্থ শুনাইবে ইহাতে আর লজ্জা কি, শ্লোক পাঠ কর।

"রায় কহে কহ ইষ্টদেবের বর্ণন।
প্রভুর সঙ্কোচে রূপ না করে পঠন॥
প্রভু কহে কহ কেন কি সঙ্কোচ লাজে!
গ্রন্থের ফল শুনাইবে বৈষ্ণব সমাজে॥

চৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্যখণ্ড ১ম

শ্রীগৌরের আদেশে রূপ সলজ্জভাবে এই দুইটি শ্লোক আবৃত্তি করিলেন।

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দর দ্যুতিকদম্ব সন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥"

বিদগ্ধ মাধব।

যে উন্নতোজ্জ্বল মধুর রস জগতে কখন অর্পিত হয় নাই, সেই স্বীয় ভক্তিসম্পদ প্রদান করিবার জন্য যিনি করুণা করিয়া এই কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন; যাঁহার দেহদ্যুতি কনককান্তি হইতেও অতি উজ্জ্বল শোভাযুক্ত, সেই শচীনন্দন হরি (সিংহ) তোমাদের হৃদয়কন্দরে সর্ব্বদা প্রকাশিত থাকুন।

"নিজপ্রণয়িতা সুধামুদয়মাপ্নুবন্ যঃ ক্ষিতৌ
কিরত্যলমুরীকৃত দ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ।
স লুণ্ঠিততমস্ততির্ম্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী
বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্যতু॥"

ললিতমাধব।

যিনি ক্ষিতিতলে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় প্রেমরসামৃত বহুল পরিমাণে বিস্তার করিয়াছেন, যিনি দ্বিজকুলাধিরাজ এই খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, এবং যিনি অজ্ঞা-নান্ধকার সমূল বিনাশ করিতেছেন, সেই জগন্মোহন শচীনন্দন শশী আমার অনি-র্ব্বচনীয় সুখ বিধান করুন।

শ্লোক শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ পরমানন্দ লাভ করিলেন; কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর নি-জের স্তুতিস্তুতি শ্রবণ করিয়া রাগান্বিত হইয়া রূপকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। রামানন্দ বলিলেন; রূপের বাক্য সহজেই অমৃতরসে পরিপূর্ণ, তোমার স্তুতিরূপ ক-র্পূর বিন্দুর সংযোগে তাহা আরও সৌগ-ন্ধময় হইয়াছে। চৈতন্য বিরক্ত হইয়া বলিলেন, এই সকল উপহাসকর লজ্জা-জনক কথা শুনিয়া তুমি উল্লসিত হইতেছ ইহাই অতি আশ্চর্য্য! রায় রামানন্দ তাঁহাকে এই বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন যে, স্বীয় গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে অভীষ্ট দেবের স্তুতি করা দোষাবহ নহে, ইহা শ্রবণ ক-রিয়া লোকের সুখ হইয়া থাকে।

"তবে রূপ গোঁসাঞি যদি শ্লোক পড়িল।
শুনি প্রভু কহে এই অতি স্তুতি হৈল॥

... ...

কাঁহা তোমার কৃষ্ণরস কাব্য সুধাসিন্ধু।
তার মধ্যে কেন মিথ্যা স্তুতি ক্ষার বিন্দু॥
রায় কহে রূপের বাক্য অমৃতের পুর।
তার মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছে কর্পূর॥
প্রভু কহে রায় তোমার ইহাতেও উল্লাস।
শুনিতেই লজ্জা লোকে করে উপহাস॥
রায় কহে লোকের সুখ ইহার শ্রবণে।
অভীষ্টদেবের স্মৃতি মঙ্গলাচরণে॥"

চৈঃ চঃ অন্ত্য খণ্ড ১ম পরিচ্ছেদ।

অতঃপর রামানন্দ ও শ্রীচৈতন্য রূপের কবিত্বের বিস্তর সুখ্যাতি করিলেন। চৈতন্য বলিলেন, "ইহাঁর সালঙ্কার কাব্য অতি-মধুর, এপ্রকার কবিত্বব্যতীত মাধুর্য্য রস প্রচার হওয়া অসম্ভব। তোমরা সকলে

কৃপা করিয়া রূপকে এই বর দাও,' যেন ইনি প্রেমরসময় ব্রজলীলা নিরন্তর প্রচার করিতে পারেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সনাতনের ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তি পৃথিবীতে অতিদুর্লভ। দীনতা, বৈরাগ্য ও পাণ্ডিত্য তাঁহাতেই সম্যকরূপে স্থিতি করিতেছে। এই দুই ভাইকে আমি ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্ত্তন করিবার জন্য বৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলাম।" রূপের প্রতি প্রভুর স্নেহ ও কৃপা দেখিয়া ভক্তমণ্ডলী সুখী হইলেন এবং প্রীতি প্রফুল্লহৃদয়ে সকলে রূপকে আলিঙ্গন করিলেন। বর্ষা চারি মাস অতিবাহিত হইলে অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ প্রভৃতি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। চৈতন্যদেব যতদিন নীলাচলে ছিলেন, ভক্তিরসপিপাসু গৌরগতপ্রাণ বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবগণ প্রেমসাগর গৌরের প্রেমানুরাগে আকৃষ্ট হইয়া প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময়ে নীলাদ্রিতে আসিতেন। অদ্বৈত প্রভৃতি নীলাচল পরিত্যাগ করিলে রূপ গোস্বামী হরিদাসের কুটীরেথাকিয়া উভয়ে কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে অতি আনন্দমনে কালযাপন করিতে লাগিলেন। দোলযাত্রা পর্য্যন্ত রূপ নীলাচলে অবস্থান করেন। তৎপরে গৌরচন্দ্র বলিলেন, "তুমি বৃন্দাবনে গিয়া রসশাস্ত্র নিরূপণ করিয়া ভক্তিরস প্রচার কর, এবং লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিয়া কৃষ্ণসেবা প্রচার কর। সনাতনকে একবার নীলাদ্রি আসিতে বলিও। তদনন্তর রূপ বঙ্গদেশ হইয়া বৃন্দাবন গমন করিলেন।

বৈদান্তিক প্রমাণতত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিষয় বা জ্ঞেয় সন্নিহিত থাকিলে, যদি কেহ তাহা বাক্য উচ্চারণ করিয়া প্রতীত করায়, তবে তাহা হইতেও (সেই বাক্য শ্রবণ হইতেও) অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। উদাহরণ—

দশ জন লোক একদা সন্তরণ দ্বারা নদী পার হইতেছিল। তাহারা নদীর পর-পার প্রাপ্ত হইয়া, সকলেই জীবিত আছে কি না জানিবার জন্য অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ১। ২ করিয়া আপনাদিগকে গণিতে লাগিল। দুঃখের বিষয় এই যে, যে যে গণিল—সকলেই মোহবশতঃ বা ভ্রান্তিবশতঃ আপনাকে বাদ দিয়া গণিল, কেহই আর আপনাকে গণিল না। সুতরাং ৯ জনের বিদ্যমানতা অবধারণ হইল—বহুবার গণিয়াও ১০ জন মিলিল না। গণনায় ১০ জন না মেলায় তাহারা এক জনের মৃত্যু অবধারণ করিয়া তাহার জন্য শোক করিতে প্রবৃত্ত হইল। কুম্ভীরে খাইয়াছে অথবা উঠিতে পারে নাই কিংবা ডুবিয়া গিয়াছে—স্থির করিয়া রোদন আরম্ভ করিলে জনৈক বুদ্ধিমান্ পথিক সেই স্থানে আগমন করিল এবং তাহাদিগকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। অনন্তর তাহারা আপনাদের ঘটনার কথা খুলিয়া বলিলে পথিক তাহাদের ভ্রান্তি অবগত হইয়া বলিল, ফের্ গণ দেখি। পথিকের কথায় তাহাদের এক জন পুনর্গণনা আরম্ভ করিল বটে; কিন্তু এবারও সে আপনাকে গণিল না, অন্য ৯ জনকে গণিল। এই সময়ে পথিক অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিল, তুমি দশম। "ত্বং দশমঃ—দশম তুমি" এই বাক্য শ্রবণের পর সেই গণয়িতার ভ্রান্তি বিদূরিত হইল; গণয়িতা তখন আপনার দশমত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া শোক পরিত্যাগ করিল।

উদাহরণের ফল এই যে, উক্ত দশমত্ব জ্ঞান বাক্য শ্রবণের অনন্তরোৎপন্ন হই-

লেও অপরোক্ষ রূপে উৎপন্ন হইয়াছিল। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, অন্যত্রও ঐ-রূপ হইয়া থাকে। সুখ বিদ্যমান আছে, অথচ তাহা ভ্রান্তি প্রতিবন্ধকে সাক্ষাৎ-হইতেছে না, এমত অবস্থায় যদি কেহ তাহা "ত্বং সুখী" বলিয়া প্রতীত করায়, তবে, সে প্রতীতি বা সে জ্ঞান অপ-রোক্ষ হইবেক। সংক্ষেপ নিষ্কর্ষ এই যে. বাক্য-জনিত জ্ঞানও কদাচিৎ অর্থাৎ বিষ-য়ের অবস্থা অনুসারে প্রত্যক্ষতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ধূম দর্শনের অনন্তর যে পর্ব্বতো বহ্নি-মান্—এই পর্ব্বত বহ্নিবিশিষ্ট, ইত্যাকার জ্ঞান হয়, সে জ্ঞানের এক অংশে পরোক্ষ এবং অপরাংশে অপরোক্ষ। বহ্ন্যংশে প-রোক্ষ ও পর্ব্বতাংশে অপরোক্ষ। জ্ঞানের যে অংশ অদৃষ্টচর বহ্নিকে বিষয় করে, ক্রোড়ীকৃত করে, সে অংশ পরোক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ থাকে, অবশিষ্টাংশ অপরোক্ষ অর্থাৎ প্রত্যক্ষতা প্রাপ্ত হয়। পর্ব্বতাবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও চক্ষুঃপথে বিনিঃসৃত অন্তঃকরণ বৃত্তি ও তদবচ্ছিন্ন চৈতন্য পর্ব্বত প্রদেশে এক বা অভিন্ন হইয়া যায় বলিয়াই পর্ব্বত বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান হয়। বহ্ন্যবচ্ছিন্ন ও অন্তঃকরণ-বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য তাদৃশ স্থলে এক বা অভিন্ন হয় না বলিয়া বহ্নি-বিষয়ে পরোক্ষ (অপ্রত্যক্ষ) জ্ঞান হইয়া থাকে। যেখানে বহ্নি আছে, মন বা অন্তঃকরণ সেখানে গিয়া বহ্ন্যাকার বৃত্তি ধারণ করে নাই, স্বস্থানে থাকিয়াই কল্পনার সাহায্যে বহ্ন্যাকার বৃত্তি ধারণ করিয়াছে, সেই কারণে চৈতন্যের প্রভেদ ও বহ্নির পরোক্ষতা ঘটিয়াছে, ইহা মনে রাখিতে হইবেক। যেখানে পর্ব্বত, অন্তঃকরণ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে সেইখানে গিয়া তদাকারাকারিত হইয়াছে, সুতরাং সেই পর্ব্বত প্রদেশস্থ পর্ব্বতাকারা মনোবৃত্তি দ্বিগুণিত চৈতন্যে সমুজ্জ্বলিত বা প্রতি-রঞ্জিত হওয়ায় স্পষ্টতাধিক্য বশতঃ পর্ব্ব-তের অপরোক্ষতা বা প্রত্যক্ষতা উৎপাদন করিয়াছে। লোকেও অনুভব করে, পর্ব্বত দেখিতেছি, বহ্নি অনুমান করিতেছি। বহ্নি দেখিতেছি, এরূপ অনুভব কেহই করে না। অনুমিতি জ্ঞান মাত্রেই পরোক্ষ, এ প্রসিদ্ধি এতন্মতে বহ্ন্যংশে সংরক্ষিত হইতে পারে কিন্তু ন্যায় মতে পর্ব্বতাংশেও পরোক্ষ জ্ঞান হওয়ার আপত্তি হয়। তাঁ-হারা পর্ব্বতো বহ্নিমান্, এই জ্ঞানকে এক জ্ঞান বলেন, সুতরাং তাহা ঐরূপ আপ-ত্তির কারণ হয়। নিষ্কর্ষ এই যে, অনুমিতি জ্ঞানের বিষয় (অনুমেয় বস্তু) মাত্রেই অসন্নিকৃষ্ট থাকে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচরে থাকে না, সেই কারণে তাহা পরোক্ষ থাকে।

চন্দন-খণ্ড দর্শনের পর যে "সুগন্ধ চন্দন" এতদ্রূপ জ্ঞান হয়, সে জ্ঞানও পরোক্ষাপরোক্ষ উভয়াত্মক। সৌগন্ধ্যাংশে পরোক্ষ এবং চন্দনাংশে অপরোক্ষ। (গন্ধ অনুমেয় ও চন্দন প্রত্যক্ষ) গন্ধ পদার্থ চক্ষু-র্গ্রাহ্য নহে বলিয়াই তদংশে পরোক্ষ জ্ঞান হয়।

দেখিতেছি, এইস্থলে নৈয়ায়িক আ-পত্তি করিবেন। নৈয়ায়িক বলিবেন, একই জ্ঞানে পারোক্ষ্য ও অপারোক্ষ্য মান্য করিতে গেলে জ্ঞানের জাতিত্ব নষ্ট হয়। সাংকর্য্য অন্যতম জাতিবাধক; সুতরাং ঐ দ্বৈরূপ্য রূপ সাংকর্য্য জ্ঞানত্ব জাতির বাধক প্রমাণ। এ বিষয়ে বৈদা-ন্তিকের প্রত্যাপত্তি (নৈয়ায়িকের আপ-ত্তির খণ্ডন) এই যে, জাতিত্বের বাধ হইলে ক্ষতি কি? জাতি না থাকাই বৈদান্তিক-দিগের ইষ্ট। জাতি, উপাধি, এ সকল

নৈয়ায়িকদিগের পরিভাষা মাত্র, কথা মাত্র, বস্তুতঃ ঐ সকলের অভিধেয় খ-পুষ্পবৎ। ঐ সকল সর্ব্বথা সর্ব্ব প্রমাণের অগোচর অ-র্থাৎ অসিদ্ধ। ফলিতার্থ—জাতি ও উপাধি প্রভৃতি প্রামাণিক নহে; বাক্‌চাতুর্য্য মাত্র। ঘটোঽয়ং—এই ঘট,—ইত্যাকার প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা সাক্ষাৎ অনুভব ঘট থাকার ও ঘটত্ব থাকার প্রমাণ সত্য; কিন্তু সেই ঘটত্ব যে জাতি নামক সৎপদার্থ, তদ্বিষয়ে প্রমাণ নহে। জাতি নিতান্তই অপ্রসিদ্ধ। সে জন্য তাহাতে অনুমান-প্রমাণও স্থান প্রাপ্ত হয় না। নৈয়ায়িক যাহাকে জাতি বলেন তাহা এই—"যাহা নিত্য অথচ বহু সমবেত, তাহাই জাতি।" সমবেত অর্থাৎ সম-বায় সম্বন্ধে অবস্থিত। এই যে ন্যায়-সম্মত জাতিলক্ষণ, এ লক্ষণ ঘটত্বে নাই। প্রথমতঃ দেখা যায়, সমবায় সম্বন্ধই অসিদ্ধ অর্থাৎ কাল্পনিক কথা মাত্র। প্রমাণসিদ্ধ নহে। দ্বিতীয়তঃ, বেদান্ত মতে ব্রহ্ম ভিন্ন সমুদায় পদার্থ অনিত্য। সুতরাং বেদান্তীর প্রতি নিত্যত্ব সমবেতত্ব ঘটিত জাতিলক্ষণের লক্ষ্য দেখান নিতান্ত দুঃসাধ্য বা সাহস মাত্র। ন্যায় মতের "উপাধি" পরিভাষাও ঐরূপ জানিবে।

নিষ্কর্ষ। অনুমিতি স্থলে অনুমেয় প-দার্থে চক্ষুরাদির সংযোগ না হওয়ায় অন্তঃ-করণ অনুমেয় প্রদেশে গমন করে না সুতরাং তৎপ্রদেশে তদাকার বৃত্তি হয় না। তাহা না হওয়ায় অনুমেয়পদার্থাবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও অন্তঃকরণ-বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন বা প্রমাতৃ-চৈতন্য এক বা অভিন্ন হইতে পারে না। তাহা না পারাতেই অনুমেয় পদার্থের সত্তা ও প্রমাতার সত্তা পৃথক ভাবে অব-স্থিতি করে। এইরূপ পৃথগবস্থানই অনু-মেয় পদার্থের পারোক্ষ্য ঘটনার কারণ।

প্রশ্ন। ধর্ম্মাধর্ম্ম নিত্য পরোক্ষ। উক্ত উভয় কস্মিন্ কালে কাহারও প্রত্যক্ষ-গোচর হয় না। প্রসিদ্ধই আছে, তাহা অনুমান প্রমাণ ব্যতীত অন্য প্রমাণের গোচর নহে। কিন্তু যেরূপ প্রত্যক্ষ-লক্ষণ বর্ণিত হইল, তাহাতে সে সকল পরোক্ষ থাকা অসম্ভব। অনায়াসেই আপত্তি করিতে পারি, উক্ত উভয় প্রত্যক্ষ না হয় কেন? যে স্থানে অন্তঃকরণ সেই স্থানেই ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুতরাং ধর্ম্মাদি-অবচ্ছিন্ন ও প্র-মাতৃ-অবচ্ছিন্ন (অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন) চৈতন্য তৎপ্রদেশে এক বা অভেদ। অপিচ, ধর্ম্মাদির সত্তাও প্রমাতৃসত্তার অনতিরিক্ত। ধর্ম্মে ইন্দ্রিয়পাত না হইলেও বহিশ্চিহ্ন অনুসারে তদ্বিষয়িণী বৃত্তি অনুমিতির দ্বারা জন্মিতে পারে, বৃত্তি হইলেই ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন ও তদ্‌বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য এক হইয়া যায়, চৈতন্য এক হওয়ায় ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রত্যক্ষতা আপত্তি অবশ্য হইতে পারে।

প্রত্যুত্তর। বিষয়াংশে "যোগ্য" বি-শেষণ দিতে হইবেক। অর্থাৎ যোগ্য বিষ-য়ই প্রত্যক্ষ হয়। ধর্ম্মাধর্ম্ম স্বতঃ পরোক্ষ-স্বভাব; সেই জন্য তাহা প্রত্যক্ষের অযোগ্য বা প্রত্যক্ষ হয় না। যাহা প্রত্যক্ষযোগ্য তাহাই প্রত্যক্ষ হয়, যাহা অযোগ্য তাহা প্রত্যক্ষ হয় না। "রূপী ঘটঃ—এই ঘটটী রূপবিশিষ্ট" ইত্যাকার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, অথচ তাহার পরি-মাণ অপ্রত্যক্ষ থাকে। রূপ ও পরিমাণ একই প্রদেশে একই ঘটে বিরাজিত, রূপাবচ্ছিন্ন চৈতন্য ও পরিমাণাবচ্ছিন্ন চৈতন্যও সেস্থানে অভিন্ন, তদুভয়ের সত্তাও প্রমাতৃসত্তার অনতিরিক্ত, অথচ রূপ প্রত্যক্ষ হয়, পরিমাণ অপ্রত্যক্ষ থাকে। কেন থাকে? রূপপ্রত্যক্ষের সঙ্গে পরি-মাণ প্রত্যক্ষ হওয়াই-ত উচিত? অথচ

তাহা হয় না। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, পারিমাণাকার বৃত্তি হয় নাই বলিয়াই পরিমাণ প্রত্যক্ষ হয় নাই। যে স্থলে চিত্ত বিষয়াকারাকারিত হয় সেই স্থলেই বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়। রূপাকার বৃত্তিকালে পরিমাণাকার বৃত্তি হয় নাই, বৃত্তি না হওয়াতে পরিমাণের সত্তা প্রমাতৃসত্তা হইতে পৃথক্‌ভূত থাকিয়া যায়, পৃথক্‌ভূত থাকাতেই পরিমাণ আত্মচৈতন্যোজ্জ্বলিত অন্তঃকরণ বৃত্তির অপ্রকাশিত থাকে।

যে বস্তু যেরূপ, মন ঠিক্ সেইরূপ বা তদাকার প্রাপ্ত হওয়ার নাম বৃত্তি এবং বৃত্তিরই অন্য নাম জ্ঞান। বৃত্তি হওয়াই যদি প্রত্যক্ষের কারণ হয় এবং বৃত্তি না হইলে যদি বিজ্ঞেয় পদার্থ অজ্ঞাত থাকে, তাহা হইলে বৃত্তিরও বৃত্তি হওয়া আবশ্যক। নচেৎ বৃত্তি প্রত্যক্ষ হইবেক না। তাহা অজ্ঞাত থাকিবেক। কিন্তু জ্ঞানের জ্ঞান হওয়া সর্ব্ববাদিসম্মত। (জানা হইয়াছে, এইরূপ অনুভবই জ্ঞানের জ্ঞান। বৃত্তিজ্ঞান সকল মূল চৈতন্যাত্মক সাক্ষীর জ্ঞেয় হয় বলিয়া ঐরূপ অনুভব বা জ্ঞানের জ্ঞান হইয়া থাকে।) জ্ঞানের জ্ঞান ও বৃত্ত্যাকার বৃত্তি সমান কথা। যদি বৃত্তি বা জ্ঞান জানিবার জন্য বৃত্ত্যন্তরের (জ্ঞানান্তরের) অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলে সে বৃত্তি জানিবার জন্যও অন্য বৃত্তির জন্ম স্বীকার করিতে হইবে। তাহা করিলে এক বৃত্তি জানিবার জন্য অন্য বৃত্তি, পুনরপি সে বৃত্তি জানিবার জন্য অন্য বৃত্তি, এইরূপ অনন্ত প্রবাহ উপস্থিত হইবে এবং সে প্রবাহ অনবস্থা নামক দোষ। অনবস্থা দোষ প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিবার বাধা জন্মায়। যদিও অনবস্থাভয়ে বৃত্তিবিষয়িণী বৃত্তি অস্বীকার করি, করিলেও জ্ঞানপ্রত্যক্ষে স্বাকাররূত্ত্যপহিতত্বঘটিত প্রত্যক্ষ লক্ষণ নাই বা থাকে না, এ কথা বাচ্য নহে। কারণ, বৃত্তির বৃত্ত্যন্তরপ্রকাশ্যতা (জ্ঞানের জ্ঞানান্তরপ্রকাশ্যতা) অস্বীকার করিলেও কিংবা না থাকিলেও স্বপ্রকাশ্যতা থাকায় জ্ঞানপ্রত্যক্ষেও স্ববিষয়ক বৃত্ত্যুপহিতত্ব ঘটিত লক্ষণ সঙ্গত হইতে পারে। অন্তঃকরণ ও অন্তঃকরণনিষ্ঠ ধর্ম্মনিচয় কেবল সাক্ষিবেদ্য (সাক্ষী চৈতন্যের প্রকাশ্য) সুতরাং সে সকলের তদনুরূপা বৃত্তি উদ্ভবের অপেক্ষা নাই। তাহা যখন নাই, তখন আর অনবস্থাদোষ ও লক্ষণের অব্যাপ্তিদোষ হইবে কেন? অন্তঃকরণ ও অন্তঃকরণের ধর্ম্মজ্ঞানাদি কেবল সাক্ষিবেদ্য—সাক্ষিচৈতন্যের বা মূল-আত্ম-চৈতন্যের প্রকাশ্য—এ কথার অর্থ বা তাৎপর্য্য অন্য কিছু নহে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ও অনুমানাদি প্রমাণের বিনা সাহায্যে অর্থাৎ ঐ সকলের দ্বারা বৃত্ত্যুদ্ভব না হইয়া প্রকাশ প্রাপ্ত হওয়াই সাক্ষিবেদ্য কথার অর্থ। আচার্য্য শঙ্কর স্বামী প্রভৃতি বলিয়া গিয়াছেন যে, নিরুপলক্ষ্যে অর্থাৎ বিনা ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারে "অহং-আমি" ইত্যাকার অন্তঃকরণ-বৃত্তি উদ্ভূত হইতেছে। (অহংবৃত্তিযুক্ত অন্তঃকরণ মূল-আত্মচৈতন্যের ভাষ্য, বিষয় বা প্রকাশ্য হইতেছে।) সর্ব্বজ্ঞ মুনি প্রভৃতি সাম্প্রদায়িকগণও প্রাতিভাসিক রজতস্থলে (প্রাতিভাসিক—ভ্রান্তিসমুদ্ভূত) রজতাকারা অজ্ঞানবৃত্তি হওয়ার কথা বলিয়া গিয়াছেন। এ সকল সত্তে সাক্ষিবেদ্য (মাত্র আত্মচৈতন্যের প্রত্যক্ষযোগ্য) অন্তঃকরণ ও অন্তঃকরণনিষ্ঠ ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতিতে উক্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণ অব্যাপ্ত হইবার নহে।

সমুদায় কথার সার সংগ্রহ এই যে, অন্তঃকরণ সেই সেই পদার্থের আকারে আকারিত অর্থাৎ তদাকারে পরিণত হইলে তাহা "স্বাকার-বৃত্তি" নামে অভিহিত হয়।

সেই স্বাকারবৃত্তির প্রকাশক আত্ম-চৈতন্য অথবা চৈতন্যপ্রতিফলিত (উজ্জ্বলিত) সেই স্বাকারবৃত্তি প্রমাতৃ-চৈতন্য নামে খ্যাত। যদি এই প্রমাতৃ-চৈতন্যের সহিত বিষয়ের সমসত্তাকতা ঘটনা হয়, আর বিষয়ে যদি প্রত্যক্ষ হইবার যোগ্যতা (সামর্থ্যবিশেষ) থাকে, তাহা হইলে তাদৃশ বিষয়ে বা পদার্থে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে।

(ক্রমশঃ)

গীতামাহাত্ম্য।

(হিন্দুবঙ্গিকা হইতে উদ্ধৃত।)

ভগবদ্গীতার ন্যায় ধর্ম্মগ্রন্থ ভূমণ্ডলে আর নাই। যে জাতির এমন ধর্ম্মগ্রন্থ আছে সে জাতি পৃথিবীর মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়ে অত্যন্ত উচ্চ পদবী দাবি করিতে পারে তাহার সন্দেহ নাই। হিন্দুকুলগৌরব কোন মহাত্মা * বলিয়াছিলেন—"ভগবদ্গীতা মানে না যে তার কথা শুনিবে কে।"

সঞ্জয় গীতাসম্বাদ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "অদ্ভুতং লোমহর্ষণং"। বাস্তবিক যখন আমরা শান্ত সমাহিত চিত্তে গীতাপাঠ করি তখন লোমহর্ষণ না হইয়া থাকে না। অর্জ্জুন গীতাসম্বাদ শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥"

এখনও অচ্যুত ভগবান আমাদিগের হৃদয়স্থিত হইয়া আমাদিগকে গীতাবাক্যে উপদেশ দিতেছেন, সেই বাক্য শুনিয়া আমরা যখন অর্জ্জুনের ন্যায়—

* রাজা রামমোহন রায়।

"নষ্টোমোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনংতব॥"

তাঁহাকে বলিতে ও বলা অনুযায়ী কার্য্য করিতে সক্ষম হইব তখন আমরা মানবজন্মের সার্থকতা লাভ করিব। গীতা আমাদিগকে ব্রহ্মভূত অর্থাৎ ব্রহ্ম-পদার্থ হইতে উপদেশ দিতেছেন! 'মদ্ভাবমাগতাঃ' বহু জ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা পবিত্র হইয়া যখন আমরা ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হই তখন মানব জীবনের উদ্দেশ্য সম্পাদিত হয়। গীতা আমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন যে জগতে মনুষ্যের একমাত্র কার্য্য ঈশ্বরের সহিত অব্যাহত ও চিরস্থায়ী যোগ। "যথা দীপোনিবাতস্থঃ" যখন যোগে নিবাত প্রদেশস্থ দীপের ন্যায় মন অচঞ্চল ভাব ধারণ করিবে "নিষ্কম্পমিব প্রদীপং" তখন আমরা পরম অবস্থা প্রাপ্ত হইব। তখন আমরা জীবন্মুক্তি লাভ করিব। যোগই মানবের এক মাত্র কার্য্য; বিষয় অলস রাখিবার স্থান মাত্র। বাউলেরা যথার্থ বলিয়াছেন,

"বিষয় বালিসে অলস রেখো।
চেতন থাকে যেন ঘুমাইও না॥"

চক্রপাণী উদ্ধৃত একটি চমৎকার শ্লোক আছে।

"পুংখানুপুংখবিষয়েম্বনুতৎপরোপি।
ধীরো ন মুঞ্চতি মুকুন্দপদারবিন্দং॥
সঙ্গীতনৃত্যকৃতিতানবশং গতাপি
মৌলিস্থকুম্ভপরিরক্ষণধীর্নটীব।"

পুংখানুপুংখ বিষয়ে তৎপর হইয়াও ধীর ব্যক্তি মুক্তিদাতা পরমেশ্বরের পদ বিস্মৃত হয়েন না। কিরূপ যেমন বুদ্ধিমতী নটী সঙ্গীত ও নৃত্য করিবার সময় আপনার মস্তকস্থিত জলপূর্ণ কুম্ভ বিস্মৃত হয় না। সঙ্গীত ও নৃত্যের নিয়ম অতি কঠিন, সেই সকল নিয়ম পালন পূর্ব্বক সঙ্গীত ও নৃত্য করিয়াও নটী মস্তকস্থিত

জলপূর্ণ কুম্ভ বিস্মৃত হয় না। তেমনি ভক্ত সাংসারিক কঠিন কার্য্য সকল করিয়াও ঈশ্বরকে বিস্মৃত হয়েন না। ভক্ত পুংখানুপুংখ রূপে বিষয়কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াও বিষয়কে তাঁহার অলস রাখিবার স্থান মাত্র জ্ঞান করেন। তাঁহার প্রকৃত বিষয় কার্য্য ঈশ্বরের সহিত যোগ। সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন সময়েও তাঁহার মন ঈশ্বরে সমর্পিত থাকে। যেমন, আমরা যাহা ভাবি না কেন, যাহা করি না কেন, আকাশের অস্তিত্ব বোধ আমাদিগের মনে সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে সেইরূপ ভক্ত যাহা করুন না কেন, সকল বস্তুতে বিশেষতঃ আত্মাতে ঈশ্বরের বিদ্যমানতা তাঁহার সর্ব্বদা জাগরূক থাকে।

সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ।

যোগী সকল ভূতে ঈশ্বরকে দেখেন ও সকল ভূতকে ঈশ্বরে দেখেন। যোগী আপনাকে সর্ব্বদা বাহ্য জগত, শরীর এবং রিপু ও কামনার আধার মন হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ও অনন্ত পরিমাণে মহৎ জ্ঞান করেন। তিনি তাহাদিগকে অনাত্মীয় জ্ঞান করেন। কেবল আত্মাই তাঁহার আত্মীয়। তিনি আত্মা ব্যতীত সকল বস্তুকে বখেড়া * জ্ঞান করেন। বখেড়া জ্ঞান করিয়াও তিনি সাংসারিক কার্য্য সকল সম্পাদন করেন। যেহেতু সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন ঈশ্বরের আদিষ্ট ও মনুষ্যের কর্ত্তব্য এবং যেহেতু—

"ন ক্ষণমপি কশ্চিৎ তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।"

কেহ একক্ষণও অকর্ম্মকৃৎ হইয়া থাকিতে পারে না। এই জন্য গীতা আদেশ করিতেছেন,

"নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং" "ততস্ত কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে।"

* মিথ্যা।

"নিয়ত কর্ম্ম কর।" "কর্ম্মত্যাগ হইতে কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ।" ভক্ত সকল কর্ম্ম ঈশ্বরোদ্দেশে করেন, কার্য্য সকলের ফলাফল তাঁহাতেই সমর্পণ করেন। ব্রহ্মেতে সকল কর্ম্ম অর্পণ করিয়া কর্ম্ম করেন বলিয়া তিনি পাপেতে লিপ্ত হয়েন না।

"ব্রহ্মণ্যাধ্যায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥"

যিনি ঈশ্বরোদ্দেশে সকল কর্ম্ম করেন তিনি কি প্রকারে পাপ করিতে পারেন? বাহ্য জগত শরীর ও মনের অধীনতা হইতে আত্মাকে বিযুক্ত করা যোগের পরম উদ্দেশ্য। ইহা শীঘ্র হয় না, ইহার জন্য অনেক সাধন আবশ্যক। ইহা এক প্রকার কুস্তি। বাহ্য জগৎ শরীর ও মনের অধীনতা হইতে আত্মার বিমুক্তিই প্রকৃত মুক্তি। চেষ্টা করিলেই ইহা ইহজীবনেই লাভ করা যাইতে পারে। প্রকৃত ভক্ত যোগস্থ হইয়াও অবিশ্রান্তরূপে কর্ম্ম করেন। "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি।" তিনি যোগস্থ হইয়া পরোপকারজনক কার্য্যে নিয়ত রত থাকেন। "সর্ব্বভূতহিতে রতঃ" তিনি নিষ্কাম হইয়া পরোপকারজনক কার্য্য করেন। অন্য কার্য্য অপেক্ষা কোন পরোপকারজনক কার্য্যের চেষ্টা নিষ্ফল হইলে সাধু ব্যক্তি যেমন মনে কষ্ট প্রাপ্ত হয়েন, তেমন অন্য কোন কার্য্যের নিষ্ফলতাতে হয় না। কিন্তু সে কষ্ট ক্ষণস্থায়ী যেহেতু তিনি কেবল কর্ত্তব্য বলিয়া সকল কর্ম্ম সম্পাদন করেন, ফলাফল ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করেন।

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

ভগবদ্গীতা জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য সম্পাদন করিতে উপদেশ দেন। এই সামঞ্জস্য সম্পাদনের উপদেশ গীতার একটি প্রধান মাহাত্ম্য।

গীতার আর একটি প্রধান গৌরবের বিষয় এই যে তিনি বাহ্য জগৎ শরীর ও মনকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া এবং অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া আত্মাকে কেবল পরমাত্মাতে নিমগ্ন করিতে আমাদিগকে উপদেশ দেন।

অহংভাব আমাদিগের সকল অনর্থের মূল। অহংভাব একেবারে আমাদিগের পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যদি আমি ঈশ্বর হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইতাম তবে আমি কি করিতে পারিতাম এইরূপ সর্ব্বদা মনে করা কর্ত্তব্য। পাপ ছাড়া আমি যাহা কিছু করিতেছি সকলই সেই ঈশ্বরের আশ্রয়ে করিতেছি, সকলই ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া করিতেছি এই ভাব সর্ব্বদা আমাদিগের মনে জাগরূক থাকা কর্ত্তব্য। যখন এক মাত্র তাঁর আশ্রয়ে তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া কাজ করিতেছি তখন আমার কিছু মাত্র কর্ত্তৃত্ব নাই। যখন তিনি আছেন তখন আমি কে? তাঁহার নিকটে আমি কিছুই নহি। ভক্ত যাহা যাহা কর্ম্ম করেন সকলই ঈশ্বরে অর্পণ করেন। আমি উপরে বলিয়াছি যে পাপ ছাড়া আমি যাহা করিতেছি তাহা ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া করিতেছি, ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বাধীন করিতেছি। যখন গীতা আমাদিগকে "অকল্মষ" অর্থাৎ নিষ্পাপ হইতে বলিতেছেন তখন ঈশ্বর পাপকার্য্য অনুমোদন করেন ইহা কখনই গীতার মত হইতে পারে না। যখন বাহ্য জগৎ উড়িয়া গেল, মন উড়িয়া গেল, অহংজ্ঞান উড়িয়া গেল, যখন জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞান এক হইল তখন ঈশ্বরই সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। এইরূপ ভক্তের অস্তিত্ব হরণ তাঁহার প্রতি ভগবানের উচ্চতম কৃপা। ইহাকে গীতা ব্রহ্মনির্ব্বাণ শব্দে আখ্যাত করিয়াছেন। ইহাই যোগের পরাকাষ্ঠা, ইহাই গীতার চরম উপদেশ।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

প্রভাত চিন্তা।

(গত জ্যৈষ্ঠ মাসের পত্রিকার ৩৬ পৃষ্ঠার পর।)

অদ্য ঈশ্বরের আহ্বান শ্রবণ করিয়া তুমি একান্তে তাঁহার পথের পথিক হও। বিগত জীবনে তুমি যে সকল অপরাধ, ক্ষমতা সত্ত্বে সৎকর্ম্ম করণে আলস্য ঔদাস্য বৃথা কাল হরণ প্রভৃতি শত শত ত্রুটী করিয়াছ, তজ্জন্য স্মৃতি তোমাকে কণ্টকিত করিতেছে কিন্তু "যাঁর দয়া মুখে বলা নাহি যায়" তিনি অধম তারণ পতিত পাবন, তাঁর নিকট কৃত পাপ জন্য ক্রন্দন করিয়া তাঁর পথে প্রত্যাবৃত্ত হও, তিনি এখনি তোমাকে তাঁহার অভয় ক্রোড়ে স্থান দান করিবেন। অদ্য মনে দৃঢ়রূপে প্রতিজ্ঞা কর যে ঈশ্বরকে নয়নে নয়নে রাখিয়া তাঁহার প্রীতির জন্য সাংসারিক কার্য্য ও পরসেবায় প্রবৃত্ত থাকিবে। জীবন অনিত্য, অদ্যই তোমার মৃত্যু হইতে পারে অতএব সেই সেই কার্য্য ও সেবা করিবার সময় উহা জীবনের শেষ দিনের কর্ম্ম মনে করিয়া প্রেম ও ভক্তি সহকারে সংযত মনে সম্পন্ন করিবে। অদ্য যদি তুমি উপদেশ বাক্য দ্বারা কাহারও চিত্তে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি-বীজ রোপণ করিতে পার, তাঁহার প্রতি—ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ উদ্রিক্ত করিতে পার, যদি কোন ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন বা তৃষ্ণার্ত্তকে জল দান করিতে পার তাহা হইলে কি তোমার অদ্যকার জীবন সফল হয় না? পরম মাতা তাঁহার কোন না কোন সন্তানের উপকার করিলে বলিয়া তোমাকে কি তজ্জন্য আশীর্ব্বাদ করিবেন না?

মহৎকার্য্য করিবার শক্তি অনেকেরই জীবনে সংঘটিত হয় না। কবি হইয়া মনোহর কান্ত পদাবলীসমন্বিত সুমধুর ভাবোপদেশ প্রদান দ্বারা লোকের মনোহরণ করা, তাহাদিগের চিত্তকে অসার

বিষয় হইতে সমাকৃষ্ট করিয়া অননুভূত-পূর্ব্ব প্রেম ও সৌন্দর্য্য রাজ্যে লইয়া যাওয়া, গ্রন্থকার হইয়া মনুষ্য-জন্ম-সাফল্য-কর উৎকৃষ্টতর মার্গে মানুষের চিন্তাস্রোত প্রবর্ত্তিত করা, স্বদেশের চিরনিহিত অভাব ও দুঃখ বিমোচন করা—কয় জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে? কিন্তু সংসারী ব্যক্তি মাত্রকেই প্রতি দিন পরের সহিত ব্যবহারাদি সম্বন্ধে অনেকগুলি কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে হয়; লোকের সহিত ব্যবহারাদি কালে ঈশ্বর কি তোমাকে সমদর্শী হইয়া সকলের সহিত সপ্রেম ও সদুদার ভাব রক্ষা করিতে বলিতেছেন না? তাহারা তোমার ইচ্ছার বিরোধী হইলেও নিজের কিঞ্চিৎ স্বার্থ ত্যাগ করিয়া যদি তুমি তাহাদিগের মনস্তুষ্টি সাধনে যত্নবান হও, কাহাকেও একটু কটু বাক্য প্রয়োগ না কর, কাহারও প্রতি ক্রোধ দ্বেষ গর্ব্ব অবজ্ঞাযুক্ত একটী কটাক্ষও বিক্ষেপ না কর, ন্যায় সত্য ক্ষমা দয়া অবলম্বন করিয়া যদি কাহারও বিন্দু মাত্র অনিষ্ট না করিয়া বরং ইষ্ট-সাধন কর; নিরভিমান বিনীত শান্ত ও সুমিষ্ট আচরণ দ্বারা এক জনেরও প্রীতি উৎপাদন বা মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হও তবে তোমার অদ্যকার দিন বিফলে যাইবে না। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিত্য কর্ত্তব্য গুলি যেন আমরা অমায়িক ও প্রেম ভাবে সম্পাদন করি। এ বিষয়ে ঈশ্বর যেন আমাদিগের আদর্শ হয়েন। তিনি বৃহৎ-কায় তিমি মৎস্যের দেহে যেরূপ যথোপযুক্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিনিযোজনা ও তাহার দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রের প্রক্রিয়া সাধনের যেরূপ সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন একটী পিপীলিকা বা ক্ষুদ্রতম কীটাণুর শরীর নির্ম্মাণে ঐরূপ রচনা-পারিপাট্যের বিন্দু মাত্র খর্ব্বতা করেন নাই। প্রত্যেকের দেহযন্ত্র তাঁহার অপার মঙ্গল ও অদ্ভুত রচনা কৌশলের একশেষ বলিয়া পরিলক্ষিত হয়। অতএব আমরা যেন ঈশ্বরকে আদর্শ করিয়া কি ক্ষুদ্র কি মহৎকার্য্য সর্ব্ব-প্রাণ ও সর্ব্বপ্রযত্নে সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত থাকি। যিনি স্বীয় জীবনের নিত্য কর্ত্তব্য সামান্য কার্য্যগুলি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করেন, তিনিই ঈশ্বর কর্ত্তৃক মহৎ কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হয়েন।

যে কার্য্য সৎ ও আমার করণীয় তাহার কিঞ্চিৎ যেন অদ্য সম্পাদন করি, যে জ্ঞান লভনীয়, যাহা দ্বারা আমার নিজের ও পরের উপকার হইতে পারে এমত জ্ঞান যেন কিছু উপার্জন করি, যে কার্য্য পরিবর্জনীয় তাহা হইতে যেন সর্ব্বথা দূরে থাকি, যে শুভ কার্য্য অনায়াসে করিতে পারি তাহা করিতে যেন অবহেলা না করি। অদ্য যেন মনে জাগরূক থাকে যে ঈশ্বর অদ্যকার প্রত্যেক মুহূর্ত্ত আমাদিগের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছেন। আমরা সেই মুহূর্ত্ত গুলির যেরূপ ব্যবহার করি তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট দায়ী, প্রত্যহ এরূপ ভাবিয়া কর্ম্ম করিতে পারিলে তবে আমাদিগের ধর্ম্মোন্নতি হইবে।

ধর্ম্মপদবীতে স্থির হইয়া দণ্ডায়মান থাকিবার সম্ভাবনা নাই, হয় অগ্রসর নচেৎ পশ্চাৎপদ হইতে হইবে। নিজের কুপ্রবৃত্তির—সাংসারিকতার সহিত সংগ্রাম করিয়া অদ্য তাহারদিগকে যথোচিত সংদমিত করিতে হইবে, নচেৎ তাহারা আমাদিগের উপর প্রভুত্ব করিতে পারে। ঈশ্বরের আদেশ এই যে আমরা দিন দিন পার্থিব হৃদয়গ্রন্থি সকল ছিন্ন করি ও তাঁহার সহিত দৃঢ় বন্ধনে হৃদয়কে সংবদ্ধ করি, তাহাকে প্রাণ মন সর্ব্বস্ব অর্পণ করি।

অদ্য যেন নিয়মিতরূপে ঈশ্বরোপাসনা তাঁহার ধ্যান ও ধারণাতে নিযুক্ত থাকি, তাঁহার প্রতি প্রীতি ও ভক্তি রসার্দ্র চিত্ত হইলে আমরা তাঁহার আহ্বান-বাণী শ্রবণ করিতে উৎকর্ণ থাকিব, ও তাহা শ্রবণ করিয়া প্রাণপণে তদনুসরণ করিব। অদ্য যেন অধিকাংশ সময় ঈশ্বরের সহিত যোজিত-চিত্ত হইয়া যাপন করি, যেহেতু তাঁহার সহিত সংযুক্ত হইলে জীবন মধুময় হয়, ও তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে কেবলই বিষাদ ও মোহের ঘনান্ধকার। যেন অদ্য তাঁহার চরণ ছাড়া না হই।

তাঁহার পরিচয়।

এই ভয়াবহ সংসারে তাঁহার মত নির্ভর স্থান আর কিছু নাই। চতুর্দ্দিকে যেরূপ শোকসন্তাপ দুঃখ বিপত্তি তাহাতে এক একবার প্রাণ অর্দ্ধ-উন্মত্তের ন্যায় হইয়া যায়। সেই অর্দ্ধোন্মত্ত অবস্থায় ইহাকে বিশ্বাস করি উহাকে বিশ্বাস করি বিশ্বাসের একটা কোন ঠিকঠিকানা থাকে না। না থাকাতে সেই বিশ্বাসহীন প্রাণে আমরা মূলহীন তরুর ন্যায় ভূতলে পড়িবার উপক্রম করি, এমন সময়ে দিব্যচক্ষে দেখিতে পাই তিনি আমাদের পড়িতে দিতেছেন না, দণ্ডদ্বারা পতনে বাধা দিতেছেন। তখন আমাদের চক্ষু তাঁহার দিকে চায়, ভক্তিভরে প্রীতিভরে তাঁহার দিকে চাই; যথার্থ অন্তঃকরণের সহিত তাঁহাকে তখন পরমবন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিয়া সেই বিশুদ্ধ আলিঙ্গন-জনিত পরমানন্দ উপভোগ করি। উচ্ছ্বসিত হইয়া সেই আনন্দ যাহাকে পাই, দৃষ্টান্তের দ্বারা, রচনা দ্বারা, কার্য্যকৌশলের দ্বারা বুঝাইতে যাই, দেখি সহজে সে বুঝিয়া ওঠে—কেন সে বুঝিবে না? সেও মানুষ। তাহার ধ্বনির সহিত আমার ধ্বনি এক হইয়া যায়, মনুষ্যত্বের মধুর মিলন-সঙ্গীত তৎকালে অপূর্ব্ব আকারে রচিত হয়। সে সঙ্গীত তবে আমাদের জীবনের যথার্থ উপাদেয় সামগ্রী হয়; সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান হইয়া আমাদের মোহান্ধকার বিনষ্ট করে; আমরা আলোক লাভ করিয়া জগতের চারিধার দেখিয়া স্বীয় অহঙ্কার দূর করি। অহঙ্কারশূন্য হইয়া বিনীতভাবে পরোপকারে ব্রতী হই, নিঃস্বার্থেই স্বার্থ দেখিতে পাই। প্রবৃত্তির মধ্যে থাকিয়া নিবৃত্তির পরিমল উপভোগে সমর্থ হই। প্রবৃত্তি আমাদের একেবারে দুর্ব্বল করিতে পারে না।

এই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দুইটী সহোদর ভ্রাতৃসদৃশ। দুই জনের মধ্যে সদ্ভাব থাকা চাই। তাহা হইলেই রক্ষা। আর তাহা না হইলে ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হইলে সংসার ছারখার হইয়া যায়। উভয়ের কোনটাই পৃথক ভাবে সংসার রক্ষা করিতে পারে না। দুইটী দুই মেরুর সমান। একটী উত্তর মেরু এবং আর একটী দক্ষিণ মেরু। উভয়ই হিম-ঘোর জীবন-বিরহিত। সুতরাং আমাদের সংসার রক্ষায় প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির মধ্যপথ আবশ্যক করে। দুয়ের মধ্য পথেই গার্হস্থ্য ধর্ম্ম বিরাজ করে। এই মধ্য পথেই সেই বিষ্ণুর পরমপদ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই মধ্য পথে সমুদয় স্থিতিলাভ করে। এই মধ্যপথে আমাদের প্রাণমন সকলি আকৃষ্ট করিয়া মাধ্যাকর্ষণ-জনিত বলপ্রভাবে আমরা যথার্থ উন্নতি লাভে সমর্থ হই, আমাদের তেজ সংযত সংহত ভাব ধারণ করে। তখন ঈশ্বর যেমন জগতে থাকিয়াও আপনার মহিমাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিঃশব্দে জগতের

কার্য্য করিতেছেন সেইরূপ আমরাও সেই সংহত তেজে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যেন নীরবে জগতের কার্য্য করি। মঙ্গলময় পরমেশ্বর চাহেন যে তাঁহার সন্তানেরা তাঁহার অনুকরণ করিয়া সংসারে বিচরণ করুক। তাঁহার এই ইচ্ছা। ইহা করিলেই আমাদিগের মঙ্গল। তাঁহার অনুকরণেই আমাদের যথার্থ মনুষ্যত্ব জন্মায়। আমাদের এত এই সব দুঃখ দারিদ্র্য থাকিতে পায় না। কিন্তু আমরা অনেক সময়ে করি না, বিষয়-মদে মত্ত হইয়া অহঙ্কারী হইয়া উঠি। হায়! এই অহঙ্কার আমাদের কি ভয়ানক ক্ষুদ্রতা। এই অহঙ্কারে আমরা একেবারে তাঁহার অনুকরণ হইতে বহু দূরে পড়ি। কারণ তিনি স্বয়ং কিরূপ মহান্ নিরহঙ্কার তাহার স্পষ্ট পরিচয় পাই। এই এত বড় জগত, তাহার রাজাধিরাজ স্রষ্টা তিনি; অথচ স্রষ্টা কর্ত্তা বলিয়া তাঁহার কুত্রাপি কোনই অহঙ্কারের চিহ্ন দেখিতে পাই না। তিনি আপনাকে বড়াই করিয়া জানান না; তবে যে তাঁহাকে নিতান্ত জানিবার জন্য ব্যাকুল হয় আগ্রহ প্রকাশ করে, সেই সাধকের দায়ে পড়িয়া কিম্বা তাহার অন্তরে নিতান্ত আবশ্যক হইলে তিনি নিঃশব্দে প্রকাশিত হন। তিনি স্তব্ধভাবে নিজ সৃষ্ট জগতের সর্ব্বদাই মঙ্গলে রত। অহঙ্কারী মানব তাঁহার এই স্তব্ধ মহিমা বুঝিতে পারে না। নিরহঙ্কার হইয়া যখন আমরা এই সংসারে বিনীতভাবে বিচরণ করি তখনই তাঁহার নীরব মহিমা আমাদের নিকট উপলব্ধ হয়। পরে তাহা অনুকরণ পূর্ব্বক যথার্থ শান্তি অনুভব করি। শোক তাপ সমুদয় চলিয়া যায়। তখন আমাদের এই ভয়ানক সংসারে প্রকৃত নির্ভর স্থান জোটে। আমাদের অবিশ্বাস ঘুচিয়া যায়, আমরা বিশ্বাসময় হইয়া প্রাণে অমৃত লাভ করি। অমৃত লাভ করিয়া সেই অমৃতময়ের যথার্থ পরিচয় প্রাপ্ত হই।

সংবাদ।

ইহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যখন এই দেশে জনসাধারণের মধ্যে ঘোরতর অজ্ঞান ও কুসংস্কার আধিপত্য করিতেছিল সেই সময় ধর্ম্মপ্রাণ একমাত্র শ্রীমৎ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় হৃদয়ের প্রেরণায় ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া মহাত্মা রামমোহন রায়ের কীর্ত্তিরক্ষার্থ বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তাঁহার অটল ধর্ম্মনিষ্ঠা অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ এবং জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচারে অসাধারণ উৎসাহ ও অধ্যবসায় দেখিয়া তৎকালে এদেশের কৃতবিদ্যদিগের শীর্ষস্থানীয় সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁহার এই মহৎ ও পবিত্র কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য তাঁহাকে আসিয়া বেষ্টন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের এই প্রদীপ্ত সূর্য্যকে তৎকালে যে সমস্ত উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমণ্ডল চারিদিকে ঘেরিয়াছিলেন দুরন্ত কাল তাঁহাদিগের অনেককেই একে একে গ্রাস করিয়াছে। যাহা অবশেষ ছিল এক্ষণে তাহাও আর নাই। আমরা শোকসন্তপ্তচিত্তে প্রকাশ করিতেছি ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর চিরদিনের জন্য এই মর্ত্ত্যভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন। যখন বঙ্গদেশে জ্ঞানধর্ম্ম বিস্তার করিয়া প্রকৃত উপকার সাধনের জন্য তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয় অন্যান্য সভ্যের সহিত এই দুই মহাত্মাও তাহার সভ্য ছিলেন। এই সভা প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের প্রথম কীর্ত্তি। এই সভার মুখপত্র এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রমে

পরিচালিত হইয়া বঙ্গে একটী যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। ইহা জ্ঞানালোক ও ধর্ম্মালোকে লোকের যারপর নাই উপকার করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাতে মহাভারত অনুবাদ করিতেন। এবং এই পত্রিকায় যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত তাহার সংশোধনের ভার তাঁহারও হস্তে ছিল। ফলত তত্ত্ববোধিনী দ্বারা এক সময় যে বঙ্গ ভাষার অসাধারণ উন্নতি হইয়াছিল তাহাতে বিদ্যাসাগরের অনেকটা সহায়তা ছিল। আজ ইহাঁর অভাবে সমস্ত ভারতবর্ষ হাহাকার করিতেছে। ইনি দীন দরিদ্রের পিতা মাতা। কোন মহাত্মা কহিয়াছেন তোমার দক্ষিণ হস্ত যাহা করিবে বাম হস্ত যেন তাহা জানিতে না পারে। বিদ্যাসাগরের দান সম্বন্ধে এই কথা সম্পূর্ণই খাটে। তিনি চির জীবন অকাতরে দীনদুঃখীকে বিস্তর দান করিয়াছেন কিন্তু তাহা কেহই জানিতে পারিত না। বিদ্যাসাগর বঙ্গভাষার পিতা। রাজা রামমোহন রায় অবশ্য বাঙ্গলায় গদ্য রচনার প্রথম সূত্রপাত করিয়া যান কিন্তু বিদ্যাসাগরের হস্তে ইহা নবজীবনে উত্থিত হয়। এখন যে ভাষার এতদূর উন্নতি হইয়াছে বিদ্যাসাগরই তাহার মূল। তিনি যে সমস্ত পুস্তক প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন বঙ্গের শিশু হইতে বৃদ্ধটী পর্য্যন্ত তদ্দ্বারা উপকার পাইতেছে। বিধবা বিবাহ ব্যবস্থা তাঁহার প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তার বিশেষ পরিচায়ক। তিনি বুঝিয়াছিলেন ইংরাজী শিক্ষা বহুল পরিমাণে প্রচলিত না হইলে এই অধঃপতিত জাতির উন্নতি নাই। তাই তিনি অল্পব্যয়ে উচ্চ শিক্ষা পাইবার জন্য অনেক গুলি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। তন্মধ্যে তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি মেট্রোপলিটান ইনিষ্টিটিউসন। এই সমস্ত বিদ্যালয়ের দ্বারা বঙ্গদেশের যে প্রচুর উপকার হইতেছে ইহা সকলেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। তিনি অত্যন্ত অমায়িক লোক ছিলেন। যিনি একবার তাঁহার সংশ্রবে আসিয়াছেন তিনি কিছুতেই তাঁহাকে ভুলিতে পারিবেন না। তাঁহার চিত্ত অতিশয় স্বাধীন এবং তাঁহার অধ্যবসায়ও অসাধারণ ছিল। যে সমস্ত সৎগুণ থাকিলে লোকে প্রকৃত মনুষ্য হইতে পারে তাঁহাতে তাহার কিছুমাত্র অভাব ছিল না। আমরা এত দিনের পর আমাদের এমন এক প্রাচীন বন্ধু ও সহযোগীকে হারাইয়া আজ যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি এবং তাঁহার অভাবে বঙ্গদেশ সমগ্র ভারতবর্ষ অন্ধকার হইয়াছে।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ছিল। ইংরাজী পারসী সংস্কৃত প্রভৃতি অনেকগুলি ভাষায় তাঁহার পারদর্শিতা ছিল। তিনি যেমন বক্তা তেমনি লেখক। 'আণ্টিকুইটি অফ উড়িষ্যা' প্রভৃতি অনেকগুলি ইংরাজী গ্রন্থ তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ। তিনি বাঙ্গালা ভাষারও যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। এক সময়ে তাহার 'বিবিধার্থসংগ্রহ' অতি আদরের সহিত এদেশে পঠিত হইত। ইওরোপে পণ্ডিতমণ্ডলীতে ইহাঁর যার পর নাই প্রতিষ্ঠা। লুপ্তপ্রায় অনেক সংস্কৃত গ্রন্থের ইনি উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন। ইনি অতি তেজস্বী ও সাহসী ছিলেন। ন্যায়রক্ষার জন্য কাহাকেই দৃক্‌পাত করিতেন না। ফলত বিদ্যাসাগর ও রাজেন্দ্রলাল এই দুই জন ভারতের বস্তুতই কৃতী সন্তান। এই দুই জনই সুশিক্ষিত ও পরহিতব্রতে নিরত ছিলেন।

আমরা এই দুই মহাত্মার বিয়োগে অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। জানি না বঙ্গমাতা আবার কবে এরূপ সুসন্তান প্রসব করিবেন।

বৈদ্যনাথে কুষ্ঠ-নিবাস সম্বন্ধে নিবেদন।

বৈদ্যনাথ ভারতবর্ষের মধ্যে একটা অতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। বৈদ্যনাথের অনুগ্রহে আরোগ্য লাভের আশায় নানা দেশ হইতে পীড়িত ব্যক্তিগণ এখানে উপস্থিত হন। অন্যান্য কঠিন রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের ন্যায় বহুসংখ্যক কুষ্ঠরোগীও ব্যাধিমুক্তির আশায় এখানে সমাগত হন। যাহাদের গৃহ এবং আত্মীয় স্বজনাদি আছে, তাহারা পুনর্ব্বার স্বদেশে প্রতিগমন করে, কিন্তু দরিদ্র এবং আত্মীয় স্বজনকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অনেক রোগী মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এখানেই বাস করে। তীর্থস্থানে অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে ভিক্ষা পাওয়া যায়, এবং এখানে থাকিলে বৈদ্যনাথের অনুগ্রহে তাহাদের ব্যাধির উপশম হইলেও হইতে পারে, এই আশায় কুষ্ঠরোগীগণ স্বদেশে প্রতিগমন অপেক্ষা বৈদ্যনাথেই বাস করা শ্রেয়ঃ মনে করে। এই দুই কারণে সকল সময়েই বৈদ্যনাথে বহুসংখ্যক কুষ্ঠরোগী দেখিতে পাওয়া যায়। যেরূপ ক্লেশে তাহারা এখানে জীবন যাপন করে, তাহা বর্ণন করিয়া হৃদয়ঙ্গম করাইবার সম্ভাবনা নাই। তাহাদের বাসের জন্য কোন গৃহ নাই। রাজপথের পার্শ্বে, বৃক্ষতলে, পুষ্করিণীর ঘাটে, অনাবৃত অবস্থায় শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সকল ঋতু তাহাদিগকে অতিবাহিত করিতে হয়। রোগের প্রাবল্যে যাহাদের হাত গলিয়া গিয়াছে, সে অবস্থায় শৃগাল কুক্কুরে আক্রমণ করিলেও তাহারা আত্মরক্ষায় সমর্থ হয় না। অনেক হতভাগ্য প্রকাশ্য রাজপথের উপর পড়িয়াই প্রাণ ত্যাগ করে। গত বর্ষে এগার জন রোগী এইরূপ অবস্থায় এখানে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। আশ্রয় গৃহের ন্যায় পানীয় জলের অভাবেও তাহারা অতি নিদারুণ ক্লেশ ভোগ করে। এখানকার গভীর কূপ হইতে জল উত্তোলন করা তাহাদের সাধ্যায়ত্ত নয়; নগরে যে দুই একটী পুষ্করিণী আছে, সংক্রামকত্বের ভয়ে লোকে তাহাদিগকে তাহা ব্যবহার করিতে দিতে পারে না; এ অবস্থায় সচ্ছন্দ স্নানাবগাহন তাহাদের ভাগ্যে প্রায়ই ঘটে না। তাহারা যদি তাহাদের পূয রক্তে বিষাক্ত মলিন বস্ত্রগুলি ধৌত এবং ক্ষত পরিষ্কার করিবার উপযোগী প্রচুর জল পায়, তাহা হইলেও তাহাদের অনেক ক্লেশ দূর হয়। পানীয় জলের জন্য, তাহারা যখন তাহাদের সেই গলিত হস্তে নদীর বালুকা খনন করিতে থাকে এবং ঝড় বৃষ্টিতে উপদ্রুত হইয়া কম্পান্বিত কলেবরে বৃক্ষতল হইতে আশ্রয়ান্বেষণে ভ্রমণ করে, তখন তাহা দর্শন করিলে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারা যায় না। হিন্দুর এই তীর্থক্ষেত্রে এতগুলি হিন্দু রোগী, দুরবস্থায় কালযাপন করে, ইহা আমাদের সমগ্র হিন্দু সমাজের লজ্জার বিষয় বলিতে হইবে। ইহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকল শ্রেণীর লোক আছে। সাধ্যানুসারে ইহাদিগের দুরবস্থা বিমোচনের চেষ্টা করা হিন্দু সমাজের—অথবা কেবল হিন্দু সমাজের কেন, সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই—একান্ত কর্ত্তব্য। একটী রীতিমত আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে ইহাদিগের ক্লেশ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তাহার জন্য প্রচুর অ-

র্থের প্রয়োজন। যত দিন না বৈদ্যনাথে একটী রীতিমত আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবে, ততদিন নিম্নলিখিত উপায় দ্বারা ইহাদিগের যন্ত্রণার কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব করা যাইতে পারে। বৈদ্যনাথ দেবমন্দিরের সদাব্রত হইতে এবং স্থানীয় লোক ও তীর্থযাত্রীদিগের নিকট লব্ধ ভিক্ষা দ্বারা তাহাদের একরূপ দিনপাত হয়। তাহাদের আশ্রয়ার্থ একটী গৃহ নির্ম্মাণ এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করিতে পারিলে, আপাততঃ তাহাদের অনেক ক্লেশ দূর হইতে পারে। তাহার পর তাহাদের বস্ত্র, শুশ্রূষা ও আংশিক চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। একবার তাহাদের জন্য একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারিলে অন্যান্য বিষয়গুলি সম্পন্ন করা তাদৃশ কঠিন হইবে না। পঞ্চাশ জন রোগীর বাসোপযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ, তাহাদের পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যতে যাহাতে গৃহটীর তত্ত্বাবধান ও সংস্কার কার্য্য চলিতে পারে, এরূপ সংস্থান করিতে হইলে সর্ব্বসমেত অন্যূন পাঁচ সহস্র মুদ্রার প্রয়োজন। আমরা এজন্য বঙ্গের প্রত্যেক দয়াশীল নরনারীর সাহায্য এবং সহানুভূতি প্রার্থনা করি। উদরান্নের জন্য শূন্য পদে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিবার সময় রাজপথের বালুকা এবং কঙ্কর রোগীদের ক্ষতে প্রবেশ করিয়া অসহ্য যন্ত্রণা উৎপাদন করে। বস্ত্রখণ্ডে পদ আবৃত করিয়া ভ্রমণ করিলেও তাহাদিগের অনেক ক্লেশ দূর হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাও তাহারা সকল সময় পায় না। বস্ত্রাভাবে তাহাদিগের মক্ষিকাকুলিত ক্ষত সময়ে সময়ে তাহাদিগকে উন্মত্তের ন্যায় করিয়া তুলে। গৃহস্থের গৃহে কত সময় বৃথা কত বস্ত্র নষ্ট হয়, নিমন্ত্রিতদিগের ভুক্তাবশিষ্ট কত দ্রব্য রাজপথে পদদলিত হইতে থাকে, অথচ এই হতভাগ্যগণ তাহাদিগের ক্ষত আবরণের উপযুক্ত বস্ত্র এবং প্রাণধারণোপযোগী উদরান্নও সংগ্রহ করিতে পারে না। যিনি যে অবস্থারই লোক হউন, ইহাদিগকে সাহায্য করা সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। অর্থ সাহায্য করা কাহারও পক্ষে অসম্ভব হইলে, তিনি বর্ষান্তে একখানি পরিত্যক্ত জীর্ণবস্ত্র প্রদান করিয়াও আমাদিগের কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারেন। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, দেবপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে কত বস্ত্রাদি বিতরিত হইয়া থাকে, কেহ উদ্‌যোগী হইয়া তাহার দুই চারিখানি বৈদ্যনাথের কুষ্ঠরোগীর জন্য পাঠাইলে তাহাদের বস্ত্রাভাব ক্লেশ দূর হইতে পারে। অর্থ হউক, বস্ত্র হউক, কোন প্রকার ঔষধ বা পথ্য হউক, যে কোন প্রকার সাহায্য হউক, আমরা আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি! বৈদ্যনাথের কুষ্ঠরোগীদের দুরবস্থা বিমোচনে আমরা আপনার সাহায্য এবং সহানুভূতি পাইব, এই বিশ্বাসেই আমরা এই অনুষ্ঠানপত্র আপনার সমীপস্থ করিতেছি। আপনার অবস্থায় যাহা কিছু সম্ভব, নিম্ন স্বাক্ষরকারীদিগের নিকট প্রেরণ করিলে তাহা যতই সামান্য হউক, সাদরে গৃহীত হইবে। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি; এপর্য্যন্ত ৭২৬৶৫ আমাদের হস্তগত হইয়াছে।

বিনীত নিবেদক,

বৈদ্যনাথ, দেওঘর। শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

শ্রীগিরিজানন্দ দত্তঝা।

জমিদার ও বৈদ্যনাথ

মন্দিরের পুরোহিত।

সন ১২৯৮ সাল। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু।

হেড মাষ্টার দেওঘর স্কুল।

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বসু বি, এ

হেড মাষ্টার দেওঘর

সুহৃদ্বরেষু—

দেওঘরের ভিক্ষোপজীবী কুষ্ঠরোগগ্রস্ত জনগণের আবাস গৃহ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে তুমি যে প্রস্তাব করিয়াছিলে তাহা আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত অনুমোদন করি।

অল্প দিন হইল যখন আমি পীড়িত হইয়া স্থান পরিবর্ত্তন হেতু প্রায় দুই মাস কাল দেওঘরে অবস্থান করি তখন এই হতভাগ্যদিগের অনির্ব্বাচ্য শোচনীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে আমার বিলক্ষণ সুযোগ হইয়াছিল। দেখিয়াছিলাম ইহারা একে রোগের জ্বালায় অস্থির তাহাতে আবার ইহারা নিতান্ত নিরাশ্রয়; ও অন্নহীন ও লোকসমাজে ঘৃণিত। বস্তুতঃ ইহাদের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করে এমন লোক অতি বিরল। সুতরাং ইহারা অতি কষ্টেই ইহাদের দুঃখময় জীবনভার বহন করিয়া আসিতেছে। কুষ্ঠরোগের যেরূপ প্রকৃতি এবং ঐ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি মাত্রেই কাল সহকারে যেরূপ কুৎসিত আকার ধারণ করে তাহাতে মানব হৃদয়ে দয়া ও সহানুভূতির উদ্রেক হওয়া দূরে থাকুক বরং উহাদের প্রতি বিসদৃশ ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার ভাব লক্ষিত হয়। এমন কি এই হতভাগ্যদিগকে দেখিবা মাত্র লোকে অস্পৃশ্য বলিয়া উহাদিগকে দূরে রাখিবার চেষ্টা পায়, কিন্তু এরূপ ব্যবহার কখনই ধর্ম্মানুমোদিত নহে। বিচার করিয়া দেখিলে এ পৃথিবীতে যদি কোন ব্যক্তি আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি ও প্রকৃত দয়া দাক্ষিণ্যের পাত্র থাকে তবে সে এই ঈশ্বরনিগৃহীত কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত হতভাগ্য ব্যক্তিগণ।

আমি দেওঘরে থাকিতে এই কুষ্ঠ রোগের নানা অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তন্মধ্যে ইহার ক্ষত ও গলিত অবস্থাই অতি ভয়ানক ও জনসমাজের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকারক। এই সময়েই উক্ত কদর্য্য রোগ অতিশয় সংক্রামক হইয়া উঠে সুতরাং ইহাদের বাস জন্য একটী স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দেশ করা নিতান্ত আবশ্যক। দেওঘর অধিবাসীরা ইহাদের সংস্রবে থাকিয়া অতি অল্প কাল মধ্যেই যে এই সংক্রামকতার পরিচয় পাইতেছে কেবল তাহাই নহে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে সমাগত বৈদ্যনাথ দেবদর্শনার্থী যাত্রীদের মধ্যেও এই রোগ সংক্রামিত হইবার বিশেষ আশঙ্কা দেখা যাইতেছে। এরূপ স্থলে সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের স্বতন্ত্র বাসস্থান নির্ম্মাণ সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়। নচেৎ এই রোগের বীজ চতুর্দ্দিকে পরিচালিত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে কালে সকলেরই উহার ফল ভোগ করিতে হইবে। আশা করি উপরোক্ত কারণসমূহ পর্য্যালোচনা করিলে কুষ্ঠ রোগীদের জন্য তোমার সাহায্য প্রার্থনার আবেদন জনসাধারণের নিকট সাদরে গৃহীত হইবে, ও সকলে এক-বাক্য হইয়া তোমার পোষকতা করিবেন।

তুমি ইতি পূর্ব্বে আমাকে বলিয়াছিলে যে ৫০ জন কুষ্ঠরোগীর বাসোপযোগী গৃহ নির্ম্মাণ করিতে গেলে প্রায় দুই সহস্র টাকা ব্যয় হইবে। আমিও ভাবিয়াছিলাম দেওঘরে একটি বিশ্রাম গৃহ নির্ম্মাণ করিব ও নিজের ভগ্ন শরীর রক্ষার্থ সময়ে সময়ে আপনার শ্রমসাধ্য ব্যবসায় ও অপরাপর কার্য্য হইতে অপসৃত হইয়া তথায় আসিয়া বিশ্রাম লাভ করিব কিন্তু এখন দেখিতেছি আমার স্বাস্থ্য অপেক্ষা কুষ্ঠরোগীদের দুরবস্থা বিমোচন অধিকতর প্রয়োজনীয়। উহাদের মঙ্গলোদ্দেশে আমি সে সংকল্প পরিত্যাগ করিলাম। অতঃপর যদি সকলের অভিমত হয় তাহা হইলে আমি নিজ ব্যয়ে কুষ্ঠরোগীদের জন্য একটী আবাস গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া অর্থের সার্থকতা লাভ ও আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করি।

এ সম্বন্ধে আমার আর একটি কথা বলিবার আছে যদি দেওঘর অধিবাসীদিগের বিশেষ কোন আপত্তি না থাকে তাহা হইলে ভগবানের কৃপায় আমি যাঁহার অবিশ্রান্ত যত্নে ও সুকুমার সুশ্রূষায় পুনর্ব্বার স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছি আমার সেই পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীর নামানুসারে এই কুষ্ঠাশ্রমের নামকরণ হয়। পরিশেষে বক্তব্য এই যে ঐ প্রধান প্রয়োজনীয় আবাস গৃহ নির্ম্মাণ করিলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইল না তাহাদের অশন, বসন ও চিকিৎসা প্রভৃতির উপায় বিধান করাও আমাদের অন্যতর প্রধান কর্ত্তব্য।

এ সকল ব্যাপার যাহাতে সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে তাহার একটি স্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে হইলে অধিকতর অর্থের প্রয়োজন সুতরাং আমার বিশ্বাস এই যে কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই স্বদেশবাসী জনগণের মধ্যে যাঁহারা স্বভাবতঃ উদারচেতা ও পরোপকারী তাঁহাদের যত্নে সেই অর্থ সংগৃহীত হইবে। দেওঘরে অবস্থান কালে বৈদ্যনাথ দেবের প্রধান পুরোহিত মহান্ত মহাশয়ের সহিত আমার কথোপকথন হইয়াছিল তাহাতে বুঝিয়াছিলাম যে তিনি মনে করিলে বৈদ্যনাথ দেবের আয় হইতেই নিত্য প্রয়োজনীয় আহারাদির সুব্যবস্থা করিতে

পারেন সুতরাং আমি তাহার মনোগত ভাব জানিয়া তাঁহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়াও একথা লিখিতে সাহসী হইলাম।

বিনয়াবনত ভ্রাতা
শ্রীমহেন্দ্রলাল সরকার।

প্রচার।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী পরিব্রাজক হড়া গ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন।

তিনি সমস্ত পরিদর্শন করিয়া যে বিবরণী দিয়াছেন আমরা নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম।

হড়াতে একটী হিন্দুধর্ম্ম প্রচারিণী সভা আছে। এই সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী ঘোষাল। ইতি এখানকার এক জন মাননীয় শ্রীসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ধর্ম্মে ইহাঁর বিশেষ অনুরাগ ও উৎসাহ আছে। আমার সহিত ইহাঁর ধর্ম্ম সমাজসংস্কার ও অপৌত্তলিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে অনেক কথোপকথন হয়। আদি ব্রাহ্মসমাজের মতের সহিত এই সমাজের মতের সকল অংশেই মিল আছে। হিন্দু শাস্ত্র হইতে একেশ্বরবাদ প্রচার করা এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। বিপিন বাবু এই সভার সম্পাদক। ইহাঁরি যত্ন ও চেষ্টায় এই সভা স্থাপিত হয়। বিপিন বাবু চির কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া তাঁহার সমস্ত জীবন একেশ্বরবাদ প্রচার ও স্বদেশের কল্যাণার্থে উৎসর্গ করিয়াছেন। গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা ধর্ম্মের সার মর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। ইহাঁরি কৃত জ্ঞান কাণ্ড ও কর্ম্ম কাণ্ড, মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ এই দুইখানি গ্রন্থ প্রধান। এই সভার দ্বারা চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে প্রকারান্তরে ব্রাহ্মধর্ম্মই প্রচার হইতেছে। সমাজ সংস্কার বিষয়ে আদি সমাজের প্রণালী সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহর্ষি প্রণীত আদি সমাজের অনুষ্ঠান পদ্ধতির উপর ইহাঁদিগের বিশেষ আস্থা আছে। এইরূপ অপৌত্তলিক বিশুদ্ধ হিন্দু অনুষ্ঠান পদ্ধতি যাহাতে সভ্য সমাজে অনুষ্ঠিত হয় সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি আছে। জ্ঞানধর্ম্ম ও নীতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ধীরে ধীরে বিশুদ্ধ ভাবে গঠিত হইবে এই সভার সভ্যদিগের এইরূপই ধারণা। পক্ষান্তরীয় যে রবিবার সেই রবিবারে ইহাঁদিগের সভা হয়। গীতা পাঠ, উপনিষদ্ পাঠ, ধর্ম্মালোচনা ও সংগীত হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

নূতন পুস্তক।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে আমরা হড়া হিন্দুধর্ম্ম প্রচারিণী সভা হইতে উপাসনা, প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম কি? প্রকৃত বিবেক, মূর্ত্তি বিবেক নামক গ্রন্থের প্রতিবাদ, সাকার নিরাকার সম্বন্ধে মীমাংসা, কর্ম্মকাণ্ড সমূহের চরম উদ্দেশ্য কি? ব্রহ্মশতকম্ এই সমস্ত গ্রন্থ উপহার পাইয়াছি। পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় এদেশের লোককে একেশ্বরবাদ যে প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম তাহা যে প্রণালীতে বুঝাইয়াছিলেন হড়া হিন্দুধর্ম্ম রক্ষিণী সভাও সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। বেদ বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ মন্থন করিয়া একেশ্বরবাদই যে এদেশের প্রকৃত ধর্ম্ম গ্রন্থকর্ত্তা অতি নিপুণতার সহিত তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। হড়া প্রদেশীয় ভট্টাচার্য্যেরা মূর্ত্তিপূজা স্থাপনের নিমিত্ত যে সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রণেতা শাস্ত্র দ্বারাই তৎ সমুদায় খণ্ডন করিয়াছেন। এই সমস্ত গ্রন্থের দ্বারা বঙ্গ সমাজে যে প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম প্রচার হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা এই গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইলাম।
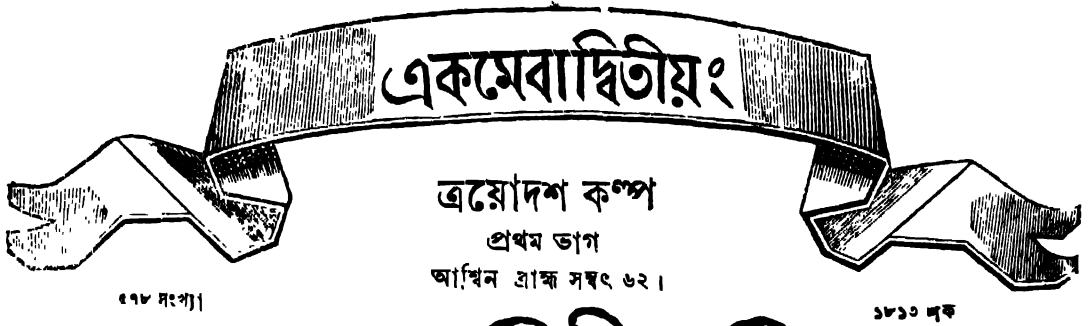
ত্রয়োদশ কল্প
প্রথম ভাগ
আশ্বিন ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬২।

৫৭৮ সংখ্যা। ১৮১৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवाएकमिदमग्रआसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

আহ্বান।

(বালকের রচিত)

হৃদয়ের রাজ্যে মোর, এসো তুমি দয়াময়
তোমারেই করিতেছি আহ্বান;
সংসারে আসিয়া আমি, বুঝিতে পারিনি তত
তাই এত কষ্ট সহিতেছে প্রাণ।
গানগুলি একে একে, গিয়াছে মরিয়া তারা,
অশ্রুবারি শীতল সমাধি দিছে;
হৃদয়ের হাহাকার, উঠিতেছে কোথা হ'তে,
কোন সুদূরে প্রতিধ্বনি শুনিছে।
বিজনেতে আছি ব'সে, আসিছে ভাবনা কত
পরশিছে কায় বিষাদ পবন;
এত হাঁসি এত খেলা, সকলি কি দুঃখভরা?
জগত শুধু কি দুখেরি স্বপন?
কবে ফুল হেঁসেছিল, সে আজ শুকিয়েগেছে
হৃদয়ের ব্যথা বলিতেছে কারে;
সাঁজের তারকাগুলি, লইয়া সম্বাদ কার
শুনাইছে জগতের পরপারে;
জীবন বহিয়া দুঃখ, চলিতেছে কোন দেশে
কে জানে কোথায়—চলেছে কোথায়;
অনুতাপে জ্বলিতেছে বিশুষ্ক হৃদয় মোর,
দয়াময় প্রভু ডাকিতেছি তাই।
এই শীর্ণ ক্ষীণকায়, কি আর করিবে হায়
গুমরি গুমরি করিছে রোদন;
দাও মোরে দয়াময়, তোমারি করুণাকণা
দাও মোর প্রাণে নূতন জীবন।
আজিকে তোমারি তরে, ভাবিতেছি কতবার
তোমারেই আজ ডাকিতেছে প্রাণ;
আজিকে হৃদয় মোর, পবিত্র করিছি তাই
তোমারে শুনাব মোর দুঃখগান;—
হৃদয়ের রাজ্যে মোর, এসো তুমি দয়াময়
তোমারেই করিতেছি আহ্বান।

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ।

[গত ফাল্গুন মাস হইতে আমি কয়েক জন বন্ধুর সহিত প্রতি রবিবার পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষির নিকট উপদেশ শ্রবণ করিতে যাইতাম। সেই সময় তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা লিখিয়া লইয়াছিলাম। এই সকল উপদেশ হইতে আমি বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছি। ব্রহ্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তিমাত্রের হৃদয়ে অন্ততঃ কিঞ্চিমাত্রও আনন্দ বিধান করিতে

পারিবে, এই আশায় সেই সকল উপদেশ এই পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছি।]

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি।

প্রথম উপদেশ—সৃষ্টি।

(১১ই ফাল্গুন রবিবার চতুর্দ্দশী ব্রাহ্মসম্বৎ ৬১, ১৮১২ শক।)

যখন দেশ ছিল না, কাল ছিল না, তখন অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ সেই পূর্ণ পুরুষ আপনার জ্ঞানে, প্রেমে, মঙ্গলভাবে, পূর্ণ-সৌন্দর্য্যে বিরাজ করিতেছিলেন। সেই অনন্ত জ্ঞানের যে মঙ্গল ইচ্ছা, তাহা তিনি আপনি নিত্যই জানিতেছিলেন। সেই মঙ্গল ইচ্ছা কি, না, তাঁর সৃষ্টিতে জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি হউক। ঈশ্বর, তাঁহার এই মঙ্গল ইচ্ছা আমাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন; তাঁহার আনন্দ, প্রেম সৌন্দর্য্য সৃষ্টির মধ্যে বিতরণ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্যই এই যে, জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি হউক।

তিনি তাঁহার শক্তি এই অনন্ত আকাশে ব্যাপ্ত করিলেন। সেই শক্তি—নীহারিকা (ether)। তিনি সেই নীহারিকা বিকম্পিত করিয়া দিলেন, আর তাহা একেবারে জ্বলিয়া উঠিল। ইন্দ্রিয়ের অগোচর নীহারিকা প্রত্যক্ষের বিষয় হইল। তাহার জ্যোতিতে সমুদয় আকাশ জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠিল। সৃষ্টির প্রারম্ভে যদি কেহ থাকিত, তবে সে বুঝিতে পারিত যে, কেমন আশ্চর্য্য রকমে চারিদিকে জ্যোতির আবির্ভাব হইয়াছিল। এই জ্যোতির মধ্যে থাকিয়া তিনি আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছিলেন।

তিনি ইচ্ছা করিলেন, আর অমনি সেই জ্যোতি ও তেজ ঘনীভূত হইয়া অগণ্য সূর্য্যরূপে পরিণত হইল। যেখানে অন্ধকারের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার ছিল, সেই খানে দীপ্তিমান্ কোটি কোটি সূর্য্যের উদয় হইল। অগণ্য সূর্য্য ঊর্দ্ধেতে, অধোতে, দক্ষিণে, বামে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া ঘুরিতে লাগিল। তাঁর ইচ্ছাক্রমে প্রত্যেক সূর্য্য হইতে গ্রহ উপগ্রহগণ বিক্ষিপ্ত হইয়া সেই প্রতি সূর্য্যের চারিধারে ঘুরিতে লাগিল, অথচ ইহাদিগের মধ্যে কোন একটী অন্যের গাত্রে পতিত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইল না।

এই অক্ষর পুরুষের শাসনে এই অগণ্য সূর্য্যচন্দ্র বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। তাঁর সৃষ্টি এই অসীম আকাশে দেশকাল সূত্রে গ্রথিত হইল।

তিনি তাঁহার শক্তি সমুদয় আকাশে ব্যাপ্ত করিয়া দিলেন। সেই শক্তি আমাদের এই জড়শক্তি; এই জড়শক্তি আকর্ষণ বিয়োজন রূপে, ঘাত প্রতিঘাতরূপে সমুদয় পদার্থে কার্য্য করিতেছে। নীহারিকা, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি স্থূল সূক্ষ্ম পদার্থ সকল আকাশে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে; এবং তিনি এই সমুদয়ই ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

আমরা বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, পদার্থ বিদ্যা বা রসায়ন, যে শাস্ত্র যতই আলোচনা করি না কেন, তথাপি আমরা সৃষ্টি-কৌশলে ঈশ্বরের অনুপম নৈপুণ্যের অন্ত পাই না। আজ কয়েক বৎসর হইল, একটা প্রকাণ্ড ধূমকেতুকে পৃথিবীর নিতান্ত অভিমুখীন হইতে দেখিয়া, জ্যোতির্ব্বিদগণ পৃথিবীর বিনাশ সম্বন্ধে একপ্রকার নিঃসংশয় হইয়া বসিয়াছিলেন; কবে উভয়ের

সংঘর্ষণে উভয়েই চূর্ণ হইয়া যাইবে, এই ভয়ে তাঁহারা অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। এমন সময়ে সেই ধূমকেতু আপনারই তেজের আধিক্যে আপনা হইতেই খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গেল এবং পৃথিবীও আকস্মিক বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইল। যেখানে মনুষ্যের গণনা নিতান্ত ভীতিজনক, সেখানে ঈশ্বরের পালনী শক্তি আমাদের আশা ভরসা সকলই;

তাঁহার কৌশল কি আশ্চর্য্য। এই পৃথিবীতে আমরা এক সূর্য্যের উদয় দেখিতেছি, কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদগণ বলেন যে এমনও সব লোক আছে, যেখানে এক সূর্য্যের উদয় হইতেছে অন্য সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। কোথাও বা দুই সূর্য্য এককালে উদয় হয়। নক্ষত্রদিগের মধ্যে আবার বর্ণভেদ কত—কোনটা লোহিত, কোনটা বা পীত, কোনটা নীলবর্ণ। ইহাদিগের সংখ্যাই বা কত। ইহাদের একদণ্ডের জন্য বিরাম নাই, সকলেই অসীমবেগে ধাবিত হইতেছে। সেই "একো বশী" সর্ব্বনিয়ন্তা পুরুষের শাসন, অসীম আকাশের অগণ্য গ্রহনক্ষত্র কেহই অতিক্রম করিতে পারিতেছে না—"তদু নাত্যেতি কশ্চন।"

বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বর শোভার আগার এই জগতে জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু—তিনেরই স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। এক দিকে তাঁহার যেমন পিতৃভাব, মাতৃবাৎসল্য, তেমনি আর একদিকে তিনি "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং।" তিনি আমাদের চক্ষুকে জ্ঞানের দ্বার করিয়া দিয়াছেন। আমরা জগৎ দেখিয়া তাঁহার ইচ্ছা পাঠ করিতেছি এবং তাঁহার স্নেহ করুণা অনুভব করিয়া তাঁহার চরণে প্রীতিপুষ্প অর্পণ করিতেছি; প্রেমভরে তাঁহার উপাসনা করিতেছি। যে আনন্দ আমরা অনুভব করিতেছি, তাহা অন্যকে না বলিয়া কোন মতেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। এইরূপে ঈশ্বরের পবিত্র নাম দেশবিদেশে বিঘোষিত হইতেছে; চারিদিকেই তাঁহার পবিত্র ধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

প্রাপ্ত।

ঈশ্বরের ত্রিকালজ্ঞতা ও মানবাত্মার স্বাধীনতা *।

যদ্যপি এরূপ কোন বস্তু থাকে যাহার কায্য কলাপ কোন বিশেষ নিয়মের অধীন নহে, সকল সময়ে অনিয়মিত বা অনিশ্চিত ভাবে হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহার ভবিষ্যৎ কার্য্য নির্ণয় করা অপরের পক্ষে দুঃসাধ্য। এক ব্যক্তি কলিকাতা হইতে বোম্বাই নগরাভিমুখে যাত্রা করিয়া পথি মধ্যে অনিয়মিত রূপে অর্থাৎ কোন দিন ১০ ক্রোশ, কোন দিন ৫ ক্রোশ কোন দিন বা ২ ক্রোশ করিয়া অনিশ্চিত ভাবে গমন করিলে একমাস পরে উক্ত ব্যক্তি কত ক্রোশ দূরে আসিয়া উপস্থিত হইবে ইহা জ্ঞানবলে পূর্ব্ব হইতে নির্ণয় করা যাইতে পারে না। কার্য্যের কোন নিয়ম না থাকিলে তাহার ভবিষ্যৎ ফল নির্ণীত হইতে পারে না। আমাদিগের আলোচ্য বিষয় মানবাত্মার স্বাধীনতা যদি আত্মার একটী ধর্ম্ম হয় অর্থাৎ আত্মার কার্য্যকলাপ যদি কোন বিশেষ নিয়মের অধীন না হয়, তাহা হইলে ইহার ভবিষ্যৎ কার্য্য কলাপ কা-

* আমরা এই প্রবন্ধটী স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত বলিয়া প্রকাশ করিলাম। ইহাতে যা কিছু মতভেদ আছে পরিশেষে তাহা দেখাইবার ইচ্ছা রহিল। সং।

হারও জ্ঞান দ্বারা নির্ণীত হইতে পারে না। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন মনুষ্যগণই কার্য্যের অনিয়ম দেখিলে তাহার ভবিষ্যৎ ফল নির্ণয় করিতে অসমর্থ, কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। আমরা বলি যাহা আমাদিগের নিকটে স্পষ্ট রূপে অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা ঈশ্বরের নিকটে সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করিবার আবশ্যকতা কি? আমরা চারি সংখ্যায় দুই সংখ্যা যোগ করিয়া দশ সংখ্যা করিতে পারি না। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া কি তিনি দশ সংখ্যা করিতে পারেন? তিনি উহা পারিবেন না বলিয়া কি তাঁহাতে অপূর্ণতা-দোষ বর্ত্তিতে পারে? কখনই না। যাহা অসত্য তাহা সকল সময়েই অসত্য।

এক্ষণে দেখা যাউক আমাদিগের আত্মার স্বাধীন ইচ্ছা আছে কি না? প্রণিধান পূর্ব্বক দেখিলে জানিতে পারা যায়, আত্মার ইচ্ছা তাহার জ্ঞানের অধীন, অর্থাৎ আত্মা কোন বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিলে পরে তৎসম্বন্ধে তাহার ইচ্ছার উদ্রেক হয়। জ্ঞানের পূর্ব্বে ইচ্ছার অস্তিত্ব থাকে না। আমরা একটী সুমিষ্ট ফল ভক্ষণ করিয়া তাহার রসজ্ঞান লাভ করিলে, পরে সেই ফল সম্বন্ধে আমাদিগের ইচ্ছা জন্মে। আবার আমরা আত্মার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে একটী বিষয় জ্ঞাত হই যে ইহার সুখস্পৃহা অতিশয় প্রবল। ইহা সকল সময়ে সুখী থাকিবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র। ইহা আপনা আপনি সুখী হইতে পারে না। সুখী হইবার নিমিত্ত ইহাকে পরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। তজ্জন্য আত্মা যে বস্তু হইতে সুখ প্রাপ্ত হয় তাহা লাভ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা আকাঙ্খা করে। এই স্পৃহা চরিতার্থ করিবার নিমিত্তই মানবাত্মা যাবতীয় কার্য্য করিতেছে। মানবগণ সুখের পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়াই হিংস্র-জন্তুপূর্ণ নিবিড় অরণ্যে, উত্তালতরঙ্গময় মহাসমুদ্রে, উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমিতে, নরশোণিতসিক্ত রণক্ষেত্রে এবং ঘন তমসাচ্ছন্ন নির্বাত ভূগর্ভে অকাতরে গমন করিতেছে। সুখের জন্য মানুষ না করিতে পারে এমন কার্য্যই নাই। আবার সুখ এবং দুঃখই মানবগণকে গুরু হইয়া জ্ঞান দান করিতেছে। অগ্নির উষ্ণতা, তুষারের শীতলতা, জড়ের স্থানাবরোধকতা প্রভৃতি ভৌতিক জ্ঞান, গৃহ নির্ম্মাণ, নগর স্থাপন, সমাজ স্থাপন, বিদ্যালোচনা, ধর্ম্মালোচনা, কৃষি বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধন, শরীর রক্ষা, পরিবার প্রতিপালন, সমাজ রক্ষা, রাজ্য রক্ষা প্রভৃতি কার্য্য আমরা সুখ ও দুঃখেরই প্রসাদে শিক্ষা করিয়াছি। সুতরাং সুখের ন্যায় মানবের পরিচালক আর কিছুই নাই। চুম্বক যেরূপ লৌহকে আকর্ষণ করে সেইরূপ সুখ মানবাত্মাকে আকর্ষণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতেছে। আত্মা সুখ ও দুঃখের নিতান্ত অধীন। সুখ যে কার্য্য করিতে উত্তেজনা দেয়, আত্মা তাহা করিতে বাধ্য এবং দুঃখ যে কার্য্য করিতে নিষেধ করে আত্মা তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। কেহ কেহ এরূপ মনে করিতে পারেন, মানবাত্মা যদি সকল সময়ে সুখের দ্বারাই পরিচালিত হয়, তাহা হইলে আমরা এরূপ কেন দেখিতে পাই যে অনেক সাধু ব্যক্তি নিজ সুখে জলাঞ্জলি দিয়া দীন দুঃখী ও পীড়িত ব্যক্তির সেবায় নিযুক্ত হয়েন? ইহার কারণ এই যে এই সকল সাধু ব্যক্তির ভগবৎ-প্রেম অতি-

শয় প্রবল। তাঁহারা ঈশ্বরকে সুখ-স্বরূপ বলিয়া অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সংসারী ব্যক্তিরা যেরূপ ধন জন মান লইয়া সুখী থাকে, ঈশ্বরপ্রেমিক ব্যক্তি-গণ সেইরূপ কেবল ঈশ্বরকে লইয়া স-র্ব্বদা সুখী থাকেন। সংসারী ব্যক্তিগণের মধ্যে যে ব্যক্তি অতিশয় স্ত্রৈণ, সে যেমন তাহার স্ত্রী ও স্ত্রীর সহিত সংসৃষ্ট তদী- ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে অ-তিশয় প্রেম করে, ঈশ্বরপ্রেমিক ব্যক্তিও সেইরূপ ঈশ্বর ও তাঁহার সৃষ্ট জীবগণকে অতিশয় প্রেম করেন। ঈশ্বরের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় ঈশ্বরসৃষ্ট জীবগণের সহিতও তাঁহার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এ জন্য যাঁহারা ঈশ্বরকে প্রেম করেন, তাঁহারাই কেবল জীবগণকে প্রেম করিতে পারেন। ঈশ্বরে যাঁহার প্রেম হয় নাই, তিনি সর্ব্বজীবে কখনও প্রেম করিতে পারিবেন না। মানবাত্মা যখন সকল সময়ে সুখ ও দুঃখের দ্বারা পরি-চালিত হইতেছে, তখন ইহার গতি নির্ণয় করা সহজ। ইহার কার্য্যের যখন একটী নিয়ম প্রাপ্ত হওয়া গেল, তখন ইহার ভবিষ্যৎ কার্য্যকলাপ পূর্ব্ব হইতে নির্ণীত হইতে পারে। একটী মনুষ্য যতগুলি সুখদায়ক বিষয়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তন্মধ্যে যে বিষয়টী সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুখজনক ও স্থায়ী বলিয়া সেই ব্যক্তি বিশ্বাস করে তাহার গতি সেই বিষয়েরই প্রতি হইবেক। ঈশ্বর সকল বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, সুতরাং তিনি সকলের অন্ত-রের বিষয় ও সকল ঘটনাই জানিতে পারেন। মানবাত্মার কার্য্যকলাপ ও বিশ্ব রাজ্যের ঘটনাবলী ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠিত নিয়মের অধীন, সুতরাং ঈশ্বর মানবাত্মার ভবি-ষ্যৎ কার্য্য-কলাপ পূর্ব্ব হইতে জানিতে পারেন।

আমরা স্বাধীন বা অধীন তাহা অন্য এক প্রকারে জানা যাইতে পারে। মান-বাত্মা ঈশ্বর-সহবাস-জনিত অতুলনীয় আনন্দ প্রাপ্ত অথবা উহার আশায় আশ্বসিত হইবার পূর্ব্বে কোন অনিত্য সুখে আসক্ত থাকিবেই। কারণ ইহা কোন বর্ত্তমান সুখ বা সুখের আশা প্রাণে পোষণ না করিয়া থাকিতে পারে না। আত্মা নীর-সতা ঘৃণা করে। মনুষ্যগণ যে নানা প্রকার পাপে লিপ্ত হয় এবং ঐ সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত শতবার প্রতিজ্ঞা করিয়াও পুনরায় তাহাতে পতিত হয় তাহার কারণ এই যে তাহারা পাপ করিয়া যে সুখ প্রাপ্ত হয়, তাহার তুল্য বা তদপেক্ষা অধিকতর সুখ অন্য কোন বিষয় হইতে লাভ করিতে বা উহার আশায় আশ্বসিত হইতে না পারিলে উহারা পূর্ব্ব পাপ পরিত্যাগ করিতে পারে না। অনিত্য সুখ পরিত্যজ্য এবং নিত্য সুখ অবলম্বনীয়, করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগকে এই শিক্ষা দিবার নিমিত্ত, অনিত্য সুখের পরি-ণাম যাতনাময় করিয়া দিয়াছেন। মনুষ্য-গণ অনিত্য সুখে আসক্ত হইয়া যাতনা পাইলে কিছুদিন তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকে। পরে প্রাণকে পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত অন্য কোন বিষয় না পাইলে পুন-রায় পাপে নিমগ্ন হয়। কারণ প্রাণকে অধিক দিন নীরস রাখিতে পারা যায় না। আমরা স্বাধীন হইলে অতি শীঘ্রই আত্ম-প্রভাবে সাধু হইতে পারিতাম। ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় কেহই এপর্য্যন্ত আত্মপ্রভাবে পাপমুক্ত হইতে পারিল না। সকল সাধকই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন ঈশ্বরের কৃপা না হইলে মুক্ত

হওয়া যায় না। ঈশ্বরের কৃপায় মানবাত্মা ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে পাইলে তাহার মধুর রসে আকৃষ্ট হইয়াই, উহা সর্ব্বপ্রকার অনিত্য সুখ পরিত্যাগ করে। ধর্ম্মসাধন করিয়া যদ্যপি এরূপ কোন তৃপ্তি না পাওয়া যাইত, তাহা হইলে কোন ব্যক্তি উহা সাধন করিতে পারিত না। উহা অতিশয় নীরস ও কঠোর বলিয়া বোধ হইত। ধর্ম্মোৎপাদ্য এই সুমিষ্ট রস প্রাপ্ত হইয়াই সাধক আপনাকে বলীয়ান মনে করে।

প্রেমই মানবাত্মার প্রকৃত রস। আত্মপ্রভাবে যে মুক্তি হয় না সাধকগণ ইহা বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহারা কহেন যতক্ষণ আত্মপ্রভাব আছে বলিয়া বিশ্বাস থাকে ততক্ষণই ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তির প্রতিবন্ধকতা থাকে। আত্মদর্প চূর্ণ হইলেই ব্রহ্মকৃপা অবতীর্ণ হয়। তজ্জন্যই ঈশা বলিলেন দীনাত্মাগণ ধন্য কারণ তাঁহারা ঈশ্বর দর্শন করিবেন এবং শ্রীচৈতন্যও বলিলেন সাধক যে পর্য্যন্ত আপনাকে তৃণাপেক্ষা নীচ দেখিতে না পান সে পর্য্যন্ত তিনি হরিসংকীর্ত্তনের যোগ্য হয়েন না। বাস্তবিক ধর্ম্মরাজ্যে দীনতা অনুভব করিতে না পারিলে ব্যাকুলতা ও প্রার্থনার ভাব বর্দ্ধিত হইতে পারে না। যে ব্যক্তি মনে করে আত্মচেষ্টায় পাপমুক্ত ও পবিত্র থাকিতে পারা যায় সে ব্যক্তির প্রার্থনার ভাব অতিশয় ক্ষীণ। দুর্ব্বলতা নিবারণের উপায়ান্তর প্রাপ্ত না হইয়াই সকল সাধক স্বীকার করিয়াছেন, প্রার্থনা ব্যতিরেকে মুক্ত হইতে পারা যায় না, ঈশ্বরের কৃপা হইলেই প্রকৃত মুক্তি হয়, আত্মপ্রভাবে মুক্তি অসম্ভব। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন আত্মপ্রভাবে মুক্তি হয় না বটে, কিন্তু মুক্তির নিমিত্ত চেষ্টা হইতে পারে। আমরা বলি এই চেষ্টার কারণ আত্মপ্রভাব নহে, ধর্ম্মোৎপাদ্য অপূর্ব্ব সুখ শান্তিই ইহার প্রকৃত কারণ। উহারই আকর্ষণে আমরা ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হই। আমরা স্বাধীন বা অধীন জানিতে হইলে কোন যুক্তির সাহায্য গ্রহণ করিবার আবশ্যক নাই। আত্মানুসন্ধান দ্বারা আমরা ইহা জ্ঞাত হইতে পারি। ঈশ্বরের নিকটে প্রেমরস ভিক্ষা না করিয়া কেবল আত্মপ্রভাবে পাপমুক্ত ও পবিত্র থাকিতে পারা যায় কি না? একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলেই হইল। কেহ যদি চেষ্টা করেন দেখিবেন, তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। পাপ হইতে তিনি আপন চিত্ত কিছুদিন সংযত রাখিতে পারিবেন বটে, কিন্তু পাপের বীজ—পাপইচ্ছা তাঁহার চিত্ত হইতে দূরীকৃত হইবে না। এই যে সাময়িক আত্মসংযম অর্থাৎ পাপ হইতে নিবৃত্তি, তাহাও আত্মার স্বাধীন ইচ্ছার কার্য্য নহে। পাপকার্য্য হইতে আমরা যাতনা পাই। সেই যন্ত্রণাই আমাদিগকে পাপ হইতে বিরত হইতে বাধ্য করে। পাপে যাতনা না থাকিলে কেহ পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারিত না, এমন কি পাপবোধই হইত না। আমরা যেরূপ অপূর্ণ ও দুর্ব্বল জীব, আমাদিগের স্বাধীনতা থাকিলে দুর্গতির সীমা থাকিত না। করুণাময় জগদীশ্বর স্বহস্তে আমাদিগকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করিতেছেন, তজ্জন্যই আমরা সুরক্ষিত হইতেছি। অনাদি অনন্ত সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরই কেবল স্বাধীন আর কেহ স্বাধীন নহে। এক্ষণে এক প্রশ্ন হইতে পারে—তবে কি তিনি তাঁহার নিয়ম দ্বারা আমাদিগকে পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়া যাতনা দিতেছেন?

ইহার উত্তরে আমরা বলি, তিনি তাঁহার ক্রোধবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে যাতনা দিতেছেন না, তিনি অপূর্ণ অজ্ঞান জীবকে নিত্য ও অনিত্য সুখের জ্ঞান প্রদান করিবার নিমিত্ত দুঃখের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা তাঁহার প্রেমেরই পরিচায়ক, নির্দ্দয়তা নহে। অজ্ঞান বালক অগ্নিতে হস্ত প্রদান করিলে যাতনা প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বর যখন বালককে পূর্ণ জ্ঞান প্রদান না করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সে অগ্নিতে হস্তপ্রদান করিলে তাহার কোন অপরাধই হইতে পারে না। কিন্তু তিনি করুণাময় ও ন্যায়বান হইয়াও নিরপরাধ বালককে অগ্নির জ্ঞান প্রদান করিবার নিমিত্ত যাতনা দেন। তিনি এই যাতনা প্রদান না করিয়া বালককে অন্য কোন উপায়ে রক্ষা করিতে পারিতেন কিন্তু তাহা হইলে বালক কোন কালে অগ্নির জ্ঞান লাভ করিতে পারিত না। পশু পক্ষীগণ যেরূপ সংস্কার দ্বারা জ্ঞানীর ন্যায় কার্য্য করে কিন্তু কোন বিষয়ের প্রকৃত জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারে না, বালকের অবস্থাও তাহাই হইত। সুতরাং যাতনা দ্বারা ঈশ্বর আমাদিগকে জ্ঞান দান করিয়া প্রেমেরই কার্য্য করেন। তিনি যাতনা হইতে আমাদিগকে দূরে রাখিয়া অজ্ঞান করিয়া রাখিলে তাঁহার করুণা প্রকাশ হইত না, বরং নির্দ্দয়তাই প্রকাশ হইত। এই বিষয় পরে অন্য এক স্থানেও আলোচিত হইবেক।

ক্রমশঃ।

শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার শিষ্যগণ।

সনাতন গোস্বামীর নীলাদ্রি গমন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রূপ নীলাদ্রি হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার কিছু দিন পরে সনাতন বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে আসিতে ইচ্ছা করেন। সনাতন বৃন্দাবনে সুবুদ্ধিরায় প্রভৃতি বৈরাগী ভক্ত সাধকদিগের পবিত্র সহবাসে কিয়ৎদিন অবস্থান করিবার পর ঝারিখণ্ডের বন্য পথে নীলাদ্রি অভিমুখে বহির্গত হইলেন। যিনি রাজসেব্য নানাবিধ সুরস ভক্ষ্য ভোজ্যে পরিপুষ্ট ও সন্তৃপ্ত থাকিয়া পার্থিব সুখৈশ্বর্য্যের সর্ব্বোচ্চ মঞ্চে উল্লাসতরঙ্গে ক্রীড়া করিতেন, বৈরাগ্যের কঠোর পেষণ তিনি আর কত দিন সহ্য করিতে পারিবেন? অনাহার অনিদ্রা পথশ্রম ও ঝারিখণ্ডের অস্বাস্থ্যকর জলপান ইত্যাদি বিবিধ কারণে সনাতনের দেহ অচিরাৎ ভাঙ্গিয়া পড়িল, এবং সর্ব্বাঙ্গে কণ্ডু (চর্ম্মরোগ) উৎপন্ন হইয়া তাহা হইতে শোণিত ও রস নিঃসৃত হইতে লাগিল। শরীরের এই অবস্থা দেখিয়া সনাতনের মনে নির্বেদ উপস্থিত হয়, এবং মনে মনে এই চিন্তা করিতে থাকেন যে, "আমি একে নীচ জাতি, আমার এই পাপ দেহও অতি অসার; শুনিয়াছি জগন্নাথের মন্দিরের নিকটেই চৈতন্যপ্রভু অবস্থিতি করেন। সেখানে জগন্নাথের পরিচারকেরা কার্য্যানুরোধে সর্ব্বদাই যাতায়াত করিয়া থাকেন। আমি তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিলে আরও আমার অপরাধ বৃদ্ধি হইবে। এ অবস্থায় যদি রথযাত্রাকালে মহাপ্রভুর সম্মুখে জগন্নাথ দর্শন করিতে করিতে রথচক্রে এই তুচ্ছ শরীর পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে দুঃখের শান্তি হয় এবং পর-

লোকে সদ্গতি লাভ করিতে পারি।” সনাতন এইরূপ চিন্তা করিয়া হরিদাসের সাধনকুটীরে সমুপস্থিত হইলেন, এবং তৎসঙ্গে প্রেমারসালাপে প্রবৃত্ত হইয়া নির্ম্মল প্রেমানন্দসুধা সম্ভোগ করত কতক্ষণে গৌরচন্দ্রের সাক্ষাৎকার লাভ করিবেন এই জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এমন সময়ে ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে গৌরাঙ্গ তথায় আগমন করিলে সনাতনের সহিত তাঁহার মিলন হইল। চৈতন্য সনাতনকে আলিঙ্গন করিতে যতই অগ্রসর হন, সনাতন ততই পশ্চাতে গমন করেন আর নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া বলেন, “প্রভু রক্ষা করুন্, আমাকে স্পর্শ করিবেন না, একে আমি অস্পৃশ্য হীন, কণ্ডুরসে আমার সর্ব্বাঙ্গ অপবিত্র, আপনার পায় পড়ি আমাকে স্পর্শ করিবেন না।” আচণ্ডালে হরিনাম বিতরণ করিবার জন্য যিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন; অধিক কি যাঁহার অলৌকিক প্রেম গলিতকুষ্ঠ রোগগ্রস্তকেও আলিঙ্গন করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই, তিনি কি প্রাণসদৃশ প্রেমাস্পদ শিষ্য ভক্তপ্রবর সনাতনের গাত্রে গাত্র-কণ্ডু-নিঃসৃত শোণিত রস দেখিয়া ঘৃণা করিবেন? প্রেমিক চৈতন্য সনাতনকে বলপূর্ব্বক হৃদয়ে গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর সনাতনের সহিত চৈতন্য প্রভুর ইষ্টালাপ হইতে লাগিল। কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপমের মৃত্যুসংবাদ সনাতন এইখানে আসিয়া অবগত হইলেন। চৈতন্য অনুপমের ভক্তিনিষ্ঠার প্রশংসা করিলে সনাতন বলিলেন;

“সনাতন কহে নীচ বংশে মোর জন্ম।
অধর্ম্ম অন্যায় যত আমার কুলধর্ম্ম॥
হেন বংশে ঘৃণা ছাড়ি কৈলে অঙ্গীকার।
তোমার কৃপাতে বংশের মঙ্গল আমার॥
যে বংশ উপরে তোমার হয় কৃপা লেশ।
সকল মঙ্গল তাঁহা খণ্ডে সব ক্লেশ॥

চৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্যখণ্ড ১ পরিচ্ছেদ।

অতঃপর শ্রীচৈতন্য সনাতনকে হরিদাসের সঙ্গে কৃষ্ণভক্তিরস আস্বাদন করিতে উপদেশ দিয়া আপনার আশ্রমে গমন করিলেন। চৈতন্য প্রতিদিনই হরিদাসের কোলাহলশূন্য শান্তিরসাস্পদ আশ্রমে আগমন করিয়া সনাতনসহ সৎপ্রসঙ্গে কিছুক্ষণ যাপন করিয়া নির্ম্মল সুখানুভব করিতেন। রথাগ্রে সনাতনের দেহপাত করিবার ইচ্ছা জানিতে পারিয়া একদিন গৌর বলিলেন, “সনাতন! দেহত্যাগ করিলে যদি ভগবানকে লাভ করা যাইত, তবে মুহূর্ত্ত মধ্যে কোটি দেহনাশ করিতে পারিতাম। দেহত্যাগাদি তমোগুণের লক্ষণ, তাহাতে কৃষ্ণলাভ হয় না; কেবল ভক্তি পূর্ব্বক ভজন সাধনে তাঁহাকে লাভ করা যায়। ভক্তি ব্যতীত হরিচরণ প্রাপ্তির আর পথ নাই। ভক্তিতে ভগবানে প্রেম উৎপন্ন হয়, এই প্রেমই কৃষ্ণচরণ প্রাপ্তির একমাত্র হেতু *। দেহনাশ করা তামসিক ধর্ম্ম, তাহা পাপের কারণ বলিয়া জানিবে। প্রেমিক ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের বিরহবিকারে ব্যথিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে চায় এবং গাঢ় প্রেমানুরাগ জন্মিলে প্রাণনাথের বিরহজ্বালা অসহ্য হয় সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রেম-ব্যাকুলতাই আবার হৃদয়নাথকে হৃদয়ে আনিয়া দেয়। তুমি কুবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের নাম মহিমা শ্রবণ কীর্ত্তন কর, আচরাৎ কৃষ্ণপ্রেম

* “ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা॥”
ভাগবত ১১শ স্কন্দ।

হে উদ্ধব! মৎসম্বন্ধীয় উর্জ্জিতা অর্থাৎ সাধনাত্মিকা ভক্তি আমাকে যেরূপ বশীভূত করিতে পারে; কি চান্দ্রায়ণাদি কি সাংখযোগ কি সদাচার কি স্বাধ্যায় কি তপস্যা কি ত্যাগ কিছুতেই তেমন পারে না।

ধন লাভ করিতে পারিবে। নীচ জাতি কৃষ্ণভজনের অযোগ্য নহে, সদ্বংশজাত বিপ্র হইলেই তাহার যোগ্য হয় না। হে সনাতন! শ্রীহরির ভজনাতে জাতিকুলের কোন বিচার নাই। যে হরির আরাধনা করে সেই শ্রেষ্ঠ হয়। দয়াময় ভগবান দীন দুঃখীর প্রতিই অধিক দয়া করেন, কুলীন পণ্ডিত এবং ধনশালী ব্যক্তিরা সদা অভিমানী। হরি-পদারবিন্দ-বিমুখ দ্বিষড়্‌গুণযুক্ত বিপ্র অপেক্ষা হরিগতপ্রাণ চণ্ডালও বরণীয়, ইহাই ভাগবতের উপদেশ *। ভজনের মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পদসেবা, অর্চ্চনা, বন্দনা, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নয় লক্ষণযুক্ত ভক্তির অনুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ †। হরিপ্রেমই হরিকে আনিয়া দিতে সমর্থ, তদ্ভিন্ন অন্য উপায় নাই, নামসংকীর্ত্তনই সকল সাধনের সার বলিয়া জানিবে। নিরপরাধে নাম লইলে প্রেমধন লাভ হয়।

* বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবৎ ৭ম স্কন্ধ।

ধর্ম্ম, সত্য, দম, তপস্যা, অমাৎসর্য্য, লজ্জা, তিতিক্ষা, অহিংসা, যজ্ঞ, দান, ধৃতি, বেদাধ্যয়ন, এই দ্বাদশ গুণ সম্পন্ন ব্রাহ্মণ যদি হরিপদারবিন্দবিমুখ হন, তাঁহার অপেক্ষা যে চণ্ডাল প্রাণ মন বাক্য কর্ম্ম ধন সকলই ভগবানে সমর্পণ করিয়াছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। যেহেতু এরূপ চণ্ডাল হইতে কুল পবিত্র হয়। কিন্তু তদ্রূপ গর্ব্বিত ব্রাহ্মণ, কুল দূরে থাকুক আপনাকেও পবিত্র করিতে পারে না।

† শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমং॥

ভাগবত ৭ম স্কন্ধ নারদবাক্য।

ভগবান বিষ্ণুর লীলা মহিমাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, ও তাঁহার পরিচর্য্যা, অর্চ্চন, বন্দন, তাঁহাতে দাস্যভাবে কর্ম্মার্পণ, বিশ্বাস ও আত্মনিবেদন এই নয় লক্ষণযুক্ত ভক্তি যদি ভগবানে সমর্পণ পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করা যায়, আমার বিবেচনায় তাহাই উত্তম অধ্যয়ন।

গৌরের মুখে অকস্মাৎ এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সনাতন বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, এবং তাঁহার চরণে ধরিয়া বলিতে লাগিলেন "তুমি সকলই অবগত আছ, আমি ত কাষ্ঠ-যন্ত্র মাত্র, যেমন নাচাও, তেমনি নাচি, যেমন করাও তেমনি করি। আমি অতি-হীন পামর, আমাকে জীবিত রাখিলে তোমার কি লাভ হইবে?" চৈতন্য বলিলেন, "তোমার দেহ আমার নিজস্ব ধন, তুমি আমাকে আত্মসমর্পণ করিয়া এখন আবার পরের দ্রব্য কেন বিনাশ করিতে চাহিতেছ? ধর্ম্মাধর্ম্ম কি বিচার করিতে পার না? তোমার দ্বারা আমি বহু প্রয়োজন সাধন করিব। তুমি বৃন্দাবনে থাকিয়া ভক্ত, ভক্তি, কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্ব এবং বৈষ্ণবের নিত্য কৃত্য ও আচার ব্যবহারাদি নির্দ্ধারণ কর। লোক সকলকে বৈরাগ্য শিক্ষা দিয়া কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণসেবা প্রচার কর, ইহা আমার একান্ত ইচ্ছা। আমি মাতৃআজ্ঞায় নীলাচলে বাস করিতেছি; বৃন্দাবনে গিয়া এই সকল কার্য্য করিতে আমার শক্তি নাই। তোমার দ্বারা এই সকল মহৎ কার্য্য আমি সিদ্ধ করিব, তুমি দেহপাত করিবে ইহা কি আমি সহ্য করিতে পারি?" হরিদাসকে সম্বোধন করিয়া আবার বলিলেন, শুন হরিদাস! ইনি পরের দ্রব্য বিনাশ করিতে চাহিতেছেন, তুমি নিষেধ কর, যেন এমন অন্যায় কার্য্য না করেন। সনাতন চৈতন্যের স্নেহবাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া তদীয় চরণে নমস্কার পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "তোমার গম্ভীর হৃদয় আমি কি বুঝিব, আমি কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায়, আপনাকে আপনি চিনি না, তুমি যা করাও তাই করি।" হরিদাস বলিলেন, ঠাকুর, তোমার গূঢ়তত্ত্ব কে জানিতে সমর্থ? কোন্ কার্য্য তুমি কাহার

দ্বারা করাও, তুমি না জানাইলে কেহই জানিতে পারে না। অনন্তর গৌরচন্দ্র হরিদাস ও সনাতনকে আলিঙ্গন দিয়া বিদায় হইলেন। চৈতন্যের আদেশমত হরিদাস সনাতনকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, সনাতন, তোমার ভাগ্যের সীমা নাই। তোমার দেহকে প্রভু নিজস্ব বলিতেছেন, তোমার সমান ভাগ্যবান আর কে আছে? প্রভুর নিজের দ্বারা যাহা হইবে না তাহা তুমি করিবে, বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিয়া তুমি ভক্তি-সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র প্রণয়ন ও আচার নির্ণয় করিয়া লোকশিক্ষা দিবে, প্রেমভক্তি বৈরাগ্য ভগবৎসেবা তোমার দ্বারা প্রচারিত হইবে, ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্য কি আছে? সনাতন, আমার এই পাপদেহ প্রভুর কোন কার্য্যেই লাগিল না, আমি মিথ্যা জীবন ধারণ করি, ভারতভূমিতে আমি বৃথা জন্মগ্রহণ করিয়াছি। সনাতন বলিলেন, তুমি প্রতিদিন তিন লক্ষ হরিনাম সংকীর্ত্তন করিয়া জগতে নাম-মহিমা প্রচার করিতেছ। কেহ আপনি আচরণ করে, কিন্তু প্রচার করে না; কেহ প্রচার করে আচরণ করে না, তুমি আচরণ ও প্রচার দুই কার্য্যই করিতেছ; তুমি জগতের পূজনীয় ও সকলের গুরু, তোমার ন্যায় সৌভাগ্যশালী আর কেহই নাই।

ক্রমে রথযাত্রার সময় উপস্থিত হইলে গৌড়ের ভক্তবৃন্দ পূর্ব্ববৎ নীলগিরিতে আগমন করিলেন। ভক্তসম্মিলনে নীলাচল আবার উল্লাস উৎসবে প্রফুল্লিত ও আনন্দানিল-হিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিল। নিত্যানন্দ,অদ্বৈত, শ্রীবাস প্রভৃতি প্রধান প্রধান ভক্তদিগের নিকট সনাতন পরিচিত হইলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য রামানন্দ প্রভৃতি পাণ্ডিত্য ও ভক্তিরসের অদ্বিতীয় রসিকগণ সনাতনের বিনয়াবনত প্রেমবিগলিত স্নিগ্ধ-মাধুর্য্যপূর্ণ পবিত্র প্রশান্ত মূর্ত্তি, আশ্চর্য্য ভগবৎপরায়ণতা, জীবন্ত বৈরাগ্যপ্রভাব এবং সুগভীর পাণ্ডিত্য ও শাস্ত্রানুগা বুদ্ধি সন্দর্শন করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। সনাতনের অসাধারণ বিনয় বৈরাগ্য দেখিয়া সকলেরই হৃদয় তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিল।

গৌরাঙ্গ জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন যমেশ্বরটোটা নামক স্থানে কোন ভক্তগৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ গমন করিয়া সনাতনকে তথায় আহ্বান করিলেন। প্রভুর আহ্বান শুনিয়া সনাতন অহ্লাদে উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্নকালে প্রখর সূর্য্যকিরণে সমুদ্রের বালুকারাশি অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইয়াছে। বায়ু-সন্তাড়িত প্রতপ্ত বালুকাকণা অগ্নিবৃষ্টির ন্যায় পতিত হইয়া দিক্‌সকল দগ্ধ করিতেছে, এই অবস্থায় সেই প্রচণ্ড বালুরাশির উপর দিয়া সনাতন চলিতে লাগিলেন, পদতল দগ্ধ হইতে লাগিল, তত্রাচ অনুরাগের মত্ততাতে কিছুমাত্র জানিতে পারিলেন না। তদবস্থায় সনাতনকে দর্শন করিয়া গৌরচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, সিংহদ্বারের শীতল পথে কেন আসিলে না? সনাতন উত্তর করিলেন,আমি অস্পৃশ্য অতি হীন দুরাচার, সিংহদ্বারে যাইতে আমার অধিকার নাই। বিশেষতঃ সেখানে জগন্নাথদেবের সেবকেরা সর্ব্বদাই গতায়াত করেন,যদি দৈবাৎ তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিয়া ফেলি, তাহা হইলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে। সনাতনের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া গৌর বলিলেন, "যদিও তুমি পবিত্রস্বভাব এবং দেব ও মুনিগণের পূজ্য, তথাপি মর্য্যাদাপালন সাধুর ভূষণ স্বরূপ। মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে লোকসমাজে উপ-

হাসাস্পদ হইতে হয়। তুমি মর্য্যাদা রক্ষা করিলে দেখিয়া আমি আনন্দলাভ করিলাম, তুমি এরূপ না করিলে আর কে করিবে?" এই বলিয়া শ্রীচৈতন্য কণ্ডুরস-শোণিতাক্ত সনাতনকে পুনঃ পুনঃ প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন।

সনাতন ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া যবনের দাসত্ব জন্য তৎসাময়িক হিন্দুসমাজে পতিতবৎ থাকিলেও তাঁহার নির্ম্মলস্বভাব জ্ঞান বৈরাগ্য ভগবন্নিষ্ঠা বশত সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিত। তিনি এরূপ ক্ষুদ্রচেতা ছিলেন না যে এজন্য গর্ব্বিত হইয়া অন্যের মর্য্যাদাভঙ্গ করিবেন। বরং তিনি ভক্তগণের এতাদৃশ শ্রদ্ধা ভালবাসা এবং গৌরচন্দ্রের প্রেম আলিঙ্গন ও তাঁহার প্রশংসার উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া আপনার হীনতা অনুভব করত নিরতিশয় কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেন। সাধুচরিত্রের লক্ষণই এইরূপ।

একদিন সনাতন অতি নির্ব্বিণ্ণচিত্তে জগদানন্দ পণ্ডিতকে বলিলেন, "আমি প্রভুকে দর্শন করিয়া দুঃখ দূর করিতে এখানে আসিলাম, এখন দেখিতেছি হিতে বিপরীত হইল। আমি অতি নিকৃষ্ট পামর, নিষেধ না মানিয়া প্রভু আমাকে আলিঙ্গন করেন, আমার কণ্ডুরক্ত রস প্রভুর অঙ্গে স্পর্শ হয়, এই মহা অপরাধে আমার আর নিস্তার নাই। কি করিলে হিত হয় কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" সনাতনের আন্তরিক গ্লানি দুঃখ দেখিয়া জগদানন্দ বলিলেন, বৃন্দাবনই তোমার যোগ্য বাসস্থান। রথযাত্রা দেখিয়া সেইখানে গমন কর। প্রভু তোমাদের দুই ভাইকে ঐস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। জগদানন্দের পরামর্শ শ্রেয়ঃজ্ঞান করিয়া সনাতন গৌরকে একদিন তাহা জ্ঞাপন করিলেন। তচ্ছ্রবণে গৌরচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া জগদানন্দকে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কি! ব্যবহার ও পরমার্থে তুমি তার গুরুতুল্য ব্যক্তি; কালিকার জগা আপনার মূল্য না জানিয়া তোমাকে উপদেশ দেয়, এ অতি আশ্চর্য্য! শ্রবণ করিয়া সনাতন বলিলেন, জগদানন্দের সৌভাগ্য আমি আজ জানিলাম। তুমি তাহাকে আত্মীয় জ্ঞানে শাসনচ্ছলে "আত্মতা সুধারস" পান করাইয়া আমাকে গৌরবস্তুতিরূপ নিম্ব-নিষিন্দা-রস দিতেছ; আজিও আমাকে তোমার আত্মীয় জ্ঞান হইল না, ইহাই আমার মহা দুর্ভাগ্য। সনাতনের বাক্যে চৈতন্য প্রভু কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "সনাতন, জগদানন্দ তোমা হইতে আমার প্রিয় নয়। তুমি এক জন শাস্ত্রদর্শী প্রবীণ পণ্ডিত, কতস্থানে তুমি আমাকে ভক্তিতত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছ; বালক জগা তোমার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া তোমাকে উপদেশ দেয় ইহা আমার অসহ্য। তোমার দেহ আমার নিকট অমৃততুল্য ও অপ্রাকৃত। প্রাকৃতবুদ্ধি করিয়া তুমি তাহা ঘৃণা কর। আমি সন্ন্যাসী, পঙ্ক চন্দনে সমদৃষ্টি আমার ধর্ম্ম। তোমাকে ঘৃণা করিলে আমার ধর্ম্ম নষ্ট হয়।" ইহা শুনিয়া হরিদাস বলিলেন, তোমার এ প্রতারণা বাক্য আমি মানি না। আমার ন্যায় অধম পাতকীকে যে তুমি চরণে স্থান দিয়াছ, ইহাতে তোমার দীন দুঃখীর প্রতি দয়াগুণই প্রকাশ পাইয়াছে। চৈতন্যদেব ঈষৎহাস্য করিয়া বলিলেন, হরিদাস সনাতন, তবে প্রকৃত কথা বলি শ্রবণ কর। আমি তোমাদিগকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করি। মাতা যেমন সন্তানের মলমূত্রদূষিত অঙ্গ বক্ষে ধারণ করিয়া সুগভীর

আনন্দনীরে নিমগ্ন হয়েন, সনাতনের দেহও আমার পক্ষে সেইরূপ। সনাতনের কণ্ডু ক্লেদময় দেহে আমার ঘৃণা হয় না। বৈষ্ণবশরীরকে সাধারণ মনে করিও না। তাহা চিদানন্দময় ও অপ্রাকৃত। ভক্ত যখন ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার নামে দীক্ষিত হয়, শ্রীহরি তখন তাহার দেহকে আপনার ন্যায় অপ্রাকৃত চিদানন্দময় করিয়া ল'ন, ভক্ত সেই অপ্রাকৃত দেহে ভগবানের ভজনা করেন। ভাগবতে ভগবান বলিয়াছেন,মরণশীল মানব যখন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার সেবাতে আত্মসমর্পণ করে তখন সে অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার সহিত একাত্মা হইয়া যায়। সনাতনের শরীরে কণ্ডু উৎপন্ন করিয়া ভগবান আমাকে পরীক্ষা করিলেন, আমি ইহাতে ঘৃণা করিলে প্রভুর নিকট অপরাধী হইতাম। সনাতন, তুমি দুঃখ করিও না, তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া আমি অতুল আনন্দ পাইয়া থাকি। এ বৎসর তুমি এইখানে থাক, তার পর তোমাকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিব।" "চৈতন্য চরিতামৃতে" কথিত হইয়াছে,গৌরাঙ্গ সনাতনকে পুনর্ব্বার আলিঙ্গন করিলে সনাতনের কণ্ডুরোগ আরোগ্য হইল এবং দেহ স্বর্ণকান্তি ধারণ করিল।

অনন্তর দোলযাত্রার উৎসব সমাপ্ত হইলে,বৃন্দাবনে গিয়া সনাতন কি কি কার্য্য করিবেন, তাহার উপদেশ দিয়া চৈতন্য তাঁহাকে বিদায় দিলেন। বিদায় কালে উভয়ের নয়ন দিয়া অবিরল প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। অতিকষ্টে আবেগ সম্বরণ করিয়া সনাতন বিদায় হইলেন। ইতিপূর্ব্বে গৌরচন্দ্র যে যে গ্রাম জনপদ, নানাজাতি-বিহঙ্গ-নিনাদিত সুরম্য কাননকুঞ্জ, প্রফুল্লিত বৃক্ষলতা, স্বচ্ছসলিলা গিরিনির্ঝরিণী ও শোভনতম গিরিচূড়া প্রভৃতি বিচিত্র প্রাকৃতিক শোভার আকর স্বরূপ বনভূমির মধ্য দিয়া বৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন, বলভদ্রের নিকট সনাতন তৎসমুদায় লিখিয়া লইয়া ছোট নাগপুরের সেই বনপথে বৃন্দাবন অভিমুখে চলিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ।

আমাদের দায়িত্ব।

আমাদের জীবনে এই একটী মহা দোষ, যে আমরা অনেক সময়ে নিজের দোষ না দেখিয়া পরের উপর দোষ আরোপ করি। আপনার দুঃখ ক্লেশের জন্য পরকে দোষী করি, নিজের দোষ অনুভব করি না। আবার কখনো কখনো সেই মঙ্গলময় ন্যায়স্বরূপের উপর দোষ আরোপ করি; প্রতি মুহূর্ত্তে যে তাঁহার করুণা লাভ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি তাহা বিস্মৃত হই। ফলতঃ আমাদের দুঃখ তাপ স্বদোষেই উৎপন্ন হয়; ঈশ্বর হইতে যে দুঃখ তাপ পাই তাহা আমাদের আত্মগ্লানি এবং তাহা আমাদের সংশোধনেরই মহৌষধ, তাহা আমাদের বিকারের প্রতিকার। এই ঔষধ সেবনের যে কষ্ট তাহা অতি সামান্য, ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। আমরা স্বদোষেই বাস্তবিক দুঃখ যাতনা ভোগ করি। যেমন এই বায়ু উপরিস্থ সূর্য্যের উত্তাপ প্রাপ্ত হইলেও তদ্দ্বারা তেমন তপ্ত হয় না, কিন্তু প্রধানতঃ ভূমিগত উত্তাপের দ্বারাই উষ্ণ হয় এবং তাহা যত ঊর্দ্ধে উঠে তত বিশুদ্ধ, সরল ও শীতলতা প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ আমরাও নানা দোষে দুষ্ট হইয়া তাঁহার নিকটে গেলে আমাদের মোহজনিত সমস্ত তাপ চলিয়া যায়, তাঁহার প্রতাপের নিকট-

বর্ত্তী হইলে আমরা তপ্ত হই না, প্রত্যুত স্নিগ্ধতা—শান্তিলাভ করি। কিন্তু ইহাই আশ্চর্য্য যে আমরা তাহা প্রায় ভুলিয়া থাকি। এখানে আমরা জ্ঞান ধর্ম্মে কতই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইতাম যদি না ঐরূপ ভ্রম আমাদের ভাগ্যে প্রায় ঘটিত। ভ্রম আমাদের কথায় কথায়। মঙ্গলময়ের উপর একান্ত আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি না থাকিলে ভ্রমের রাজ্য হইতে আমাদের নিষ্কৃতি লাভের উপায় নাই। ভ্রম নিরাসের জন্য মানুষের উপর অধিক নির্ভর করিলে বিশেষ কোন ফলোদয় হয় না। প্রত্যুত অনেক সময়ে ফল এই হয়,যে এক ভ্রম হইতে ভ্রমান্তরে ভ্রমণ করিতে হয়, শান্তি সহজে লাভ করা যায় না। শান্তিলাভ করিতে হইলে করুণাময়ের আশ্রয় নিতান্তই আবশ্যক। তাঁহার আশ্রয় পাইলে, যেমন সমুদ্রের জল লবণাক্ত হইলেও তদুত্থিত বাষ্প নির্ম্মল হইয়াই ঊর্দ্ধ আকাশে উত্থিত হয়, সেইরূপ আমরাও এই ধূলিনির্ম্মিত নশ্বর দেহেই পবিত্র হইয়া উন্নতির পথে উত্থিত হই। ইহা জানিয়াও কিন্তু আমরা মোহ ছাড়ি না, তাঁহাকে প্রীতিভরে আলিঙ্গন করি না। আর কষ্ট পাইলেই বলি ঈশ্বর আমাদিগকে যাতনা দিতেছেন। ফলতঃ এইরূপ চিন্তা করাও দোষাবহ। ঈশ্বর আমাদিগকে দয়া করিতে বিন্দুমাত্রও পশ্চাৎপদ নহেন। তিনি সুখ বিতরণে মুক্তহস্ত,তাঁহার দ্বার অবারিত,তিনি সর্ব্বসুখদাতা; তিনি আমাদিগকে অশেষ বিষয়ে অধিকারী করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, আমরা আপনাদের দোষে সে অধিকার হইতে বঞ্চিত হই, সে অধিকারজনিত উপকার লাভ করিতে পারি না। গ্রীশ দেশীয় রাজা এলেকজণ্ডর যখন বালক ছিলেন সেই সময়ে যখন তাঁহার সঙ্গীগণ তাঁহাকে তাঁহার পিতার ভূরি ভূরি জয়াধিকারের সংবাদ দিত তখন আলেকজণ্ডর তাহাতে আহ্লাদিত না হইয়া তাহাদিগকে কহিতেন "আমার পিতা আমার জন্য কিছুই রাখিবেন না"। সঙ্গীরা তাহাতে আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহাকে পুনশ্চ কহিত, কেন ইহার অর্থ কি? তোমার পিতা তো তোমারই জন্য সমুদয় উপার্জ্জন করিতেছেন। তাহার উত্তরে তিনি কহিতেন "আমি অনেক বিষয়ের উত্তরাধিকারী বটে কিন্তু নিজে কিছুই করিতেছি না।" এই গ্রীকরাজের মনে বাল্যকাল হইতেই স্বীয় কর্ম্মের দায়িত্ব উপলব্ধি হইত। তিনি নিজে একজন ভালরূপ কর্ম্মিষ্ঠ পুরুষ না হইলে তাঁহার পিতার রাশি রাশি অধিকার যে বৃথা হইবে প্রথম হইতেই ইহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন। আলেকজণ্ডরের ন্যায় এই স্বীয় কর্ম্মের দায়িত্ব সকল মানুষেরই বুঝিবার কথা। স্বস্ব কর্ম্মের উপর আমাদের বিশেষ রূপ দৃষ্টি রাখা চাই। আমরা অগ্রে যথার্থ কর্ম্মী হইলে তবে আমাদের পরমপিতার প্রদত্ত অধিকার সমূহ ঠিক উপলব্ধি ও ধারণ করিতে পারিব। কেবল পরচর্চ্চায় অকর্ম্মণ্য ভাবে দিনাতিপাত করিলে তাঁহার দত্ত অধিকার বুঝিতে পারি না। আর তজ্জন্য পিতার বিষয়ে অনধিকারী হইয়া অসৎপুত্রের ন্যায় তাঁহার নামে অযথা দোষ আরোপ করিলে চলিবে কেন? এই অযথা দোষারোপ দ্বারা আমরা সহজ উপায়ে নিজে দোষমুক্ত হইবার চেষ্টা পাই বটে কিন্তু সত্য যাইবে কোথায়? যখন দোষ অধিক পরিমাণে আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলে তখন আমাদের চৈতন্য হয় এবং তৎকালে আমরা অনুতপ্ত হৃদয়ে মুক্তিলাভের প্রয়াসী হইয়া উঠি। মুক্তির জন্য তখন

আপনিই দায়িত্ব বহন করি, অন্যের উপর দায়িত্ব স্থাপন করি না। দেখ ইউরোপ এক সময়ে পোপের মুখাপেক্ষী হইয়া স্বীয় দায়িত্বহীন হইয়া অন্ধকারে ডুবিয়াছিল। পোপের মুখের কথাই প্রায় তাহার মুক্তি স্বরূপ ছিল। তাহাতে ইউরোপ দিন দিন অবনত হইয়া পড়িতেছিল কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় শীঘ্রই পোপের আধিপত্য লুপ্ত হইল। ইউরোপও স্বীয় দায়িত্বের প্রভায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া কত না স্বাধীনতা লাভ করিল।

পুনশ্চ এই যে ইংরাজ জাতি দেশ বিদেশে আধিপত্য স্থাপন করিয়া প্রভূত সম্পদ লাভ করিয়াছেন তাহার প্রধান হেতু কি? প্রধান হেতু এই যে, ইংরাজ আপনার দায়িত্ব খুব বুঝিয়াছেন। তাঁহারা বলেনঃ—"England expects every man to do his duty." "ইংলণ্ড চান প্রত্যেক মনুষ্য তাহার আপন আপন কর্ম্ম করুক"। আমরাও আমাদের দেশের পূর্ব্ব পুরুষদিগের অতি নিগূঢ় দায়িত্ব সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক ধ্বনি পাই—"আত্মৈব নিয়তো বন্ধুঃ আত্মৈব নিয়তো রিপুঃ"। তাঁহারা নিজের দায়িত্ব বেশ রীতিমত বুঝিতেন এবং তদনুসারে স্বীয় দোষ মালিন্য সকল প্রক্ষালিত করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেন। এইরূপে সকল দিক হইতেই দেখিতে পাই যে, মানুষের দায়িত্ব মানুষ নিজের উপরে গ্রহণ না করিলে তাহার উন্নতির আশা নাই। যত আমরা নিজের দায়িত্ব পরের স্কন্ধে না চাপাইয়া নিজের উপর চাপাইতে কুণ্ঠিত না হইব তত আমাদের উন্নতির পথ প্রশস্ত হইবে। আমরা হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হইয়া যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভে সক্ষম হইব।

—

সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা।

(ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক কম্বুলিয়াটোলা পাঠ্যসমিতির অধিবেশনে পঠিত।)

আমি অদ্য একটি অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যে ক্ষুদ্র প্রবন্ধখানি হস্তে করিয়া এখানে আমি আজ আপনাদের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছি, তাহার নাম "সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা।" একে তো চিকিৎসা মাত্রই অন্ধকারে ঢেলা নিক্ষেপ; তাহাতে আবার কবিরাজি চিকিৎসা—উনবিংশ-শতাব্দীয় বিজ্ঞানের প্রখর রশ্মি আজ পর্য্যন্ত যাহার গবাক্ষ ভেদ করিতে পারে নাই! তাহাতে আবার সামাজিক রোগের চিকিৎসা—যাহার গহন অরণ্যে মহা মহা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা অন্ধকারে দিশা-হারা হইয়া কোথাও তাহার অস্থি-সন্ধি খুঁজিয়া পা'ন না! একে চিকিৎসা—তাহাতে কবিরাজি চিকিৎসা—তাহাতে আবার সামাজিক রোগের চিকিৎসা! একে রজনী দ্বিপ্রহর —তিথি তায় অমাবস্যা—ঋতু তায় মেঘাচ্ছন্ন বর্ষা! কিন্তু হইলে হইবে কি—আমি এখন মাঝ-গঙ্গায় উপস্থিত! আমা হইতে এ পারও যত দূর, ও-পারও তত দূর! এখন আমার পক্ষে এগোনোও যা—পিছোনোও তা; বিপদ দুয়েতেই সমান! এসময়ে পিছোনো লাভে-হইতে কেবল কলঙ্কের ভাগী হওয়া! এখন কর্ত্তব্য কি? ঢেউ দেখিয়া লা ডুবানো কর্ত্তব্য—না শক্ত করিয়া হাল ধরিয়া থাকিয়া গন্তব্য কূলের দিকে প্রাণপণে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য? এগোনোই কর্ত্তব্য—তাহাতে আর সন্দেহ নাই!

অতএব তাহাই করা যা'ক—এগোনো যা'ক্।

কিন্তু তাহা করিবার পূর্ব্বে একটি কথা আমার বলিবার আছে; তাহা এই যে, ডাক্তারি বিদ্যা স্বতন্ত্র, আর, কবিরাজি বিদ্যা স্বতন্ত্র! ডাক্তারি বিদ্যার গোড়াতেই শবদেহ পরীক্ষা; কবিরাজি বিদ্যার গোড়াতেই শরীর-মনের সম্বন্ধ-পর্য্যালোচনা। ডাক্তারি মতে—আগে শরীর, পরে মন; কবিরাজি মতে—আগে মন, পরে শরীর। কবিরাজি-শাস্ত্রের অন্তরের কাহিনী এই যে সহস্র মৃত শরীর পরীক্ষা করিলেও জ্যান্ত শরীরের প্রাণ-প্রধান নিগূঢ় তত্ত্বগুলির অন্বেষণ পাওয়া যাইতে পারে না; কেননা, শরীরের সহিত যেখানে মনের সংশ্লেষ, সেইখানেই প্রাণের বসতি; কাজেই—প্রাণের নিগূঢ় তত্ত্ব অন্বেষণ করিতে হইলে প্রাণের সেই-বসতি-স্থানে—শরীর মনের সন্ধি-স্থানে—মনোনিবেশ করা জিজ্ঞাসু ব্যক্তির সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কবিরাজি শাস্ত্রের গোড়াতেই তাই ত্রিগুণের সহিত ত্রিদোষের সম্বন্ধ পর্য্যালোচিত হইয়াছে। ত্রিগুণের সহিত ত্রিদোষের সম্বন্ধ—কথাটা কিছু ঘোরালো রকমের! তাহা শুনিলে হঠাৎ মনে হয়—যেন, শামুকের নস্যের ডিবা'র মধ্য হইতে এই মাত্র তাহা গা ঝাড়া দিয়া উঠিল! কিন্তু তাহার স্থূল তাৎপর্য্য যার পর নাই সহজ; তাহা আর কিছু না—মনের সহিত শরীরের সম্বন্ধ। অনতিপরেই আপনারা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, ত্রিগুণ (যাহাকে আপনারা এত ভয় পাইতেছেন) তাহা আর কিছুই নয়—কেবল মনের তিনটি মুখ্য-তম বৃত্তি; আর, ত্রিদোষ সেই তিনটি মুখ্য মনোবৃত্তির সহানুপাতী (parallel-runing) তিনটি শারীরিক মূল-ধাতু। এই দুয়ের সম্বন্ধ নিরূপণই কবিরাজি শাস্ত্রের গোড়া'র কাহিনী। গোড়াতেই আমি এই গোড়া'র কাহিনীটি আপনাদের নিকটে পরিষ্কার করিয়া ভাঙিয়া বলা শ্রেয় বিবেচনা করি; কেননা, সুর না বাঁধিয়া যন্ত্র-বাদন করা, আর, প্রবন্ধের গোড়া না বাঁধিয়া ডালপালা বিস্তার করা—দুইই সমান! তাহা এক প্রকার হত্যাকার্য্য—তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া অপেক্ষা ক্ষান্ত হওয়াই ভাল! আর একটা কথা এই যে, গোড়া'র কথা গোড়ায় না বলিয়া আমি যদি মাঝখানকার কোনো-একটি কথার উপরে প্রবন্ধের গোড়া পত্তন করি, তাহা হইলে হইবে এই যে, আমি একভাবে এক কথা বলিব—আপনারা পাঁচজনে তাহা পাঁচ-ভাবে গ্রহণ করিয়া তাহার পাঁচ রকম অর্থ করিবেন; লাভে হইতে আমার প্রকৃত মন্তব্যটি মাঠে মারা যাইবে।

কিন্তু এটা আপনারা স্থির জানিবেন যে, গোড়া'র কাহিনীটি এক প্রকার Rubicon নদী! একবার জো শো করিয়া আপনারা আমার সঙ্গে তাহার ওপারে পৌঁছিতে পারিলেই—আর আপনাদের কোনো ভাবনা চিন্তা থাকিবে না! সেখান হইতে আপনারা তর তর করিয়া অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইবেন।

কবিরাজি চিকিৎসা'র গোড়া'র কাহিনী যে কি তাহা আমি গোড়াতেই ইঙ্গিত করিয়াছি—কি? না ত্রিগুণের সহিত ত্রিদোষের সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা। ত্রিগুণ কি? না সত্ত্বরজস্তমো; ত্রিদোষ কি? না বাত পিত্ত কফ। প্রস্তাবিত গোড়াবন্ধন-কার্য্যের দুইটি স্তর; প্রথম স্তর—ত্রিগুণের গুণ-পরিচয়; দ্বিতীয় স্তর—ত্রিগুণের সহিত ত্রিদোষের সম্বন্ধ-নিরূপণ; এই দুইটি স্তরের গঠন-কার্য্য কোনো মতে আমি আমার হস্ত হইতে ঝাড়িয়া

ফেলিতে পারিলেই গোড়া-বন্ধনের দায় হইতে এ যাত্রা নিষ্কৃতি পাই, এবং সেই দৃঢ় ভিত্তিমূলের উপরে ভর করিয়া—বর্ত্তমান বঙ্গসমাজের রোগই বা কিরূপ, আর, তাহার কবিরাজি চিকিৎসা-প্রণালীই বা কিরূপ, তাহার আলোচনা-কার্য্যে নিশ্চিন্ত মনে প্রবৃত্ত হই।

প্রথম; ত্রিগুণের গুণ-পরিচয়। ত্রিগুণের নাম শুনিয়া আপনারা হয় তো মনে করিতেছেন—"না জানি কি একটা ত্রিশূলধারী দার্শনিক বিকট-মূর্ত্তি আসিতেছে—তাহার সে বিরূপাক্ষ-দৃষ্টিতে একবার সে আমাদের মুখের পানে খট্মট্ করিয়া তাকাইলেই আমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি উড়িয়া যাইবে!" কিন্তু তাঁহাকে আপনারা একবার চক্ষে দেখিলেই, আপনাদের সে ভ্রম ঘুচিয়া গিয়া—উল্টা তখন আপনারা আমাকে এরূপ না বলিলে বাঁচি যে, "এই তোমার সত্ত্ব রজ স্তমোগুণ—এ'র জন্য এত তুমুল কাণ্ড! আমাদের স্তন্যপানের বয়স হইতেই এর সঙ্গে তো আমরা একত্রে বাস করিয়া আসিতেছি; এমন কি—এ'র সঙ্গে আমরা মাতৃগর্ভ হইতে একত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়াছি বলিলেই হয়!" এই দেখুন্—ত্রিগুণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শুভ্র বেশে আপনাদের সমক্ষে দেখা দিতেছে; —তমোগুণ কি? না বহির্জগতে রাত্রি এবং অন্তর্জগতে নিদ্রা; রজোগুণ কি? না বহির্জগতে দিবা এবং অন্তর্জগতে কর্ম্ম-চেষ্টা; সত্ত্ব-গুণ কি? না বহির্জগতে সন্ধ্যা এবং অন্তর্জগতে চিন্তা; তাহার মধ্যে প্রাতঃ-সন্ধ্যার সহিত তত্ত্বচিন্তা এবং ঈশ্বরারাধনা; আর, সায়ংসন্ধ্যার সহিত আরাম-চিন্তা এবং ক্রীড়া কৌতুক সবিশেষ উপযোগী। চিন্তা চেষ্টা এবং নিদ্রা এই তিনটিই ত্রিগুণ-চক্র; সংক্ষেপে—গুণ-বৃত্ত; বৃত্ত—কি না চক্র। চিন্তা চেষ্টা এবং নিদ্রা অন্তর্জগতে বৃত্তের ন্যায় পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হয়, আর, বৃত্তের ন্যায় আবর্ত্তিত হয় বলিয়াই উহারা প্রধানতঃ বৃত্তি-শব্দের বাচ্য। বাহিরে যেমন দিন রাত্রি—অন্তরে তেমনি মনোবৃত্তি—উভয়েই উভয়ের সঙ্গে লয় তান মিলাইয়া পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত হইতেছে। বহির্জগতে যখন রাত্রি আগমন করে, অন্তর্জগতে তখন নিদ্রা আগমন করে; বহির্জগতে যখন চন্দ্রমা অস্তমিত হইয়া অরুণ-সারথি আবির্ভূত হয়, অন্তর্জগতে তখন নিদ্রা ভাঙিয়া গিয়া ধ্যান আবির্ভূত হয়; বহির্জগতে যখন প্রভাত অস্তমিত হইয়া মধ্যাহ্ন দিবা আবির্ভূত হয়, অন্তর্জগতে তখন ধ্যান ভাঙিয়া গিয়া কর্ম্ম-চেষ্টা আবির্ভূত হয়; এইরূপে নিদ্রা চিন্তা এবং চেষ্টা বৃত্তের ন্যায় একে একে আবর্ত্তিত হয়; আর, বৃত্তের ন্যায় আবর্ত্তিত হয় বলিয়াই উহারা প্রধানত বৃত্তি শব্দের বাচ্য; মনুষ্যের আর আর যত প্রকার মনোবৃত্তি আছে, সমস্তই ঐ তিনটি মূল-বৃত্তির ডালপালা; যেমন চিন্তার ডালপালা—কল্পনা স্মৃতি যুক্তি ইত্যাদি; চেষ্টার ডালপালা—প্রযত্ন উদ্যম অধ্যবসায় ইত্যাদি; নিদ্রার ডালপালা—আলস্য অবসাদ বিলাস ইত্যাদি। গুণ-বৃত্তই—ত্রিগুণ-চক্রই—মনের তিনটি মূলতম বৃত্তি; আর, সে তিনটি বৃত্তি পরস্পরের সহিত সহস্র জড়াজড়ি করিয়া থাকিলেও তিনের এ'র ও'র তা'র মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করিতে আমরা কিছুমাত্র বাধা অনুভব করি না। চেষ্টার সঙ্গে যদিচ কখনো বা চিন্তা জড়ানো থাকে (যেমন কর্ম্ম-চেষ্টার সঙ্গে অন্ন-চিন্তা,) কখনো বা নিদ্রা জড়ানো থাকে (যেমন পরিশ্রান্ত পাখা-বেহারার পাখাটানার সঙ্গে নিদ্রা); নিদ্রার সঙ্গে যদিচ কখনো বা

চিন্তা জড়ানো থাকে (যেমন চিন্তানুরূপ স্বপ্ন), কখনো বা চেষ্টা জড়ানো থাকে (যেমন ঘুমের ঘোরে কথা কওয়া অথবা যাহা তদপেক্ষা আরো আশ্চর্য্য—ঘুমের ঘোরে চলা-ফেরা); চিন্তার সঙ্গে যদিচ কখনো বা চেষ্টা জড়ানো থাকে (যেমন দুরূহ বিষয়ে মনঃসংযোগ), কখনো ব' নিদ্রা জড়ানো থাকে (যেমন অন্যমনস্ক-ভাবের দিবা-স্বপ্ন); বৃত্তিত্রয়ের মধ্যে যদিচ এইরূপ ঘনিষ্ঠ মাখামাখি-ভাব সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা তিনের ইতরেতর-প্রভেদ সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করি, আর, সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করি বলিয়াই তিনকে পৃথক্ নামে নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হই। এই গেল ত্রিগুণের গুণ-পরিচয়।

দ্বিতীয়; ত্রিগুণের সহিত ত্রিদোষের সম্বন্ধ-নিরূপণ। চিন্তা চেষ্টা এবং নিদ্রা, এই তিনটি মূল মনোবৃত্তির সহিত,ক্রমান্বয়ে বাত পিত্ত এবং কফ এই তিনটি দৈহিক মূল উপকরণের সবিশেষ সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে; তাহার সাক্ষী—দেশশুদ্ধ সকল লোকেই জানে যে, শ্লেষ্মা বাড়িলেই নিদ্রা বাড়ে, আলস্য বাড়ে এবং গা মাটি মাটি করে; পিত্ত বাড়িলেই গাত্রদাহ উপস্থিত হয় এবং ছট্‌ফটানি বাড়ে—চেষ্টা বাড়ে; বায়ু বৃদ্ধি হইলেই চিন্তা বাড়ে—কল্পনা বাড়ে।

ক্রমশঃ।

THE RELIGION OF LOVE.

By a Hindu, intended for all Sects and Churches.

CHAPTFR I.

The Fundamental Truth of Religion enunciated.

That there is a soul and that there is a Soul of the soul, upholding the latter by his power and immanence, and that, if he separate himself from the soul, the soul is reduced to nothing, and that the said Being superintendeth the operations of the soul and of external nature, with which the soul is intimately connected, is the fundamental truth of religion. Without the belief that there is a *present* support of the soul and of external nature and that God has not retired after making the universe, there can be no religion. In God we live, move and have our being. He is the Soul of the soul and the Life of life. Through the immanence and the everpresent superintendence of God, Nature bringeth forth moving and unmoving things. There is no other cause for the changes in the universe. We are dependent and imperfect spirits. He on whom we depend is the Perfect Spirit. The Perfect Spuit is infinite in power, wisdom and goodness, eternal, omnipresent, formless and one without a second or else He cannot be the Perfect Spirit. It is very well known that monotheistic nations believe that the Supreme Being is possessed of the attributes mentioned above. Polytheistic nations also, ancient or modern, savage or civilized, have been ascertained by philologers, antiquarians and writers on comparative religion to describe their unknown and unknowable God by the above attributes.

2. Belief in the existence of a being of Infinite Goodness is the basis of the Religion of Love. This belief is quite sufficient for the fabric of practical religion to build upon. Dogmas about the inscrutable nature of God are stone. It is only Love and Practical religion that is Life. We hasten from theoretical religion to practical religion, commencing with the subject of the preservation of health as the primary condition of a religious life.

ঈশ্বরের সৃষ্টি নৈপুণ্য।

সংখ্যা ১—মাকড়সার জাল।

আমরা দেখি যে মাকড়সা নিজের দেহ হইতে এক প্রকার সূত্র বাহির করিয়া আপনার বাসস্থান নির্ম্মাণ করে।

কিন্তু এই বাসস্থান নির্ম্মাণ করিবার এক একটী সূত্র যেরূপ সুকৌশলে নির্ম্মিত হয়, তাহা ভাবিতে গেলে একেবারে নির্ব্বাক্ হইয়া পড়িতে হয়। প্রত্যেক মাকড়সার উদরের শেষভাগে চারিটী বা ছয়টী সূত্রনির্ম্মাণ যন্ত্র আছে। প্রত্যেক যন্ত্রে আবার কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। কোন সুবিখ্যাত পণ্ডিতপ্রবর (Reaumar) বলেন যে, এই এক একটী যন্ত্র এক একটী সূচীর অগ্রভাগের ন্যায় সূক্ষ্ম হইলেও ইহাদের প্রত্যেকটীতে সহস্র করিয়া সূক্ষ্মতর ছিদ্র আছে। ঐ সকল ছিদ্র হইতে সহস্রধারে সূত্র নির্গত হইয়া সূত্র-নির্ম্মাণ-যন্ত্র হইতে দশ ইঞ্চি দূরে একত্র মিলিত হয়। তখন আমরা জাল নির্ম্মাণ করিবার একটী মাত্র সূত্র প্রস্তুত দেখিতে পাই। চারি হাজার সূত্রে একটী সূত্র প্রস্তুত হইল, অথচ তাহা এত সূক্ষ্ম যে সহজে চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না। কে এই মহান্ কৌশলের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে পারে যে ইহার স্রষ্টা নাই—ইহা ঘটনার চক্রে ঘটিয়া গিয়াছে? ইহাও সেই বিশ্বকর্ম্মার সৃষ্টি, যাঁর ইচ্ছায় এই দ্যুলোক ভূলোক সমুদয় বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

সৎপ্রসঙ্গ।

ধর্ম্মের বল। আমেরিকার কোন সুপ্রসিদ্ধ কবি তাঁহার দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়া রাখিয়াছেন যে তিনি এক দিন এক ধর্ম্মপ্রচারকের সহিত কোন উম্মাদ-নিবাসে গমন করিয়াছিলেন। প্রচারক সেইখানে উপাসনা করিলেন এবং তৎ-সঙ্গে একটী সঙ্গীতও করিয়াছিলেন। এই উম্মাদ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ যদিও অপরা-পর সময়ে অত্যন্ত গোলমাল করিত কিন্তু প্রচারক যখন উপাসনা ও সঙ্গীত করিতে-ছিলেন, তখন তাহারা সকলেই পুত্তলি-কার ন্যায় নির্ব্বাক্ হইয়া শ্রবণ করিতে-ছিল; অনেকে উক্ত সঙ্গীতে যোগদান পর্য্যন্ত করিয়াছিল। কবি দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইলেন; এবং জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, বুদ্ধির অতীত সেই পরমেশ্বর যে ইহা-দিগের অন্তরে শান্তিপ্রদান করিতেছেন, ইহাই কি তাহাদিগের এইরূপ অন্তর্নিহিত ধর্ম্মভাবের মধ্যে, উপাসনাকালীন এই রূপ শান্তভাবের মধ্যে প্রকাশ পায় না? বাস্তবিক ধর্ম্মের বলে আমরা যে শান্তি লাভ করিতে পারি, তদপেক্ষা আর কিসে অধিকতর শান্তি লাভের প্রত্যাশা করিতে পারি?

ধর্ম্মে রক্ষা। অর্থে মত্ত হইয়া আমাদের যতক্ষণ পরের বিষয়ে হিংসা হয়, ধর্ম্মে মত্ত হইয়া আমাদের ততক্ষণ পরের বিষয়ে হিংসা শুভ। (ধর্ম্মের সময় যে পরের বিষয়ে হিংসার কথা বলিলাম, তাহার অর্থ ষড়রিপু হননেচ্ছা)।

ধর্ম্ম অর্থের শীর্ষে। ধর্ম্মকে আগে দেখা চাই তাহার পরে অর্থ। ধর্ম্মের আশ্রয়ে অর্থ বিরাজ করিতেছে। তাড়াতাড়ি যে আমরা ধর্ম্মকে বাদসাদ দিয়া অর্থের প্রতি আকৃষ্ট হই তাহা আমাদের পক্ষে অশুভ লক্ষণ। ধর্ম্মকে বাদ দিয়া ধর্ম্মকে অগ্রে স্থান না দিয়া অর্থকে অগ্রে স্থান দিতে যাইলেই আমাদের ক্ষতি বই লাভ নাই। আগে ধর্ম্মকে রক্ষা কর পরে অর্থ কাম সমস্তই রক্ষা পাইবে।

সত্যানুসন্ধান। সত্যকে লাভ করিবার ইচ্ছা থাকিলে সত্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। সত্যের প্রতি লক্ষ্য স্থির না রাখিলে সম্ভবতঃ সত্য লাভ করা দুরূহ হইয়া উঠে। আর যদি সত্যের পরিবর্ত্তে আপনার প্রতি অধিকতর লক্ষ্য রাখি, তাহা হইলে সত্য লাভ করিবার পরিবর্ত্তে আপনারই সঙ্কীর্ণতা সংগ্রহ করিতে হয়।

যে বৃক্ষ পুষ্পোদ্গমকালে পুষ্পিত হয় নাই, তাহা হইতে ফলের সময়ে ফললাভের প্রত্যাশা বৃথা।

দেখা যায় যে প্রীতিস্রোত উচ্চ অপেক্ষা নিম্নাভিমুখেই প্রচুর পরিমাণে ধাবিত হয়। সন্তানের মাতৃভক্তি অপেক্ষা মাতার পুত্রবাৎসল্যই দৃঢ়তর দেখা যায়।

পরমমাতা তাঁহার সন্তানদিগকে যেরূপ স্নেহ প্রদর্শন করেন, কোন্ মানব তাঁহাকে সেরূপ প্রীতি প্রত্যর্পণ করিতে পারে?

আমাদিগের প্রকৃত অভাব অতি অল্প এবং অল্পেই দূর করা যায়। কিন্তু আমাদিগের কাল্পনিক অভাব এত অধিক যে কিছুতেই সেগুলি মিটান যায় না।

আত্মনিন্দাই বিনয় নহে।

মহান্ সত্য সর্ব্বাপেক্ষা সরল;
মহান্ আত্মা সর্ব্বাপেক্ষা সরল।

প্রাপ্তিস্বীকার ও সমালোচনা।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ ঠাকুর তাঁহার সংগৃহীত ইংরাজী, ফরাসী ও বাঙ্গালা প্রায় দুই শত গ্রন্থ আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ের উন্নতি সাধনার্থ দান করিয়াছেন। হরনাথ বাবুর এই সদ্দৃষ্টান্ত সাধারণের অনুকরণীয়।

যোগনাথ।

হরিলীলা—২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড। গ্রন্থখানি পড়িলে স্থানে স্থানে প্রকৃতই ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া যাইতে হয়। গ্রন্থকার "নিবেদনে" যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন, ঈশ্বরেচ্ছায় তাহা সফল হইবে আশা করা যায়। এক কথায় গ্রন্থখানি প্রকৃত ভক্তের পক্ষে অতি উপাদেয় বোধ হইবে। প্রথম খণ্ড যেরূপ উদার ভাবে লিখিত হইয়াছে, বর্ত্তমান খণ্ডে দু একটী স্থলে সেরূপ উদারতা রক্ষিত হয় নাই, একটুখানি সাম্প্রদায়িকতার ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। আর একটী কথা—"পিতৃদেবের মৃত্যুতে" ইত্যাদি (২৯৫ পৃঃ) এরূপ ভাবের কথা না থাকিলেই উত্তম হইত।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২রা কার্ত্তিক রবিবার কালনা ব্রাহ্মসমাজের চতুর্বিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রাতে ৮ টার পর ও সায়ংকালে ৭॥ টার পর ব্রহ্ম উপাসনা হইবে, ভক্ত সাধকবৃন্দ উপাসনায় যোগ দিয়া সুখী করিবেন।

শ্রীবিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬২ বৈশাখ হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	২৩২৫।৵ ৫
পূর্ব্বকার স্থিত	৩৪৪৭৸৶৫
সমষ্টি	৫৭৭৩।/১০
ব্যয় ...	১৮২৫।৶১০
স্থিত	৩৯৪৭৸৵০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	২৬৮।/১০

নববর্ষের দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটী হইতে পারিবারিক দান	৩০৲
শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৪৲

মাসিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয় ব্রহ্মসঙ্গীত বিদ্যালয়ের সাহায্য। ১৮১২ শকের কার্ত্তিক হইতে ১৮১৩ শকের আষাঢ় পর্য্যন্ত	৪৫৲
শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরেঘাটা) ১৮১২ শকের পৌষ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত	১৲
" " বৈকুণ্ঠনাথ সেন ১৮১২ শকের ভাদ্র হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত	২৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়	১০০৲
শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়	৩০৲
" " প্যারিমোহন রায়	১০৲
" " গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
" " হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৲
" " ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৲
" " গোপালচন্দ্র মল্লিক	১৲
" " শ্রীনাথ মিত্র	১৲

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
" " ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়	৫৲
" " বলাইচাঁদ পাইন	৮৲
" " শ্রীনাথ মিত্র	১৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু বিনোদবিহারী আঢ্য	৩৲
" " ঈশ্বরপ্রসাদ পাইন	১৲
দানাধারে প্রাপ্ত	২।/১০
	২৬৮।/১০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২১১।৶১০
পুস্তকালয় ...	৪৭ ৵১০
যন্ত্রালয় ..	১৩৯৭।/১০
গচ্ছিত ...	১১৮/১৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	৩॥৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ...	২৬৯।/১০
দাতব্য ...	১০৲
সমষ্টি	২৩২৫।৵৫

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ	৪৯৬ /০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৯০৸৶৫
পুস্তকালয়	১০৯।/৫
যন্ত্রালয়	৬১৫।০
গচ্ছিত	৩৩।৶৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	১ /৫
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ...	২৬৯।/১০
দাতব্য	১০৲
সমষ্টি .	১৮২৫।৶১০

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

ত্রয়োদশ কল্প
প্রথম ভাগ
কার্ত্তিক ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬২।

৫৭৯ সংখ্যা। ১৮১৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

গান।

রাগিণী—ভৈরবী।

তোমার মহিমা গাহিবারে
যাচিছে অভয় দান;
অভয় পাইয়া দিশি দিশি
শোনাব তোমারি নাম।
হাসিয়া উঠিবে তরু লতা,
পাইয়া নূতন প্রাণ;
উঠিবে গাহি বিহগগণে
উচ্ছ্বাস-পূরিত গান।
পাপতাপ যত দূরে যাবে
শুনিয়া তোমার নাম;
পুণ্য প্রেম আসিবে, সে গানে
করিবারে যোগদান।
বিশ্বজগত উঠিবে জাগি,
করি সে অমৃত পান;
মত্ত হইয়া করিবে শুধু
তব দেব! জয় গান।
জয় জয় ভগবান!

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ।

দ্বিতীয় উপদেশ—পৃথিবী।

(১৮ই ফাল্গুন, রবিবার, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১, ১৮১২ শক।

এই যে অগণ্য নক্ষত্র অসীম আকাশে ভ্রাম্যমাণ, আমাদের পৃথিবী তাহাদের মধ্যে একটী সামান্য গ্রহমাত্র। আবার উহার মধ্যে তুমি এত ক্ষুদ্র যে গণনার মধ্যে আইস না। আমরা পৃথিবীর ক্ষুদ্র কীট হইলেও আমাদের কত উচ্চ অধিকার। ঈশ্বর কেবল আমাদিগকেই তাঁহাকে জানিবার অধিকারী করিয়াছেন। "সূর্য্য যাঁহার মহাসভার সামান্য একটী জ্যোতিষ্মান্ বিন্দু, তাহার মধ্যে আপনাকে বড় দেখা বিনয়ের নিতান্ত বহির্ভূত" (হাফেজ)। মান অভিমান পরিত্যাগ করিয়া বিনীত ভাবে, কাতর প্রাণে তাঁহার দিকে অগ্রসর হও, তবে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবে।

এই যে অসীম আকাশে অগণ্য নক্ষত্র ঘুরিতেছে, তাহারা সকলে মিলিয়া একটি

যন্ত্র—ঈশ্বর শঙ্কুস্বরূপ হইয়া সমুদয় ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। এই সৌর জগতের পরস্পরের মধ্যে একটী ঘনিষ্টতম যোগ রহিয়াছে। তাঁহার পালনী শক্তি এমনই আশ্চর্য্য। পৃথিবী একটা সুপ্রকাণ্ড বেলুন যন্ত্র। পৃথিবীর দ্রুতগতির বিরাম নাই! ইহার উপরে ভূলোকনিবাসী যাবতীয় জীবগণ আপনাপন অন্ন পান লাভ করিয়া সুখে কালযাপন করিতেছে, অথচ ইহা হইতে পতনের আশঙ্কা নাই। তাঁহার কৌশল কি আশ্চর্য্য!

এই পৃথিবী অতি পূর্ব্বে একটি সুপ্রকাণ্ড অগ্নি-গোলক ছিল। জীবজন্তু ওষধি প্রভৃতির চিহ্ন মাত্র দেখা যাইত না। ক্রমে পৃথিবীর গাত্রে আচ্ছাদন (Crust) পড়িল। ভিতরে প্রচণ্ড অগ্নি—উত্তপ্ত দ্রবধাতু; বাহিরে অগ্নিময় অপেক্ষাকৃত কঠিন আবরণ। সূর্য্যও তখন ঘোর বাষ্পময় মেঘে আবৃত। অগ্নির উত্তাপে পৃথিবী হইতে বাষ্প উত্থিত হইয়া পুনরায় জলরূপে পড়িতে লাগিল। এই সময়ে পৃথিবীর মধ্যে অতি ভয়ঙ্কর গোলমাল চলিতেছিল। একদিকে যেমন ঘোরতর বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তেমনি আবার আগ্নেয় গিরি হইতে অগ্নি পৃথিবীর আচ্ছাদন ভেদ করিয়া উঠিতে লাগিল; চতুর্দ্দিকে ভয়ানক ভূমিকম্প হইতে লাগিল; কতক স্থান বা উপরে চলিয়া গেল—পর্ব্বত হইল; কতক স্থান বা গর্ত্ত হইয়া গেল—জলের আধার সমুদ্র হইল। কিন্তু তথাপি পৃথিবীর গতির বিরাম নাই। পৃথিবী জলও স্থলে বিভক্ত হইয়া ক্রমে শীতল হইয়া আসিতে লাগিল।

এইরূপে যুগযুগান্তর চলিয়া গেল। ক্রমে কীটাণু শঙ্খ প্রভৃতি জলজন্তুর সৃষ্টি আরম্ভ হইল। ক্রমে মকর, কুম্ভীর প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জলজন্তুর সৃষ্টি হইল। তাহার পরে যখন ক্রমে স্থলভাগ অরণ্যময় হইয়া উঠিল, তখন আবার সেই অরণ্যের উপযুক্ত সুপ্রকাণ্ড হস্তী (mammoth) প্রভৃতির উৎপত্তি হইল। কিন্তু তখনও অগ্ন্যুৎপাতের বিরাম নাই। ভূগর্ভস্থ দ্রব ধাতু সমূহের আলোড়নে উচ্চস্থান নিম্ন হইল, নিম্নস্থান উচ্চ হইল, সমুদ্র পর্ব্বতে, পর্ব্বত সমুদ্রে পরিণত হইল। সেই যুগ-পরিবর্ত্তন কালের ঘোর মহাপ্রলয় কাণ্ডের নিদর্শন বহুশতাব্দী পরে আজও আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। হিমালয়-সমান অভ্র-ভেদী পর্ব্বতের উন্নততম চূড়ায় আজও আমরা সমুদ্রজাত জীবজন্তুর অস্থি-আবরণ বিস্তর দেখিতে পাই। এই সময়ে প্রচণ্ড বাত্যার প্রভাবে বৃক্ষরাজি নির্ম্মূল হইয়া ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইল এবং ভবিষ্যতে পাথুরিয়া কয়লারূপে মনুষ্যের অশেষ উপকার সাধন করিবার জন্য প্রোথিত রহিল। সমুদ্রস্থিত শঙ্খপ্রবাল স্থানে স্থানে মৃত হইয়া রাশীকৃত হইতে লাগিল; আবার তাহাদের সন্তান সন্ততি ঐ গুলির উপরেই প্রাণত্যাগ করিয়া প্রবালস্তূপ পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিল এবং এইরূপে ক্রমে ক্রমে প্রবাল দ্বীপে পরিণত হইল। ক্রমে ওষধি বনস্পতির জন্ম, জীবজন্তুর আবির্ভাব নূতন শোভায়, নূতন সৌন্দর্য্যে পৃথিবীকে আলোকিত করিয়া তুলিল। অগ্নিময় গোলক হইতে এই শোভন সুন্দর পৃথিবীর সৃষ্টি। কি আশ্চর্য্য কৌশল এই মর্ত্ত্যলোককে শোভাসৌন্দর্য্যে ভূষিত করিল।

এইরূপে কত যুগ গিয়াছে, তবে এই পৃথিবী বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়াছে। পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হয় যে, যেমন উত্তর আমেরিকার সহিত দক্ষিণ আমেরিকা সংযুক্ত আছে,

সেইরূপ পূর্ব্বে ইউরোপের সহিত আফ্রিকার, এসিয়ার সহিত অস্ট্রেলিয়ার সংযোগ ছিল। যেন সকল দেশ একত্রিত হইয়া এক মহাদেশ বিদ্যমান ছিল। ক্রমে ভূমিকম্পের আক্রমণে নূতন পর্ব্বতের জন্ম হইল। জল সমূহ অপেক্ষাকৃত নিম্ন ভূভাগে প্রবেশ করিয়া আফ্রিকাকে ইউরোপ হইতে, অস্ট্রেলিয়াকে এসিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে।

আলোককিরণের পরীক্ষায় যতটুকু উপলব্ধি হয়, ধূমকেতুস্থ পদার্থের বিশ্লেষণে যাহা দেখা যায়, তাহা হইতে নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীতে যে সকল ধাতু আছে, তাহার অনেকগুলিই সূর্য্যেও বর্ত্তমান। ঈশ্বরের সৃষ্টিপ্রণালী বিশ্বরাজ্যের চারিদিকে একইরূপ; কিন্তু এই ঐক্যের মধ্যে তিনি বিচিত্রতার সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। যেমন বৃহস্পতির চারি চন্দ্র। বৃহস্পতি সূর্য্য হইতে বহুদূরে আছে বলিয়া এক চন্দ্রে তাহার অন্ধকার বিদূরিত হয় না এবং এই চন্দ্রগুলিও সূর্য্য হইতে অনেক অন্তরে স্থিত বলিয়া নিজেও বেশী জ্যোতিষ্মান্ নহে। এই জন্য পৃথিবীকে এক জ্যোতিষ্মান্ চন্দ্র দিয়া বৃহস্পতিকে চারি ক্ষীণজ্যোতি চন্দ্র দিলেন এবং উভয় গ্রহের আলোকের সমতা রক্ষা করিলেন। সূর্য্য হইতে দূরস্থিত মন্দগামী শনিগ্রহের তিনটী আলোকময় পরিধি দিয়া তাহাকে উজ্জ্বল করিলেন। এই পরিধি আর কিছুই নহে, কেবল চন্দ্র সমূহের সমষ্টি মাত্র। সেই অসংখ্য চন্দ্রের কিরণে সেখানে কি না জানি শোভা—যেন তিনটী দীপমালার দ্বারা বেষ্টিত রহিয়াছে। এক চন্দ্রের যে আলোকে পৃথিবীর অন্ধকার দূর হইল, চারি চন্দ্রের সেই আলোকে বৃহস্পতির অন্ধকার দূর হইল, আবার চন্দ্র সমষ্টির তিনটী আবর্ত্তনে শনিগ্রহের অন্ধকার দূর হইল। দেখ, ঈশ্বরের রাজ্যে চারিদিকে সমতা রক্ষা করিবার জন্য কেমন বিচিত্রতা বর্ত্তমান। একের অভাব তিনি অন্য সকল দ্বারা কেমন পূর্ণ করিতেছেন—আলোকের পরিবেশন তাহার উপমা। সৃষ্টির মধ্যে তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা অবিশ্রান্ত কার্য্য করিতেছে। তিনি তাঁর সেই মঙ্গল ইচ্ছা আপনি নিত্যই জানিতেছেন।

প্রেমের আকর করুণাময় পরমেশ্বর মনুষ্য-জাতিকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোপরি স্থাপন করিয়াও নিরস্ত নহেন। তিনি মনুষ্যের উপকারের জন্য কত প্রকার বৃক্ষলতা সৃজন করিলেন, দেশভেদে কত ফলফুলের বিচিত্রতা সম্পাদন করিলেন; ঔষধের জন্য কত লতাগুল্ম সৃজন করিলেন; সংসারের উপকার সাধনের নিমিত্ত লৌহ প্রভৃতি কত ধাতু এবং শোভা সৌন্দর্য্য সাধনের জন্য কত বিচিত্র রত্ন-রাজির ভাণ্ডার ভূগর্ভে নিহিত করিয়া দিলেন। কি আশ্চর্য্য তাঁহার দয়া! কি অনুপম তাঁহার করুণা।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

প্রাপ্ত।

ঈশ্বরের ত্রিকালজ্ঞতা ও মানবাত্মার স্বাধীনতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দেখান হইল বটে, আমাদিগের ইচ্ছা স্বাধীন নহে, ইহা ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নিয়মের অধীন, সুতরাং তিনি মানবাত্মার ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ জ্ঞাত আছেন, কিন্তু এক্ষণে এক বিষম সমস্যা

উপস্থিত। আত্মার স্বাধীনতা না থাকিলে, আত্মার দায়িত্ব বোধ ও কার্য্য-চেষ্টা বিড়ম্বনা হইয়া পড়ে। আমরা অবস্থার দাস হইয়া যাই। স্বয়ং ঈশ্বর পাপ ও পুণ্য কার্য্যের কারণ হইয়া যান। ঈশ্বরে নির্দ্দয়তা, অসমদর্শিতা প্রভৃতি দোষ অর্শে, এবং আত্মায় অলসতা প্রশ্রয় পায়। ইচ্ছাময় পরমেশ্বর ইহা নিরাকরণার্থ মানবাত্মার স্বাধীনতা না থাকলেও মানব হৃদয়ে এক বিশ্বাস প্রদান করিয়াছেন যে ইহার স্বাধীনতা আছে। আকাশের নীলিমা যেরূপ সত্য ঘটনা না হইলেও দর্শকের নিকটে সত্য বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ মানবাত্মার স্বাধীনতা না থাকিলেও উহা আমাদিগের নিকটে স্বাধীন বলিয়া বোধ হয়। পরমেশ্বর এই বিশ্বাসটী আমাদিগের অন্তরে এরূপ প্রবল করিয়া দিয়াছেন যে শত শত লোক উহার বিরুদ্ধে অভিমত ব্যক্ত করিলেও উহা নষ্ট হয় না। এমন কি আত্মার স্বাধীনতা নাই, এই কথা চিন্তা করিবামাত্র প্রাণে অশান্তি উপস্থিত হয়। আমাদিগের আত্মার স্বাধীনতা কল্পনা করিবার একটী কারণও আছে। আমরা কোন একটী বিষয়ে বদ্ধভাবে নিযুক্ত থাকি না, অর্থাৎ কোন একটী বিষয় আমাদিগকে সুখই প্রদান করুক আর দুঃখই প্রদান করুক, তাহাকেই লইয়া আমরা কালাতিপাত করি না। কোন বিষয়ে নিযুক্ত হইয়া যদি আমরা দুঃখ প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে অবিলম্বে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন সুখকর বিষয়ে প্রবৃত্ত হই। এমন কি কোন সুখদায়ক বিষয়ে নিযুক্ত হইয়াও যদ্যপি আমরা জানিতে পারি তদপেক্ষা অধিকতর সুখদায়ক বিষয় আছে, তাহা হইলে পূর্ব্ব বিষয়টী পরিত্যাগ করিয়া পরবিষয়টীতে নিযুক্ত হইবার নিমিত্ত আমাদের প্রবৃত্তি হয়। এইরূপে আমরা এক বিষয় ছাড়িয়া বিষয়ান্তরে গমন করিতে পারি বলিয়া আমাদিগের স্বাধীনতা আছে বোধ হয়। কিন্তু এই বিষয়ান্তর গমনের প্রকৃত কারণ কি আমরা অনুসন্ধান করি না। সুখ ও দুঃখের উত্তেজনাকে প্রধান কারণ বলিয়া আমরা বিবেচনা না করিয়া আপন ইচ্ছাকেই প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করি। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে মনুষ্যগণ ঊর্দ্ধ হইতে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলে যেরূপ মনে করিত তাহারা আপন ইচ্ছা ক্রমে ভূপৃষ্ঠের দিকে আইসে, কোন শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আইসে না, সেইরূপ মানবগণ সুখের আকর্ষণী শক্তি দ্বারা বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে আকৃষ্ট হইয়াও মনে করে তাহারা আপন ইচ্ছানুযায়ী আইসে। যাহা হউক উক্ত বিশ্বাসটী চিরকাল আমাদিগের হৃদয়ে রাজত্ব করে না। কিন্তু উহা কাহারও কথায় বা কোন যুক্তি দ্বারা দূরীভূত হয় না। মানবাত্মা কল্পিত স্বাধীনতা ধনে ধনী মনে করিয়া কল্পিত আত্মপ্রভাবে সংসারে সুখী হইবার নিমিত্ত চেষ্টা করে, বহু চেষ্টা করিয়াও যখন প্রকৃত সুখ প্রাপ্ত না হয়, তখন তাহার আত্মপ্রভাবে সন্দেহ জন্মে এবং পরে বুঝিতে পারে তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও স্বাধীনতা নাই এবং সে পরমাত্মার নিতান্ত অধীন। এই সময়ে মানবাত্মা আপনাকে অতিশয় দীন হীন ও দুর্ব্বল দেখিতে পায়। সুখী হইবার নিমিত্ত সে কেবল ঈশ্বরকৃপার উপর নির্ভর করে। দয়াময় ঈশ্বর তাহার ব্যাকুলতা দেখিয়া তাহাকে তৃপ্ত করিবার নিমিত্ত অমৃত রস প্রদান করেন। তৃষ্ণার্ত্ত মানবাত্মা ঈশ্বরপ্রদত্ত সুধারস পান করিয়া

আনন্দে বিহ্বল হইয়া কেবল তাঁহারই নাম গান করিতে থাকে, এবং সানন্দে বলিতে থাকে "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্"। যাহা হউক আত্মপ্রভাব সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষিত না হইলে এবং তত্ত্বজ্ঞান বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইলে আমাদিগের আত্মার স্বাধীনতায় বিশ্বাসটী অন্তর হইতে বিলুপ্ত হয় না, সুতরাং আমাদিগের কোন ক্ষতি হয় না. জীবনের যে অবস্থায় আমরা স্বাধানতাহীন অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম সমূহের সম্পূর্ণ অধীন বলিয়া বুঝিতে সমর্থ হই, সে অবস্থায় তাঁহার নিয়মানুযায়ী অনিত্য বিষয় হইতে যাতনা প্রাপ্ত হইয়া আর আমরা তাঁহাকে নির্দ্দয় বলিয়া দোষারোপ করিতে পারি না, কারণ জ্ঞানোন্নতি হওয়ায় আমরা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি যে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান হইলেও তিনি তাঁহার অনুরূপ পূর্ণ সৎ চিৎ ও আনন্দসম্পন্ন একটী জীব বা আর একটী ব্রহ্ম সৃষ্টি করিতে পারেন না। তাঁহার সৃষ্ট জীব যতই উন্নত হউক না, সে জ্ঞান শক্তি ও আনন্দে তাহার স্রষ্টা পূর্ণ ব্রহ্ম অপেক্ষা নিকৃষ্ট থাকিবেই। আবার তিনি মানবাত্মাকে অতিশয় অপূর্ণভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি তাহাকে একবারে জড় ও পরমার্থ জ্ঞানসম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। সংসারে তাহাকে নানা প্রকার অবস্থায় পাতিত করিয়া সুখ ও দুঃখ দ্বারা তিনি সর্ব্বপ্রকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞান প্রদান করেন। সুতরাং সৃষ্ট জীবের ভাগ্যে অজ্ঞানতা, দুর্ব্বলতা ও নিরানন্দ অপরিহার্য্য। এই সময়ে দুঃখকে আমরা সানন্দে আলিঙ্গন করি এবং তাহার প্রসাদে নূতন নূতন জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া উন্নত হইয়াছি বলিয়া করুণাময় পরমেশ্বরের নিকটে কতই কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতে থাকি। আমরা তাঁহাকে অসমদর্শিতা দোষেও আর দোষী করিতে পারি না, কারণ জ্ঞানপ্রভাবে স্পষ্ট রূপে দেখিতে পাওয়া যায় মনুষ্যগণ বিভিন্নঅবস্থাপন্ন হইলেও তাহাদের সকলের ভাগ্য ঠিক একই প্রকার! আমরা ভাগ্যের উৎকর্ষাপকর্ষ সুখ ও দুঃখ দ্বারা পরিমাণ করিয়া থাকি। আমরা স্থূল দৃষ্টিতে মনুষ্যগণের মধ্যে কাহাকেও ভাগ্যবান কাহাকেও বা ভাগ্যহীন মনে করি, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে জানিতে পারা যায় সকলের ভাগ্য সমান। একজন সম্রাট ও একজন নিরক্ষর কৃষকের অবস্থার বিষয় তুলনা করিয়া আমরা যে সময়ে বিচার করি স্থূলদৃষ্টিতে সম্রাটকে কৃষক অপেক্ষা ভাগ্যবান মনে হয়, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে উভয়কে সমভাগ্যবান বলিয়া বোধ হইবে। ন্যায়বান বিধাতা মানবাত্মা সম্বন্ধে এরূপ একটী অত্যাশ্চর্য্য বিধান রাখিয়াছেন যে মানবগণ যে অবস্থায় প্রথমে সৃষ্ট হইয়াছে সেই অবস্থা হইতে তাহাদিগের গন্তব্য স্থান—প্রকৃত সুখ শান্তির প্রস্রবণ ব্রহ্ম প্রাপ্তি বা মুক্তি প্রাপ্তির অবস্থা পর্য্যন্ত মধ্যের পথটীতে তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য সকলকে সমান পরিমাণ দুঃখ যাতনা ভোগ করিতে হয়। সময়ের অল্পাধিক্য আছে কিন্তু দুঃখের পরিমাণের অল্পাধিক্য নাই। দুঃখ যাতনার পরিমাণ সকলের ভাগ্যে সমান। এক ব্যক্তি হয়ত ত্রিংশৎ বৎসর বয়সে ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইতে পারেন, আবার একজন হয়ত পঞ্চাশৎ বৎসর বয়সে ব্রহ্মানন্দ পাইতে পারেন। কিন্তু প্রথমোক্ত ব্যক্তির ত্রিশ বৎসরের দুঃখ যাতনার পরিমাণ শেষোক্ত ব্যক্তির পঞ্চাশ বৎসরের দুঃখ যাতনার পরিমাণ অপেক্ষা ন্যূন নহে। এই জন্য মুমুক্ষু ব্যক্তির প্রাণের অবস্থা

মোহান্ধ সংসারী ব্যক্তির প্রাণের অবস্থা অপেক্ষা অধিকতর যাতনাময়। মুমুক্ষু ব্যক্তি প্রাণ হইতে সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক অনিত্য সুখ বা তাহার আশাকে বিদায় দিয়াছে। এক্ষণে তাহার প্রাণে শূন্যতা পূর্ণ করিবার জন্য সে ব্যাকুল ভাবে ঈশ্বরের নিকটে কৃপা প্রার্থনা করিতেছে, সুতরাং তাহার প্রাণে নীরসতা-জনিত যাতনা আসিয়াছে। পাপান্ধ ব্যক্তি যতদিন পাপলব্ধ সুখকে অনিত্য বলিয়া বুঝিতে না পারে ততদিন পাপ ত্যাগ করে না, সুতরাং নিত্য সুখ ব্রহ্মানন্দ লাভে তাহার বিলম্ব ঘটে। মুমুক্ষু ব্যক্তি শীঘ্র ব্রহ্মানন্দ পায় বটে কিন্তু ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তির পূর্ব্বে অল্প সময়ের মধ্যে তাহাকে প্রাণে অধিক নীরসতা সহ্য করিতে হয়। পাপান্ধ ব্যক্তি শীঘ্র ব্রহ্মানন্দ পায় না কিন্তু পাপলব্ধ অনিত্য সুখ দ্বারা মাঝে মাঝে তাহার প্রাণ সরস থাকে। অন্য দিকে একজন কৃষক পাঁচটী টাকা লাভ করিতে পারিলে তাহার প্রাণে যে পরিমাণে সুখের উদয় হয়, একজন সম্রাটের হয়ত একটী রাজ্যলাভ হইলে সেই পরিমাণ সুখ হয় না। আবার কৃষকের পাঁচটী টাকা লাভ করিতে হইলে যে পরিমাণে ক্লেশ সহ্য করিতে হয় সম্রাটেরও একটী রাজ্য লাভ করিতে হইলে সেই পরিমাণে কষ্ট সহ্য করিতে হয়! একটী কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তি একটী মাত্র টাকা অর্জ্জন করিতে পারিলে যেরূপ সুখী হয় একজন নীরোগ সুস্থ ব্যক্তি এক সহস্র টাকা অর্জ্জন করিতে পারিলে সেরূপ সুখী হইতে পারে না। অবস্থাভেদে এক বিষয় হইতে আমাদিগের অন্তঃকরণে বিভিন্ন প্রকার ভাবের উদয় হয়, সুতরাং অবস্থা বৈচিত্র দ্বারাও সুখ ও দুঃখের পরিমাণ জগতে সমান থাকিতে পারে। সুখ ও দুঃখ দ্বারাই যখন আমরা ভাগ্যের পরিমাণ করি তখন অবস্থা বিভিন্ন প্রকার হইলেও কোন ক্ষতি হয় না, ফলতঃ ঈশ্বরের কৃপাদৃষ্টি সকলের উপর সমান ভাবে পতিত হইতেছে, ইহা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়ে জগতে আর অলসতা দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বয়ং ঈশ্বর যে স্থানের নিয়ন্তা, সেস্থানে কে অলস থাকিতে পারে? জ্ঞানের খর্ব্বতা বশতঃ আমরা অলসতার ভয় করি, কিন্তু দয়াময় ঈশ্বর এরূপ কৌশলে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন যে মনুষ্য যদি স্বয়ং ঈশ্বরকে ধরিয়া থাকে, তাহা হইলেই সে স্থির হইতে পারে, নতুবা সে অন্য যে কোন বিষয় ধরিয়া থাকুক না, সে কখনই স্থির থাকিতে পারিবে না। অশান্তিরূপ অগ্নিদ্বারা তাহার প্রাণ দগ্ধ হইবেই। সুতরাং মনুষ্য ঈশ্বরকে ছাড়িয়া ধনী হউক বা মানী হউক, রাজা হউক বা প্রজা হউক যে অবস্থায় থাকুক, তাহার শান্তি নাই। তাহার প্রাণ শীতল করিবার একটী উপায় নির্দ্ধারণ না করিলে নিস্তার নাই। এইরূপে যে যেখানে থাকুক, করুণাময় পরমেশ্বরের নিয়ম ক্রমে বিলম্বে বা অবিলম্বে সে তাঁহারই পদচ্ছায়ায় উপস্থিত হইয়া সংসারতপ্ত হৃদয়কে শীতল করে। অজ্ঞানতা নিবন্ধন আমরা সুখ শান্তির নিলয়ে একবারে উপস্থিত হইতে পারি না, কিন্তু ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে সুখস্বরূপ দয়াময় ঈশ্বরের কৃপায় তাঁহারই দ্বারস্থ হই। ফলত সাধু, অসাধু, ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী, অজ্ঞান, কর্ম্মী অকর্ম্মী সকল ব্যক্তিই এক নিয়ম সূত্রে গ্রথিত।

এক্ষণে এক প্রশ্ন হইতে পারে, মানবাত্মার স্বাধীনতা যদি বাস্তবিক নাই, তাহা হইলে ঈশ্বর কি কারণে আমাদিগের হৃদয়ে

স্বাধীনতার একটি ভ্রমাত্মক বিশ্বাস রোপণ করেন? ইহার কারণ এই যে আমরা পূর্ণজ্ঞান লইয়া জন্মগ্রহণ করি না, সুতরাং সংসারের দুঃখ যাতনার বিধান দেখিয়া আমরা ভীত হই এবং দুঃখ যাতনা কিরূপে মঙ্গলের সোপান ইহা সহজে বোধগম্য হয় না। তজ্জন্য আমরা ঈশ্বরকে দয়াবান ও মঙ্গলময় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। ঈশ্বরের নিষ্ঠুরতা যদি প্রথমেই আমাদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায় তাহা হইলে তাঁহার প্রতি আমাদিগের ভক্তি শ্রদ্ধার উদ্দীপনা হইতে পারে না। দয়াময় ঈশ্বর ইহার নিরাকরণার্থে কৌশল দ্বারা আমাদিগকে আত্মার স্বাধীনতা-ধর্ম্মে বিশ্বাসী করেন। সুতরাং সংসারে দুঃখ যাতনার স্রোত দেখিয়া আমরা ঈশ্বরকে ইহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি না, আমরা স্বয়ং ইহার কারণ বলিয়া মনে করি এবং আমাদিগের দায়িত্ববোধ ও জন্মে।

আর একটী বিষয় আলোচনা করিয়াই আমরা প্রবন্ধটী শেষ করিব। আমরা ধর্ম্মরাজ্যে দেখিতে পাই সাধুগণ ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারের নিমিত্ত অতিশয় ব্যগ্র। ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠিত সুনিয়মেই যদি সকলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতেছে তাহা হইলে সাধুগণের ধর্ম্মপ্রচারের আবশ্যকতা কি? আমরা বলি ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারের ইচ্ছাও ঈশ্বরের নিয়মাধীন। তাঁহারই নিয়ম ক্রমে সাধুগণ ধর্ম্মপ্রচারের নিমিত্ত দণ্ডায়মান হয়েন। আমরা সংসারের বিভিন্ন অবস্থায় পড়িয়াই জ্ঞান লাভ করি সত্য কিন্তু একজন মনুষ্যের সকল অবস্থায় পড়িয়া জ্ঞান লাভ করা অধিক কাল সাপেক্ষ এবং ঘটিয়া উঠা সম্ভবও নহে, সুতরাং কতকগুলি অবস্থায় পড়িয়া কিছু জ্ঞান লাভ করিবার পর পরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা আমাদিগের সেই পূর্ব্বার্জ্জিত জ্ঞান বর্দ্ধিত হয়। দয়াময় ঈশ্বর আমাদিগের এই মহান্ মঙ্গল সাধনার্থ সাধুগণের হৃদয়ে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারের বলবতী ইচ্ছা প্রদান করিয়াছেন। জগতে কোন বস্তু অকারণ অবস্থিতি করে না। সকলই মঙ্গলময় ঈশ্বরের শুভাভিপ্রায় সংসিদ্ধির নিমিত্ত রহিয়াছে। একটী সামান্য বালুকা কণাও তাঁহার অনভিপ্রায়ে স্থানান্তরিত হইতে পারে না। *

* সম্পাদকের মন্তব্য।

বর্ত্তমান প্রস্তাবের অনেকগুলি কথা এরূপ সত্য মিথ্যায় জড়িত যে, তাহার অন্তর্গত সত্যকে মিথ্যা হইতে বাছিয়া লওয়া সুকঠিন। লেখক বিষয়-ভোগ-জনিত ক্ষণিক সুখ এবং ব্রহ্মসহবাসের স্থায়ী সুখ এই দুইকে একই দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন এইটিই গোলযোগের মূল। সুখের আকর্ষণে চালিত হওয়া স্বতন্ত্র এবং সুখের স্থায়িত্ব অস্থায়িত্ব বিবেচনা করিয়া স্থায়ী সুখের অন্বেষণ করা স্বতন্ত্র। সুখের আকর্ষণ হইতে উপরে না উঠিলে তাহার স্থায়িত্ব অস্থায়িত্ব বিবেচনা সম্ভবে না। পশু পক্ষীরা সুখের আকর্ষণে চালিত হয়, কিন্তু তাহার স্থায়িত্ব অস্থায়িত্ব বিবেচনা তাহাদের মনকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও অধিকার করে না। মনুষ্যের মনোমধ্যে একটি অত্যাশ্চর্য্য নিগূঢ় রহস্য আছে—মনুষ্যের আত্মার স্বাধীনতা বলো—পরকাল বিশ্বাস বলো—ব্রহ্মজ্ঞান বলো—সমস্তই সেই নিগূঢ় রহস্যটিকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে। সে রহস্যটি, এক কথায় অসীমের সহিত সসীমের সম্বন্ধ। মনুষ্য সে দিন জন্মিয়া, কেমন করিয়া অনাদ্যনন্ত সত্যে হাত বাড়ায়, সংকীর্ণ পৃথিবীতে জন্মিয়া কেমন করিয়া সর্ব্বব্যাপী এবং সার্ব্বভৌমিক সত্যে হাত বাড়ায়, শরীর পিঞ্জরে থাকিয়া কেমন করিয়া শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্যের প্রতি উদীক্ষণ করে? প্রশ্নটি একটু স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখিলে স্পষ্টই আমরা অন্তঃকরণে বুঝিতে পারি যে, "কেমন করিয়া" তাহা আমরা জানি না, কিন্তু মনুষ্য যে তাহারই গুণে মনুষ্য নচেৎ পশুতে মনুষ্যে প্রভেদ কেবল নাম মাত্র, এটি আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারি। সীমাবদ্ধ মনুষ্যের অন্তঃকরণে পরিপূর্ণ সত্যের ছায়া যাহা নিপতিত হয় সেইটিই তাহার স্বাধীনতার নিদান। পরমাত্মা স্বরূপত,

স্বাধীন; জীবাত্মা পরমাত্মার প্রতিবিম্ব ধারণ করে—এই সূত্রে স্বাধীন; যদি পরমাত্মার প্রতিবিম্ব জীবাত্মাতে সঞ্চারিত না হইত তাহা হইলে বিষয়ের আকর্ষণই তাহার সর্ব্বেসর্ব্বা হইত—আত্মার স্বাধীনতার নাম গন্ধও তাহাতে থাকিত না। পরমাত্মার মুক্তভাব আদর্শ রূপে জীবাত্মার অন্তঃকরণে প্রতিভাত হয় বলিয়াই জীবাত্মা বিষয়-সুখের আকর্ষণে বিচলিত না হইয়া তাহার অস্থায়িত্ব হৃদয়ঙ্গম করে—আর "আমাকে বিষয়-সুখ বাঁধিয়া রাখিতে পারে না" এইরূপ মনে করে—এবং সেই সঙ্গে আপনার স্বাধীনতা উপলব্ধি করে। স্বাধীনতা—মুক্তভাব—অসীম ভাব—এইরূপ নানা শব্দের মূলগত অর্থ একই; কি? না পরিমিত বিষয়ের বন্ধন হইতে উপরে অবস্থিতি। জীবাত্মা সহস্র সুখের আকর্ষণে জড়াইয়া পড়িলেও তাহার মনের নিগূঢ় প্রদেশে এইরূপ একটি ধ্বনি উঠে যে, এ সুখ আমার জীবনের সর্ব্বস্ব নহে। যদি বল যে, ব্রহ্মানন্দও তো একপ্রকার সুখ—কিন্তু একথাটি কেবল কথা মাত্র। পরিমিত বিষয়ের সহিত মাখামাখি ভাবই ঐহিক সমস্ত সুখের মূল; পশুরা সেই বন্ধনে একেবারেই বিহ্বল—তাহারা তাহার একটুও এদিক্ ওদিকে নড়িতে পারে না; কিন্তু মনুষ্য পরিমিত বিষয়ের বন্ধন হইতে উচ্চে লক্ষ্য নিবিষ্ট করিতে পারে,—মূল সত্যকে জগতের কোথাও পাওয়া যায় না অথচ সেই মূল সত্যকে মনুষ্য অন্বেষণ করে এবং হৃদয়ে উপলব্ধি করে। মনুষ্যের এইরূপ উচ্চ লক্ষ্য তাহাকে পরিমিত কোনো সামগ্রীরই অধীনতা স্বীকার করিতে দেয় না—ইহাই মনুষ্যের স্বাধীনতা; এবং এই স্বাধীনতাই ব্রহ্মানন্দের সোপান। পরাধীনতা বিষয়-সুখের সোপান—স্বাধীনতা ব্রহ্মানন্দের সোপান—দুয়ের মধ্যে এইরূপ মূলগত প্রভেদ। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, পরব্রহ্ম স্বরূপতঃ স্বাধীন; জীবাত্মা পরমাত্মার আদর্শ অন্তরে উপলব্ধি করে বলিয়া তাহারই গুণে স্বাধীন; সংক্ষেপে বলিতে হইলে—পরমাত্মা স্বরূপতঃ স্বাধীন—জীবাত্মা প্রতিরূপতঃ স্বাধীন। আমরা যদি নিজের গুণে স্বাধীন হইতাম তবে ঈশ্বরের প্রসাদ যাজ্ঞা আবশ্যক হইত না; কিন্তু তাঁহারই আবির্ভাব অন্তরে প্রাপ্ত হইয়া আমরা তাহারই গুণে স্বাধীন—এই জন্য পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাঁহার প্রসাদ যাজ্ঞা পরম উৎকৃষ্ট ফল-প্রদ। নিম্নলিখিত প্রশ্নোত্তরে সমস্ত পরিষ্কার রূপে প্রকাশ পাইবে।

প্রশ্ন। মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তির স্বাধীনতা কি রূপ?

উত্তর। বুদ্ধির মূলে অপরিসীম মূল সত্যের আদর্শ বিদ্যমান থাকাতে, তাহা কোনো পরিমিত সত্যে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না; পরিমিত সত্যের অনুসন্ধান কোনো কালেই শেষ হইতে পারে না। পশু-পক্ষীরা পরিমিত বিষয়েই সন্তুষ্ট—সত্যের অপরিমিত মাহাত্ম্য তাহাদের মনে আদবেই অধিকার পায় না; কাজেই দাঁড়াইতেছে যে, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি শৃঙ্খলাবদ্ধ। কিন্তু মনুষ্যবুদ্ধি কোনো পরিমিত বস্তুতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। কেন? না যেহেতু শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্যের আদর্শ তাহার অন্তঃকরণে ধ্রুবতারার ন্যায় স্থির রহিয়াছে; তাহারই জ্যোতি মোহমেঘ ভেদ করিয়া জীবাত্মাতে প্রতিভাত হয়।

প্রশ্ন। মনুষ্যের ইচ্ছার স্বাধীনতা কিরূপ?

উত্তর। বিষয়াতীত শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্যের প্রতিবিম্ব জীবাত্মাকে মুক্তির পথ দেখাইতেছে, জীবাত্মা বিষয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সে পথে সহসা অগ্রসর হইতে পারিতেছে না; অথচ বুঝিতে পারিতেছে যে, সে পথে যাইতে তাহার অধিকার আছে এবং সেই পথই অনন্ত মঙ্গলের সোপান। এইরূপে সে আপনার স্বাধীনতা হৃদয়ঙ্গম করিতেছে। কিন্তু সে স্বাধীনতার মূল জীবাত্মা নিজে নহে—শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপের আদর্শ যাহা তাহার জ্ঞানে প্রতিবিম্বিত হইতেছে তাহাই তাহার মূল। এই জন্য ঈশ্বরের প্রসাদ যাচ্ঞা জীবাত্মার স্বাধীনতার পক্ষে মহোপকারী;—শুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত স্বরূপের আদর্শ অন্তরে থাকাতেই জীবাত্মা স্বাধীন এবং সেই আদর্শ অন্তরে পরিস্ফুট করাই স্বাধীনতা পরিস্ফুট করিবার প্রকৃষ্ট উপায়।

রাজা রামমোহন রায়।

সিটিকলেজ গৃহে রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভায় শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক পঠিত।

কালিদাস রঘুবংশের গুণকীর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন যে, "ক সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক চাল্পবিষয়া মতিঃ"; আমিও আজ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের গুণকীর্ত্তনের পূর্ব্বে সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করিতেছি—কোথায় সেই ধর্ম্মের বলে বলীয়ান্, স্বার্থের প্রতি নির্ম্মম, অগাধ বুদ্ধিমান্ রাজা রামমোহন রায় আর কোথায় আমি! আমার অত্যন্ত ভয়

হইতেছে, পাছে দীর্ঘকায়-ব্যক্তি-লভ্য ফলের প্রতি আসক্তচিত্ত বামনের ন্যায় আমার অক্ষমতা বশতঃ উপস্থিত সভ্য-মণ্ডলীর নিকট উপহাসভাজন হইয়া পড়ি। কিন্তু এই ভয়ের কারণ সত্বেও যে এখানে দণ্ডায়মান হইতে সাহসী হইয়াছি, তাহার কারণ এই যে, আজ এমন একটী দিন যে দিন প্রতি বঙ্গবাসীর, কেবল বঙ্গবাসীর কেন, সমস্ত ভারতবাসীর, সেই মহাত্মার জন্য শোক প্রকাশ করা কর্ত্তব্য, যাঁহার রোপিত বৃক্ষের সুশীতল ছায়াতে আমরা সকলেই বিশ্রাম লাভ করিতেছি এবং যাঁহার ভস্মাবশেষ শতযোজন দূরে থাকিয়া ইংলণ্ডকে আমাদিগের তীর্থস্থানরূপে নির্দ্দেশ করিতেছে। একবার ভাবিলেই হৃদয় দুঃখে ভরিয়া যায় যে, সে মহাত্মা আর নাই, যে মহাত্মার সাধনার বলে আমরা বর্ত্তমান সৌষ্ঠবসম্পন্ন বঙ্গভাষার বীজ প্রাপ্ত হইলাম; যাঁহার সাধনার বলে হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া বর্ত্তমান যুগের উত্থানশীল কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের জন্মদান করিয়াছে; যাঁহার সাধনায় নিষ্ঠুরতম সতীদাহ উঠিয়া যাওয়াতে কত ধর্ম্মপরায়ণা বিধবা মাতা, পিতার শোকে শোকার্ত্ত পুত্রদিগকে জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত করিতে সক্ষম হইতেছেন এবং সেই মহাত্মারই যত্ন ও পরিশ্রমের ফলে আমরা আমাদিগের সেই পুরাতন আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারিয়াছি। এমন হিতৈষী বন্ধুর মৃত্যুতে কোন্ ভারতসন্তান, ভারতরমণী শোক-সন্তপ্ত-চিত্ত না হইয়া থাকিতে পারিবেন? সেই শোক প্রকাশ করিবার জন্য আজই উপযুক্ত দিন; তাই শত উপহাসের নির্ম্মম কটাক্ষের ভয় সত্বেও আজ এই শোকের দিনে তাঁহার জীবনের দু-একটী কথা মাত্র, তাঁহার নানা গুণের মধ্যে দু একটী গুণের বিষয় মাত্র, উপস্থিত বন্ধুবান্ধবের সহিত আলোচনা করিয়া আমার জীবনকে শীতল করিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে উন্নত করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

রামমোহন রায় একজন বড় লোক ছিলেন—তাঁহার সম্বন্ধে কেবল মাত্র এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হয় না। এই কথা বলিবার সময় আমাদিগের একবার অনুধাবন করিয়া দেখা আবশ্যক যে তিনি কত বড় লোক ছিলেন। আজ কালও তো অনেক বড় লোক আছেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে তুলনা করিলে তাঁহারা অনেকেই পশ্চাতে পড়েন। কেন? কারণ অতি সামান্য—যে ব্যক্তি যতটা হৃদয়ের প্রকৃত উদারতা ও আন্তরিক স্বার্থত্যাগ প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, সেই ব্যক্তি ততটা মহৎলোক। স্বার্থত্যাগই মহত্ত্বের পরিমাণ। একবার সেই সময়কার অবস্থা ভাবিয়া দেখুন, চারিদিকে কুসংস্কারের রাজত্ব; কেবল দলাদলি ও গালাগালি; লেখা পড়ার মধ্যে জমিদারী সেরেস্তার কার্য্য করিবার জন্য গুরুমহাশয়ের নিকট কড়াঙ্কে শতকে প্রভৃতি বিদ্যার দু-একটী কথা মাত্র শিখিলেই যথেষ্ট মনে হইত; আবালবৃদ্ধ সকলেই আলস্যে কাল হরণ করিয়া অত্যন্ত আমোদ লাভ করিত; বৃদ্ধেরা হয়তো পাশা প্রভৃতি খেলাইয়া বৃথা আমোদে সমস্ত বেলা কাটাইলেন, যুবকেরা সেই সময় নিজেদের দায়িত্বজ্ঞানরহিত হইয়া ঘুড়ি-উড়ান, বুলবুলির লড়াই প্রভৃতি অতি জঘন্য আমোদে সময় অতিবাহিত করিল। সকলেই জানেন যে, আলস্যই সকল প্রকার দুষ্প্রবৃত্তির পথপ্রদর্শক—ইহাদেরও পক্ষে এই নিয়মের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই; বরঞ্চ উপরিপক্ষে কৌলীন্যপ্রথা

দুষ্প্রবৃত্তি সকলের সহায়তাই করিয়াছিল। আমরা হয়তো ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ-ভাগে এই রাজধানী কলিকাতায় বসিয়া পূর্ব্বকার কৌলীন্যপ্রথার নির্দ্দয় পশুভাব সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারিব না! কিন্তু তথাপি আমাদিগের এবিষয়ে একবার ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য, কারণ এই বিদ্যো-জ্জ্বল সময়েও আমরা দু-একটী কুলীনের কথা সংবাদপত্রে দেখিতে পাই। এই সেদিন বরিশাল অঞ্চলে একটী ভদ্রলোক অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী ভদ্রবেশধারী ব্যক্তি এককালে পচিশ বৎসর হইতে চারি পাঁচ বৎসরের পর্য্যন্ত ছয় সহোদরা ভগিনী-দিগকে বিবাহ করিয়া আপনার কুল উজ্জ্বল করিয়াছেন। এই সকল শুনিয়া হৃদয় কি নিদারুণ ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইয়া আইসে। আজ আমরা এই একটী কৌলীন্য প্রথার সংঘটন দেখিয়া ঘৃণায় লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িতেছি। কিন্তু রামমোহন রায়ের সময়ে এমন ঘটনা হয়তো প্রতি-গৃহের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল এবং ইহার উপরে সহমরণের প্রথা দুর্দ্দান্তভাবে রাজত্ব করিতেছিল। এইরূপ ঘোর সা-মাজিক অরাজকতার সময়ে প্রভাতের পূর্ব্বগগনে শোভনমূর্ত্তি অন্ধকার-নিরাস-ক্ষম সূর্য্যের ন্যায় উত্থিত হইয়া রাজা রামমো-হন রায় স্বীয় অমোঘ অস্ত্রবলে কুসংস্কার সমুদয় একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিলেন এবং তখনকার সময়ের দোষে ইহার জন্য তাঁহাকে প্রভূত পরিমাণে স্বার্থ-ত্যাগ করিতে হইয়াছিল; তিনি যে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া অকাতরে স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁহার মহত্ত্ব।

তাঁহার গ্রন্থাবলী এবং জীবনচরিত পাঠ করিলে জ্বলন্তভাবে অনুভব করি যে, তিনি একজন স্বদেশপ্রেমিক, উদারহৃদয় নব্যভারতের সংস্কারক ছিলেন। ইংরা-জীতে একটী প্রবাদ আছে যে necessity is the mother of invention, অর্থাৎ অভাব উপ-স্থিত হইলেই তাহা দূর করিবার উপায় উদ্ভাবিত হয়—ইহা অতি যথার্থ। আমরা তাঁহাকেই তত অধিক মহৎ লোক বলিব, যিনি যত পরিমাণে এই অভাব অন্বেষণ ক-রিয়া আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াও অভাব নিরাসের উপায় উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হইবেন। প্রায় চারি শত বৎসর অতীত হইতে চলিয়াছে, ভারতবর্ষ তান্ত্রিক আচা-রের কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হইয়া গিয়া-ছিল; পশুবলি যে কত হইত, তাহার কে সংখ্যা করিবে, সময়ে সময়ে নরবলি পর্য্যন্ত হইতে শুনা গিয়াছে। ক্রমে দেবতার পূজার্থ যত হউক বা না হউক, নিষ্ঠুর পশু-বলি, তান্ত্রিকদিগের উদরের এবং তৎসঙ্গে হিংসা,নিষ্ঠুর আমোদ প্রভৃতি পশুবৃত্তিরও পরিতৃপ্তি সাধন করিত। যে দেশের ঋষিগণ সকল কর্ম্মই ধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত রাখিতে কহিয়াছেন; যে দেশের শাস্ত্র-সমুদ্র, নিবৃত্তি সংযমের শ্রেষ্ঠতা সহস্র সহস্র বৎসর ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে, সেই দেশের সাধু ব্যক্তিগণ, প্রকৃত মনু-ষ্যত্বের প্রতি তান্ত্রিকদিগের এরূপ অত্যা-চার এবং ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের এরূপ ভয়াবহ প্রশ্রয়দান কখনো কি সহ্য করিতে পারেন? তাই তদানীন্তন ধর্ম্মালোচনার প্রধানস্থান নবদ্বীপ হইতে প্রেমের অব-তার চৈতন্যদেব উঠিয়া 'অহিংসাই পরম ধর্ম্ম' এবং 'ভগবদ্ভক্তিই জগতে সার' এই দুই মন্ত্রবলে,সঙ্কীর্ত্তনের উন্মাদিনী শক্তিতে, দয়াপ্রবণ ভারতবাসীর অন্তর্নিহিত দয়া-বৃত্তি ও ভগবৎপ্রেম জাগ্রত করিয়া তুলি-লেন। চৈতন্য তখনকার এই ধর্ম্মের অভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিস্তর স্বার্থত্যাগের

বলে সেই অভাব মোচন করিলেন, তাই তিনি একজন মহাত্মা পুরুষ। চৈতন্য ধর্ম্মসংস্কার করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, কিন্তু রামমোহন রায় ভারতবাসীর জন্য কেবল মাত্র ধর্ম্মসংস্কার করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই; যাহাতে ভারতবাসীর কি ধর্ম্ম, কি সাহিত্য, কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, সকল বিষয়ের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হয়, তাহাই রামমোহন রায়ের প্রাণগত অভিলাষ ছিল। তিনি নব্যভারতের নানাপ্রকার অভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া সেই অভাব নিরাসের উপায় উদ্ভাবনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন এবং আপনার সমূহ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও সেই অভাব সমূহ দূর করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন; তাঁহার সংস্কার ধর্ম্মবিষয়ে সীমাবদ্ধ না হইয়া সর্ব্বতোমুখী হইয়াছিল। ইহাতেই তিনি প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা পুরুষ এবং ইহারই জন্য তিনি নব্যভারতের সংস্কারকদিগের শীর্ষস্থানীয়।

কিন্তু তিনি যে সকল নূতন সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই সকল প্রকার নূতন সংস্কার সুদৃঢ় ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে স্বীয় ধর্ম্মপিপাসার বলে জ্ঞানের সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত, ঋষিদিগের সেই পুরাতন ধর্ম্ম আনয়ন করিলেন; পরে সেই ধর্ম্মের সুবিমল জ্যোতিতে সামাজিক প্রভৃতি অন্যান্য সকল বিষয়ই আলোকিত করিয়া দেখিলেন যে, এই সকলেও কুসংস্কারের নিবিড় অন্ধকার রাজত্ব করিতেছে। তখন তিনি ধর্ম্মের কেন্দ্রভূমিতে দাঁড়াইয়া সকলপ্রকার কুসংস্কারই উন্মূলন করিতে কৃতসংকল্প হইয়া প্রাণপণ পরিশ্রম করিলেন এবং প্রায় সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হইলেন। এই সময়েই প্রকৃতপক্ষে নূতনসংস্কার ও পুরাতনপ্রিয়তার ঘাত প্রতিঘাতে বাঙ্গালী জাতি সংগঠন হইবার প্রথম সূত্রপাত হইল; এই সময়েই বঙ্গদেশীয়গণ আপনাদিগের অজ্ঞাত ভাবে এক জাতীয়সূত্রে সম্বদ্ধ হইতে চলিল।

ব্রহ্মবিদ্যা যে ভারতবাসীদিগের পৈতামহ সম্পত্তি, তাঁহাদিগের নিকট এবং বিশেষতঃ তাঁহার স্বদেশীয় বঙ্গবাসীদিগের নিকট, সেই ব্রহ্মবিদ্যা আনয়ন করিতে গিয়া রামমোহন রায়কে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, কিন্তু ইহা আশ্চর্য্য নহে। সহস্র মূল্যবান্ পদার্থও অব্যবহার বশতঃ ধূলিরাশি পরিপূর্ণ হইয়া মলিন হইয়া যায়। আর্য্য ঋষিগণ বিস্তর সাধনার বলে ব্রহ্মবিদ্যালাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু নানা ঘটনার স্রোতে পড়িয়া তাঁহাদিগের পরবর্ত্তী অনেক বংশ মূর্ত্তিপূজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন—এদিকে ব্রহ্মবিদ্যার উপর নানাপ্রকার কুসংস্কার জঞ্জাল আসিয়া ব্রহ্মবিদ্যাকে আবরণ করিয়া ফেলিল। কিন্তু এই ব্রহ্মবিদ্যার দু-একটি কিরণরেখা রাশীকৃত জঞ্জাল ভেদ করিয়া বাল্য কালেই রামমোহন রায়ের চক্ষে আসিয়া পড়িয়াছিল। সেই দু-একটি কিরণরেখাতেই তিনি এরূপ মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, সেই বাল্যকালেই পিতামাতা কর্ত্তৃক প্রদত্ত নির্ব্বাসনদণ্ডের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া তিনি কেবল একমাত্র সত্যলাভের আশায়, নির্ভয়ে অটলভাবে "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালী" নামক এক সুতীক্ষ্ণ কুঠারের দ্বারা কুসংস্কারের দুর্ভেদ্য অরণ্য ভেদ করিতে অগ্রসর হইলেন। এই গ্রন্থ লিখিয়া তিনি পিতামাতা কর্ত্তৃক বাটি হইতে বহিষ্কৃত হইলেন এবং তিনি এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের তথ্যানুসন্ধানের নিমিত্ত একাকী পদব্রজে এমন কালে তির্ব্বতযাত্রা করিলেন, যখন আজিকার মত বাষ্পীয়

যানের বেগপ্রভাবে শতশত ক্রোশ একটি দিনের মধ্যে যাওয়া যাইত না এবং যখন পথে পথে দস্যুদল পথিকদিগের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইত। "প্রথম বয়সেই সাংসারিক সকল সুখ পরিত্যাগ করিয়া এক সত্যের জন্য কত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। এত অল্প বয়সে একাকী পরিব্রাজক হইয়া কঠোর হিমালয় ভেদ করিয়া ধর্ম্মের প্রতি কি অপ্রতিহত অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন।"* যাহা হউক তিনি হিমালয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া নানা বিঘ্ন বিপত্তির পর চল্লিশ বৎসর বয়সে বাটি ক্রয় করিয়া কলিকাতায় সুস্থির হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার কার্য্য প্রকৃতরূপে আরম্ভ হইল; এই সময় হইতেই তিনি একেশ্বরবাদ প্রকৃতরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বেদান্ত প্রভৃতি গ্রন্থ অনুবাদ করিতে লাগিলেন। তিনি বাল্যাবস্থাতেই কোরাণ পড়িয়া দেখিয়াছিলেন যে তাহা একেশ্বরবাদই প্রচার করিতেছে এবং তাহার পরে সংস্কৃত শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিতে গিয়াও দেখিলেন যে তাহাতেও ঐ একই কথা। তখন তিনি ভাবিলেন যে খৃষ্টানদিগের বাইবেল শাস্ত্রও নিশ্চয়ই একেশ্বরবাদ প্রচার করিবে; তাই তিনি বাইবেল পড়িয়া বাইবেলের মধ্য হইতে প্রমাণ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং দেখিলেন যে বাস্তবিক বাইবেলও একেশ্বরবাদই প্রচার করিয়াছে। বাইবেল হইতে একেশ্বরবাদ প্রচার করিবার আর একটী প্রধান কারণ এই যে, সেই সময় মিসনরিগণ দেশীয়দিগকে খৃষ্টান করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসাহ পূর্ব্বক প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রামমোহন রায় যদিও মুসলমানদিগকে, খৃষ্টানদিগকে, কোরাণ হইতে বাইবেল হইতে দেখাইয়াছেন যে তাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র একেশ্বরবাদই প্রচার করিয়াছে, কিন্তু তাঁহার আন্তরিক অভিলাষ এই ছিল যে প্রথম স্বজাতি স্বদেশীয়দিগকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেন যে, সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের চরম উপদেশ ব্রহ্মবিদ্যা; তাঁহাদিগের প্রিয়তম হিন্দুধর্ম্মের মধ্যবিন্দু সেই একমাত্র শুদ্ধমপাপবিদ্ধং পরব্রহ্ম।

রামমোহন রায় যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, সে সময়ের এমন-ই দুরবস্থা ছিল যে, রামমোহন রায় প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মকে, সেই আর্য্য ঋষিদিগের পবিত্র ধর্ম্মকে কুসংস্কারের ঘোর কণ্টকারণ্য হইতে মুক্ত করিতে গিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি তদানীন্তন নামত হিন্দুদিগের নিকটে অহিন্দু বলিয়া পরিচিত হইলেন; কেবল তাহাই নহে, ইহার জন্য তাঁহাকে নানাপ্রকার অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু আজ বোধ হয়, এমন কোন হিন্দু নাই, যিনি রামমোহন রায়কে অহিন্দু বলিতে সাহসী হইবেন। বরঞ্চ, যাঁহারা মূর্ত্তিপূজার পক্ষপাতী, আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি যে, তাঁহারা বেদের কথা শিরোধার্য্য করিবেন কি না; তাঁহাদিগের মতে স্মৃতি তন্ত্র প্রভৃতি সমুদয় শাস্ত্র অগ্রাহ্য করা যাইতে পারিলেও বেদের কথা অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে কি না? আমার বিশ্বাস, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই বেদের কথা অগ্রাহ্য করিতে সাহস করিবেন না; কারণ তাহা হইলে তিনি প্রচলিত প্রথানুসারে সমাজচ্যুত হইলেও হইতে পারেন। আর বেদের কথা যদি শিরোধার্য্য হয়, তবে

* "পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত" প্রতিনিধি সভায় পূজ্যপাদ মহর্ষির বক্তৃতা।

বেদে যখন ব্রহ্মোপাসনারই বিধি আছে এবং ব্রহ্মভিন্ন অন্য কোন কিছুর উপাসনা করিতে স্পষ্টাক্ষরে নিষেধ আছে, তখন তাঁহারা কোন্ যুক্তিতে মূর্ত্তিপূজার পক্ষে বক্তৃতাদি করিতে সাহস করেন? বেদ বলিতেছেন

"আত্মৈবেদং নিত্যদোপাসনং স্যাৎ নান্যং কিঞ্চিৎ সমুপাসীত ধীরঃ"

জ্ঞানবান্ ব্যক্তি পরমাত্মারই উপাসনা করিবেক, আর কোন কিছুরই উপাসনা করিবেক না। এখন বোধ হয়, সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ব্রহ্মের উপাসনাই হিন্দুধর্ম্মের উদ্দেশ্য এবং এই ব্রহ্মের উপাসনা প্রথমতঃ ভারতবর্ষে প্রচার করাই প্রকৃত ভক্ত হিন্দুসন্তান মাত্রেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া অবধারণ করা উচিত।

রামমোহন রায় বেদান্ত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে ভারতে একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া তাঁহার হিন্দু নামের উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছিলেন। তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন; কিন্তু তিনি কিরূপ একেশ্বরবাদী ছিলেন? তিনি বৈদান্তিকের ন্যায় অথবা অন্য কোন প্রকারের একেশ্বরবাদী ছিলেন? তিনি যে প্রকারের একেশ্বরবাদী হউন না কেন, ইহা নিশ্চয় যে, তিনি

"জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ, জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ"

এই প্রকার পাপ পুণ্যের একাকার ভাবপ্রবর্ত্তক নীরস শুষ্ক অপ্রকৃত বেদান্তমতের পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রচলিত মতানুসারে কোন প্রকারেই তাঁহাকে একজন বৈদান্তিক বলা যাইতে পারে না। তিনি বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্ম, পরে যাহার নামান্তর হইয়াছিল ব্রাহ্মধর্ম্ম, তাহাই তিনি প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। তিনি বেদান্তসূত্রের যে টিপ্পনীর সহিত অর্থ করিয়া গিয়াছেন এবং ভট্টাচার্য্যের সহিত তাঁহার যে বিচার চলিয়াছিল তাহারই কয়েক স্থান উদ্ধৃত করিলেই এবিষয় বোধগম্য হইতে পারিবেক। এই সম্বন্ধে অনেক স্থানে এত আন্দোলন ও আলোচনা হইয়া থাকে, যে শ্রোতৃমণ্ডলীর বিরক্তিভাজন হইবার আশঙ্কা সত্ত্বেও কয়েকটী স্থান উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইতেছি। তিনি একস্থানে বলিতেছেন যে "জীব আনন্দময় না হয় * * যেহেতু জীব আর ব্রহ্মের ভেদ বেদে দেখিতেছি।" তিনি দুই তিন স্থানে বেদবেদান্ত হইতে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে "বিবর্ত্তরূপে ব্রহ্ম জগৎ কারণ হয়েন * * বিবর্ত্ত শব্দের অর্থ এই যে আপনি নষ্ট না হইয়া কার্য্যরূপে উৎপন্ন হয়েন।" বর্ত্তমান ব্রাহ্মগণ যখন বলেন যে ঈশ্বর জগত সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইতে বেদান্তের উক্ত কথার, কেবল কথার তারতম্য ব্যতীত পার্থক্য কোথায়, তাহা জানি না। রামমোহন রায় শ্রুতির দ্বারা স্পষ্টই দেখাইয়াছেন যে "ব্রহ্ম এই সকল অনুভূত বস্তুর মধ্যে কিছুই নহেন এই মাত্র ব্রহ্মের নির্দ্দেশ, ইহা ভিন্ন আর নির্দ্দেশ নাই। সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে যে জগৎ তাহার মধ্যে যথার্থ রূপ যে সত্য তিনিই ব্রহ্ম; প্রাণ প্রভৃতি ব্রহ্ম নহেন, তাহার মধ্যে সত্য যে বস্তু তিনিই ব্রহ্ম হয়েন।" তিনি অনেকবার এই ভাবে বলিয়াছেন যে "যেমন মিথ্যা সর্প সত্য রজ্জুকে অবলম্বন করিয়া সত্যরূপে প্রকাশ পায়, বস্তুতঃ সে রজ্জু সর্প হয় এমত নহে। সেইরূপ সত্যস্বরূপ যে ব্রহ্ম, তিনি মিথ্যারূপ জগৎ বাস্তবিক হয়েন না।" তিনি বেদান্তসূত্রের ভূমিকায় ব্রহ্মজ্ঞানীর

পঙ্ক চন্দনে সমজ্ঞানের পক্ষীয়দিগের প্রতি একটু মৃদু মধুর উপহাস করিয়া বলিলেন যে “ব্রহ্ম উপাসনাতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞানের বহির্ভূত হইয়া লোক ক্ষিপ্ত হয় ইহাও লোকের বিশ্বাস জন্মে।” পূর্ব্বোল্লিখিত ভট্টাচার্য্য যখন জিজ্ঞাসা করিলেন যে “যদি কেহ কহে যে বেদান্তে সকলই ব্রহ্ম ইহা কহিয়াছেন তাহাতে বিহিত অবিহিত বিভাগ কি? তবে কি কর্ত্তব্য বা কি অকর্ত্তব্য” ইত্যাদি, তখন রামমোহন রায় প্রকৃত বেদান্তের পক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন “যে ব্যক্তি এমত কহে যে সকলই ব্রহ্ম তাহাতে বিহিত অবিহিতের বিভাগ কি, তাহার প্রতি ভট্টাচার্য্যের এ আশঙ্কা করা যুক্ত হইতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি কহে যে লোকেতে প্রত্যক্ষ যাহা যাহা হইতেছে তাহার বাস্তব সত্তা নাই যথার্থ সত্তা কেবল ব্রহ্মের, আর সেই ব্রহ্মসত্তাকে আশ্রয় করিয়া লৌকিক যে যে বস্তু যে যে প্রকারে প্রকাশ পায় তাহাকে সেই সেইরূপে ব্যবহার করিতে হয়; * * তাহার প্রতি ভট্টাচার্য্যের এ আশঙ্কা কদাপি যুক্ত হয় না।” রামমোহন রায় জানিতেন যে প্রচলিত অপ্রকৃত বেদান্তমত বড়ই অনিষ্টকর, তাই তিনি সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত প্রভৃতি পড়ান হইবে শুনিয়া তাহার বিরুদ্ধে হিন্দু কলেজ সম্বন্ধে প্রার্থনাপত্রে লিখিলেন যে “Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe, that all visible things have no real existence, that as father, brother &c. have no actual entity, they consequently deserve no real affection, and therefore the sooner we escape from the world the better.” অর্থাৎ যে বৈদান্তিক মত সমস্ত বস্তুর সত্তা লোপ করিয়া দিয়া একাকার ভাব প্রচার করে, তাহা শিক্ষা করিলে বালকেরা সামাজিক প্রভৃতি কোনও কর্ম্মেরই উপযুক্ত হইবেক না। হিন্দুকলেজ সম্বন্ধে প্রার্থনাপত্র পড়িলেই মনে মনে এই প্রশ্ন উঠে যে, যদি তাঁহার বৈদান্তিকের বেদান্ত প্রচার করিবার ইচ্ছা থাকিত, তবে তিনি সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের বিরোধী হইলেন কেন? আর এক কথা এই যে, যদি তিনি কেবল প্রচলিত বেদান্তই প্রচার করিতেন, তবে অন্যান্য আরও অনেক বৈদান্তিক পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ অত্যাচারের কথা শুনা যায় না, কেবল তাঁহারই প্রতি অত্যাচার হইত কেন? সকল কথা ছাড়িয়া দিলেও, বেদান্ত প্রচার করিতে গিয়া, অন্যান্য নানা সুবিধা সত্ত্বে এক ব্রহ্মসভাস্থাপনের জন্য তাঁহার কঠোর ত্যাগ স্বীকার করিবার কিছুমাত্র আবশ্যক ছিল না। তাঁহার গ্রন্থ আলোচনা করিয়া যতদূর বুঝা যাইতে পারে, তাহাতে সকলেই ব্রাহ্মের প্রকৃত অর্থে তাঁহাকে একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম যথার্থ ভক্ত ব্রাহ্ম বলিবে।

তাঁহাকে বৈদান্তিকগণ যে বৈদান্তিক বলিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি, যখন তাঁহাকে তাঁহার মৃত্যুর পরে মুসলমানেরা মুসলমান, খৃষ্টানেরা খৃষ্টান বলিতে পারিয়াছিল। তাঁহার সকল ধর্ম্মের একেশ্বরবাদটুকুর সহিত অতি প্রগাঢ় সহানুভূতি ছিল; এই জন্য সকল ধর্ম্মাবলম্বীগণ তাঁহাকে নিজনিজ দলের অন্তর্ভুক্ত ভাবিতেন। তাঁহার উদারতা এত বিস্তৃত যে আধুনিক থিওসফিষ্টগণও তাঁহার জীবন ও কার্য্যের মধ্য হইতে সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে স্বদলে গ্রহণ করিয়াছেন।

ধর্ম্মসংস্কারই রামমোহন রায়ের সকল কার্য্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কার্য্য বলিয়া,

সেই বিষয়ই যথাসাধ্য উল্লেখ করিলাম। তাঁহার সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সংস্কার সম্বন্ধে এবং তাঁহার উদারতা প্রভৃতি সম্বন্ধেও আমা অপেক্ষা অনেক বিজ্ঞতর ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনেকবার অনেক কথা হইয়া গিয়াছে, সুতরাং সে সকল বিষয় এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে ক্ষান্ত থাকিব! তবে তাঁহার সেই সকল সংস্কার কার্য্যে যে স্ত্রীজাতির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছিল, পরিবর্ত্তনের এই মুখ্য সময়টীতে, সে বিষয় অন্ততঃ কিছুও আলোচনা করা আবশ্যক।

ইহ জগতে অখিলমাতা পরমেশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপ, স্নেহমমতায় মাতৃস্থানীয় নারীজাতির প্রতি যাঁহার শ্রদ্ধা নাই, যিনি নারীজাতির মাতৃত্বকে স্বচ্ছন্দে অবহেলা করিতে পারেন, তিনি বোধ হয় যথার্থ বড়লোক কদাপি হইতে পারিবেন না। সম্প্রতি যিনি সমস্ত ভারতকে কাঁদাইয়া আনন্দধামে গমন করিয়াছেন, সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নারীজাতির প্রতি কত প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ছিল। সকলেই বোধ হয় জানেন যে, তিনি একদা গ্রীষ্মকালের দ্বিপ্রহরে ক্ষুধাতুর তৃষ্ণাতুর হইয়া এক দোকানে গিয়া দোকানীর নিকট জলপ্রার্থনা করিলেন। দোকানী কেবল জলই দিতে প্রস্তুত হইল; তাহার স্ত্রী তাহাকে কেবলমাত্র জল দিতে নিষেধ করিয়া প্রথমে যৎকিঞ্চিৎ আহারীয় দ্রব্য গৃহ হইতে আনিয়া দিতে বলিল; তাহাতে দোকানী ক্রুদ্ধ হইয়া স্ত্রীকে তিরস্কার করিয়া বলিতে লাগিল যে, তাহার জ্বালায় সংসারে কিছু সঞ্চিত থাকিবার উপায় নাই। স্ত্রী এরূপ তিরস্কার সহ্য করিয়াও ক্ষুধার্ত্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কিছু আহারীয় আনিয়া প্রদান করিল! এই এক ঘটনাতেই বিদ্যাসাগর মহাশয় নারীজাতির সুকোমলভাব, তাঁহাদিগের মাতৃত্ব সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিলেন। তিনি যেমন আপনার মাতাকে সাক্ষাৎ দেবতারূপে দেখিতেন, সেইরূপ সমস্ত স্ত্রীজাতিকে মাতৃচক্ষে দেখিয়া তাঁহাদিগের দুঃখনিবারণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

রামমোহন রায়ও স্ত্রীজাতিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। তিনি যখন তিব্বত প্রদেশে একাকী অসহায় অবস্থায় গমন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে সেখানকার স্ত্রীলোকেরাই পুরুষদিগের সহস্র প্রকার অত্যাচার হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল। রামমোহন রায়ও এই এক ঘটনাতেই স্ত্রীজাতির হৃদয় দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন; এমন কি, তাঁহার জীবনের শেষভাগেও যখন এই ঘটনার কথা উল্লেখ করিতেন, তখন তাঁহার চক্ষু হইতে অবিরলধারে অশ্রু বহিতে থাকিত। সেই যে তিনি তিব্বত হইতে স্ত্রীজাতির স্নেহমমতা হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া আনিয়াছিলেন, জীবনের শতসহস্র বিঘ্ন বিপত্তিও তাহা মুছিয়া দিতে সক্ষম হয় নাই। "স্ত্রীলোকদিগের প্রতি তাঁহার ব্যবহার অতি চমৎকার। স্ত্রীজাতিকে তিনি অত্যন্ত সমাদর করিতেন। তাঁহার একজন আত্মীয় বলেন যে, তিনি যখন বসিয়া থাকিতেন, তখন কোন স্ত্রীলোককে তিনি তাঁহার সহিত দাঁড়াইয়া কথা কহিতে দিতেন না। হয়, স্ত্রীলোকটীকে বসাইতেন, নতুবা নিজে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতেন।"* তিনি যে কেবল স্ত্রীজাতির সহিত উত্তম ব্যবহার করিতেন, তাহা নহে, তিনি তাঁহাদিগের প্রকৃত

* সুযোগ্য লেখক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "রামমোহন রায়ের জীবন চরিত।"

বন্ধু ছিলেন; হিন্দু-রমণীদিগের জন্য তিনি যাহা করিয়া গিয়াছেন, অন্য কে ততটা করিতে পারিয়াছে? আজ কত অনাথা হিন্দুবিধবা, হয়তো রামমোহন রায়ের নামও জানেন না, কিন্তু তাঁহারই রোপিত মহান্ বৃক্ষের ফল উপভোগ করিতেছেন; কত হিন্দুবিধবা তাঁহারই কল্যাণে সহমরণ হইতে রক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা আপনাদিগের জীবন সার্থক করিয়া সংসারের সুখশান্তি পরিবর্দ্ধিত করিতেছেন!

রামমোহন রায়ের ন্যায় একজন মহাত্মা পুরুষ যে সতীদাহ নিবারণ করিবার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিবেন তাহা আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু বাস্তবিক যাঁহার আত্মা উদার, তাঁহার নানা ক্ষুদ্র কথায়, ক্ষুদ্র কার্য্যে উদারতা ও মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে। রামমোহন রায়ের সহিত সতীদাহের পক্ষপাতীগণ তর্ক করিবার কালে সতীদাহ রাখিবার যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের নিতান্ত সঙ্কীর্ণ আত্মার সঙ্কীর্ণতাই প্রকাশ পাইয়াছে; কিন্তু রামমোহন রায় তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে লিখিতে গিয়া, স্ত্রীজাতির প্রতি যেরূপ উদারতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব আরও দীপ্তিমান্ হইয়াছে। সতীদাহের পক্ষপাতীদিগের সতীদাহ রক্ষাপক্ষে এই যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল যে স্ত্রীলোকগণ ( ) স্বভাবত অল্পবুদ্ধি, (২) অস্থিরান্তঃকরণ (৩) বিশ্বাসের অপাত্র, (৪) সানুরাগা এবং (৫) ধর্ম্মজ্ঞান শূন্যা। রামমোহন রায় এক একটী বিষয় ধরিয়া উত্তর দিলেন। তিনি প্রথম বিষয়ে বলিলেন যে "স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন যে, অনায়াসেই তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? * * বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাট রাজার পত্নী, কালিদাসের পত্নী প্রভৃতি যাহাকে যাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন, তাহারা সর্ব্বশাস্ত্রের পারগরূপে বিখ্যাতা আছে। বিশেষতঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে যে, অত্যন্ত দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন, মৈত্রেয়ী ও তাহার গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতার্থ হয়েন।" দ্বিতীয় বিষয়ে বলিলেন যে, "যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, তথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য দ্বারা স্বামীর উদ্দেশে অগ্নিপ্রবেশ করিতে উদ্যত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, তথাচ কহেন, যে তাহাদের অন্তঃকরণের স্থৈর্য্য নাই।" তৃতীয় বিষয়ে বলিলেন যে গণনা করিলে দেখা যাইবে যে "প্রতারিত স্ত্রীর সংখ্যা দশগুণ অধিক হইবেক; তবে পুরুষেরা প্রায় লেখা পড়াতে পারগ" এই জন্য কোন স্ত্রীলোক কদাচিৎ অপরাধ করিলে পুরুষেরা প্রচার করিয়া বেড়ান, কিন্তু "পুরুষে স্ত্রীলোককে প্রতারণা করিলে তাহা দোষের মধ্যে গণনা করেন না।" "স্ত্রীলোকের এই এক দোষ আমরা স্বীকার করি যে, আপনাদের ন্যায় অন্যকে (অর্থাৎ পুরুষকে) সরল জ্ঞান করিয়া হঠাৎ বিশ্বাস করে, যাহার দ্বারা অনেকেই ক্লেশ পায় এ পর্য্যন্ত যে কেহ কেহ প্রতারিত হইয়া অগ্নিতে দগ্ধ হয়।" চতুর্থ বিষয়ে বলিলেন যে অধিকতর সানুরাগ কে, "তাহা উভয়ের বিবাহ গণনাতেই ব্যক্ত আছে, অর্থাৎ এক এক পুরুষের প্রায় দুই তিন দশ বরঞ্চ অধিক পত্নী দেখিতেছি; আর স্ত্রীলোকের এক পতি, সে ব্যক্তি মরিলে কেহ তাবৎ সুখ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গে মরিতে বাসনা করে, কেহ বা যাবজ্জীবন অতি কষ্ট যে ব্রহ্মচর্য্য

তাহার অনুষ্ঠান করে।” পঞ্চম বিষয়ে বলিলেন যে তাহাদের ধর্ম্মভয় অল্প, “এ অতি অধর্ম্মের কথা। দেখ কি পর্য্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে। অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ, যাঁহারা দশ পনর বিবাহ অর্থের নিমিত্ত করেন, তাঁহাদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না; * * তথাপি ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্মভয়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ না করেকেও এবং স্বামী দ্বারা কোন উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম্মনির্ব্বাহ করেন। * * দুঃখ এই যে, এই পর্য্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধনপূর্ব্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।” এইরূপে তিনি সতীদাহ পক্ষপাতীদিগের নারীজাতির প্রতি অযথা অপবাদ সমূহের সম্পূর্ণরূপে প্রতিবাদ করিয়া তবে শান্তি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। স্ত্রীজাতির কষ্ট দেখিলে তাঁহার কোমল হৃদয়ে গুরুতর আঘাত লাগিত। এই কারণেই তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন, যাহাতে হিন্দু বিধবা রমণীগণ মৃত স্বামীর বিষয়ের একাংশের অধিকারী হয়েন।

তাঁহার স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে লেখা পড়িলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে তিনি স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। বাস্তবিক প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষা ও প্রকৃত স্ত্রীস্বাধীনতা না প্রচলিত হইলে আমাদিগের দেশের শ্রেয় নাই। এই স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার অর্থে আমি বিশ্ব বিদ্যালয় প্রচলিত স্ত্রীশিক্ষা অথবা মার্কিণ মুলুকের স্ত্রীস্বাধীনতার কথা বলিতেছি না। স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে আমি এই বলি যে, ধর্ম্মকার্য্য, গৃহ কর্ম্ম, লেখা পড়া প্রভৃতি সকল প্রকার সৎ বিষয়ে যেমন পুরুষের স্বাধীনতা আছে, তেমনি সকল প্রকার সৎবিষয়ে স্ত্রীলোকেরও স্বাধীনতা থাকা কর্ত্তব্য। অসৎ বিষয় হইতে যেমন পুরুষদিগকেও রক্ষা করা কর্ত্তব্য, স্ত্রীলোকদিগকেও সেই রূপ রক্ষা করা কর্ত্তব্য। পুরুষদিগকে অসৎ বিষয় হইতে রক্ষা করা যদি না হয়, তাহা হইলে যে স্ত্রীলোকদিগকেও রক্ষা করিবে না, তাহা নহে। এ বিষয়ে পরস্পর পরস্পরকে অপেক্ষা করে না। অসৎ বিষয় হইতে পুরুষদিগকেও নিশ্চয়ই রক্ষা করিতে হইবে, স্ত্রীলোকদিগকেও নিশ্চয়ই রক্ষা করিতে হইবে; সৎ বিষয়ে পুরুষদিগকেও স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে, স্ত্রীলোকদিগকেও স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইবে। আর বাস্তবিক, স্ত্রীজাতি এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন যে, তাঁহারা মনুষ্যত্বের অধিকার হইতে বিচ্যুত থাকিবেন; যে তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের এই অনন্ত-সুন্দর বিশ্বরাজ্যের আলোচনা হইতে বঞ্চিত করিতেই হইবে? সকলেই জানেন যে, বিগত কলিকাতার মহাপ্রদর্শনীতে দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের জন্য সপ্তাহে এক দিন বিশেষ রূপে নির্দ্ধারিত ছিল। কিন্তু বঙ্গদেশীয় রমণীদিগের নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, তাঁহাদিগের অনেকে, মানবের বুদ্ধির ভাণ্ডার স্বরূপ এই মহাপ্রদর্শনী একটীবারও চক্ষে দেখিতে পাইলেন না। আমি আমার দুই একটী বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি যে তাঁহারা তাঁহাদিগের পরিবারস্থ কোন স্ত্রীলোককে এই মহাপ্রদর্শনীতে একটী দিনের তরে ও পাঠান নাই। স্ত্রী-

জাতিকে এইরূপ কঠোর পরাধীনতার মধ্যে আবদ্ধ রাখিলে তাঁহারা স্বাধীনতার স্বাস্থ্যকর ভাব হারাইয়া ফেলিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের সন্তানগণও যে স্বাধীনতাভাব বিবর্জ্জিত হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। শরীরের অর্দ্ধাঙ্গ রুগ্ন থাকিলে অপর অর্দ্ধাঙ্গও রুগ্ন হইয়া পড়ে। তাই বলি হে স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণ, স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা হরণ করিও না এবং স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। এবিষয়ে যুক্তি যেমন আমাদিগকে পথ দেখাইতেছে, শাস্ত্রও সেইরূপ পথ দেখাইতেছে। শাস্ত্রকারগণ বলেন যে "গৃহমধ্যে রুদ্ধা থাকিলেও স্ত্রীরা অরক্ষিতা" এবং "যেখানে নারীগণ সম্মানিত হন, সেখানে দেবতারা প্রসন্ন থাকেন।

যে মহাত্মা পুরুষ আমাদিগের জন্য সকল বিষয়ের উন্নতির দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছেন, সেই বঙ্গদেশের বন্ধু, সমুদয় ভারতবর্ষের বন্ধু মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থে আজ এই সভা আহুত হইয়াছে। সময়ে সময়ে তাঁহার স্মৃতি আমাদিগের হৃদয়ে জাগরূক রাখিবার জন্য কোনরূপ প্রতিমূর্ত্তি কোন প্রকাশ্যস্থানে রাখিবার কল্পনা হয়। তাঁহার এরূপ প্রতিমূর্ত্তি রক্ষা অবশ্য অকর্ত্তব্য হইতে পারে না কিন্তু উহাই তাঁহার স্মৃতি জাগরূক রাখিবার পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার স্মৃতি চিহ্ন তাঁহার জীবন চরিত; * তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন তাঁহার গ্রন্থ সকল। এই সকল পুস্তক প্রত্যেক ভারতবাসীর গৃহে গৃহে রাখা কর্ত্তব্য।

তাঁহার আর এক সুমহান্ কীর্ত্তিস্তম্ভ তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ। এই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন সেই একমেবাদ্বিতীয়ং পরমেশ্বরের উপাসনা করিবার নিমিত্ত এবং সকল সম্প্রদায়ভুক্ত, সকল ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের মধ্যে একতা স্থাপনের নিমিত্ত। তিনি অধিকারপত্রে লিখিয়া দিলেন যে সমাজগৃহে এমন সকল বক্তৃতা সঙ্গীতাদি হইতে পারিবেক "As have a tendency to the promotion of the contemplation of the Author and Preserver of the universe * * * and strengthening the bonds of union between men of all religious persuations and creeds." কি এক প্রগাঢ় উদারতা! এইরূপ বিশ্বজনীন উদারতাকে ভিত্তি করিয়া ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করা কেবল ভারতবর্ষে নহে, জগতের মধ্যে ইহাই প্রথম। কিন্তু আমাদিগের দুর্ভাগ্যের কথা কি আর বলিব?—কোথায় রাজা রামমোহন রায় সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন আনয়ন করিবার নিমিত্ত যত্ন করিলেন, আর কোথায় আমাদিগের মধ্যে গৃহবিবাদ। আমার বোধ হয়, এই গৃহবিবাদের মূল জাতীয় ভাব লইয়া; এক সম্প্রদায় সত্য প্রচার করিবেন জাতীয়ভাব বর্জ্জন করিয়া, অপর সম্প্রদায় সত্য প্রচার করিয়া করিবেন জাতীয় ভাব রক্ষা। ধর্ম্ম অর্থাৎ পারমার্থিক সত্য এক; তাহা সাধারণ্যে প্রচার করা আর। সত্য যাহা, তাহা চিরকালই সমান থাকিবেক; কিন্তু তাহা প্রচার করিতে হইবে প্রত্যেক জাতির জাতীয়ভাব রক্ষা করিয়া, দেশকাল পাত্র বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া। বৈজ্ঞানিক সত্য কেবলমাত্র জ্ঞানের কথা; কিন্তু তাহাও বুদ্ধিমান ছাত্রের নিকট এক

---

* আম[illegible] পুনরায় উল্লেখ করিতেছি যে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রামমোহন রায়ের একখানি উত্তম জীবন চরিত লিখিয়া সমুদায় ভারতবর্ষের এবং বিশেষতঃ বঙ্গদেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

প্রকারে বুঝাইতে হয়, অল্পবুদ্ধি ছাত্রের নিকট আর এক প্রকারে বুঝাইতে হয়। কিন্তু পারমার্থিক সত্য ধারণ করা কেবল মাত্র জ্ঞানের কার্য্য নহে, তাহা সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়েরও কার্য্য; এই জন্য যতটা পারা যায় হৃদয়ে গুরুতর আঘাত না লাগে, এরূপ ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা কর্ত্তব্য। আমরা ঋষিদিগের সঞ্চিত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছি বলিয়া; তাঁহাদিগের ব্রহ্মজ্ঞান আমাদিগের জীবনে পরিণত করিতে যাইতেছি বলিয়া আমাদিগের জাতীয়ভাব ত্যাগ করিবার কি নিতান্তই আবশ্যক? না কখনই নহে।

রামমোহন রায় প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট তাঁহাদিগের আপনাপন ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন যে প্রত্যেক জাতিতে জাতীয়ভাব রক্ষা করিয়াও সত্যধর্ম্ম প্রচার করিতে বাধ্য হয় না। এমন কি, তিনি একস্থানে বলিয়াও গিয়াছেন যে "শাস্ত্রানুসারে আহার ও ব্যবহার নিষ্পন্ন করা উচিত হয়।" তিনি আর একস্থানে বেদান্তসূত্রের কথা উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ করিলেও ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে; "বর্ণাশ্রমাচার বিনাও ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন হয়। রৈক্য প্রভৃতি বর্ণাশ্রমাচারের অনুষ্ঠান না করিয়া ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। ... ... তবে ... ... বর্ণাশ্রম ধর্ম্মত্যাগী যে সাধক তাহা হইতে বর্ণাশ্রম বিশিষ্ট যে সাধক তাহাকে শ্রেষ্ঠ করিয়া কহিয়াছেন।" 'জাতীয়ভাব রক্ষা করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার' এই মূলমন্ত্র তাঁহার জীবনে কেমন সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন। তিনি উপবীত আমরণ রক্ষা করিয়াছিলেন, এমন কি তাঁহাকে সমাধিস্থ করিবার সময় তাঁহার গলায় উপবীত দেখা গিয়াছিল এবং তিনি অনুরোধ করিয়াছিলেন যে মৃত্যুর পরে খৃষ্টীয় অনুষ্ঠান অনুসারে সমাধি দেওয়া না হয়; কিন্তু আবার এদিকে যখন বর্ত্তমান লেখকের পূজ্যপাদ পিতামহ তাঁহার পিতার হইয়া রামমোহন রায়কে দুর্গাপূজায় নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিলেন, তখন রামমোহন রায় সে নিমন্ত্রণ বিনীত ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, এবং তখনকার কালে দুর্গোৎসবের কুৎসিত অকুৎসিত নানা প্রকার বৃথা আমোদের প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারিয়া, এবং ব্রহ্ম প্রীতিতেই আপনার সমুদয় প্রীতি স্থাপন করিয়া সেই তির্ব্বত পরিব্রাজক রামমোহন রায়ের উপযুক্ত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

এই স্থলে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত রামমোহন রায়ের সুন্দর জীবনচরিত হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি তাঁহার সার্ব্বভৌমিকতা ও জাতীয়ভাব এই উভয়ের সামঞ্জস্য দেখাইতেছেন। "রামমোহন রায় যদি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ও সার্ব্বভৌমিক ভাবে সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন, তবে তিনি সেই সমাজকে হিন্দুভাবে সজ্জিত করিলেন কেন? বাস্তবিক তিনি সমাজকে বিশেষরূপে হিন্দু আকার দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ বেদীতে বসিয়া বেদপাঠ করিতেছেন, বৈদিক শ্লোকের ব্যাখ্যা হইতেছে, এ সকল সম্পূর্ণ হিন্দুভাব। টষ্টডীড পত্রের অসাম্প্রদায়িক উদারভাব, এবং ঐরূপ হিন্দুভাবের মধ্যে সঙ্গতি হইতে পারে কি না, ইহাই বিবেচনার বিষয়।

"কেহ কেহ উহার জন্য রামমোহন রায়কে অসঙ্গতি দোষে দোষী কহিয়াছেন। আমরা সেরূপ কোন দোষ দেখি না।

সত্যমাত্রই অসাম্প্রদায়িক ও উদার। সত্য ভারতবর্ষীয় কি ইউরোপীয়, হিন্দু কি যাবনিক, জাতীয় কি বিজাতীয় নাই। সত্য আমারও নহে,তোমারও নহে। উহা মানবজাতির সাধারণ সম্পত্তি। কিন্তু সত্যকে কার্য্যে পরিণত করা ও সত্য প্রচার সম্বন্ধে প্রত্যেক জাতি তাঁহাদিগের জাতীয় ভাব ও রুচি অনুসারে বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকেন। কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায় দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করেন, কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায় বসিয়া প্রার্থনা করেন, এবং কোন সম্প্রদায় একবার দাঁড়াইয়া ও একবার বসিয়া প্রার্থনা করেন। সার্ব্বভৌমিকতা রক্ষা করিতে হইবে বলিয়া কি এই তিন প্রকারেই প্রার্থনা করিতে হইবে? ইহার তুল্য অসম্ভব ও হাস্যের কথা আর কি আছে? জাতীয় ভাব অবলম্বন করাতে কেবল দোষ নাই এরূপ নহে, ঐরূপ করাই কর্ত্তব্য। নতুবা প্রচার বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া সুকঠিন। সমগ্র জগতের ইতিহাস এ কথার যাথার্থ্য পক্ষে সাক্ষ্যদান করিতেছে। * * *

"তবে রামমোহন রায়ের দোষ কোথায়? সমাজে যে হিন্দুপ্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা ট্রষ্টডীড পত্রের কোন্ কথার বিরুদ্ধ? এ পর্য্যন্ত কেহ তাহা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।"

এতক্ষণ আমরা এক মহাত্মাপুরুষের জীবন আলোচনা করিয়া এই শিক্ষা লাভ করিলাম যে, সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, ব্রহ্মের জন্য সর্ব্বস্ব, সকল প্রকার স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারা যায় এবং আবশ্যক হইলে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যখন আমরা বুঝিলাম যে ব্রহ্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মই আমাদের হৃদয়ের দেবতা, তখন কেন আমরা অন্য দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করিব? যখন ব্রহ্ম আমাদিগের সকল কর্ম্মের দেবতা বুঝিলাম, তখন কেন অন্য কোন পরিমিত দেবতাকে আমাদিগের ক্ষুদ্র বৃহৎ অনুষ্ঠান সকলের দেবতা করিব? আমাদিগের কর্ত্তব্য এই যে, আমরা যাহা সত্য বলিয়া বুঝিব, তাহা সর্ব্বপ্রযত্নে, শত সহস্র বিপদ ঘটিলেও হৃদয়ে ধরিয়া রাখিব—পরিত্যাগ করিব না। ইহা না করিলে আমাদিগের অনেকটা কপটতাচরণ করা হয়। প্রত্যেক ভারতবাসী যখন মূর্ত্তিপূজা পরিত্যাগ করিয়া আপনার জীবনের প্রত্যেক অনুষ্ঠান জাতীয় ভাবে ব্রহ্মের সম্মুখে সম্পন্ন করিবেন, তখনই জানিব যে রামমোহন রায়ের জয়। রামমোহন রায়কে যদি আমাদের রামমোহন রায় বলিয়া পরিচয় দিতে যথার্থই ইচ্ছা করি, এবং তাহাতে আমরা যদি যথার্থই গৌরব অনুভব করি, তাহা হইলে আমাদিগের নিতান্তই কর্ত্তব্য যে আমরা আমাদিগের জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল অনুষ্ঠানই ব্রহ্মকে আহ্বান করিয়া সম্পন্ন করি।

"পিতামহ ঋষিরা যে ব্রহ্মকে বহু সাধনা দ্বারা আবাহন করিয়া আমাদের ভারতবাসীর হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, আমাদের হীনতা অন্ধকারে যে ব্রহ্মের মূর্ত্তি এতদিন আচ্ছন্ন হইয়া আছে, রামমোহন রায় সেই ব্রহ্মকে আমাদের হৃদয় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আমরা যদি তাঁহার সেই শুভ সংকল্প সিদ্ধ করি, তবেই তাঁহার চিরস্থায়ী স্মরণস্তম্ভ পৃথিবীতে স্থাপন করিতে পারিব। আমরা অগ্রে ভারতবর্ষের মন্দিরে সনাতন ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিব, অবশেষে এমন হইবে যে পৃথিবীর চারিদিক হইতে ধর্ম্মার্থীরা ভারতবর্ষের তীর্থক্ষেত্রে ব্রহ্মদর্শন-লালসায় দলে দলে আগমন করিতে থাকিবে, তখনই রাজা রামমোহন রায়ের জয়। তিনি যে সত্যের পতাকা ধরিয়া ভারতভূমিতে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই পুরাতন সত্যের জয়। তখন সেই রামমোহন রায়ের জয়ে, ঋষিদের জয়ে, সত্যের জয়ে, ব্রহ্মের জয়ে আমাদের ভারতবর্ষেরই জয়।" *

* "রামমোহন রায়"—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ত্রয়োদশ কল্প
প্রথম ভাগ
অগ্রহায়ণ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬২।

৫৮০ সংখ্যা ১৮১১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ब्रह्मवाएकमिदमग्रआसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयसर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यसाधनञ्च तदुपासनमेव।

গান।

রাগিণী—বেলাওল।

হৃদয়াসনে এস হে—
মরম দলিত পাপে,
জাগে শুধু শোকতাপে।
প্রেমময় পিতা তুমি,
দীনহীন শিশু আমি;
শীতল অমৃত ধারে
বরিষ হে হৃদি পরে।
রাখো হে জীবনধারে,
ডাকো বা মরণ পারে,
তোমারি চরণে দিব
প্রীতি প্রিয়কার্য্য সব।
সদা দেব সাথে থাকো,
পাপতাপ যাবে লাখো;
নূতন অমৃত আশে
আনন্দে হৃদয় ভাসে।

প্রার্থনা।

(গত আশ্বিন মাসে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক পঠিত।)

অসতোমা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্ম্মাঽমৃতং গময়।

হে সৎস্বরূপ, আমাকে অসৎ হইতে সৎস্বরূপে লইয়া যাও। চারি দিকে দেখিতেছি সকলই অসৎ। সকলই পরিবর্ত্তনশীল—কিছুরই স্থিরতা নাই। একটী গাছ কাটিয়া ফেলিলাম, কিছুদিন পরে দেখিলাম যে তাহা মাটী হইয়া গিয়াছে। এখন সেই গাছ কোথায় গেল? সকলেই বলিবেন যে গাছ নাই বটে, কিন্তু গাছের পরমাণু পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে। তাহা হউক, কিন্তু গাছ তো আর নাই; গাছের কিছুই স্থিরতা রহিল না। এই অস্থির গাছের মত এই পৃথিবীর সকলই অস্থির। একটী বাটী নির্ম্মাণ কর—দেখিতে হইবে যেন তাহা অচলের ন্যায় চিরস্থায়ী; তাহা দেখিলে মনেই হইবে না যে এই বাটীও একদিন ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে। কিন্তু

দেখিতে দেখিতে এমন বাটীও পড়িয়া গিয়া, যে সকল বস্তু দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল, অবশেষে তাহাতেই পরিণত হয়; কেবল তাহাই নহে, সেই বালি চূণ কিছুই থাকে না, সমস্তই মাটী হইয়া যায়। এই সকল দেখিয়া কেমন বুঝা যাইতেছে যে জগতের কিছুরই স্থিরতা নাই। এই যে এমন সুন্দর অট্টালিকাবিশিষ্ট মহানগরী আছে, হঠাৎ যদি সেই লিসবনের ভূমিকম্প উপস্থিত হয়—তখন এই সকল গর্ব্বময় ধূলিরাশি কোথায় থাকিবে? বাহির হইতে শত সহস্র দুঃখ ক্লেশ আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিয়াও যে রাজপ্রাসাদের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই, হয়তো আজ সেই গর্ব্বিত রাজপ্রাসাদ সহসা হ্রদে পরিণত হইল। যেখানে পুষ্করিণী ছিল, তাহা হয় তো পর্ব্বতে পরিণত হইল। এইরূপ চিরপরিবর্ত্তন সম্মুখে দেখিয়াও কি আমাদিগের অন্তরে ভয় হয় না? এমন কি মনে হয় না যে, আজ আমি আপনার সৌন্দর্য্যমদে আপনার ঐশ্বর্য্য-মদে মত্ত হইয়া আছি, কিন্তু আর কিছু দিন পরে সে সমস্তই কালের করাল গ্রাসে পতিত হইবে, কাহারো কোনো চিহ্ন মাত্রও অবশিষ্ট থাকিবে না। এইরূপ ভয়সংকুল অনিত্য সংসারের মোহপাশ হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য হে সৎস্বরূপ, হে ধ্রুব সত্য সনাতন পরব্রহ্ম, আজ তোমাকে সকাতরে ডাকিতেছি—তুমি এই অসৎ পরিবর্ত্তনশীল পৃথিবী হইতে আমাকে তোমারি পথে লইয়া যাও।

কেবলি যে জড়জগতেই পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই, তাহা নহে; আমাদের মনের ভিতরেও কি ঘোরতর পরিবর্ত্তনের কার্য্য চলিয়াছে। সেই শৈশব কাল হইতে এই আজ পর্য্যন্ত, পরিবর্ত্তনের স্রোতে পড়িয়া বিন্দুপরিমিত মন কত সহস্র চিন্তার গুরুভার বহন না করিয়াছে! আবার ভাবিয়া দেখিলে বিহ্বল হইয়া পড়িতে হয় যে, এইরূপ সহস্র সহস্র প্রকারের চিন্তা কেবল আমারই মনের বিশেষ ধর্ম্ম নহে কিন্তু এই জগতে যে কোটি কোটি লোক বাস করিতেছে, সকলেরই ইহা সাধারণ ধর্ম্ম। পরিবর্ত্তনের প্রবাহ কেমন আশ্চর্য্য! কিন্তু এই চিরপরিবর্ত্তনের মধ্যে, এই নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যে কি অপরিবর্ত্তনীয় একমাত্র কেহ আছেন বলিয়া মনে হয় না? এই শুধুই পরিবর্ত্তনের সম্মুখে দাঁড়াইতে হৃদয় কি কম্পিত হয় না এবং কম্পিত হইয়া কি এক "অতি ধীর গম্ভীর, আপনে আপনি স্থির" মহান্ পুরুষের প্রতি ধাবিত হয় না?

বাস্তবিক কি এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের পশ্চাতে অপরিবর্ত্তনীয় কেহ নাই? এই দেখিতেছি আমার শরীর—ইহার না জানি কতই পরিবর্ত্তন হইতেছে। আজ এই খানে ক্ষত, কাল ওইখানে ক্ষত; আজ এই অসুখ, কাল ওই অসুখ; প্রতি পলে পলে, প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এই আমাদের ক্ষণভঙ্গুর শরীরে যে কত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, তাহা কে বলিবে? কিন্তু এই শরীর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে "আমি"-রও কি পরিবর্ত্তন হইতেছে? এই "আমি' টুকু স্থির রহিয়াছে বলিয়াই আমার শরীর, এত বিঘ্ন বিপত্তি, এত পরিবর্ত্তনের মাঝখানেও "আমার" শরীররূপে বিদ্যমান এবং এই "আমার" শরীর আছে বলিয়াই তাহাতে হিরন্ময় কোষ আত্মা বিশুদ্ধ পবিত্র সেই পরব্রহ্মের আসনরূপে অবস্থান করিতে পারিয়াছে। যদি শরীরের ন্যায় "আমি"ও

পরিবর্ত্তনশীল হইত, তাহা হইলে কোথায় এই সৌষ্ঠব সম্পন্ন মনুষ্যদেহ থাকিত, আর কিরূপেই বা জগতে জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি হইত? তখন এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে আমি ছিলাম, পরমূহূর্ত্তে আর সে আমি থাকিতাম না—তখন কোন্ আমি বাস্তবিক আমি, এই লইয়াই অন্তরে সন্দেহ উপস্থিত হইত; ইহার মীমাংসা হইত না—উন্নতির কিছুমাত্র পথ থাকিত না।

সেইরূপ এই যে অগণ্য সূর্য্য চন্দ্র লইয়া বিশ্বচরাচর অবিশ্রান্ত ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, কত শত পরিবর্ত্তন এই জগতের উপর দিয়া নিয়তই চলিয়া যাইতেছে; যদি এই সমস্ত বিশ্ব সেই ধ্রুব সত্য মহান্ পুরুষের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইত, তাহা হইলে আমরা সৃষ্টি স্থিতির শোভন মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে মহাপ্রলয়ের এক ভীষণ করাল মূর্ত্তি দেখিতে পাইতাম। যদি সেই মহান্ পুরুষের সত্য নিয়মের একসূত্রে সমস্ত জগত না গ্রথিত হইত, তাহা হইলে আমরাই কোথায় থাকিতাম? সকলেই আপন আপন ইচ্ছানুসারে চলিত। হয়তো এগ্রহ ওগ্রহে পড়িতেছে; পৃথিবীতে হয়তো চন্দ্র পড়িতেছে; পৃথিবী হয়তো চন্দ্রকে লইয়াই সূর্য্যের ভিতরে পড়িতেছে। একটি নিয়মেরও বন্ধন থাকিত না—কেনই বা থাকিবে? তাই বলি যে এই সহস্র প্রকার পরিবর্ত্তনের মধ্যেও এক অপরিবর্ত্তনীয় ধ্রুব সত্য রহিয়াছেন।

আরও বলি। কোন স্থানে যদি কতকগুলি পুস্তক শ্রেণীবদ্ধ ভাবে রক্ষিত দেখিতে পাই, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বলিব যে, এইগুলি কোন সজ্ঞান মনুষ্য কর্ত্তৃক এরূপ ভাবে রক্ষিত। আবার যদি সেই পুস্তকগুলি খুলিয়া দেখি যে, তাহার মধ্যে ভাষা ভাব প্রভৃতি অনেক বিষয়েই ঐক্য আছে, তাহা হইলে আমরা অনুমান করিয়া লই যে, সেই সকল পুস্তক একই জ্ঞানের দ্বারা লিখিত। এখন একবার প্রকৃতির দিকে চাহিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইব যে এই জগতের পশ্চাতে কোন সত্য পুরুষ নিয়ন্তা আছেন কি না। প্রকৃতির কোন্ দিকে দেখাইব? যে দিকে দেখাইতে যাই, সেই দিকেই আমার দেবতার হস্ত দেখিতে পাই। এই যে সন্ধ্যাকাল, এই সন্ধ্যাকাল কি প্রতিদিনই ফিরিয়া আইসে না? প্রতিদিনই কি সন্ধ্যা প্রশান্তির নব নব বেশ ধারণ করে না? প্রতিদিন সন্ধ্যা সেই গভীর প্রশান্ত ভাব সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হয় এবং প্রতিদিন সন্ধ্যার এই প্রশান্ত ভাবের মধ্য দিয়া ঈশ্বর তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি আমাদের হৃদয়ে প্রকাশ করেন। প্রতিদিন প্রভাতে দেখ সূর্য্য উদয় হইবেই হইবে; প্রতি গ্রীষ্মে উত্তাপ হইবেই; প্রতি শীতকালে শীত হইবেই; এবং প্রতি বৎসর শীত গ্রীষ্ম ঋতু সকল পর্য্যায়ক্রমে ঘুরিয়া যাইবেই। এই যে জগতের বিচিত্রতার মধ্যে, পরিবর্ত্তনের মধ্যেও এমন অপরিবর্ত্তনীয় সুনিয়ম সংস্থাপিত দেখিতেছি, ইহা দেখিয়াও কি প্রকারে বলিতে ইচ্ছা হয় যে, এই সকল নিয়মের স্রষ্টা এক জ্ঞানস্বরূপ সত্য সনাতন পুরুষ নাই? এক সামান্য কৌশল দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়া যাই, আর হে বিশ্ববিধাতা, তোমার এই অনন্ত কৌশলময় সৃষ্টি দেখিয়াও আমাদের হৃদয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়? হে সত্যস্বরূপ, তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি যে আমাকে তুমি অসৎ হইতে ডাকিয়া লও; আমার চক্ষু এই পরিবর্ত্তনশীল জগতেই পড়িয়া থাকে, তুমি সেই চক্ষু, সৎস্বরূপ তোমার

দিকে ফিরাইয়া দেও; আমার আত্মায় জ্ঞান প্রেরণ কর, যাহাতে আমি তোমাকে জানিতে পারি।

হে জ্যোতিঃস্বরূপ, আমাকে অন্ধকার হইতে জ্যোতিঃস্বরূপে লইয়া যাও। এখন জানিয়াছি যে তুমি আছ, এবং সকলেই তোমারি নিয়মে চলিতেছে; এখন তো-মার অভয়পদ লাভ করিয়াছি, তাই হে দয়াময়,তোমাকে আকুলপ্রাণে ডাকিতেছি যে তুমি আমাকে অজ্ঞানের মোহ-অন্ধকার হইতে তোমার শুভ্র বিমল জ্যোতির নি-কটে লইয়া যাও। বাহিরের অন্ধকার হইতে আমি কিছুমাত্র ভীত নহি, আমি আপনার অন্তরের অন্ধকার হইতে বড়ই ভীত হইতেছি। বাহিরের অন্ধকার দূর করিবার জন্য তুমি চন্দ্রসূর্য্য দিয়াছ; এমন কি, ঘোর অমানিশারও অন্ধকার, অসীম আকাশে অগণ্য গ্রহ নক্ষত্র তোমারি আদেশে দূর করিতে থাকে। কিন্তু অন্ত-রের অন্ধকার দূর করিবার সামর্থ্য গ্রহ-নক্ষত্রের নাই, চন্দ্রেরও নাই, সূর্য্যেরও নাই; একমাত্র জ্যোতির জ্যোতি, তুমি ভিন্ন সে অন্ধকার আর কেহই দূর করিতে পারিবে না। তুমি আমাদের চিরন্তন ব্রহ্ম, তুমি আমাদের গৃহদেবতা, তুমি আমাদের অন্তরের দেবতা; তুমি আমাকে দেখা দাও, তোমার অনন্তজ্ঞানের, পূর্ণজ্যোতির কণামাত্র দিয়া আমাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা কর। মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃত স্বরূপে লইয়া যাও।

আমরা প্রতি মূহূর্ত্তেই মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছি; প্রতি মূহূর্ত্তেই আমা-দের শরীরের ক্ষয় হইতেছে; কিন্তু তুমি জগতের মঙ্গলময়ী চির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছ জানিয়া আর এই শরীরের মৃত্যুকে বিন্দুমাত্রও ভয় করি না। আমি যেমন অজ্ঞান হইতে ভীত হই, সেইরূপ আত্মার মৃত্যু হইতে অতিমাত্র ভীত হই। যখন দেখি যে তুমি আমাদিগের আত্মার স্বাধীন ইচ্ছা দিয়াছ এবং যখন দেখি যে তুমি আমাদিগকে তোমার পবিত্র স্বরূপের নিকট যাইবার অধিকার ও ক্ষমতা প্রদান করিয়াছ, তখনই ভয়েতে ব্যাকুল হইয়া পড়ি, তখনই হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠে যে কি গুরুতর ভারই আমাদের মস্তকের উপরে ন্যস্ত রহিয়াছে। কতবার হৃদয় এই স্বাধীনতার ভাব হারাইয়া ফেলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্যুস্বরূপ রিপুগণের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে পরাস্ত হইয়া মৃত্যুর ক্রীতদাস হইয়া পড়িয়াছে। আজ যখন সেই কথা ভাবি, আজ যখন দেখি যে, আমরা অমৃতের পুত্র হইয়াও, অমৃতের দ্বার মুক্ত দেখিয়াও না বুঝিয়া মৃত্যুর সহিত ক্রীড়া করিয়া কত সময় বৃথায়ই অতিবাহিত করিয়াছি, তখন হৃদয় আর থাকিতে পারে না—প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। হে অমৃতস্বরূপ, এখন আর কাহার নিকটে যাইব! তোমারি চরণে আসিয়াছি; তুমি সঞ্জীবনী সুধা দ্বারা আমাকে সঞ্জীবিত কর। আমার হৃদয়ে এমন বল প্রেরণ কর যে, আর কখনও যেন মৃত্যুর প্রলোভনে না পড়ি, সর্ব্বদাই তোমাকে চক্ষের সম্মুখে রাখিতে পারি, এবং তোমার নাম জগতে প্রচার করিয়া যাহাতে আমার ন্যায় অন্যান্য সকলকেও মৃত্যুপাশের বন্ধনক্লেশ দেখাইয়া দিয়া মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত করিতে পারি, এরূপ ক্ষমতা প্রদান কর। আমার শরীর মন আত্মাকে নিব্ব্যাধি কর। আমার প্রতি শুভ আশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ।

তৃতীয় উপদেশ—অন্নময়কোষ।

(২৫ সে ফাল্গুন,১৮১২ শক,৬১ ব্রাহ্ম সম্বৎ, রবিবার কৃষ্ণত্রয়োদশী।)

যখন দেশ ছিল না, কাল ছিল না, তখন সেই অনাদি সনাতন ব্রহ্ম আপনার সৌন্দর্য্যে আপনিই মগ্ন ছিলেন। সে ভাব কে বুঝিবে? জগতে যে কিছু তাঁর শক্তি—প্রাণ, মন, জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতেই আমরা যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি। তিনি আপনার সৌন্দর্য্যে আপনিই মগ্ন ছিলেন; সে সৌন্দর্য্যের ভাব—তিনি আপনার জ্ঞানে, আপনার প্রেমে, আপনার মঙ্গলভাবে পূর্ণ ছিলেন। আপনার জ্ঞান, আপনার প্রেম, আপনার মঙ্গলভাব তিনি আপনিই জানিতেছেন। এই সৌন্দর্য্যের কণামাত্র জগতের সমস্ত শোভা সম্পাদন করিয়াছে। তাঁর সেই যে মঙ্গলভাব, তাহাতে মঙ্গল ইচ্ছার যোগ আছে। তিনি আপনার মঙ্গল ইচ্ছা আপনি নিত্যই জানিতেছেন। যখন অপরের সকল ইচ্ছা বুঝিতে পারি না, তখন তাঁহার সমস্ত ইচ্ছা জানিব কি প্রকারে? তাঁর সেই মঙ্গল ইচ্ছার পরিচয় এই জগৎ; এই জগতেই বুঝিতে পারিতেছি যে তাঁহার ইচ্ছা কিরূপ। এই জগৎ সংসার দেখিয়া তাঁর জ্ঞান যতটুকু বুঝিতে পারি, তাহার পর ভাবি যে, আরও কত জ্ঞান আছে। এই জগৎসংসার দেখিয়া তাঁর জ্ঞান উপলব্ধি করি।

প্রেম এই জগতের কোন্ স্থানে না আছে? জগতই তাঁর প্রেমের পরিচয়, তাঁর মঙ্গলভাবের পরিচয়। আমরা জ্ঞানের দ্বারা জানিতেছি যে তিনি জ্ঞানে পূর্ণ; আবার তাঁহার সেই জ্ঞানের কার্য্য প্রত্যক্ষ দেখিলাম—পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে এই সমস্ত জগৎ আমারই দেবতার জ্ঞান প্রকাশ করিতেছে। এইখানে জ্ঞান ও প্রত্যক্ষে মিলিয়া গেল। মঙ্গল ইচ্ছার পরিচয় এই জগতেই রহিয়াছে। যতটুকু জানিতে পারিয়াছি, তাহাতো পারিয়াছি; আর যতটুকু জানিতে পারি নাই, তাহা তিনি আপনিই জানেন।

তাঁহার ইচ্ছার পরিচয় এই যে, সৃষ্টির সময়ে তিনি আকাশে আপনার শক্তি প্রকাশ করিলেন, তাঁহার যে শক্তি তাঁহাতে ছিল, তাহার কতক অংশ তিনি এই অসীম আকাশে বিস্তৃত করিয়া দিলেন। ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। তিনি আপনার শক্তি আকাশে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন। সেই যে শক্তি—সেই এই জড় জগৎ, এই জড় জগৎ আকাশে রহিয়াছে। জড় জগতের প্রথম গুণ দুইটি—বিস্তৃতি ও বাধকতা (Extension and resistance); এই দুইটী গুণ জড় জগতের সঙ্গে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। ঈশ্বর জড়জগতের এই দুইটী বিশেষ গুণ ব্যতীত আরও যে পাঁচটী অবান্তর গুণ দিয়াছেন—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, তাহাও আশ্চর্য্য। জড় জগৎ তাঁর ইচ্ছাতেই এই পাঁচ গুণ পাইয়াছে, তিনিই সব দিয়ে দিয়েছেন। রূপ—অবয়ব সকল দেখ, কি সুন্দর। আদি সৌন্দর্য্য তাঁহাতে আছে, তাঁহার সেই সৌন্দর্য্য হইতেই এই সমস্তই সুন্দর হইয়াছে। ফুলেতে ছোট ছোট কেশর আছে, তাতে কি রকম আশ্চর্য্য গন্ধ রহিয়াছে। এই যে জগৎ, সেও তাঁহার সেই অসীম শক্তি পায় নাই, সে শক্তি তাঁহাতেই পূর্ণরূপে রহিয়াছে—ইহাই তাঁহার মহিমা।

তাঁহার শক্তি হইতে জড়জগৎ হই-

য়াছে। শক্তি আপনাপনি আইসে নাই—ঈশ্বরের শক্তি হইতে জড় জগতের শক্তি আসিয়াছে। যখন এই সমস্তই তাঁহার শক্তি, তখন যাঁহা হইতে এই সকল আসিয়াছে, তাঁহাকে ছাড়িয়া কি থাকিতে পারে? আশ্রয় ছাড়িয়া কি আশ্রিত থাকিতে পারে? অতএব ইহা প্রতীতি হইতেছে যে, এই শক্তি-বিশিষ্ট আকাশে বিস্তৃত সমুদয় জগৎ তিনি ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সকলই তাঁহা হইতে হইয়াছে এবং তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সকল সৃষ্ট বস্তুকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন অতএব তিনি "সপর্য্যগাৎ," তিনি অগ্নিতে আছেন, তিনি জলেতে আছেন, তিনি ওষধি বনস্পতিতে আছেন; তিনি সকল জগতেই প্রবিষ্ট হইয়া আছেন।

যিনি জ্ঞান-গোচর, তাঁহাকে যদি প্রত্যক্ষ করিতে চাও, তবে জগত দেখিয়াই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ কর, যদি নয়ন খুলিয়া দেখ, তাঁহাকে জগতে প্রত্যক্ষ করিবে; যদি নয়ন নিমীলিত করিয়া দেখ, তাঁহাকে ধ্যানে সাক্ষাৎ পাইবে। চৈতন্য এইরূপ প্রেমের বিষয় বেশ বলিয়াছেন।

"মরমে লাগিল রূপ, না যায় পাসরা।
জলের ভিতরে ডুবি, সেখানেও গোরা॥"

ঈশ্বর যিনি, যাঁকে লোকে খুঁজিয়া পায় না, তাঁহাকে চক্ষু খুলিলেও দেখা যায়, চক্ষু মুদ্রিত করিলেও দেখা যায়। তাঁহাকে সকল স্থানেই দেখিবে এবং স্বীয় আত্মাতে দেখিবে—অন্তরে বাহিরে তাঁহাকে দেখিবে। ব্রাহ্মধর্ম্মে আছে—

"এষ সেতুর্ব্বিধরণ এষাং লোকানামসম্ভেদায়"—

তিনি লোকভঙ্গ নিবারণার্থে সেতুস্বরূপ হইয়া সমুদয় ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। এই যে জড়জগৎ, বেদেতে ইহাকেই অন্নময় কোষ বলিয়াছেন।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার শিষ্যগণ।

রূপ সনাতন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পুরুষোত্তম হইতে সনাতন বৃন্দাবন পৌঁহুছিবার কিয়দ্দিন পরে, রূপ গোস্বামী তথায় আসিয়া মিলিত হন। রূপ নীলাদ্রি হইতে স্বদেশে আসিয়া অর্থ সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, আত্মীয় কুটুম্ব ব্রাহ্মণগণকে এবং দেবসেবার জন্য বিতরণ করিয়া দি-লেন। গৌড় নগরে বণিকগৃহে যে দশ সহস্র মুদ্রা গচ্ছিত ছিল, তাহাও এই জন্য আনাইলেন। এই সকল কার্য্য সমাধা করিতে বঙ্গদেশে তাঁহার এক বৎসর বিলম্ব হয়। পরে নিশ্চিন্ত হইয়া বৃন্দাবনে ভক্তমণ্ডলী মধ্যে উপস্থিত হন।

জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত রূপ সনাতন, রঘুনাথ দাস, গোপালভট্ট প্রভৃতি সংসারবিরাগী সর্ব্বত্যাগী সাধু ভক্ত মহাত্মাদের সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনেই বাস করেন। রূপ সনাতনের এক মাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীবল্লভতনয় জীব গোস্বামীও হরিপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। তৎকালে অবধূত নিত্যানন্দ গৌড়দেশে চৈতন্যপ্রবর্ত্তিত হরিভক্তিবিধান প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। জীব নিত্যানন্দের আদেশ গ্রহণ করিয়া মথুরা মণ্ডলে চলিয়া আসিলেন, এবং পিতৃব্যদিগের সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন। জীব, রূপের মন্ত্রশিষ্য ও পিতৃব্যদ্বয়ের অনুরূপ গুণবান, প্রেমিক, ভক্ত ও সংস্কৃত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন পণ্ডিত ছিলেন। বলিতে কি,রূপ সনাতন ও জীব

গোস্বামীকে চৈতন্যপ্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্মের বেদব্যাস বলা যাইতে পারে। তাঁহারা জ্ঞানগর্ভ ও প্রেমভক্তিরসাত্মক বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া শ্রীচৈতন্যের প্রেম ভক্তির ধর্ম্মকে ভারতে দৃঢ় করিয়া গিয়াছেন। রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধব নাটক, এবং জীব গোস্বামী ষট্‌সন্দর্ভ ও ভাগবৎ সন্দর্ভ প্রভৃতি গ্রন্থে প্রেমভক্তিরসের গভীর সিদ্ধান্ত সকল সুশৃঙ্খলার সহিত লিপিবদ্ধ করিয়া ভক্তি-তত্ত্ব-বিজ্ঞান প্রচার করিয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সে ইঁহারা বৃন্দাবনে দ্বারে দ্বারে যৎসামান্য মাধুকরী ভিক্ষা দ্বারা কথঞ্চিৎ রূপে জীবন ধারণ করত তরুতল আশ্রয় করিয়া কেবল হরিগুণানুকীর্ত্তন, গ্রন্থানুশীলন ও গ্রন্থরচনাতে নিমগ্ন থাকিতেন। ইঁহারাই এপ্রদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রধান প্রচারক ছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার রস মাধুর্য্য কামগন্ধশূন্য পবিত্র ভাবে গ্রহণ করিয়া তাহা প্রচার করেন।

রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভক্তিরস ব্যাখ্যান, ও উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণের লীলা, বিদগ্ধ মাধব ও ললিত মাধব নাটকদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা ও দ্বারকালীলা বর্ণন করেন। তদ্ভিন্ন দানকেলিকৌমুদী, গোবিন্দবিরুদাবলী, মথুরামাহাত্ম্য, লঘুভাগবত, ব্রজবিলাস প্রভৃতি বহুসংখ্যক গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। সনাতন গোস্বামী ভাগবতামৃত, হরিভক্তিবিলাস, রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে ভক্ত, ভক্তি ও কৃষ্ণতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য রসলীলা ও বৈষ্ণবদিগের নিত্যকৃত্য আচার ব্যবহারাদি বিবৃত করিয়াছেন। জীব গোস্বামী ভাগবতসন্দর্ভ, ভক্তিসিদ্ধান্ত, গোপালচম্পু, উপদেশামৃত, ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি বহুল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সকল গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। তদ্ব্যতীত বাঙ্গালা ভাষায় রূপ গোস্বামীকৃত রিপুদমন বিষয়ে রাগময় কোণ ও সনাতন গোস্বামী প্রণীত কৃষ্ণভক্তি বিষয়ে রসময় কলিকা এবং জীবগোস্বামী প্রণীত করচা গ্রন্থ আছে, কিন্তু এই সকল প্রাচীন গ্রন্থ এক্ষণে অতীব দুষ্প্রাপ্য।

চৈতন্য সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবেরা শ্রীচৈতন্য, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ এই তিন প্রভু ব্যতীত যে ছয়জন গোস্বামীকে আদিগুরু বলিয়া স্বীকার করেন, তন্মধ্যে রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী শীর্ষস্থানে অবস্থিত। চৈতন্য প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে ইঁহারা কতদূর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, ইহাতেই তাহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে।

শ্রীচৈতন্য রূপ সনাতনকে মথুরা বৃন্দাবনের বিলুপ্তপ্রায় তীর্থ সকল পুনরুদ্ধার করিবার জন্য বারবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। * ইহাতে অনুমান হয়, তৎসময়ে মথুরা বৃন্দাবন পরবর্ত্তী কালের ন্যায় প্রসিদ্ধ ছিল না। এক্ষণে যেস্থানে যে যে দেবালয় কুঞ্জ কুটীর প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তাহা বিদ্যমান ছিল না। চৈতন্যের পরবর্ত্তী সময়ে বৃন্দাবনধাম বিশেষ ভাবে বিখ্যাত হইয়া উঠে, এবং স্থানে স্থানে দেবমন্দির ও সাধক ভক্তদিগের আশ্রম, লতাকুঞ্জশোভিত সুরম্যসাধন কুটীর সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়া দিব্য শ্রীতে পরিশোভিত হয়। চৈতন্যের সময়ে যে দুই চারি জন ভক্ত বৈষ্ণব তীর্থদর্শনের উদ্দেশে বৃন্দাবন আসিতেন, তাঁহারা তীর্থ মনে করিয়া বৃন্দাবনের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। যখন শ্রীগৌ-

* কবি কর্ণপুর প্রণীত "চৈতন্য চন্দ্রোদয়" নাটকের ৺ প্রেমানন্দ দাস কৃত বঙ্গানুবাদ ৯ম অঙ্ক।

রাঙ্গ বৃন্দাবন গমন করিয়া রাধাকুণ্ড তীর্থের অনুসন্ধান করেন, তখন কেহই তাঁহাকে রাধাকুণ্ডের কথা বলিতে পারেন নাই। পরিশেষে তিনি তীর্থ বিলুপ্ত হইয়াছে জানিয়া, একস্থানে ধান্যক্ষেত্রের অল্প জলে স্নান করিলেন। ইহা দেখিয়া তত্রত্য অধিবাসীরা বিস্মিত হইয়াছিল। উত্তরকালে এইস্থান রাধাকুণ্ড নামে বিখ্যাত হইয়াছে। পুরীসম্প্রদায়ের গুরু মাধবেন্দ্র পুরী মথুরায় আগমন করিয়া গোপালমূর্ত্তি প্রকাশ করেন, এবং রূপ গোস্বামী মথুরামাহাত্ম্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া লোপপ্রাপ্ত তীর্থ সকল পুনঃপ্রকাশিত করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনধামে গোবিন্দদেব ও মদনগোপালের সেবা রূপ সনাতনই প্রচার করেন। মদনমোহন ও গোবিন্দজীর মন্দির যাহা ভগ্নাবস্থায় এখনও বৃন্দাবনে অবস্থিত আছে, তাহা রূপ সনাতন কর্ত্তৃক সংস্থাপিত এইরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কিন্তু গোবিন্দজীর মন্দিরে ১৫১২ শকের এক শিল্পলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে যে, পৃথুরাও কুলোদ্ভব মানসিংহ তাহা স্থাপিত করেন। † রূপ সনাতন শ্রীচৈতন্যের পরলোক প্রাপ্তির পরেও কিছু কাল জীবিত ছিলেন। চৈতন্যদেব ১৪৫৫ শকে অন্তর্হিত হয়েন, সুতরাং শিল্পলিপি অনুসারে গোবিন্দজীর মন্দির গৌরলীলা সমাপ্তির ৫৭ বৎসর পরে প্রতিষ্ঠিত। রূপ সনাতন এতদিন পর্য্যন্ত ইহলোকে ছিলেন এরূপ বোধ হয় না। এই মন্দির মানসিংহের প্রতিষ্ঠিত হইলেও রূপ সনাতন কোন রূপে তাহার পরম্পরা কারণ হইতে পারেন।

মদনমোহনের মন্দিরপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ভক্তমাল গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, সনাতন গোস্বামী প্রথমতঃ যমুনাতটে সূর্য্যঘাট নামক স্থানের সমীপবর্ত্তী এক নিভৃত উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপরে সামান্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া মদনমোহন-বিগ্রহ সংস্থাপিত করেন। কিয়দ্দিন পরে কোন একজন বণিক নাট্যশালা ও রত্নময় বেদী সমন্বিত সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মিত করেন ও মদনমোহন বিগ্রহের রীতিমত সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

এইরূপ কথিত আছে, শেষাবস্থায় বৃন্দাবনে অবস্থানকালে একদিন সনাতন যমুনাতে স্নান করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় পথিমধ্যে একটি মূল্যবান রত্ন দেখিতে পাইয়া ভাবিলেন, কোন দীন দুঃখীকে ইহা দান করিবেন। কিন্তু ধন রত্ন স্পর্শ করা সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ, এই জন্য উহা একখানি খাপরাতে উঠাইয়া লইয়া কোন স্থানে মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়া দিলেন। বর্দ্ধমান প্রদেশস্থ মানকর গ্রামনিবাসী জীবন নামক এক ব্রাহ্মণ অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। এ ব্যক্তির অনেক পরিবার অথচ কিছুই অবলম্বন ছিল না। ব্রাহ্মণ অর্থের আকাঙ্ক্ষায় কাশীতে গিয়া বহু দিন শিবের আরাধনা করেন। শিব প্রসন্ন হইয়া স্বপ্নাবস্থায় এই আদেশ করেন, বৃন্দাবনে সনাতন নামে এক গোঁসাই আছেন, তাঁহার নিকটে গমন করিলেই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে, লোকদুর্লভ সর্ব্বদুঃখহারী বহু ধনরত্ন লাভ করিয়া দরিদ্রতা দূরীভূত হইবে। এ সংসারে কোন্ সূত্রে কি ঘটনা সঙ্ঘটিত হয় কে বলিতে পারে? ব্রাহ্মণের ভববন্ধন মোচনের সময় উপস্থিত, তাহা তিনি জানিতেও পারেন নাই, সামান্য ধনের

† "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" ১৭[illegible] শকাব্দ, ১৩২ পৃষ্ঠা।

চিন্তাতেই নিমগ্ন হইয়া আছেন, কিন্তু অচিরে তিনি যে পরম ধন প্রাণারাম ভগবানকে হৃদয়ে লাভ করিয়া ভব-যন্ত্রণা হইতে চিরদিনের মত মুক্তিলাভ করিবেন, তাহা কোন দিন স্বপ্নেও ভাবেন নাই। বিধাতা যখন দুঃখী জনের প্রতি দয়া করেন, তখন কাচ অন্বেষণ করিতে দিব্যরত্ন মিলাইয়া দেন, গরল প্রার্থনা করিলে অমৃত দান করেন। ব্রাহ্মণ সনাতনের আশ্রমে সমাগত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, এবং আনন্দাবেশে করযোড়ে রহিলেন। সনাতনও ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া মিষ্ট বাক্যে বলিলেন, "ঠাকুর মহাশয়, তুমি কে ? এবং কি জন্যই বা এখানে আসিয়া আমার প্রতি কৃপা করিলে ?" সনাতনের নম্রতাপূর্ণ প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া বিপ্রের চিত্ত চমৎকৃত ও দ্রবীভূত হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ সকল কথা সনাতনকে বিজ্ঞাপিত করিলে, সনাতন বলিলেন, আমি ভিক্ষাজীবী, কোথায় অর্থ পাইব ?" শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল, নিরাশ হৃদয়ে নানাপ্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের কাতরতা দেখিয়া সনাতন আকাশ পাতাল ভাবিয়া আকুল হইলেন। এমন সময়ে দৈবাৎ মণির বৃত্তান্ত মনে পড়িয়া গেল। ব্রাহ্মণকে আশ্বাসিত ও শান্ত করিয়া বলিলেন, "ঠাকুর, আমার স্মরণ ছিল না, মহাদেব মিথ্যা বলেন নাই, বহুমূল্য মণি লইবে, আমার সঙ্গে চল দেখাইয়া দিই।" সনাতন ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া যমুনাতীরে গেলেন, এবং বামহস্তের তর্জ্জণী হেলাইয়া বলিলেন, "এইস্থানে মৃত্তিকা খুঁড়িয়া দেখ।" ব্রাহ্মণ মৃত্তিকা খনন করিয়া মণি না পাইয়া সনাতনকে বলিলেন, "তুমি উঠাইয়া দাও।" তিনি বলিলেন, আমি স্নান করিয়াছি স্পর্শ করিব না। পুনর্ব্বার খুঁজিতে খুঁজিতে ব্রাহ্মণ মণি পাইলেন এবং গোঁসাইকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

পথে যাইতে যাইতে জীবন মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিল, গোঁসাই এমন মূল্যবান রত্ন কেন আমাকে দিলেন, ইহা রাখা কি স্পর্শ করা দূরে থাকুক, একবার চাহিয়াও দেখিলেন না, আর আমি ইহারই জন্য ব্যাকুল হইয়া ঈশ্বরের আরাধনা করিলাম, এইত আমার চরিত্র ! ছি ! ছি ! আমার এই ঘৃণিত জীবনে শত ধিক্ ! আর এই রত্নকেও ধিক্ ! এই অসার বস্তু দূরে পরিত্যাগ করিয়া আমি তাঁহার চরণে শরণ লইব, তিনি যে ধন পাইয়া মজিয়া আছেন, আমি তাহাই লইব, বিনা মূল্যে আমি তাঁহার পদে বিক্রীত হইব। দরিদ্র ব্রাহ্মণ এইরূপ ভাবিয়া ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া বটেশ্বর গ্রাম হইতে ফিরিয়া গেলেন, এবং সনাতনের পদতলে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "এই তুচ্ছ মণি মুক্তাতে আমার আর প্রয়োজন নাই, কৃপা করিয়া আমাকে চরণে স্থান দিয়া কৃষ্ণপ্রেমধন দান করিয়া কৃতার্থ কর।" গোঁসাই বলিলেন, "তুমি তাহা পাইবে না, গৃহে গিয়া শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা কর, সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবে।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি গৃহে যাইব না, তোমার চরণই একমাত্র আমার ভরসা, কৃপা করিয়া মূঢ় জনকে আশ্রয় দাও।" সনাতন বলিলেন, "যদি মণি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হও, তবে হরিধন পাইবার যোগ্য হইতে পারিবে।" এই কথা বলিবা মাত্র ব্রাহ্মণ মণি যমুনা মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। তাহা দেখিয়া সনাতন মহা আনন্দিত হইয়া ব্রাহ্মণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, এবং

বিস্তর প্রশংসা করিয়া কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। ধন্য সনাতন! তুমিই প্রকৃত স্পর্শমণি,তোমার সাধু জীবনের স্পর্শ মাত্রে ব্রাহ্মণের ক্ষণস্থায়ী পার্থিব ধনের পিপাসা মিটিয়া গেল। তদবধি এই ব্রাহ্মণের বংশধরেরা গোস্বামী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন এবং তাঁহারা মানকর পরিত্যাগ করিয়া কাঠমাড়গাঁ গ্রামে অদ্যাপি বাস করিতেছেন।

রূপ সনাতন বিবিধ শাস্ত্রে যদিও প্রবীণ পণ্ডিত ছিলেন, তথাপি নিরভিমান নির্ম্মৎসর হইয়া আপনাদিগকে অতি অকিঞ্চন জ্ঞান করিতেন। যাঁহারা পৃথিবীর মান সম্ভ্রম ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ভোগৈশ্বর্য্য তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছেন, প্রাকৃত জনোচিত গর্ব্ব অভিমান তাঁহাদের স্বর্গীয় হৃদয়ে কি প্রকারে স্থান পাইবে? একদা একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পাণ্ডিত্যাভিমানে স্ফীত হইয়া রূপ সনাতনকে বিচার-যুদ্ধে আহ্বান করেন। হরিপ্রেমে প্রেমিক নিরহঙ্কার রূপ সনাতন বিনা বিচারে পরাজয় স্বীকার করিয়া পণ্ডিতকে জয়পত্র লিখিয়া দিলেন। এই সময়ে জীব গোস্বামী যমুনাতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত জীবকে জয় করিতে অভিলাষ করিয়া হস্তী অশ্ব প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া মহাসমারোহে যমুনাতীরে উপস্থিত হইলেন, এবং জীবকে বলিলেন, রূপ সনাতন বিচারের ভয়ে আমাকে জয়পত্র লিখিয়া দিয়াছেন, তুমি হয় বিচার কর, নতুবা জয়পত্র লিখিয়া দাও। জীব ইহা শুনিয়া চিন্তা করিয়া দেখিলেন, এ ব্যক্তি রূপসনাতনের মহিমা কিছুই জানে না, পণ্ডিতাভিমানী হইয়া তাঁহাদিগকে পরাভব করিয়াছি মনে করিয়া গর্ব্ব করিতেছে, এই গর্ব্ব খর্ব্ব করা আবশ্যক। এই ভাবিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন, বিনা শাস্ত্রপ্রসঙ্গে তুমি তাঁহাদিগকে কিপ্রকারে পরাভূত করিলে? যাহউক, আমি তাঁহাদের এক জন ক্ষুদ্র শিষ্য, আমাকে পরাভব কর, দেখি তোমার কেমন পাণ্ডিত্য। এই বলিয়া জীব শাস্ত্রবিচারে দিগ্বিজয়ীকে পরাস্ত করিয়া তাহার দর্প চূর্ণ করিলেন। রূপ গোস্বামী এই বিচারের কথা শুনিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন, এবং জীবকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, তুমি জয় পরাজয় মান অপমান ত্যাগ করিয়া বৈরাগী হইয়াছ, তবে কেন পরাজয় করিতে ইচ্ছা করিলে। আপনি পরাভব স্বীকার করিয়া অমানী হইয়া দীনতার সহিত কেন তাহাকে মান ও জয়দান করিলে না? জীব বলিলেন, গুরুনিন্দা অসহ্য এই জন্য বিচার করিয়াছি। জীব গোস্বামীর অভিমান নাই, রূপ তাহা জানিতেন, তথাপি লোকশিক্ষার উদ্দেশে শাসন করিবার জন্য বলিলেন, "অদ্য হইতে আমি আর তোমার মুখাবলোকন করিব না।" গুরুদেবের এই বাক্য বজ্রের ন্যায় জীবের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল, কাতর হৃদয়ে অনেক স্তুতি মিনতি করিলেন, কিন্তু তাহাতে রূপ প্রসন্ন হইলেন না। অবশেষে অন্ন জল পরিত্যাগ করিয়া যমুনাতটে নির্জ্জন স্থানে থাকিয়া গুরু-পদধ্যানে নিযুক্ত হইলেন, গুরু-বিরহ-শোকে দুই নয়নে অবিরল জলধারা বহিতে লাগিল। কৃচ্ছ্র সাধ্য তপস্যাতে শরীর ক্রমে শীর্ণ হইয়া আসিল। সনাতন জীবের এরূপ কষ্টকর অবস্থা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন এবং রূপের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যতপ্রকার সদাচার আছে, তন্মধ্যে সকলের ইষ্টজনক শ্রেষ্ঠ সদাচার কি? রূপ বলিলেন, প্রভু,

আমার বিবেচনায় জীবে দয়াই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সদাচার। সনাতন বলিলেন, তবে কেন তাহা হয় না? তখন রূপ এই বাক্যের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া জীবকে আহ্বান করিলেন, এবং স্নেহসহকারে ছলছল নয়নে আলিঙ্গন করিয়া পুনর্গ্রহণ করিলেন। জীবও গুরুপদে শত শত প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

রূপ বৃন্দাবনে আগমন করার পর অতি কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। কোন দিন অনাহারে কাটাইয়া দিতেন, কোন দিন সামান্য দুগ্ধপান করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। সনাতন ইহা অবগত হইয়া এক দিন অনুযোগ কয়িয়া রূপকে বলিলেন, তুমি অনশন থাকিয়া কৃষ্ণকে কেন দুঃখ দাও, মাধুকরী ভিক্ষা দ্বারা উদর পূর্ণ কর। তদনুসারে রূপ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন। প্রথমতঃ রূপ নিজে রন্ধন পূর্ব্বক ভোজন করিতেন, পরে সনাতনের আদেশে স্বপাক ভোজন পরিত্যাগ করেন।

তৎকালে মহানুভব আকবর সা দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। তিনি সনাতনের মহত্ত্ব ও সাধুতার বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার দর্শন প্রত্যাশায় বৃন্দাবনে আইসেন। বিরক্ত বৈরাগী সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজদর্শন অবৈধ জ্ঞান করিয়া প্রথমতঃ সনাতন আকবরের সহিত কথা কহেন নাই। পরে আকবর সাকে ঈশ্বর-পরায়ণ ভক্ত জানিয়া সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক আলাপ করেন। সনাতনের কোন আকাঙ্ক্ষা থাকিলে তাহা পূরণ করিবেন আকবরের এই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু নিঃসঙ্গ বীতস্পৃহ ভগবৎপ্রেমিক বৈরাগীর কামনা পূর্ণ করা সম্রাটের সাধ্যায়ত্ত নয়। ভগবৎচিন্তাতে হৃদয়মনকে নিমগ্ন করিয়া সাধুরা যে নির্ম্মল শান্তি ও শাশ্বত সান্দ্রানন্দ সম্ভোগ করেন, তাহা পৃথিবীর অতীত বস্তু। ভক্তের হৃদয় যে পিপাসায় পিপাসিত পৃথিবীর পঙ্কিল বারিতে তাহা নিবারিত হইবার নহে। জল স্থল অন্তরীক্ষ বিশ্বচরাচরের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা ও পালয়িতা প্রেমময় পরম পিতাকে হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সাধক ভক্ত ঊর্দ্ধে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্র-খচিত অনন্ত নীলাকাশ এবং নিম্নে সসাগরা সকাননা কুসুমকুন্তলা ধরণী এই বিপুল বিশ্বসৃষ্টিতেও আপনার মানস-পটে প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বরের অনন্ত সৌন্দর্য্য ও অনির্ব্বচনীয় মহিমা এবং দীপ্যমান মঙ্গলভাব অবলোকন করত যে সুগভীর আনন্দার্ণবে আপনাকে নিমজ্জিত করেন, তাহার সহিত পার্থিব কোন্ আনন্দের তুলনা হইতে পারে? কোন আর্য্য ঋষি বলিয়াছেন,

> "নিস্তরঙ্গোঽতিগম্ভীরঃ সান্দ্রানন্দসুধার্ণবঃ।
> মাধুর্য্যৈকরসাধার একএবাস্তি সর্ব্বতঃ॥"

ঈশ্বর নিস্তরঙ্গ অতি গম্ভীর নিবিড় আনন্দ-স্বরূপ সুধার সমুদ্র এবং মাধুর্য্য রসের একমাত্র আধার। যাঁহারা সেই সুধাসমুদ্রে অবগাহন করিয়াছেন, এবং সেই প্রগাঢ় মাধুর্য্য রসের বিন্দুমাত্রও আস্বাদন করিয়া আপ্তকাম হইয়াছেন, তাঁহাদের আর কোন্ কামনা অবশিষ্ট ও অপূর্ণ আছে যে, তাঁহারা ইতর জনের ন্যায় রাজপ্রসাদের জন্য লালায়িত হইবেন। ফ্রান্স দেশীয় কোন ধর্ম্মপরায়ণ মহৎ ব্যক্তি জনকোলাহলময় নগর পরিত্যাগ করিয়া শান্তিময় বিজন পল্লীতে বাস করিতেন। সম্রাট লুই ফিলিপ তাঁহার ধার্ম্মিকতাতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সেই সাধু পুরুষ বলিয়াছিলেন, আমি রাজপ্রাসাদে গমন করিলে হতবুদ্ধি ও অপ্রস্তুত হইয়া যাইব, আর রাজা

আমার কুটীরে আসিলে কষ্ট অনুভব করিবেন, অতএব যিনি যেখানে আছেন, তিনি সেই স্থানেই থাকুন, ইহাই সৎ পরামর্শ। দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার কোন সময়ে গ্রীকদেশীয় সন্ন্যাসী দায়োজিনিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়া রাজগর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি আমার নিকটে কি প্রার্থনা কর?" দায়োজিনিস তখন রৌদ্র সেবন করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, তোমার নিকটে আমার কিছুই প্রার্থনা নাই, তুমি মৎসমীপে দণ্ডায়মান থাকাতে আমার রৌদ্র পোহাইবার ব্যাঘাত হইতেছে, অতএব তুমি সরিয়া দাঁড়াও, যাহা তুমি দিতে পার না, তাহা হইতে বঞ্চিত করিও না। আরব দেশের কোন মুসলমান তপস্বীর আশ্রমে সেই দেশের বাদসাহ সমাগত হইয়া তপস্বীকে বলিয়াছিলেন, আপনি আমার কাছে কি প্রার্থনা করেন? তৎশ্রবণে সাধু তপস্বী গম্ভীর স্বরে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, "তোমার নিকটে আমার আর কোন কামনা নাই, কেবল এই প্রার্থনা, তুমি আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও এবং আর কখনও আসিও না।" আমাদের ভক্ত সনাতনও আকবরকে বলিয়াছিলেন আমার কিছুই আকাঙ্ক্ষা নাই। শেষে সম্রাট নির্ব্বন্ধ সহকারে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করাতে সনাতন বলেন, যদি একান্তই আমাদের উপকার করিতে আপনার বাসনা হয়, তবে আমাদের আশ্রমের যে অল্পস্থান টুকু যমুনার স্রোতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহা বান্ধাইয়া দিন। সনাতনের নিস্পৃহ শান্ত বৈরাগ্য প্রভাব, জ্বলন্ত ঈশ্বরপ্রেমিকতা ও অসাধারণ মহত্ত্ব সন্দর্শন করিয়া আকবরের গর্ব্ব অভিমান দূর হইয়া গেল। বিনয়াবনম্র হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন, "যিনি ত্রিজগতের নাথ পরম দুর্লভ ও দুরারাধ্য, তিনি তোমার হৃদয়ধামে সদা বিরাজমান, তুমি সেই দেবদুর্লভ মহাধনে পরমধনী হইয়াছ, আমি তোমার কোন্ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিব, আমার রাজত্বের গৌরব বৃথা অভিমান মাত্র।"

যে অনন্য মহত্ত্ব, অলৌকিক ত্যাগস্বীকার, [illegible] হৃদয়ের মহানুভাবতা এবং পরমেশ্বরে অবিচলিত প্রেমানুরাগের আত্মবিলয়কারিণী শক্তিতে মানুষ ইতিহাসে বরণীয় হইয়া থাকেন, রূপ সনাতনের চরিত্রে তৎসমুদায় প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। তাঁহারা যেন জ্ঞানভক্তি বৈরাগ্য ভগবৎসেবার জীবন্ত প্রতিকৃতি স্বরূপ ছিলেন। পার্থিব ভোগবাসনা তুচ্ছ করিয়া কি প্রকারে পরমেশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে হয়, ধন মান পদমর্য্যাদা বিদ্যা বুদ্ধিতে মহাগৌরবান্বিত হইয়া কিরূপে প্রেমিক ভক্ত জিতেন্দ্রিয় পরোপকারী নিরভিমান অহঙ্কারশূন্য সাধু বৈরাগী হইতে হয়, রূপ সনাতন সর্ব্বত্যাগী কন্থা-করঙ্গ-ধারী তরুতলবাসী হইয়া তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। ধন মান বিদ্যা সকলই তাঁহারা পরমেশ্বরের সেবাতে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাবৎ জ্বলন্ত বৈরাগ্য ও স্বর্গীয় জীবনোদ্গত তপস্যার পুণ্যাগ্নিতে শত শত ব্যক্তির ঘোর সংসারাসক্তি ও ইন্দ্রিয়তৃষ্ণা দগ্ধীভূত হইয়া গিয়াছে। সাধুদিগের কারুণ্যপূর্ণ সুপ্রশান্ত পুণ্য-বারি-বিধৌত মুখমণ্ডলে যে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় মাধুরী সমুদ্ভাসিত হয়, তাহার সংস্পর্শ মাত্রে সংকীর্ণচেতা সংসার-সর্ব্বস্ব ইন্দ্রিয়-সুখ-নিরত সহস্র সহস্র ব্যক্তির মোহ-যবনিকা মুহূর্ত্ত মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়। জরা ব্যাধি শোক তাপে সন্তপ্ত, বিবিধ দুর্নীতি ও

পাপভারে আক্রান্ত, সংসারামোদে আসক্তচিত্ত নরনারীর মোহাচ্ছন্ন হৃদয়ে ধর্ম্মের বিমল আলোক প্রতিভাসিত করাই ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষদিগের জীবনের উদ্দেশ্য। এই সময়ে রূপ সনাতন প্রভৃতি সর্ব্বত্যাগী উদাসীন ভক্ত বৈষ্ণবদিগের সাধু দৃষ্টান্তে ও তাঁহাদের মুখারবিন্দ-বিগলিত ভক্তি-রসামৃত-সিঞ্চিত উপদেশ রচনাবলী শ্রবণ করিয়া কত কত ধনী সন্তান পরমার্থ রসপানে প্রমত্ত হইয়া সংসার-সুখ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পথের ভিখারী হইয়াছিলেন। যে কেহ ইহাঁদের পবিত্র সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারাই নবজীবন লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

যখন বঙ্গীয় জনসমাজ ভক্তি শ্রদ্ধা বিশ্বাস নির্ভরশীলতা প্রভৃতি সুকোমল হৃদয়-ভাবকে বিস্মৃত হইয়া কেবল শুষ্ক কর্ম্ম-বন্ধনে জড়িত ছিল, সেই সময়ে ইহাঁরা শুদ্ধভক্তিরূপ অমৃত ফলের আস্বাদন করত পরবর্ত্তী লোকদিগের জন্য গ্রন্থাকারে তাহা দান করিয়া গিয়াছেন। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা যে সকল অমূল্য সত্য প্রাণময় বাক্যে প্রচার ও জীবনে পরিণত করত নীরসচিত্ত লোকদিগের হৃদয় সুমধুর ভক্তিরসে আপ্লাবিত করিয়া মধুময় হরিনাম সংকীর্ত্তনের জয়ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, অতীতের অন্ধকার ও কালের আবরণ ভেদ করিয়া আজও তাহা সুদূরাগত বংশীধ্বনির ন্যায় মর্ম্মস্থলে স্পৃষ্ট হইয়া আমাদের কঠোর চিত্তকে উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে। কালের পরিবর্ত্তনে দেশের দুর্ভাগ্য বশত যদিও আমাদের দেশের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অতিশয় হীনদশা উপস্থিত হইয়াছে, যদিও তাহারা নির্ম্মল জ্ঞানালোচনার অভাববশত নানাপ্রকার কুসংস্কার অন্ধতা ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের আশ্রয়-ভূমি হইয়াছে, তথাপি পূর্ব্বতন বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের অকপট সরলতা নির্ম্মলপ্রেম-পূর্ণ জীবন ও বৈষ্ণব শাস্ত্রের প্রেমভক্তি-রসের মধুময় উপদেশ, বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্ম-ভাব ও বিশুদ্ধ ভক্তিনিষ্ঠাকে অধুনাতন নানাবিধ অসাত্বিকতা ও ভ্রষ্টাচারের মধ্যেও কিয়ৎপরিমাণে সরস ও সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। অদ্যাপি এই সম্প্রদায়ে যে পরিমাণ অহৈতুকী হরিভক্তি, আচারনিষ্ঠা হরিনাম শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে অনুরাগ ও হৃদয়মুগ্ধকর বিনয় বৈরাগ্য দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যত্র তাহা অতি দুর্লভ।

রূপ সনাতনের প্রাকৃত জীবন সম্বন্ধে অধিক কিছু জানিবার উপায় নাই। বৈষ্ণব গ্রন্থকর্ত্তারা তাঁহাদের আধ্যাত্মিক জীবনের ইতিহাসই বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়াছেন। রূপ ও সনাতনের বিবাহ ও সন্তানাদি সম্বন্ধে আমরা আজিও কোনরূপ সুনিশ্চিত প্রমাণ প্রাপ্ত হই নাই। বোধ হয় একমাত্র ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামীই তাঁহাদের অতুল ধনৈশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী ছিলেন। কিন্তু তিনিও নশ্বর ধনের মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছিলেন। রূপ গোস্বামী রাজকার্য্য পরিত্যাগ করণানন্তর স্বীয় বাসভূমিতে গমন করিয়া ধনসম্পত্তি আত্মীয় কুটুম্বগণকে ও সৎকার্য্যের উদ্দেশে দান করিয়াছিলেন, "চৈতন্য চরিতামৃতে" ইহা লিখিত আছে, কিন্তু কোথায় তাঁহাদের বাসস্থান ছিল, বৈষ্ণধর্ম্ম অবলম্বন করার পর তাঁহাদের স্ত্রী পরিবারগণই বা কোথায় গেলেন, ইত্যাদি বিষয় উক্ত গ্রন্থ-কর্ত্তা কিছুমাত্র লিপিবদ্ধ করেন নাই। উক্ত গ্রন্থে তাঁহাদের জন্মবিবরণাদিরও কোন উল্লেখ নাই, তবে অস্পৃশ্য পতিত নীচ জাতি বলিয়া তাঁহারা যে আপনা-

দিগকে পরিচিত করিতেন, ইহা ঐ গ্রন্থ পাঠে জানা যায়। বোধ হয় এই কারণেই অনেকে রূপ সনাতনের মুসলমান-কুলে জন্ম সম্বন্ধে সন্দেহ করিয়া থাকেন। কিন্তু "চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক," "ভক্তি-রত্নাকর," "লঘুতোষণী" এবং "বৈষ্ণব তোষণী" প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ভরদ্বাজগোত্রসম্ভূত যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণবংশে কর্ণাটরাজ সর্ব্বজ্ঞ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বীয় পুত্র অনিরুদ্ধকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া পরলোক গমন করেন। অনিরুদ্ধের দুই স্ত্রীর গর্ভে রূপেশ্বর ও হরিহর নামে দুই পুত্র হয়। রূপেশ্বর শাস্ত্রবিদ্যায় ও হরিহর শস্ত্রবিদ্যায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বর কনিষ্ঠ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া, মাতা ও স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া পৌরস্ত্যদেশে শিখরভূমির রাজার অধিকারে আসিয়া বাস করেন। সেইস্থানে তাঁহার এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। পুত্রের নাম পদ্মনাভ। পদ্মনাভ গঙ্গাবাস করিবার অভিপ্রায়ে গঙ্গা-তীরবর্ত্তী নবহট্ট (নৈহাটী) গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। ইনি জগন্নাথমূর্ত্তির উপাসক ছিলেন এবং যাগযজ্ঞ ধর্ম্মোৎসবাদিতে পরমানন্দে কালযাপন করিতেন। পদ্মনাভের আঠারটি কন্যা ও পাঁচটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। পুত্রগণের নাম পুরুষোত্তম, জগন্নাথ, নারায়ণ মুরারি ও মুকুন্দ। সর্ব্বকনিষ্ঠ মুকুন্দের পুত্র কুমার। কুমার পরম ধার্ম্মিক শুদ্ধাচারী ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। কথিত আছে, যদি কখন দৈবাৎ যবন দর্শন করিতেন, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া সেদিন আর অন্নজল গ্রহণ করিতেন না। ইনি অতিশয় নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং জ্ঞাতিবর্গের অন্যায় ব্যবহারে উদ্বিগ্ন হইয়া নবহট্টের বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্ববঙ্গের বাকলাচন্দ্রদ্বীপে (আধুনিক বাকরগঞ্জ) গিয়া বাস করেন। যাতায়াতের সুবিধার নিমিত্ত যশোহরের অন্তর্গত ফতোয়াবাদ নামক গ্রামে দ্বিতীয় বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। কুমার দেবের অনেকগুলি সন্তান হইয়াছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ সনাতন, মধ্যম রূপ কনিষ্ঠ বল্লভ বা অনুপম বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। রূপ ও সনাতন বাল্যকালেই নানা বিদ্যাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহোদর বিদ্যাবাচস্পতির নিকটে সনাতন গোস্বামী যথানিয়মে শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবতোষণী ও দশম টিপ্পনী গ্রন্থে সনাতন স্বীয় গুরুর উল্লেখ করিয়াছেন। রূপ সনাতনের বৈষয়িক বুদ্ধিও বিশেষ প্রখরা ছিল, বঙ্গেশ্বর গৌড়াধিপতি হুসেন সাহা তাঁহাদের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া সনাতনকে সচিবের পদে ও রূপকে প্রধানতম রাজকার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে ইহাঁরা রাজকার্য্যোপলক্ষে গৌড় রাজধানীতে আসিয়া তৎসন্নিহিত রামকেলি গ্রামে বাস করিয়াছিলেন।

রূপ সনাতনের পার্থিব জীবন বৃন্দাবন ধামেই নিঃশেষিত হয়। চৈতন্যদেবের অন্তর্দ্ধানের ঠিক কত দিন পরে রূপ ও সনাতনের পরলোকপ্রাপ্তি হয়, তাহা আজিও অসংশয়িত রূপে প্রতিপাদিত হয় নাই। মহানুভব কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" গ্রন্থ রচনা ১৫৩৭ শকে * সম্পূর্ণ হয়, তৎকালে কেবল জীব গোস্বামী মাত্রই জীবিত ছিলেন।

---

* "শাকে সিন্ধগ্নি বাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যাহেঽসিত পঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥"

প্রায় চারি শত বৎসর অতীত হইল রূপ সনাতন এই জরা-মরণ-পাপ-তাপ সঙ্কুল মর্ত্ত্যভূমি অতিক্রম করিয়া অমরধামে যাত্রা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মহৎ জীবনের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সকল আজও শত শত ব্যক্তির জীবনকে ধর্ম্মপথে পরিচালিত করিতেছে, শত শত ভোগ বিলাসপরায়ণ ধর্ম্মহীন মানবের প্রাণে বৈরাগ্য ও ভগবৎপ্রেম উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতেছে। তাঁহাদের পবিত্র নাম উচ্চারিত হইবামাত্র হৃদয় ইতর সুখেচ্ছা বিস্মৃত হয় এবং বৈরাগ্য ও ভগবৎপ্রেমরসে অভিষিক্ত হইয়া উঠে। পুণ্যপাপদর্শী প্রেমময় পরমেশ্বরের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করিয়া এই পুণ্যশ্লোক সাধু ভ্রাতৃদ্বয়ের পুণ্যকাহিনী আমরা এই স্থানেই উপসংহৃত করিলাম।*

আলস্য।

আলস্য আমাদের দূষিত বিলাসের একটী অঙ্গ। ইহা আমাদিগের নিজদোষে উৎপন্ন হয়। পাপাচারজনিত ক্লান্তি—হতাশ—শিথিলতা হইতে ইহার জন্ম। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে পরিশুদ্ধ থাকিবার চেষ্টা করেন, আলস্য তাঁহাদের ত্রিসীমায় স্থান পায় না। আলস্য জীবনের মলিন শিথিল আবেশ; ইহার অধীন হইলে এমন উৎকৃষ্ট মানবজন্ম কি কুৎসিত নরক সমান হয়! সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ইহার স্পর্শে নীরস নিষ্প্রভ হইয়া যায়,—জাগ্রত হইতে পায় না। প্রাণহীন চেতনায় আলস্য সমুদয় আলিঙ্গন করে। ইহার বশীভূত জন সেই আলিঙ্গন-জনিত মধুর মোহে বিভোর হইয়া থাকেন, জগতের বিশুদ্ধ গভীর স্থির সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন না। ইহা উপলব্ধি করিতে গেলে আমাদের অন্তরে রীতিমত ধীরভাবের প্রতিষ্ঠা চাই, কিন্তু অলস জনে তাহা নাই; তিনি বাহিরে দেখিতে ধীর, বাস্তবিক তিনি একজন চঞ্চলধর্ম্মী; তিনি অল্প কোলাহলেই অন্তরে অন্তরে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠেন, সংসারের গুরুভার নীরবে বহন করা তাহার পক্ষে দুরূহ ব্যাপার। সংসারের গুরুভার বহিতে গেলে সদা-সর্ব্বদা ধৈর্য্যোন্মুখ হইয়া থাকা আবশ্যক; আলস্য লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা ঘোর বিড়ম্বনা। আলস্য ধৈর্য্যের ভাণ, ভণ্ড ধৈর্য্য। আলস্য ও ধৈর্য্য, উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ বিদ্যমান। ধৈর্য্য বাহিরে দেখিতে নীরব, যেন অলসমূর্ত্তি, কিন্তু ভিতরে তাহার কঠিন শ্রমসহ ভাব, ভিতরে তাহার কার্য্যের স্রোত অনবরত অদৃশ্যভাবে প্রবাহিত হয়; ইহা ধরণী সদৃশ; ধরণীর ন্যায় ইহা ধারণগুণযুক্ত—কার্য্যকরী; ধরণী যেমন স্থাবর জঙ্গম পদার্থসমূহকে বক্ষে ধারণ করিয়া, এবং স্বীয় কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক, সূর্য্যের চারিধারে পুনরায় নীরবে অদৃশ্যভাবে প্রদক্ষিণ করিয়া আসে, সেইরূপ ধৈর্য্য ও দুঃখ শোক সন্তাপকে বক্ষে ধারণ করিয়া আপনার চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক বিষয়ের কোলাহলময় সংসারের চারিধার পর্য্যবেক্ষণ করিতে সমর্থ। ধৈর্য্যের এইরূপ

---

* অশুদ্ধ-শোধন।

বিগত ভাদ্র মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৮২ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ১ম পংক্তির "লীলা" এই শব্দের পর 'ও দ্বারকা লীলা' এই টুকু সংযোজিত হইবে। এবং ৮৩ পৃষ্ঠার টীকার ২য় স্তম্ভের ২য় পংক্তির 'ব্রহ্মধামে' এই শব্দের পরিবর্ত্তে 'ব্রজধামে' হইবে ও ১০ম পংক্তির 'ব্রহ্মলীলা' এই শব্দের পরিবর্ত্তে 'ব্রজলীলা' হইবে।

বল, কিন্তু আলস্যের এ বল নাই। সম্মুখে দেখিতে উভয়েই স্থৈর্য্যগুণবিশিষ্ট। আলস্যও বিপদাপদে নড়িতে চায় না, ধৈর্য্যও বিপদাপদে নড়িতে চায় না; দুইই যেন এক কিন্তু একবার পরীক্ষা করিলেই তাহাদের গুণাগুণ ধরা পড়ে। উভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা কিরূপ, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। আলস্যের ভিতরে পদার্থ নাই, ধৈর্য্যের মধ্যে পদার্থ আছে। আলস্য যেন এই সাধারণ বায়ু। এই সাধারণ আর অম্লজান বায়ু যদি দুইটী পৃথকভাবে পৃথক পৃথক স্বচ্ছ আধারে রক্ষিত হয় তাহা হইলে বাহির হইতে আধারদ্বয় শূন্যবৎ দেখাইবে, যেন তাহারা দুই একই পদার্থ, কিন্তু পরীক্ষিত হইলেই সে ভুল ভাঙ্গিয়া যায়। অম্লজানের আধারে যদি একটা অনলতাপলোহিত দীপশলাকা প্রবেশ করান যায় তাহা হইলে তাহা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে, কিন্তু সাধারণ বায়ুর আধারে প্রবেশ করাইলে কোন ফলই হয় না। তাই, আমরা দেখিতে পাইতেছি ধৈর্য্যের মধ্যে কিরূপ শক্তি বিদ্যমান; বাহিরের প্রতাপের সংঘর্ষে আসিলেই তাহার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ধৈর্য্যের অন্তরে অন্তরে শক্তি প্রবাহিত হয়, তাহা অন্তঃশক্তি সফল কিন্তু আলস্য শক্তিহীন নিষ্ফল। এই শক্তিহীন নিষ্ফল আলস্যকে আমাদের সর্ব্বতোভাবে দূর করা উচিত, তাহা হইলেই আমাদিগের শ্রেয়। আলস্য যাঁহারা না পরিহার করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহাদের অন্তঃকরণ সততই জর্জর কম্পিত, তাঁহারা লোকসমাজে অজ্ঞানাবৃত হইয়া জীবন্মৃতবৎ পড়িয়া থাকেন। তাঁহাদের দেখিয়া, নয়নসমক্ষে ক্ষীণজ্যোতি নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় কর্ম্মময় সংসারের অন্তরে অতৃপ্তির উদ্রেক হয়, সংক্রামক রোগের ন্যায় অন্যান্য জনের জীবনকে আক্রমণ করে, সমাজের তাহাতে ক্ষতি বই লাভ হয় না। সেই হেতু অলস হইয়া এ সংসারে থাকা অতিশয় ক্লেশদায়ক; নীরস পতিত পত্রের ন্যায় ধূলিবিলুণ্ঠিত হইয়া অলস ব্যক্তি সংসারে ঘুরিয়া বেড়ায়, কোথাও প্রকৃত আশ্রয় পায় না। এ জগতে অলস অকর্ম্মণ্যের স্থান নাই। প্রকৃতির পানে চাহিয়া দেখ, তাহার কোন কিছু অকর্ম্মণ্য অলসভাবাপন্ন হইলেই পড়িয়া যায়, তাহার স্থানে আবার নূতন শোভা জাগিয়া ওঠে; একটী পদার্থও তাহার দেখিতে পাই না, যাহা শিথিল অলসভাবে অধিক দিন বাঁচিতে পায়। প্রকৃতির মাঝে কর্ম্মের বিরাম নাই, দিবারাত কর্ম্ম চলিতেছে, তাই তাহার এত শোভা! আমরা বাঙ্গালী জাতি এত হীনদশাপন্ন কেন? তাহার কারণ আমরা ভারি আলস্যপ্রিয়, শয়ন করিতে পাইলে উপবেশন করিতে চাহি না, উপবেশন করিতে পাইলে দণ্ডায়মান হইতে চাহি না। আর আজকালকার স্বাধীন উন্নত জাতিদিগের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর, দেখিতে পাইবে তাহারা একদণ্ড বসিয়া নাই, তাহাদের কর্ম্মের বিরাম নাই, তাহারা সর্ব্বদা কর্ম্মিষ্ঠ হইয়া বলিষ্ঠ হৃদয় লাভ পূর্ব্বক দিন দিন নবপ্রাণে অনুপ্রাণিত হইতেছে, এবং ঈশ্বরের নব নব মহিমা আবিষ্কার পূর্ব্বক জীবন সার্থক করিয়া—উন্নতিপথের পথিক হইয়া পুনরায় অন্যান্য জাতিকে তাহাদের লব্ধ জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইতেছে। দেখ আলস্যহীন জাতির কত উদ্যম কত উৎসাহ কত আশা ভরসা, আর আলস্যপ্রিয় জাতির কত হতাশা, কত দুঃখ

শোক, কত দুর্দশা। যে অলস তাহার এ জগতে রক্ষা পাওয়া ভার, সমস্ত জড় প্রকৃতি পর্য্যন্ত যেন উপহাস-নেত্রে তাহাকে দেখে; সমস্ত প্রকৃতি একস্বরে আলস্যের প্রতিবাদ করিতে যেন প্রস্তুত। এই বিশ্বের মাঝে কিছুই অলস হইয়া বিশ্রাম লাভ করিতে পায় না, অষ্টপ্রহর কর্ম্মের পরিবর্ত্তন আবর্ত্তন চলিতেছে, আদান প্রদানের তুমুল আন্দোলন চলাচল ক্রমাগত হইতেছে; নিঃশ্বাসের সময় জীবেরা বায়ু হইতে স্বভাবতঃ অম্লজান লইয়া অঙ্গারজান পরিত্যাগ করে, উদ্ভিদেরা পুনরায়, রৌদ্রের প্রভাবে, অঙ্গারাংশ গ্রহণ-পূর্ব্বক অম্লজান ত্যাগ করে। এইরূপ সংসারে সকলই কাজে পরিপূর্ণ, সকল পদার্থই কার্য্যগতপ্রাণ হইয়া পরস্পর পরস্পরের অভাবমোচনে রত; অনাবশ্যক বলিয়া কোন পদার্থকেই অবহেলা করিতে পারি না। আবশ্যকের পর আবশ্যক প্রতিমুহূর্ত্তে নিনাদিত হইতেছে, কর্ম্মসংগ্রামে জীবগণকে অবিরাম জাগাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে, এই অবিরাম জাগরণে ক্ষুদ্র যাহা মহৎ হইয়া পড়িতেছে; মহৎ হইতে বাসনা করিলে বসিয়া থাকিলে চলিবে না, কাজের পর কাজ চাই; কাজের পর কাজ হইয়া মহৎ ব্যাপার সমূহ সম্পন্ন হয়;—এই বায়ু রাজ্যের অম্লজান ও অজান নামে দুই বায়বীয় পদার্থের পরস্পর সম্মিলনে জলীয় বাষ্প হইয়াছে, আবার সেই বাষ্প ঘনীভূত হইয়া জল হইয়াছে, পুনরায় সেই জল হইতে নদনদী সমুদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। পুনশ্চ এই নদনদীসিন্ধু-পরিব্যাপ্ত, তৃণতরুলতা ফলপুষ্পময়, নানাজীবসমুচ্চয়ে পরিপূর্ণ হইয়া এরূপ উন্নত আকার ধারণ করিতে পৃথিবীর যুগযুগান্তর গিয়াছে। এই হেতু দেখিতে পাই, আমাদের সময় বিন্দুমাত্র আলস্যে ক্ষেপণ করিলে আমাদের মহা ক্ষতি;—বিন্দুমাত্র সময় আমাদের কতখানি অবসর! কতখানি জীবন তাহাতে লাভ করা যায়। যাঁহারা বড় লোক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ফাঁকতালে বড় লোক হন নাই, অবিশ্রান্ত অনলস ভাবে কাজ করিয়া বড়লোক হইয়াছেন। রোমদেশীয় ধার্ম্মিকপ্রবর বিজ্ঞ সেন্সর কেটো একদিন অলসভাবে কাটাইবার দরুন সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। বীর নেপোলিয়ন, যিনি ইউরোপের আধুনিক অবস্থার মুখপত্রস্বরূপ, তাঁহার জীবনী পাঠ করিলে কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই, আলস্য তাঁহার চরিত্রকে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হয় নাই; তিনি যখন যুদ্ধক্ষেত্রে কার্য্য করিতেন তখন এক মুহূর্ত্তও আলস্যে অতিবাহিত করিতেন না, চিন্তিত মনে চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, পরীক্ষা অধ্যয়ন অভ্যাসে সতত মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক, সময়কে যুদ্ধের কলকৌশলে একেবারে ছাইয়া রাখিতেন, তাই তাঁহার যুদ্ধে সত্বর জয়লাভ হইত, অল্পবলে শতগুণবলকে পরাভূত করিতেন। অনালস্য তাঁহার জয়লাভের প্রধান বল স্বরূপ ছিল। তিনি অনালস্য মন্ত্রে আপনাকে আপনি দীক্ষিত করিয়াছিলেন, বিন্দুমাত্র সময় সহজে কাহাকেও দিতেন না, সময় যে অমূল্য পদার্থ তাহা তিনি বেশ বুঝিতেন, তাই তাঁহার প্রায় কথায় কথায় জয় হইত; যেখানে তাঁহার পরাজয় হইয়াছে সেখানে তাহা ঘটিয়াছে প্রায় কেবল তাঁহার অন্যান্য কর্ম্মচারীর আলস্য দোষে; আর তাঁহার সময়ের নিয়ম প্রণালী বন্দোবস্ত তাঁহার কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে কেহ যে কারণেই হউক, তেমন ধারণ

করিতে পারে নাই বলিয়া। যাহা হউক তাঁহার জীবনের জয়পরাজয়ের মধ্যে তাঁহার অনলস ধীরভাব সর্ব্বদা প্রায় জাগ্রত থাকিত, তিনি সেই ধীরভাবে সময়কে আলস্যবিহীন করিয়া স্বকার্য্যউদ্ধারে যত্নবান থাকিতেন। নেপোলিয়নের এই অনালস্য-জনিত সমরকৌশল পরে ইউরোপের প্রচলিত বিষয় হয় কথার কথা হয়; এই কৌশলে ইউরোপীয়েরা অনেক সময় নানা জাতিকে অত্যল্প বলে পরাজিত করিয়াছে; যতক্ষণ শত্রুপক্ষ তাহার অসংখ্য বলের উপর নির্ভর করিয়া মহাসুখে আলস্যে কাল অতিবাহিত করে, ততক্ষণ ইউরোপীয়েরা সময়কে নিয়মিত করিয়া যথাকালে যথা কার্য্য করে, বিন্দুমাত্র কাল আলস্যে না কাটাইবার জন্য যত্নশীল থাকে তাহাতেই তাহাদের সত্বর জয়লাভ হয়। এইরূপে দেখি, যে দিকে আলস্যহীনতা সেই দিকেই জয়; এ জগতে আলস্যের স্থান নাই। গচ্ছতি ইতি জগৎ, চলিবার মন্ত্রে জগৎ দীক্ষিত, অকর্ম্মণ্য ভাবে বসিয়া থাকিবার জন্য সে হয় নাই; তাহার মধ্যে যাহারা বাস করিবে তাহাদেরও সেইরূপ না হইলে আর নিস্তার নাই। ক্রমাগত চলিতে হইবে, ক্রমাগত পরিশ্রম করিতে হইবে। আমাদের যে বিশ্রাম তাহা কেবল শ্রমের আয়োজন মাত্র। অলস জন প্রকৃত বিশ্রাম কাহাকে বলে তাহা জানিতে পারে না। আলস্যে বিশ্রাম নাই। ইহা শুধু দেহ মনের বিকার উৎপাদন করিয়া মানবজীবন নিরর্থক করে।

THE RELIGION OF LOVE.
(INTENDED FOR ALL SECTS AND CHURCHES.)

By A Hindu.

(Continued from the last number.)

Chapter II

Of Health and its Relation to Religion.

Ill health deprives a man of cheerfulness, the sunshine of the mind, and makes it difficult for him to love God and love man. When disease makes it difficult for us to practise religion, the primary condition of a religious life is health. Ill health is a serious bar to such practice. It disables a man to concentrate his mind upon God for purposes of communion, a subject which will be treated of in the next chapter, nay upon anything in the world. Ill health also sours the temper of a man and makes him irritated at things at which any ordinary man would not be irritated. It also makes him subject to abject fears which are quite opposed to the spirit of religion, The religious man is always fearless. A writer on health very pertinently remarks; "Almost all family disputes arise from the members of it not getting up early and taking exercise. Exercise and the sun's light are next to religion the greatest peacemakers". The writer did not think that when they are the greatest peace-makers, they are a part and parcel of religion itself, and are not next to it.

2. If a pious man unfortunately happen to be a sickly man, he can conquer the moroseness, vexation, fear, anxiety and disquietude caused by ill health, by will-force and thus prevent it from becoming such a bar to the practice of Religion of Love as it otherwise would be. He not only can do this but, on the contrary, can make it a means of ennobling his nature by patience and resignation to God and communing with Him and doing good to mankind by continual exercise of will-force and thereby accomplishing more the purpose of existence which is the attainment of nobleness than healthy men can. This should afford sufficient consolation to the sickly. The continual exercise of will-force above alluded to hath a very ennobling effect upon character.

3. The conditions of health are well laid down in the following extract from the

religious scriptures of a truly civilized nation which was very well aware of the intimate connection between health on one side and religion and morality on the other ;

"Proper diet, proper amusement, proper exercise, proper work, proper sleep, proper wakefulness, constitute the woe-destroying austerity." *

There is a saying current among the said nation that "health is the root of religion, wealth, fruition of desire and eternal salvation, and also another that 'health of body is the primary condition of the exercise of religion."

4. Health is mainly promoted by temperance in eating and drinking, regard to the quality of the food taken, as adapted to the constitution of the individual, and the present state of his body, exercise in the open air, clothing adapted to the state of the weather, proper ventilation and proper supply of light, cleanliness which is next to godliness and forbearance from immoderate sexual intercourse though it be of a lawful character. One should guard the seed as the vestal virgin of old did the sacred fire, for on it depend health, cheerfulness, decision and fixity of purpose and character. The immoderation above alluded to is a characteristic of the present false civilization to be treated of hereafter. The absence of such immoderation is called *Brahmocharya* in the Hindu shastras and is highly recommended by them.

5. Among those things that constitute the woe-destroying austerity is proper diet. What is the proper diet of man, animal or vegetable, has been a question discussed by doctors from remote antiquity and has not yet been decided. When it has not been yet decided, a mixed diet should, for the present, be reckoned as the proper diet of man. But it has been observed that that mixed diet in which flesh forms the predominating element, increases the inferior propensities of man such as lust and anger, wherefore it is not suited to a religious life. That mixed diet in which vegetables and milk form the predominating element is therefore preferable to the other.

6. Cheerfulness of mind is the principal constituent of religion. There are some articles of food which promote it and others which destroy it, such as stale and indigestible food. Ah ! little do religious men in general mark the connection between diet on one hand, and morality and religion on the other.

7. Temperance in eating and drinking include abstinence from the taking of alcoholic liquors in any shape, nay indeed, from the use of any intoxicating substance whatever, tobacco included.

8. And old English poet* says that health depends on the following things:

"Great Temperance, open air,
Easy labor, little care."

The present material civilization the characteristics of which are over-work, excessive brain-labor, and an impatience which even the railway cannot satisfy, is not therefore favorable to the preservation of health.

9. For the practice of religion, *mens sana in corpore sano*, or a healthy mind in a healthy body is essentially necessary, but the present civilization is not favorable to the attainment of health of body and of mind.

10. A certain Reviewer † very ably remarks : "One of the inevitable effects of cultivation (civilization) is to make men dissatisfied with poverty and deprivation, to stimulate the demands for the comforts of life which the mass of toilers can not attain. As society advances, new wants arise, the luxury of to-day becomes a necessary of life tomorrow ; and every want, though essential to man's improvement and perfection (?) involves new victims to suicide and madness. The telegraph, the railway and the newspaper tell on the nerves of mankind and the weak break down, even the strong often perish from overwork. The struggle for life in civilized countries is becoming more and more the struggle of the intellect ; the brain is the weapon with which the fight is waged and when it breaks down, suicide often follows."

Certainly that civilization which promoteth the greatest of all crimes, suicide, is not true civilization. Material civilization. is not true civilization. Religious and moral civilization, including material civilization and controlling the same, is true civilization.

* Bhagavat Gita or the Song Celestial.

* Sir Philip Sidney.

† The Review of Reviews for May 1891

We shall consider the question of material civilization in a future chapter. It is no wonder that, in the present age of false civilization, men would appear advocating suicide.

11. A new era will dawn upon mankind when the connection of health with religion and morality will be fully recognized, when the infringement of a law of health will be deemed a crime as much as any other, when any civilization, unfavorable to the promotion of health both of body and mind, will be reckoned no civilization at all.

12. But before the violation of a law of health is deemed a crime by men in general, the laws of health, both physical and mental, should be well ascertained, and sound knowledge concerning the same, generally diffused in society.

13. The laws of health should be taught and knowledge about air, water and foods imparted in all schools as a part of religion itself.

সমালোচনা।

বুদ্ধদেব। আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে লোকান্তরস্থ ডাক্তার রামদাস সেন প্রণীত বুদ্ধদেবের জীবনী সমালোচনার্থে প্রাপ্ত হইয়াছি। রামদাস সেনের ইহাই শেষ পুস্তক। তিনি "ঐতিহাসিক রহস্য" প্রভৃতি গ্রন্থ সকল রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষ পুষ্ট করিয়াছেন, জগতকে দেখাইয়াছেন যে বঙ্গসাহিত্য প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি কঠোর আয়াসসাধ্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত নহে। কিন্তু রামদাস সেনের পরে আর কাহাকেও দেখিতে পাই না যিনি এবিষয়ে অনুসন্ধিৎসু। লোকান্তরগত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বঙ্গদেশীয়দিগের মধ্যে সাহিত্যের এই বিভাগে যদিও বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি দুঃখের বিষয় এই যে তিনি বঙ্গভাষায় তেমন কিছুই লিখিয়া যান নাই। রামদাস সেনের এই শেষ পুস্তক দেখিয়া আমাদের হৃদয় পুনর্বার শোক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ এই পুস্তক খানির ভূমিকা লিখিয়াছেন। ভূমিকাটি গ্রন্থের উপযুক্তই হইয়াছে। মূল গ্রন্থে যেমন গবেষণার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়, ভূমিকায়ও সেইরূপ গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ভূমিকাতে বেদান্তবাগীশ মহাশয় লিখিতেছেন—"এগ্রন্থ কোন ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ নহে; প্রবাদবাক্য শুনিয়াও লিখিত নহে। * * ইহা ভূরিভূরি পুরাতন বৌদ্ধগ্রন্থ পরিদর্শনের পর লিখিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে বুদ্ধের প্রকৃত বা অবিকৃত জীবন ওধর্ম্ম অবগত হওয়া যায়। সেই জন্য অন্যান্য পুস্তক অপেক্ষা এই পুস্তক আমাদের অধিক আদরের বস্তু।" প্রকৃতই আমরা ইহা পড়িয়া এই কারণে সুখী হইলাম যে ইহা বুদ্ধের অপরাপর জীবন চরিতের ন্যায় কোন বিদেশীয় লেখকের অনুকরণে লিখিত নহে। এই পুস্তক খানি পড়িতে পড়িতে গ্রন্থকারের সত্যানুসন্ধিৎসার পুনঃ পুনঃ প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

গ্রন্থের আরম্ভেই গ্রন্থকার শাক্যসিংহের জন্মকাল সম্বন্ধে দেশীয় শাস্ত্রের দিক্ হইতে সুন্দর যুক্তি সকল দেখাইয়াছেন। ইউরোপীয়গণ বলেন যে বুদ্ধ খৃষ্টজন্মের প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু রামদাস সেন রাজতরঙ্গিণী হইতে দেখাইয়াছেন যে বুদ্ধ খৃঃ পূঃ ৬৯৯ বৎসর সময়ে জীবিত ছিলেন এবং অন্যান্য শাস্ত্র হইতে দেখাইয়াছেন যে "বুদ্ধদেবকে কোনও প্রকারে খৃঃ পূঃ ৫৫০ বৎসরের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে পারা যায় না। তবে টিপ্পনীতে গ্রন্থকার বলিতেছেন যে কেহ কেহ বলেন রাজতরঙ্গিণীর এই নির্ণয় সম্যক্ শুদ্ধ না হইতেও পারে। কেন না অন্যান্য প্রমাণের সহিত নির্ণয়ের মিল হয় না এবং মুদ্রিত রাজতরঙ্গিণী পুস্তকখানি বিশেষ শুদ্ধ নহে; ইহাতে অনেক ভুল আছে। বুদ্ধদেবের জন্মকাল নির্ণয় সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিবার বিষয় বটে এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও স্বীয় স্বীয় মতের পরিপোষক যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহাও দেখা কর্ত্তব্য। গ্রন্থকার নিজেই বলিয়াছেন যে, "ইংরাজগণের এ নির্ণয় (খৃঃ পূঃ ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধের জন্ম সম্বন্ধে কিংমূলক, তাহা আমরা জানি না।" আরও দুই এক স্থানে এই জীবন চরিতের বিশেষ নূতনত্ব দেখিতেছি। বৌদ্ধ মতের যেরূপ সুন্দর সমালোচনা হইয়াছে আশা করি তাহা পাঠ করিয়া সকলেই পরিতৃপ্ত হইবেন।

প্রেমের জয়। শ্রী শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ইহাতে সংক্ষিপ্ত রূপে মুক্তিফৌজের কার্য্য বিবরণী লিখিত আছে। প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রচারকের এই পুস্তিকাখানি পাঠ করিয়া দেখা উচিত যে মুক্তিফৌজের সেনাগণ জগতে কিরূপ "প্রেমের জয়" ঘোষণা করিয়াছেন। গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি বাহির করিয়া প্রকৃত হিতৈষীর কার্য্য করিয়াছেন।

মেঘদূত। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রণীত।

পত্রপ্রেরকের প্রতি।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার গুপ্ত (মৌলবী বাজার) আমাদিগকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ভবিষ্যতে তাহার প্রত্যুত্তর দিবার ইচ্ছা রহিল।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ৫ পৌষ শনিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার পর সারস্বত আশ্রমে বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজের চতুস্ত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
সম্পাদক।
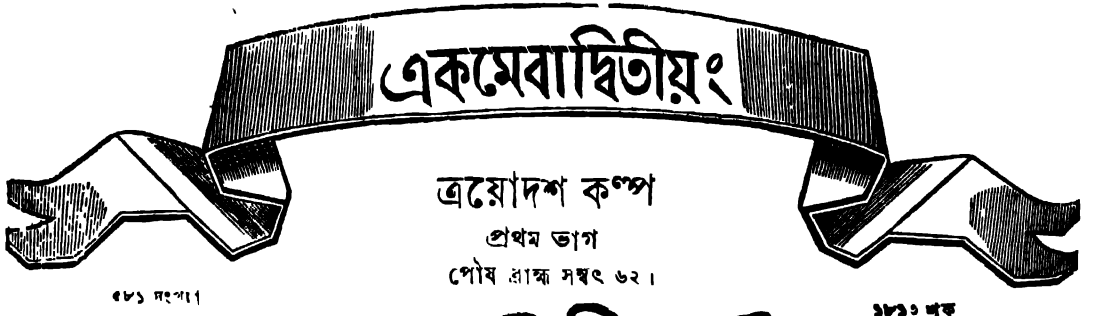
ত্রয়োদশ কল্প
প্রথম ভাগ
পৌষ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬২।

৫৮১ সংখ্যা ১৮১৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বেহালা ব্রাহ্মসমাজ।

জ্ঞান, প্রীতি, কর্ম্ম ও ধর্ম্মপথ।

(শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক পঠিত)

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত; উত্থান কর, জাগ্রত হও। আর কত দিন আমরা অজ্ঞান-অন্ধকারে নিমগ্ন থাকিব? আর কতকাল মোহনিদ্রা আমাদের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে? আমাদের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। আমরা অজ্ঞানান্ধকারের কারাগারে এতদিন পড়িয়া আছি যে, সেই কারাগার হইতে মুক্তির পথ কেহ স্পষ্ট রূপে দেখাইয়া দিলেও আমরা সে পথ অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করি না। আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমোদ আহ্লাদের এরূপ দাস হইয়া পড়িয়াছি যে, মহানের দিকে আমাদের চক্ষু ফিরিতেই চাহে না। কোথায় আমাদের পূর্ব্বতন মুনি ঋষিগণ বিত্তৈষণা, স্ত্রী-ঐষণা, পুত্রৈষণা—সমুদয় সংসারকে একদিকে পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের কঠোর সাধনার বলে পরব্রহ্মকে জানিতে পারিয়া নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন; আর আমরা কোথায় পরব্রহ্মকে একদিকে পরিত্যাগ করিয়া সংসারের ভয়কে, পদমর্য্যাদা নষ্ট হইবার ভয়কে হৃদয়ে অধিকতর স্থান প্রদান করিতে থাকি। আমাদিগকে শত ধিক্! আমরা মনে করি না যে, সেই পরমেশ্বর ভয়ানকেরও ভয়ানক "ভীষণং ভীষণানাং।" যখন তাঁহার রুদ্রমুখ দেখি, তখন কি আর কোনও প্রকার ভয় হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে? আবার যখন তাঁহার প্রসন্ন মুখ দেখিতে পাই, তখন সহস্র বাধা বিপত্তি, সহস্র দুঃখ ক্লেশ উৎপীড়ন করিতে থাকিলেও আর কিছুতেই ভয় হয় না।

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।"

সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি আর কাহা হইতেও ভয় প্রাপ্ত হন না।

আজ আমরা সুহৃদ্বর্গে এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজে সম্মিলিত হইয়াছি। চারিদিকে চাহিয়া দেখি, শারদীয় পূর্ণচন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্না স্বীয় রজত কান্তিতে সমুদয় আচ্ছন্ন করিয়া আমাদের হৃদয়েও

কেমন এক পবিত্র ভাব আনয়ন করিতেছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে সেই পূর্ণ সৌন্দর্য্যের ছায়ামাত্র দেখিতে পাইতেছি। এই এমন সুন্দর কালে এমন সুন্দর স্থানে আসিয়া কি আমরা রিক্তহস্তে ফিরিয়া যাইব? ইহাও কি কখন হইতে পারে যে, যে দয়াময় পরমেশ্বর আমাদিগকে অযাচিত ভাবে সকল প্রকার সুখ সম্পদ্ মুক্তহস্তে বিতরণ করিতেছেন; আর আজ আমরা এই ভক্ত-সমাগম-ক্ষেত্রে তাঁহাকে "হৃদয় থালভার ভক্তি পুষ্পহার" উপহার প্রদান করিতেছি, তখন তিনি কি আমাদিগকে অমৃতদান করিবেন না? তিনি অবিরলধারে আমাদের আত্মায় অমৃতবর্ষণ করিতেছেন, কিন্তু আমরা পাপ-তাপে মলিন হইয়া তাহা গ্রহণ করিতেছি না। হৃদয়কে প্রশস্ত করিলে, আত্মার দ্বার উন্মুক্ত রাখিলেই দেখিতে পাইব যে, পরমাত্মা আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে অমৃতের স্রোত নিয়তই প্রবাহিত রাখিয়াছেন। সমাজভয়েই হউক, লোকভয়েই হউক, বা যে কোন কারণেই হউক অনেকে সকল সময়ে ব্রহ্মবিষয়ে আলোচনা করিবার অবকাশ পান না; কিন্তু আজ যখন আমরা সেই ব্রহ্মের নামে এখানে সমাগত হইয়াছি, তখন যেন আর আমাদিগকে রিক্ত হস্তে ফিরিয়া যাইতে না হয়; আমরা যেন আজ অমৃতের উৎস হইতে অমৃত না লইয়া বাটীতে ফিরিয়া না যাই। আজ আমরা সকলেই উপযুক্ত মত অমৃত লইয়া হৃদয়কে পূর্ণ করিব; সেই অমৃত আমাদিগকে সমাজভয় লোক-ভয় প্রভৃতি নানাপ্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমৃতের উৎসের পথে লইয়া যাইবে।

এই অমৃতলাভ করিবার পথকে পণ্ডিতগণ দুর্গম করিয়া বলিয়াছেন "দুর্গং পথস্তৎকবয়ো বদন্তি।" তিনটী বিভিন্ন মার্গ মিলিত হইয়া এই সূক্ষ্মতম পথ প্রস্তুত হইয়াছে। সেই তিনটী মার্গ (১) জ্ঞান-মার্গ (২) প্রীতিমার্গ এবং (৩) কর্ম্মমার্গ; ——এই তিনটী পথের সঙ্গমস্থান হইতে ঈশ্বর পর্য্যন্ত ধর্ম্মের পথ এবং তাহা "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া" শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম। এখন উক্ত তিনটী মার্গের প্রত্যেকটীর বিষয় কিছু বিশেষ-রূপে আলোচনা করা যাউক।

প্রথম জ্ঞানমার্গ। যে কোন ব্যক্তিতে আমরা প্রীতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রভৃতি স্থাপন করিব, তাহার পূর্ব্বে তাঁহাকে জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য; যদি তিনি অশ্রদ্ধার পাত্র হন, প্রীতির উপযুক্ত পাত্র না হন, তবে আমার হৃদয়কে তাঁহাতে ন্যস্ত করিব না; আর যদি শ্রদ্ধা ভক্তির উপযুক্ত পাত্র হয়েন, তবে আরও উৎসাহ সহকারে তাঁহার বিষয় জানিয়া তাঁহাতে হৃদয়ের সমুদয় প্রীতি স্থাপন করিয়া চরিতার্থ হইব। ইহারি জন্য প্রথমে প্রীতির পাত্রের জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক। যদি ব্রহ্মকে প্রীতি করিতে যাই, যদি ব্রহ্মের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে প্রস্তুত হই, তবে সর্ব্ব প্রথমেই ব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই বুঝিতে পারিব যে কিরূপ কার্য্য তাঁহার প্রিয় কার্য্য। করুণাময় পরমেশ্বর আমাদেরই মঙ্গলের জন্য আমাদের হৃদয়ে তাঁহাকে জানিবার এক স্পৃহা দিয়াছেন। এই স্পৃহা চরিতার্থ করিতে গিয়া সেই ব্রহ্মাবর্ত্ত আর্য্যাবর্ত্তের মুনি ঋষিগণ স্ত্রী পুত্র, বিষয় বিভব প্রভৃতি সকল প্রকার সাংসারিক সুখের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী হইয়া কত শত বৎসরের ক-

ঠোর সাধনার বলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মসম্বন্ধে দুই প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন—এক অভাবপক্ষীয়, দ্বিতীয় ভাবপক্ষীয়। ব্রহ্মচিন্তা করিতে করিতে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে জগতে যে কিছু বস্তু ইন্দ্রিয়গোচর হইতেছে, তাহার মধ্যে, কোনটীই ব্রহ্ম নহে। তাঁহারা বলিলেন

"অথাত অাদেশো নেতি নেতি নহ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্তাথ নামধেয়ং।"

ইহা নহেন, ইহা নহেন, এইরূপই ব্রহ্মের নির্দ্দেশ; ইহা নহেন, ইহা অপেক্ষা তাঁহার অন্য উৎকৃষ্ট নির্দ্দেশ নাই।

"স এষ নেতি নেত্যাত্মা গৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে।"

ইহা নহেন, ইহা নহেন, এই প্রকার সেই এই পরমাত্মার নির্দ্দেশ; তিনি ইন্দ্রিয় ও মনের গ্রাহ্য নহেন, সুতরাং কেহ তাঁহাকে ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারে না। ইহা হইল ঋষিদিগের অভাবপক্ষীয় জ্ঞান। বর্ত্তমান কালে প্রতীচ্য ভূমির পণ্ডিতগণ ব্রহ্মের এইরূপ কতকটা অভাবপক্ষীয় * জ্ঞানলাভ করিয়াই ক্ষান্ত আছেন, কিন্তু পিতামহ ঋষিগণ কেবল মাত্র তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা অন্বেষণ করিতে করিতে, চিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্মের ভাবপক্ষীয় জ্ঞানও যথেষ্ট লাভ করিলেন। তখন তাঁহারা বলিলেন যে সেই পরমাত্মা

"সত্যস্য সত্যং প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যং।"

তিনি সত্যের সত্য; প্রাণ প্রভৃতি সত্য বটে কিন্তু তাহার মধ্যে এই পরমাত্মাই সত্যের সত্য। তাঁহারা ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া বলিলেন

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম কর্তৃক জীবিত রহে এবং প্রলয়কালে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতি গমন করে ও তাঁহাতে প্রবেশ করে। "রসোবৈ সঃ। রসংহ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" সেই পরমাত্মা রসস্বরূপ তৃপ্তিহেতু। সেই রসস্বরূপ পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়েন। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহারা আনন্দঘন ব্রহ্মেতেই আপনাদিগের সকল কামনার পরিসমাপ্তি করিলেন।

ক্রমে তাঁহারা জ্ঞানমার্গে চলিতে চলিতে জ্ঞান ও প্রীতির সঙ্গমস্থানে আসিয়া পড়িলেন। যখন তাঁহারা ভাবপক্ষীয় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেন, যখন তাঁহারা বুঝিলেন যে আমাদের এই পরমেশ্বর সখার সখা পরম সখা, মাতার মাতা পরমমাতা, পিতার পিতা পরমপিতা, তখনই তাঁহারা হৃদয়ের সমুদয় প্রীতি ভক্তি শ্রদ্ধা তাঁহারই চরণে অর্পণ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইলেন।

প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে ব্রহ্মপ্রীতি না আসিয়া থাকিতে পারে না। যখন দেখি যে, প্রচণ্ড নিদাঘের নিশাকালে সেই করুণাময় পরমেশ্বর মলয় বায়ু প্রেরণ করিয়া, পূর্ণচন্দ্রের সুশীতল সুধারসে জগত সিক্ত করিতে থাকেন; যখন দেখি যে, তিনি বর্ষাকালে প্রচুর জলবর্ষণ করিয়া কৃষকদিগের ব্যাকুলতা দূর করেন; আবার সেই তিনি আমাদিগের আত্মার ব্যাকুলতা আপনাকে দিয়াও নিরাকরণ করেন, তখন হৃদয় কি স্বতই সেই মহান্ অনন্ত পুরুষের প্রতি ধাবিত হয় না? আত্মা হইতে কি ব্রহ্ম-যশোগান স্বতই উচ্ছ্বসিত

* ইংরাজিতে যাহাকে negative knowledge বলে।

হইয়া উঠে না? ব্রহ্মপ্রীতি নিয়তই ব্রহ্মজ্ঞানের অনুগামী।

ক্রমে যখন সাধক জ্ঞানমার্গ ও প্রীতি মার্গের সন্ধিস্থল হইতে আরও উন্নত হইতে থাকেন, তখন তিনি কর্ম্মমার্গের মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়েন। যাঁহাকে আমি প্রীতি করি, যাঁহার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি আছে, তাঁহার যাহা প্রিয়কার্য্য, তাহা সম্পাদন না করিয়া আমি কি থাকিতে পারি? শুধু কি মুখে বলিলেই হয় যে, আমার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, আমি ব্রহ্মেতে প্রীতি স্থাপন করিয়াছি? প্রীতির নিদর্শন কোথায়? ব্রহ্মপ্রীতি হৃদয়ে আসিলেই আমরা দুইটী কার্য্য না করিয়া থাকিতে পারিব না – প্রথম তাঁহার অপ্রিয়কার্য্য পরিত্যাগ, দ্বিতীয় তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন। যদি তাঁহার অপ্রিয় কার্য্য সকল পরিত্যাগ না করি, তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝিলাম যে এখনও হৃদয়ে ব্রহ্ম প্রীতি আসিতেই পারে নাই। আবার যদি তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন না করি, তাহা হইলেও বুঝিলাম যে তাঁহার প্রতি প্রীতির উপযুক্ত কার্য্য করিলাম না, অতএব সর্ব্বাঙ্গীণ প্রীতি এখনও হৃদয়কে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। পরম স্নেহময় পিতার অনিমেষ নয়ন সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিয়া সন্তানগণের মঙ্গল-সাধন করিতেছেন; আমাদেরও কর্ত্তব্য যে আমরা নিরলস হইয়া তাঁহারই সংসারের মঙ্গল-সাধনের উদ্দেশে শুভ কর্ম্মে রত থাকি। আমাদিগের অলসভাবে কালযাপন করিলে চলিবে না।

জ্ঞান, প্রীতি ও কর্ম্মের ত্রিবেণী-সঙ্গম হইতে এক সরল ধর্ম্মপথ চলিয়াছে। এই ধর্ম্মপথের নেতা স্বয়ং ঈশ্বর।

"মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥"

এই মহান্ পুরুষ সকলের প্রভু। এই জ্ঞানজ্যোতিঃস্বরূপ অনন্ত ঈশ্বর সুনির্ম্মলা শান্তির উদ্দেশে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হয়েন। আমরা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া এই সরল ধর্ম্মপথ হইতে বহুদূরে পড়িয়া গিয়াছি। কিন্তু তিনি স্বীয় জ্যোতিঃস্বরূপে বিরাজমান থাকিয়া আমাদিগকে বারম্বার তাঁহারি পথে ফিরাইয়া আনিতেছেন। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার এই ধর্ম্ম-পথ ভিন্ন আর দ্বিতীয় পথ নাই। এই ধর্ম্মপথ আর কিছুই নহে, কেবল জ্ঞান, প্রীতি ও কর্ম্মের উপযুক্ত সমাবেশ। এই জ্ঞান, প্রীতি ও কর্ম্মের উপযুক্ত সমাবেশ-বিশিষ্ট ধর্ম্মকে, চাই কেবল ধর্ম্মনামেই অভিহিত কর, কিম্বা ভাগবৎধর্ম্ম নামেই অভিহিত কর কিম্বা ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়াই বল, তাহাতে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটিবে না। যে ধর্ম্মের নেতা স্বয়ং ঈশ্বর, সে ধর্ম্ম চিরকালই সত্যধর্ম্ম থাকিবে—তাহার বিনাশ নাই। দেখ, সেই অতি পুরাকালে যে ব্রহ্মজ্ঞান সমস্ত ভারতবর্ষকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল, আজও তাহার আস্বাদ পাইয়া আমরা কত-না আনন্দ উপভোগ করিতেছি। আমাদিগের কর্ত্তব্য যে সেই পূর্ব্বতন ঋষিদিগের ন্যায় আমরাও শরীর ও মনকে সংযত করিয়া কঠোর সাধনা দ্বারা সুনির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে চেষ্টা করি। যতই এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইব, ততই ব্রহ্মপ্রীতি হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া উঠিবে। আবার যখন ব্রহ্মজ্ঞানে আত্মা উন্নত হইবে, ব্রহ্ম-প্রীতিতে হৃদয় পরিপূর্ণ হইবে, তখন তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা অতি সহজ হইয়া যাইবে—ব্রহ্মপ্রদর্শিত ধর্ম্মপথে চলা

অনায়াস-সাধ্য হইয়া উঠিবে। ব্রহ্মপ্রীতি যদি একবার আমাদিগের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়, তাহা হইলে আমরা নির্ভীক-চিত্তে বজ্রদৃঢ় স্বরে ঘোষণা করিতে পারি যে, যদি আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হই, যদি লোকসমাজ কর্তৃক তাড়িত, লাঞ্ছিত, বহিষ্কৃত হই, এমন কি, যদি শরীর হইতে অশেষ যন্ত্রণা দিয়া প্রাণ উৎকীর্ণ করিয়া লওয়া হয়, তথাপি সেই প্রিয়তম প্রাণসখা পরমেশ্বরকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। তখন আমাদিগের হৃদয়ে এমন বল আসিবে যে, সংসারের সকল প্রকার ভয়কে তুচ্ছ করিয়া আমরা আমাদিগের কি গৃহ্য অনুষ্ঠানে, কি সামাজিক অনুষ্ঠানে, কি অন্তরে কি বাহিরে সকল স্থানে, সকল কার্য্যে সেই অমূর্ত্তমজমব্যয়ং, মূর্ত্তিবিহীন, জন্মবিহীন, অবিনাশী পরব্রহ্মকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইব; সকল কার্য্য তাঁহারি হস্তে সমর্পণ করিয়া, সন্তান যেমন মাতৃক্রোড়ে থাকিয়া নির্ভয় হয়, সেইরূপ নির্ভয় হইব এবং তাঁহার প্রসন্ন মুখ দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইব। এক সময়ে যখন প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টীয় সম্প্রদায় সবে মাত্র দেখা দিয়াছে, তখন রোমান ক্যাথলিকগণ তাহাদিগের উপর ভীষণ অত্যাচার করিত। প্রটেষ্টাণ্টগণ রোমান ক্যাথলিকদিগের ধর্ম্মগুরু পোপের অধীনতা স্বীকার করিত না বলিয়া এই প্রকার অত্যাচার। অত্যাচারের পরিমাণ একটী উদাহরণেই প্রকাশ পাইবে। পোপ-নিযুক্ত কোন কর্ম্মচারী এক প্রটেষ্টাণ্টকে পোপের অধীনতা স্বীকার করিতে বারম্বার অনুরোধ করিলেও যখন সে কিছুতেই তাহা স্বীকার করিল না, তখন, বলিতে শরীর শিহরিয়া উঠে, মনুষ্য-হৃদয় মনুষ্য হৃদয়ের পাষাণভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়ে, সেই অসহায় প্রটেষ্টাণ্টের চক্ষু অল্পে অল্পে অস্ত্রবিদ্ধ করা হইতে লাগিল। কিন্তু ধর্ম্মের বল এমন অসাধারণ বল যে এমন পাশব অত্যাচারেও প্রটেষ্টাণ্ট কিছুতেই পোপের অধীনতা স্বীকার করিল না। সেই প্রটেষ্টাণ্ট অজ্ঞানের মধ্যে বাস করিয়াও এক ধর্ম্মবিশ্বাসের বলে দেবহৃদয় মনুষ্যবিশেষকে অনুসরণ করিয়া কি আশ্চর্য্য বীরত্বই প্রদর্শন করিল, আর আমরা সত্যস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ, প্রেমময়, করুণাময়, জীবন্ত জাগ্রত দেবতা পরমেশ্বরকে আমাদিগের অতি নিকটস্থ একমাত্র পরম আশ্রয় জানিয়াও তাঁহার ধর্ম্মের জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হইব, নানা প্রকার ভয়ে অস্থির হইব? যাঁহার ভয়ে মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে তিনি স্বয়ং যখন আমাদের হৃদয়-দেবতা, প্রাণের একমাত্র অবলম্বন, তখন আমাদের আর কিসের ভয়? অভয়ের আশ্রয়ে থাকিয়া হৃদয়কে ভয়জর্জ্জরিত করিতে কি আমাদিগের লজ্জা হয় না, ঘৃণা হয় না? তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা থাকিতে চাহি না—তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকাই আমাদিগের মৃত্যু, তাহাই আমাদিগের নরক; আর তাঁহাকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিলে আমাদিগের সমুদয় ভয় দূর হইয়া যাইবে।

"যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ। যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ। তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

এই অসীম আকাশে যে অমৃতময় জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ, যিনি সকলি জানিতেছেন, এই আত্মাতে যে অমৃতময় তেজোময় পুরুষ, যিনি সকলি জানিতেছেন; সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন,—তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।

হে পরমাত্মন্, হে প্রাণনাথ হৃদয়েশ্বর, তোমার নিকটে আর কি প্রার্থনা করিব? তুমি আমাদিগের সকল শুভ কামনাই পূর্ণ করিতেছ। তুমি মাতার ন্যায় আমাদিগকে বিপথ হইতে সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছ। তোমার নিকট আর কি প্রার্থনা করিব? তোমার নিকট আজ এই সমাজমন্দিরে, এই সুহৃদ্বর্গের মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া এই প্রার্থনা করি যে, আমরা যেন নিতান্তই রিক্তহস্তে ফিরিয়া না যাই; তোমার বিষয়ে যে টুকু জ্ঞান সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলাম, যেন তাহার উপর আরো ধিকতর জ্ঞান লাভ হয়; হৃদয়ে যতটুকু তোমার প্রতি প্রীতি ছিল, এখন যেন তাহা বর্দ্ধিত হইয়া সমুদয় হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া ফেলে। কবে আবার সেই পুরাকালের ন্যায় ভারতের প্রতি গৃহে তোমারি মহিমা পরিকীর্ত্তিত হইতে থাকিবে—ওঙ্কারের পুণ্যনাম বিঘোষিত হইতে থাকিবে? কবে আবার ভারতের উজ্জ্বল মুখশ্রী দেখিতে পাইব?

হে অনাথের আশ্রয়! আমাদের এই বঙ্গদেশ সকল বিষয়ে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। কেবল একমাত্র ধর্ম্মের বলই ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু ভাবিলে আকুল হইতে হয় যে, ধর্ম্মপিপাসা, ধর্ম্মবল যেন ক্রমে এদেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। এখন তুমিই ইহার জননী হইয়া ইহাকে রক্ষা কর, যেন এদেশে ধর্ম্মের নামে বিন্দুপরিমাণেও মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া না হয়। হে বুদ্ধিদাতা, বলদাতা, তুমি আমাদিগের হৃদয়ে এমন বুদ্ধি ও শক্তি প্রেরণ কর, যাহাতে আমরা যথার্থই ধর্ম্মের বলে বলীয়ান্ হইয়া উঠি। তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ কর নাই; তুমি আমাদিগের প্রতি এই আশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর যেন আমরাও তোমাকে পরিত্যাগ না করি।

"মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্ত নিরাকরণং মেঽস্তু।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ।

চতুর্থ উপদেশ—প্রাণময় কোষ।

(৯ই চৈত্র, রবিবার ৬১ ব্রাহ্মসম্বৎ।)

তাঁহার ইচ্ছাতে ক্রমে পৃথিবী প্রশান্ত হইল। সূর্য্য প্রকাশিত হইল; এতদিন যে তাহার বাষ্প আবরণ ছিল, তাহা ক্রমে অপসারিত হইল। পরিমিত রূপে রৌদ্র হইল, পরিমিতরূপে বৃষ্টি হইল। এ সকল কেন হইল? তাঁহার লক্ষ্য কি? পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টিই তাঁহার লক্ষ্য। এই যে পৃথিবী এমন প্রশান্ত হইল, শৈবালক অবধি বটবৃক্ষ পর্য্যন্ত বৃক্ষসকল উৎপন্ন হইল, এই সকলই তাঁহারই ইচ্ছাতে।

এই যে প্রাণের সৃষ্টি হইল, প্রাণ কোথা হইতে আসিল? ইহা কি আপনাপনি আসিয়াছে? যেমন পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ঈশ্বর আপনার শক্তি সমুদয় আকাশে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়া অন্নময় কোষ সৃষ্টি করিলেন, সেইরূপ সেই মহাপ্রাণ আপনার প্রাণ বৃক্ষমূলে স্থাপিত করিয়াছেন। প্রাণের ক্রিয়া, প্রাণন শক্তি জড়জগতের শক্তি হইতে কত বিভিন্ন।

এই জড়জগতে যে সকল শক্তি আছে, তাহাতেই তাঁহার জ্ঞানের পরিচয়; প্রধানতঃ সেই সকল শক্তি দুই—আকর্ষণ ও বিয়োজন। এই দুই শক্তির বলেই জড় জগৎ চলিতেছে; এই দুই শক্তিতেই

জড়জগতের গতি, এই দুই শক্তিতেই জড়-জগতের স্থিতি।

"দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্ম চক্রং।"

এই যে ব্রহ্মচক্র ঘুরিতেছে, ইহাই তাঁহার মহিমা। এই যে গ্রহগণ আমাদিগের এই পৃথিবীর সঙ্গে এই সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, এই সূর্য্য ক্ষুদ্র বৃহৎ পঞ্চাশটী গ্রহগণের সহিত আর এক সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে;—সেই সূর্য্য আমাদিগের এই সূর্য্য হইতে কত বৃহৎ। আবার সেই সূর্য্য তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণকারী গ্রহগণের সহিত আরও বৃহৎ এক সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এইরূপে অগণ্য সূর্য্য পরিভ্রমণ করিতেছে—ইহার অন্ত কোথায়, ইহার অন্ত কোথায়! আমাদিগের এই পৃথিবী যে আকাশের মধ্যদিয়া একবার গমন করিয়াছে, সে আকাশে আর ফিরিয়া আসিতে পারিবে না।

এই তো গেল জড়ের শক্তি। কিন্তু প্রাণন শক্তি, সে আবার আরও আশ্চর্য্য; সে শক্তি জড়ের বিপরীত শক্তি, সে শক্তি জড়শক্তিকে অতিক্রম করিয়া চলে। একটা গাছ জন্মাইল; এই গাছের যতটা পত্তন ভূমি আবশ্যক, ততটা ভূমিতে তাহার মূল বিস্তৃত হইয়া প্রবেশ করিল এবং তাহারই উপরে গাছটীকে স্থিরভাবে দাঁড় করাইয়া রাখিল। এইরূপে গাছ আপনার উপযুক্ত পত্তনভূমি আপনিই প্রস্তুত করিতেছে। তাহার যতটা নীচে যাইবার প্রয়োজন, ততটা নীচে গেল, আবার যতটা উপরে যাইবার প্রয়োজন, ততটা ঊর্দ্ধে গেল। আবার দেখ, তালগাছ নারিকেলগাছ প্রভৃতি প্রাণন শক্তির বলে কৈশিক আকর্ষণের দ্বারা কত ঊর্দ্ধে রস লইয়া যাইতেছে এবং কত ঊর্দ্ধে আপনাপন ফল প্রস্তুত করিয়া লইতেছে। এই প্রাণন শক্তি কেবল আপনাকে গড়ায়। প্রাণ থাকিতে গেলেই অন্ন আবশ্যক, সেই অন্ন পৃথিবীতে আছে; প্রাণ এই পৃথিবী হইতে রস গ্রহণ করিয়া আপনাকে পুষ্ট করিতেছে। এই প্রাণ যে আপনাকে গড়াইতেছে, সে কি জানে যে কি রূপে গড়াইতেছে? সে তো এক অন্ধশক্তি, কিন্তু কি আশ্চর্য্যরূপে গড়াইতেছে। ঈশ্বর যে গাছের যে আদর্শ দিয়াছেন, সেই গাছ সেই অনুসারেই কেমন বাড়িতেছে। বিশেষ বীজ হইতে যে বিশেষ গাছ হইবে, ইহা, যাঁহার ইচ্ছায় বিশেষ গাছ হইয়াছে, তিনিই জানেন যে কি রূপে হইবে।

এই যে অন্নময় কোষ পৃথিবী, প্রাণ আপনাকে বাড়াইবার জন্য তাহা হইতে রস টানিয়া পান করে; কিন্তু দেখ কি আশ্চর্য্যরূপে এই কার্য্য হইতেছে। এই অন্ন সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত বৃক্ষমূল সকল যেখান হইতে রস প্রাপ্ত হয়, সেই খানেই গমন করে; এমন কি, মধ্যে যদি প্রস্তর ব্যবধান থাকে, তবে তাহাও ভেদ করিয়া গিয়া সরস ভূমিতে পৌঁছিয়া রস আকর্ষণ করিয়া থাকে। ইহাই আশ্চর্য্য যে সামান্য বৃক্ষমূল প্রস্তর পর্য্যন্ত ভেদ করিতে পারে। এইখানে ঈশ্বরের ইচ্ছা, ঈশ্বরের জ্ঞান একটী গাছে দেখিতে পাইতেছি! তাঁহার ইচ্ছা কে জানিবে? আবার দেখ যে, প্রাণের উপকরণ কতগুলি চাই। এক উপকরণ মাটী তাহা শুষ্ক হইলে হইবে না; জল চাই, জল ও মাটী একত্র হইলে তবে রস হয়; ইহার উপর আবার তেজ চাই, বাতাস চাই, আলো চাই। এতগুলি উপকরণ একত্র হইলে তবে একটী গাছ

হয়। তাহাদের একটা যদি না থাকে, তবে আর গাছ হইতে পারে না;—এই গুলি কে সংযোগ করিয়া দিলেন?

এই সৌর জগৎ সূর্য্যের চারিধারে ঘুরিতেছে। সূর্য্য যদি আর একটু নিকটে থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবী জ্বলিয়া যাইত; যদি আরও দূরে যাইত, তাহা হইলে পৃথিবী শীতল হইয়া পড়িত। এই জন্য সূর্য্যের তেজ ঠিক উপযুক্ত রূপে আসিতেছে, তাই প্রাণ বাঁচিতেছে। এই একটা জ্ঞানের কেমন পরিচয়। কেন সূর্য্যকে এতটা দূরে রাখিলেন? দেখ, এক সূর্য্য ঠিক্ উপযুক্ত দূরে রহিল—তেজের পরিমাণ হইল, প্রাণও বাঁচিতে লাগিল। ইহা জ্ঞানেরই কার্য্য; অন্ধ শক্তি দ্বারা হয় নাই। বাতাসের আবশ্যক, চলাচল না হইলে বাতাস বহে না; ঐ এক সূর্য্যের তেজ লাগিয়া বাতাস চলিতেছে। জল চাই, মেঘ না হইলে বৃষ্টি হইবে না; ঐ এক সূর্য্যের তেজ লাগিয়া বাষ্প উত্থিত হইয়া মেঘ হইল এবং মেঘ হইতে বৃষ্টি পড়িয়া মৃত্তিকা সরস হইল। ঈশ্বর এক সূর্য্য নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়াতে বাতাস চলিতেছে, বৃষ্টি হইতেছে, মৃত্তিকা উপযুক্ত হইতেছে। আলো যদি না থাকিত, সমস্ত গাছের পাতা বিবর্ণ হইয়া যাইত। এই চারি বস্তুই এক সূর্য্যের উপর নির্ভর করিতেছে; সূর্য্য না থাকিলে কিছুই হয় না। তাঁহার রচনায় কেমন একটা সরল ভাব; যতগুলি জিনিসের দরকার, এক সূর্য্যই সেই সমস্তের প্রধান কারণ—এক সূর্য্য দেওয়াতে প্রাণ চলিতেছে। প্রকৃতির এক পদও এদিক ওদিক নড়িবার উপায় নাই—সমস্তই সেই বিশ্বপিতার শাসনে চলিতেছে।

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।"

তাঁহারই শাসনে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, বৃষ্টি হইতেছে এবং তাহাতেই প্রাণ বাঁচিতেছে।

এক প্রাণন কার্য্য দ্বারাই ঈশ্বরের জ্ঞান ও ইচ্ছা কেমন স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে; তাঁহার মহিমা আমরা কি সহজে জানিতে পারিতেছি। এই বিশ্বযন্ত্র নিয়মে চলাতেই প্রাণ থাকিতে পারিয়াছে। প্রাণের উপকরণ ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুৎ—আকাশ ব্যবধান মাত্র। এই উপকরণ কোথা হইতে হইয়াছে, তাহা আমাদের জ্ঞানে প্রকাশ হইয়াছে। মনে কর জল; ইহা হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিত হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে। আবার যে বাতাস আমরা স্পর্শ করিতে পারি না, সেই বাতাসে তাহা অপেক্ষাও সূক্ষ্ম পদার্থ অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন হইতে প্রস্তুত হইল। স্থূলভাবে দেখিতে গেলে দেখিতে পাই যে এই পৃথিবী প্রধানতঃ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ এই চারি বস্তুতে স্থিতি করিতেছে, কিন্তু যখন আরো সূক্ষ্মভাবে দেখিতে চাই, তখন দেখি যে পৃথিবী প্রধানতঃ অক্সিজেন নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন ও কার্ব্বন এই চারি সূক্ষ্ম পদার্থে স্থিতি করিতেছে। এই সকলে ঈশ্বরের জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা বলিতে পারি যে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন মিলিত হইয়া জল হইল; অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন মিলিত হইয়া বায়ু হইল; কিন্তু কেন হইল, তাহা কে জানে? এ গুলি না হইলে প্রাণ থাকিতে পারে না।

ঈশ্বর যে এই সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, এই সকলে কেমন ক্রমোন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়—সব ক্রমে হইতেছে একেবারে কিছুই হয় না। শৈবালক অবধি বটবৃক্ষ পর্য্যন্ত সব ক্রমোন্নতির দৃষ্টান্ত

প্রথম দেখ যে বরফ সব শ্বেতবর্ণ রহিয়াছে, ক্রমে একটুখানি হল্‌দে বর্ণ বিশিষ্ট হইল, তাহার পরে সমুদয় বরফের ক্ষেত্র একেবারে হল্‌দে হইয়া গেল। কি প্রকারে এই বরফ হল্‌দে হইয়া গেল? বরফের উপর এক প্রকার শৈবাল হয়; এই শৈবালের বর্ণে বরফ রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে। বৃক্ষজাতির মধ্যে দেখ, প্রথমে শৈবাল হইল। তাহার পরে তদপেক্ষা উন্নত হইল তৃণগুল্ম প্রভৃতি; আবার তাহা হইতে উন্নত (fern প্রভৃতি) শাখাপ্রশাখাবিহীন বৃক্ষ। ক্রমে শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম, তাহাদের আর ফুল ফল হয় না। ক্রমে ক্রমে কেবল ফুলের গাছ হইতে লাগিল, তাহার পরে ফুলফলশোভিত আম্রাদি বৃক্ষ দেখিতে পাইতেছি। বৃক্ষের কেমন ক্রমোন্নতি দেখিলাম। এই সকলেরই লক্ষ্য আছে, উদ্দেশ্য আছে; বিনা লক্ষ্যে কিছুই উৎপন্ন হয় নাই।

প্রাণের মধ্যে বিচিত্রতাও কত দেখা যায়। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে একরকম, শীত প্রধান দেশে একরকম; গ্রীষ্ম প্রধান দেশে নারিকেল প্রভৃতি সরস ফল, শীত প্রধান দেশে বাদাম পেস্তা প্রভৃতি। এখানে নারিকেল কেন, ওখানেই বা পেস্তা বাদাম কেন; আর বরফের উপরে শৈবালই বা কেন? সকলেরই লক্ষ্য আছে। এই সকল দেখিয়া জানিতেছি যে জগতে ক্রমোন্নতি ও বিচিত্রতা আছে।

অন্নময় কোষের মধ্যে প্রাণ চলিয়াছে। প্রাণ কি শূন্যে শূন্যে থাকিতে পারে? অন্নময় কোষের মধ্যেই প্রাণ রহিল; গাছের মধ্যেই প্রাণ থাকিল—পৃথক্ থাকিবে কি প্রকারে? এতক্ষণ যে প্রাণময় কোষের কথা বলিয়া আসিলাম, তাহা স্থাবরের বিষয়; এই স্থাবর পাদপ ঝড় জল সহ্য করিয়া এক স্থানেই রহিয়াছে। ঈশ্বর কেমন কৌশল করিয়া দিয়াছেন, যাহাতে পাদপজাতি এক স্থানে থাকিয়াই প্রাণরক্ষা করিতে পারে। আর এই গাছের আয়ুই বা কত—আমেরিকায় একশত দুই শত বৎসরেরও গাছ আছে।

আবার প্রাণ বীজে যে থাকে, সে বড় আশ্চর্য্য। ছোলা এক আছে, একটু জল দিতে থাকিলেই তাহা হইতে অঙ্কুর বাহির হইবে। এমন কি মিসর দেশীয় মমির (mummy, বহুকালের রক্ষিত মৃতদেহ) মধ্যে যে ধান্য প্রভৃতি শস্য থাকে, তাহা জলে রাখিয়া দেখা গেল যে তাহা হইতে অঙ্কুর নির্গত হইল; আবার সেই অঙ্কুরসহিত বীজ মাটীতে রোপণ করিয়া দেখা গেল যে তাহা হইতে ধানের গাছ হইল। একবার ভাবিয়া দেখ যে, প্রায় চারি হাজার বৎসর যে বীজ শুষ্ক হইয়া আছে, তাহা হইতেও প্রাণ বাহির হইয়া যায় নাই। কিন্তু এই প্রাণ স্বয়ং আইসে নাই। প্রাণ না থাকিলে, আপনাপনি যে প্রাণ আসিতে পারে না, তাহা পরীক্ষায় জানা গিয়াছে। পরীক্ষার জন্য উত্তাপের দ্বারা জল হইতে জীবিত কীটাণু ও বীজ প্রভৃতির প্রাণ নষ্ট করিয়া, বোতলের মধ্যে বদ্ধ করিয়া দুই বৎসর কাল পর্ব্বত-শৃঙ্গে ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল; কিন্তু এই দুই বৎসর পরে বোতল খুলিয়া দেখা গেল যে, তাহাতে কোন প্রাণীর লক্ষণ দেখা যায় নাই। প্রাণ আপনি হয় না; যখন মহাপ্রাণ হইতে প্রাণ আইসে, তখনই প্রাণ জন্মায়;—প্রাণের হেতু সেই মহাপ্রাণ। জড়ের কার্য্য প্রাণ ধারণ করা; কিন্তু প্রাণ সেই মহাপ্রাণ হইতে আসিয়াছে। যেমন তাঁহার শক্তি হইতে অন্নময় কোষ হইল, তেমনি তাঁহার ইচ্ছায় প্রাণ রহিল

অন্নময় কোষে। জড়ের এমন শক্তি নাই যে প্রাণকে প্রসব করে—তিনিই প্রাণ দিয়াছেন।

তাঁহার ইচ্ছা কে বুঝিবে, যে, কেমন করিয়া প্রথম গাছ উৎপন্ন হইল—ইহা বলিতে পারিবে? উত্তপ্ত ভূমি যখন শীতল হইল, গাছ জন্মাইতে আরম্ভ হইল। কিন্তু প্রথম গাছ কোথা হইতে আসিল, সে তাঁহারই ইচ্ছা—সে কে বুঝিবে? যখন পৃথিবী উত্তপ্ত ছিল, তখন ধাতু পর্য্যন্ত গলিয়া যাইতেছে, তখন কি গাছ থাকিতে পারে? যখন পৃথিবী শীতল হইল, তখন তিনিই প্রথম গাছ সৃষ্টি করিলেন। প্রত্যেক বৃক্ষের কেমন আশ্চর্য্যরূপ আদর্শ করিয়া দিলেন যে, তাহার বীজে সেই আদর্শানুযায়ী শক্তি চিরকাল রহিল। সকলেরই আদিমূল অন্বেষণ করিতে গেলে এক ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন অন্য কোন হেতু বুঝা যায় না। তিনি আপনার ইচ্ছা আপনি জানেন; আবার আমরাও সৃষ্টির কৌশল দেখিয়া তাঁহার ইচ্ছা বুঝিতে পারি। দেখ এই জড় ও প্রাণ আলোচনা করিয়া তাঁহার ইচ্ছা ও জ্ঞানের কত পরিচয় প্রাপ্ত হইলাম।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

সঙ্গীত।

সঙ্গীতের তুল্য মধুর হৃদয়গ্রাহী বিষয় আর কিছুই নাই; সঙ্গীতে জীব হৃদয়ের সহিত বশীভূত হয়, মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া যায়। সঙ্গীত এমনি সরস শক্তিমান যে তাহার আশ্রয়ে আমাদের বৃত্তি সকল সহজে প্রস্ফুটিত হয়, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ই সমভাবে পুষ্টিলাভ করে। ইহা জীবের প্রতি মঙ্গলময়ের আশীর্ব্বাদ। সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে ইহার বিশেষরূপ প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়; ইহা শুনিবামাত্র ইহার ভাবের সঙ্গে হৃদয়কে টানিয়া লইয়া যায়। সঙ্গীত এ সংসারে দুঃখ শোক যন্ত্রণার উপশমের এক প্রধান উপায়; ইহার সূক্ষ্ম সরসতা বিদ্যুৎবেগে জড়তা, মলিনতা দূর করে।

সঙ্গীত সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। কবিতা এত যে প্রাচীন, বোধ হয় তাহারো পূর্ব্বে সঙ্গীত বিদ্যমান ছিল। সঙ্গীত ও কবিতার মধ্যে বেশ প্রভেদ দেখিতে পাই; প্রথমটী যদি রস হয় তবে দ্বিতীয়টী গুড়। সঙ্গীতের অপেক্ষা কবিতায় মননের প্রভাব বেশী; কবিতা যেন সঙ্গীতের অপেক্ষা মননের দ্বারা ঈষৎ পরিপাক লাভ করিয়াছে। কবিতার প্রধান ক্ষেত্র ভাষায়, সঙ্গীতের প্রধান ক্ষেত্র স্বরে। কিন্তু দুইটী যেন পরস্পর হৃদয়সখা;—সঙ্গীতও কখন কবিতার সাহায্যে মধুর আকার ধারণ করে, কবিতাও কখন সঙ্গীতের সাহায্যে মধুর আকার ধারণ করে। এই দুই সখার মধ্যে সঙ্গীত যেন ঈষৎ অশিক্ষিত সরল, আর কবিতা যেন ঈষৎ শিক্ষিত সরল। সঙ্গীতকে আমরা স্বরবর্ণ আর কবিতাকে ব্যঞ্জনবর্ণ কহিতে পারি। যেমন স্বরবর্ণের সাহায্যে ব্যঞ্জনবর্ণ পরিস্ফুট হইয়াছে, সেইরূপ সঙ্গীতের সাহায্যে কবিতা পরিস্ফুট হইয়াছে। সঙ্গীতও কাব্য, কবিতাও কাব্য; সঙ্গীত স্বর-কাব্য আর কবিতা ব্যঞ্জনকাব্য—ইহা মিশ্রপ্রাণ।

প্রাচীন কালে, ভারতবর্ষ যেমন সঙ্গীতের গূঢ় অনুশীলনে রত হইয়াছিল এমন কোন দেশ হয় নাই। আমাদের সঙ্গীত শাস্ত্রের সূক্ষ্মভাবময় শ্রুতিনাদ আর রাগ

রাগিণীর বিধিবদ্ধতা তাহার এক বিশেষ প্রমাণ। প্রাচীন ভারতবর্ষের ন্যায় ইউ-রোপ আজ কাল সঙ্গীতের নিগূঢ় অনু-শীলনে রত হইয়াছে;—শব্দ-কম্পনের মাত্রা, পরিমাণ, শব্দের কারণ ও ফল সকলই তন্ন তন্ন করিয়া আবিষ্কার করিতে ব্যাকুল। বর্ত্তমান ইউরোপে প্রাচীন ভারতের অধ্যবসায় দেখিতে পাইতেছি! ইউরোপ আজি দেশবিদেশের সঙ্গীত অনু-সন্ধান পূর্ব্বক তাহার তত্ত্বনির্ণয়ে রত। এদিকে তাহার দৃঢ় অস্থিমজ্জাময় দৈত্য-দেহ, ওদিকে তাহার মধুর প্রেমসখ্য-পূর্ণ দেবাত্মা, এই দুয়ের সুন্দর সংযোগে ইউরোপের আজি কি শোভা! এই নব-শোভাময় ইউরোপ অনবরত বিশুদ্ধ সঙ্গীত সমূহ রচনা করিয়া কি মহাবেগে তাহার সঙ্গীতের অভাব দূরীকরণে সতত ব্যস্ত! আর আমরা তাহাতে কিরূপ অবহেলা করি তাহা স্মরণ করিলে ঘৃণায় আমাদের প্রাণমন জর্জ্জরিত হয়। বর্ত্ত-মান ভারত জীর্ণ শীর্ণ অলস চরিত্রহীন তনু লইয়া বসিয়া আছে, তাই তাহাকে সঙ্গীতের সদ্ভাব প্রাণভরে আলিঙ্গন ক-রিতে পারিতেছে না।

ভারতে গানের উন্নতি সকল দেশের অগ্রে হইয়াছিল। এখানে যন্ত্র বাজা-ইবার প্রথাও কত প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত ছিল তাহার ঠিকানা নাই। কোন ইউরোপীয় গ্রন্থকার বলেন সঙ্গীত ভারত হইতে মিসরে, মিসর হইতে জুডায়, পরে জুডা হইতে গ্রীসে যায়। অনেকে কহেন যে সঙ্গীত একেবারেই মিসর হ-ইতে গ্রীসে যায়। ইউরোপ সঙ্গীত সম্বন্ধে মিসরের কাছে ঋণী। ইউরোপের মধ্যে সঙ্গীতচর্চ্চা সর্ব্বপ্রথমে গ্রীসে আরম্ভ হয়।

গ্রীসে স্বরযন্ত্রের প্রকৃত ব্যবহার অ-নেক পরে হয়। তথায় প্রথম প্রথম যখন গান গাওয়া হইত, তখন যন্ত্র কেবল তা-হার সঙ্গে গৌণভাবে ব্যবহৃত হইত; ব-লিতে গেলে বিশেষরূপে গানের যতিকে চিহ্নিত করিবার জন্যই যন্ত্রের প্রয়োজন হইত। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠশতাব্দির পর হ-ইতে ইউরোপে স্বরযন্ত্রের মুখ্য ও পৃথক ব্যবহারের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। লে-সবস দেশীয় টেরপাণ্ডার (Terpander of Lesbos) খৃষ্টপূর্ব্ব ৬৭০ বৎসরের সময় সপ্ত-তন্ত্রিযুক্ত কিটার নামক যন্ত্র উদ্ভা-বন ও প্রচলিত করেন; ফ্রিজিয়া প্রদেশ বাসী অলিম্পিয়স নামে কোন ব্যক্তি গ্রীসে ফ্লুট্‌বাদন-কৌশল প্রথম প্রদর্শন করেন। দ্বিতীয় পিথিয়াডে (খৃষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দির প্রারম্ভ) আরগস্ দেশীয় সাকাডেস্ (Sacades of Argos) গানের সা-হায্যব্যতীত সাধারণের সমক্ষে ফ্লুট বাজা-ইয়াছিলেন। এই সময় ইউরোপে যন্ত্র-বাদ্যের এতদূর উন্নতি হয়, যে, তদ্দ্বারা লোকে কণ্ঠস্বরের সাহায্য ব্যতীতও শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হ-ইত। টেজিআ দেশীয় আগালাউস (Agalaus of Tegea) গানের সহায়তা ব্যতীত তন্ত্রী-যন্ত্র বাজাইয়া বিশেষরূপ সম্মান লাভ ক-রেন। ইহা অষ্টম পিথিয়াডে (খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৫৮ বৎসরের সময়) ঘটে। আরিস্টাক্সে-মাসের (Aristaxemas) সময় গ্রীক স্বরগ্রাম দুই অষ্টক পর্য্যন্ত ছিল এবং তাহাকেই গ্রীকেরা সর্ব্বোচ্চ, অপরিবর্ত্তনীয়, নির্ভুল প্রণালী কহিত, কিন্তু উইলার্ড সাহেব বলেন সেই সময় ভারতের অতি প্রাচীন বীণাযন্ত্র যাহা নারদ মুনি বাজাইতেন তাহার স্বরগ্রাম সাড়ে তিন অষ্টক পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বলিতে কি, গ্রীসীয় সঙ্গীতের প্রভাবেই

প্রকৃত রোমীয় সঙ্গীতের আবির্ভাব হয়। রোমে সঙ্গীত প্রথমে অতিশয় কর্কশ ও হীনাবস্থায় ছিল, থাকা না থাকা তাহার দুইই সমান ছিল, কিন্তু যখন লাটিন ভূমিতে গ্রীসের লোকেরা যাইয়া তাহাদের সঙ্গীত রোপণ করে,তখন হইতে গ্রীসীয় সঙ্গীতের অপেক্ষাকৃত জীবিত মধুর ভাবে প্রাণহীন রুক্ষ রোমীয় সঙ্গীত যথার্থ প্রাণলাভ করে। ফলত তখন হইতে রোমীয় সঙ্গীত গ্রীসীয় সঙ্গীতেরই পরিণাম ভিন্ন আর কিছুই রহিল না। গ্রীসীয় সঙ্গীত যখন লাটিন ভূমিতে দেখা দেয় তখন প্রথমে তাহার প্রতি তথাকার উচ্চ শ্রেণীর লোক তেমন যত্নপ্রদর্শন করেন নাই, কেবল নিম্নশ্রেণীর লোক—ক্রীত দাসেরাই তাহাকে যৎকিঞ্চিৎ আদর করিত।

গ্রীসের প্রভাবে রোমীয় সঙ্গীত বহুকষ্টে জন্ম লাভ করিয়া পুনরায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। ভারতের সঙ্গীত যেমন উন্নতির পথে উঠিবার কালে সহসা বহিঃশত্রুর আক্রমণে অবনত হইয়া পড়ে, সেইরূপ রোমীয় সঙ্গীত অল্পদূর উঠিয়াই বহিঃশত্রুর আক্রমণে মুহ্যমান হইয়া পড়ে। রোমীয় সঙ্গীত খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত কষ্টে সৃষ্টে আপনাকে আপনি রক্ষা করিয়া আইসে—পরে তাহার দুরবস্থা হয়। উৎপাত অত্যাচারে রোমীয় কলা বিদ্যার অন্যান্য ভাগের ন্যায় সঙ্গীতও স্পষ্টরূপে পতনোন্মুখ হইতে আরম্ভ হয়; শেষে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর সময় যখন চতুর্দ্দিক হইতে নানা বর্ব্বর জাতি আসিয়া ইটালি ছাইয়া ফেলিল তখন সঙ্গীতও অন্যান্য আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কলাবিদ্যার সামগ্রীর সঙ্গে সঙ্গে বিশেষরূপে উৎসন্নদশা প্রাপ্ত হইল। এই উৎসন্নাবস্থা রোমীয় রাজ্যের অবসানবার্ত্তা সূচনা করিয়া দিয়াছিল। কলাবিদ্যার অবসন্ন, মুমূর্ষু ভাবের সঙ্গে রোমরাজ্যও অবসন্ন মুমূর্ষু হইয়া পড়িল। কলাবিদ্যা জাতির মাধুর্য্য ও সরসভাব; ইহার বিকসিত ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জাতিও বিকসিত ও সরস হয়। কলাবিদ্যা জাতীয় স্ফূর্ত্তির পরিমাপক যন্ত্র স্বরূপ। ইহার শ্রেষ্ঠতম মধুর অংশ সঙ্গীত। সেই সঙ্গীত যে জাতির গৃহ হইতে চলিয়া যায় সে জাতির জীবনী শক্তি নিতান্তই করাল-কাল-তিমিরাচ্ছন্ন। অন্তরে অন্তরে জীবনীশক্তি সঞ্চার করিতে—বিশ্ব জাগাইতে সঙ্গীতের তুল্য আর জিনিস নাই।

> "গীতেন প্রীয়তে দেবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ পার্ব্বতীপতিঃ
> গোপীপতিরনন্তোঽপি বংশীধ্বনিবশঙ্গতঃ।
> সামগীতি-রতোব্রহ্মা বীণাশক্ত্যা সরস্বতী
> কিমন্যে যক্ষগন্ধর্ব্বদেবদানবমানবাঃ॥"

সঙ্গীতের ভাব মানবের মনে প্রথমে সহজে জাগে, মানব নিজ দুঃখ সুখ তাহাতেই মধুররূপে ব্যক্ত করিতে সুখকর বোধ করে। সর্ব্বদেশেই অপরাপর বিদ্যা সঙ্গীতের ক্রোড়ে বিদ্যমান ছিল। ইউরোপে যে মিউজিক বলিলে আজকাল শুদ্ধ সঙ্গীত বুঝায়, পূর্ব্বে তাহা বুঝাইত না। পূর্ব্বে প্রাচীন গ্রীকেরা ইহাকে আরো ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করিত; তাহারা ইহা দ্বারা যেমন গীত ও নৃত্যের বিজ্ঞান, সেইরূপ আবার কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন এবং রোমদেশীয় আলঙ্কারিক ও সমালোচক কুইণ্টিলিয়ানের মতে ব্যাকরণ পর্য্যন্ত জ্ঞাপন করিত। এই সমস্তকে রোমকেরা পরে 'ষ্টুডিয়া' হিউমানিটেটিস্' অর্থাৎ মানবের অধ্যয়ন বিষয় এই প্রকার আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। সংক্ষেপে ইউরোপে তখনকার প্রায় সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের সমষ্টিকে এক-

কথায় মিউজিক বলা হইত, মিউজিকটা যেন গাছের গুঁড়ির স্বরূপ ছিল।

ইউরোপে সঙ্গীতের যথার্থ উন্নতি খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রভাবে হয়। পূর্ব্বে ইউরোপে সঙ্গীত ভারি নীরস ছিল; তথাকার অন্যান্য দেশের কথা আর কি বলিব, দুই সভ্য প্রাচীন দেশ গ্রীস ও রোমেরই সঙ্গীত কর্কশ ছিল; গ্রীসের অপেক্ষা রোমের সঙ্গীত অধিকতর জঘন্য ছিল। রোমীয় সঙ্গীতের ঘোর রুক্ষ বেশ পূর্ব্বেই বলিয়াছি অপেক্ষাকৃত ভাল গ্রীসীয় সঙ্গীতের দ্বারা বিশেষরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। যাহা হউক, বস্তুতঃ প্রথমে ইউরোপের কোন প্রদেশেরই সঙ্গীত জীবন্ত মধুর, প্রাঞ্জল, যথার্থ উন্নত ছিল না, কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মের আবির্ভাবের পর খৃষ্টধর্ম্মী রোমীয় ধর্ম্মযাজকদিগের দ্বারা সঙ্গীতের সমূহ উন্নতি ঘটে। তাঁহারা নিরাপদে তাঁহাদের নিস্তব্ধ ধর্ম্মমন্দিরে বসিয়া একাগ্রচিত্তে ধর্ম্মকার্য্যে সহায়তালাভের জন্য সঙ্গীতের চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইতেন। খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবে, ইউরোপীয় সঙ্গীতে মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য ও কারুণ্য সঞ্চারের সূত্রপাত হয়। সকল দেশেই ধর্ম্মের মধুরিমায় সঙ্গীত মধুর হইয়াছে, উন্নতিলাভ করিয়াছে।

খৃষ্টের স্বজাতি ইহুদিদিগের দ্বারা ইউরোপে কি কিছু সঙ্গীতের উন্নতি হইয়াছে? খৃষ্টের ধর্ম্ম ইউরোপকে স্পর্শ করিল, মগ্ন করিল, এই সুযোগে ইহুদিদিগের সঙ্গীত ইউরোপকে সম্ভবতঃ স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু কই? হিব্রু সঙ্গীতের প্রভাবের কথা কোন কালে তেমন তো শোনা যায় না। ওল্ড টেষ্টমেণ্টের গ্রন্থকর্ত্তারা বারবার সঙ্গীত অভ্যাসের কথা এবং ডেভিড সলোমন এই দুই রাজার অধীনে ইস্রেলীয় ধর্ম্ম সম্পর্কীয় অনুষ্ঠানে খুব ঘটার সহিত সঙ্গীত যোগের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তবুও তাহা হইতে হিব্রু সঙ্গীতের অবস্থা বুঝিবার যো নাই, হিব্রু সঙ্গীত যে কিরূপ ছিল এবং তাহা অপর দেশকে কিছু স্পর্শ করিয়াছে কি না তাহা কিছুই জানা যায় না বা বলা চলে। হিব্রুজাতি সাধারণতঃ যেমন অন্যান্য শিল্প বিজ্ঞানেও বিশেষ উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই, সেইরূপ তাহারা সঙ্গীতবিদ্যাতেও বিশেষ উন্নতি করিতে পারে নাই। তাহাদের মধ্যে কোনরূপ স্বরলিপির চিহ্নমাত্রও পাওয়া যায় না। সঙ্গীত তাহারা মিসরবাসীদিগের নিকট শিখিয়াছিল।

মিসরে সঙ্গীতের মন্দ উন্নতি হয় নাই, তাহার বেশ প্রমাণ পাওয়া যায়। পর্য্যটকেরা প্রাচীন মিসরের মমিদিগের সমাধি গৃহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, মিসরে সঙ্গীতের উন্নতি সম্বন্ধে অনেক চিহ্ন পাইয়াছেন। কোন মমি সমাধিগৃহের দেয়ালে এইরূপ চিত্র অঙ্কিত আছে—ছয় জন নটী সাদা কাপড় পরিয়া রহিয়াছে, তাঁহাদের স্কন্ধের উপর কালো আল্‌গা পশমের জাল ঝুলিতেছে, তাহাদের ঘন কৃষ্ণ কুন্তল ভাঁজ ভাঁজ হইয়া পড়িয়াছে; সেই কুন্তলগুলি তাহাদের মস্তকের চতুর্দ্দিকে ঝুলিবার দরুণ মুখাবরণ-সদৃশ শোভা পাইতেছে। সেই ছয় জন চিত্রে এমনি ভাবে স্থাপিত যে, দেখিলে মনে হয় যেন তাহারা সারি বাঁধিয়া চলিতেছে এবং এক সময়ে সকলে বাজাইতেছে। তাহাদের মধ্যে যে প্রথম নেত্রী তাহার হস্তে চতুর্দ্দশতন্ত্রিসংযুক্ত একটী হার্পযন্ত্র, দ্বিতীয়ের হস্তে একটী গিটার যন্ত্র। এই গিটার যন্ত্র আধুনিক ইউরোপীয় গিটারের অসদৃশ নহে; তৃতীয়ের হস্তে একটী সুনির্ম্মিত বীণা; চতুর্থ নটী

যেন স্পষ্টরূপে সময় রক্ষা করিয়া হাতে তাল দিতেছে; পঞ্চমের হস্তে একপ্রকার দু-নলা বাঁশী। ইহা অনেকটা আজ কালকার ক্লারিওনেটের মত লম্বা ও সরু, দুটী নল সমান দীর্ঘ। এবং ষষ্ঠের হস্তে একটী তাম্বুরিন। ইহা একপ্রকার ক্ষুদ্র ঢক্কা বিশেষ। এই ষষ্ঠেতেই নটীদলের শেষ হইয়াছে। এই নটীদিগের ভোগ-বিলাসপূর্ণ হাবভাব পর্য্যন্ত চিত্রে চিত্রিত হইয়াছে। সেই সমাধিগৃহের আর এক স্থানে হার্পবাদক দুইটী পুরুষ এবং একটী গিটারবাদকের আকৃতি রহিয়াছে। তাহাদের হার্পগুলি পূর্ব্বোক্ত নটীদিগের হার্প অপেক্ষা ছোট; ইহাদের নয়টী করিয়া তাঁত। এই নয়তন্ত্রী হার্প পুরুষদ্বয়ের প্রত্যেকে বাজাইতেছে; একজন একাকী বাজাইতেছে, আর এক জন গিটারবাদকের সঙ্গে বাজাইতেছে। পুরুষ দুটীর খালি মাথা খালি পা, ঝোল্লা কাপড়, দাড়ি গোঁফ সব মুণ্ডিত, দেখিতে অনেকটা আমাদের উদাসীন বৈরাগীদিগের মত। এদেশে যেমন উদাসীন ধর্ম্মানুরক্ত জনদিগের দ্বারা কত সময়ে সঙ্গীত বিদ্যার রীতিমত উন্নতি হইয়াছে; বোধ হয় সেইরূপ কতকটা মিসরেও হইয়াছে। সকল দেশেই প্রায় ধর্ম্মগত-প্রাণ ব্যক্তিগণের দ্বারা সঙ্গীতের উন্নতির পথ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

সঙ্গীত সকলকে তাহার মধুর মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে নিমন্ত্রণ করিতেছে, তাহার নিমন্ত্রণ কাহারো উপেক্ষা করিতে সাধ যায় না। সঙ্গীতের কাছে সভ্যাসভ্য চরাচর সব যেন দ্রবীভূত।

> "অজ্ঞাতবিষয়াস্বাদো বালঃ পর্য্যঙ্কিকাতলে।
> রুদন্ গীতামৃতং পীত্বা হর্ষোৎকর্ষং প্রপদ্যতে।
> বনেচর স্তৃণাহারশ্চিত্রো মৃগশিশুঃ পশুঃ।
> লুব্ধো লুব্ধক সঙ্গীতে গীতে যচ্ছতি জীবিতং।"

সার উইলিয়ম জোন্স বলেন, তিনি একজন বিশ্বস্ত, স্বচক্ষে প্রত্যক্ষকারী লোকের নিকট শুনিয়াছেন—নবাব সিরাজউদ্দৌলা যে স্থানে বসিয়া তৃপ্তচিত্তে ঐক্যতানিক সঙ্গীত সেবন করিতেন, সেই স্থানে দুইটী বন্য মৃগ প্রায় বন হইতে আসিত। এইরূপ একদিন সেইস্থানে আসিয়া হৃষ্টমনে সঙ্গীত শুনিতেছে এমন সময়ে নবাব তাহাদিগের একটীকে বাণবিদ্ধ করেন। এদেশের একজন বিদ্বান ব্যক্তি জোন্স মহোদয়কে বলিয়াছিলেন যে, তিনি বারবার দেখিয়াছেন যে বিষধর ক্রূর সর্প সকল বাঁশীর স্বর শুনিবামাত্র গর্ত্ত হইতে বহির্গত হইত। একজন বুদ্ধিমান পারস্যবাসী তাঁহাকে বারম্বার একটী গল্প বলিয়াছিলেন এবং তাহা লিখিয়া লইতেও অনুমতি করেন। গল্পটী এই—যখন প্রসিদ্ধ বীণবাদক বুল্ বুল্ উপাধিধারী মির্জা মহম্মদ সিরাজের সমীপস্থ কোন নিকুঞ্জে বসিয়া বৃহৎ শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে বীণ বাজাইতেছিলেন সেই সময়ে তিনি স্পষ্টরূপে দেখিয়াছিলেন যে বুল্ বুল্ পক্ষীগণ বাদকের নিকটে আসিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল, কখনো গাছের উপর হৃষ্টমনে ডাকিতেছিল, কখনো ডাল হইতে ডালে নৃত্য করিতেছিল যেন তাহাদের বড় সাধ বাদ্য যন্ত্রটীর কাছে যায়, কখনো বা মহা উল্লাসে ভূমিতে টপ করিয়া পড়িতেছিল। উল্লিখিত পারস্যবাসী জোন্স মহোদয়কে বিশেষ রূপে কহিয়াছেন যে তাহাদের এই ভাব রাগের পরিবর্ত্তন মাত্রে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এইরূপ আরো নানা গল্প আছে। আমরাও পক্ষীদিগের এই ভাব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ঠিক্ পিয়ানো বাজাইয়া গাইতে বসিবার সময় দুএকটী চড়াই পাখীকে জানালার উপর

বসিয়া বিশেষ রূপে চঞ্চলতা প্রকাশ ও কলরব করিতে দেখিয়াছি। প্রায় প্রতিদিন তাহাদিগকে ঐরূপ গানবাজনার সময় আসিতে দেখিয়া আমার মনে এই ধারণা হয় যে উহারা নিশ্চয়ই সঙ্গীতের মাধুরীতে আকৃষ্ট হইয়াছিল, এবং সেই জন্য গাইতে গাইতে তাহাদের দিকে কতবার আমাদের দৃষ্টি পড়িয়াছিল।

সঙ্গীতের আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি! কথিত আছে ইহার মোহিনী শক্তির প্রভাবে গ্রীসের অরফিয়স্ অরণ্যের পশুদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন, নদীর গতি স্থির করিয়াছিলেন, এমন কি মহান বিটপী সমূহও তাঁহার সঙ্গীতমাধুরীতে আকুল হইয়া অবনত হইয়াছিল।

আমাদের শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর কি মোহিনী শক্তি ছিল! তিনি এমনি বাজাইতেন যে তাঁহার বাঁশীর সেই সুললিত ভাবপূর্ণ ধ্বনি শুনিয়া আভীর-কন্যারা যখন যমুনার তীরে জল আনিতে যাইত তখন তাহারা সহজে গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারিত না এমনি মোহিত হইত। আর অধিক কি বলিব, শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির কথা সর্ব্বজনবিদিত।

সকলেই জানেন বোধ হয়, "লা মার্সেইল" নামক এক সঙ্গীতের বলে ফরাসিজাতির কিরূপ রণোন্মত্ততা জন্মিয়াছিল!

একবার পূর্ব্বে রায়জেনেরোতে তথাকার নিগ্রোরা কাজকর্ম্ম বশত যে পথে গমনাগমন করিত সেই পথ খুব উচ্চ ছিল বলিয়া তাহারা যাতায়াতের শ্রম সহজ করিবার জন্য সার বাঁধিয়া গান গাইতে গাইতে দৌড়াইত। তাহাদের গানে বড় গোল হইত বলিয়া, তাহাদিগকে পথে গান গাইতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হয়; কিন্তু নিগ্রোরা না গান করিয়া কিছুতেই সেই উচ্চ পথে দৌড়াইতে পারিত না। তাহাতে কর্ম্মের ক্ষতি হইত, তাই পুনরায় তাহাদিগকে পথে গান গাইতে অনুমতি দেওয়া হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দিতে চতুর্দ্দশ লুইর অনশনক্লিষ্ট সেনারা বিস্তর যুদ্ধযাত্রার পর, সন্ধ্যাকালে অনেক সময় তাহাদিগের অর্দ্ধাশন ও যুদ্ধযাত্রা-জনিত জ্বালা যন্ত্রণা গীতিসুধাপানের দ্বারা অনেকটা দূর করিত।

আর কত বলিব, সঙ্গীতের আশ্চর্য্য বল, আশ্চর্য্য আকর্ষণ!

সঙ্গীত আমাদের দেশে, মুসলমানদিগের রাজত্বকালে তেমন উন্নতি লাভ করিতে পায় নাই বটে, কিন্তু তাহাদিগের কোন কোন বাদসাহের সময়, বিশেষতঃ আকবর সাহর আশ্রয়ে তাহার রক্ষা ও কার্য্য রীতিমত চলিয়াছিল। আমাদের পূর্ব্ব সঙ্গীতগুলি লইয়া মুসলমানেরা সৌখীন প্রাণে বহিরালোচনা করে এবং তাহাতে আসক্ত হইয়া পড়ে, তজ্জন্য তৎসমুদয় অনেকটা বিনাশের মুখ হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে, একেবারে মারা পড়িতে পায় নাই, পরন্তু মধ্যে মধ্যে কিছু ঔৎকর্ষ্য লাভ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু দোষটা এই, যে আমাদের সঙ্গীতের সরলতার উপর অনেক সময় উহাদিগের কষ্ট কল্পনার কৃত্রিমভাব সমূহ বড় স্পর্শ করিয়াছে। বাদসাহের দরবার জাঁকাইতে গিয়া অনেক সময় সঙ্গীত তাহার সরল মাধুরী হারাইয়া বাহির চাকচিক্যপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কষ্টকল্পনার কৃত্রিম আলাপ আমাদের তুচক্ষের বিষ; অনেকে ঐরূপ আলাপের দ্বারা সঙ্গীতের রাজ্যে কৌশল বিস্তার করিতে চাহেন, কিন্তু সে কৌশলে বিশেষ তেমন ফল নাই, তাহা

বৃথা আড়ম্বরমাত্র। সরল হৃদয়গ্রাহী সঙ্গীতের প্রাণে বাস্তবিক আপনা আপনি কেমন সুন্দর সৎকৌশল জাগে, তাহাতে লোকে কেমন সহজভাবে একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া যায়। আজকাল ইউরোপে ইটালী ও জর্ম্মণদেশীয় সঙ্গীতের মধ্যে জর্ম্মণদেশীয় সঙ্গীত সরলতার জন্য বিখ্যাত। জর্ম্মণদেশীয় সঙ্গীতজ্ঞেরা কেমন সরলভাবে, বিশুদ্ধ উন্মুক্তপ্রাণে স্বরকাব্য রচনা করিয়াছেন বলিয়া ইউরোপীয়েরা আজকাল সঙ্গীত বিষয়ে ইটালীর অপেক্ষা বেশীভাগ জর্ম্মনীর পক্ষপাতী। বাস্তবিক, ইটালীয় সঙ্গীত শুনিলে তাহার মধ্যে যেন ক্ষীণ মৃদু প্রাণ লুকাইতে দেখিতে পাই, মনে হয় যেন ইটালীয়েরা শক্তিমান সারল্যের অপেক্ষা টুকুটাকু কৃত্রিম লালিত্যের প্রতি বড় অনুরাগী। ইটালীদেশীয় সঙ্গীত আধুনিক জর্ম্মণ সঙ্গীতের তুলনায় যেন স্ত্রী ভাবাপন্ন। আধুনিক জর্ম্মণসঙ্গীতে বেশ্ বিক্রম, পুরুষত্ব, খোলাভাব, বিশুদ্ধ উদার প্রেমপূর্ণ মনুষ্যত্ব পাই, প্রাণমন যথার্থ ভরিয়া উঠে। আজকাল ইউরোপীয় সঙ্গীতরাজ্যে এখন জর্ম্মণীই শ্রেষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে ইটালী সঙ্গীতের মুকুট ধারণ করিত এখন জর্ম্মণী সেই মুকুট ধারণ করিয়াছে। জর্ম্মণী এখন ইউরোপীয় সঙ্গীত রাজ্যের রাজা।

সঙ্গীতের সরলতা প্রাচীন ভারতবাসীরা বেশ্ বুঝিতেন। তাঁহারা পৃথিবীর সকল জাতির অগ্রে সারল্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠতালাভ করিয়াছিলেন। সরলভাবে তাঁহারা প্রকৃতির ভাব সমূহকে স্বরে চিত্রিত করিতে সবিশেষ যত্ন করিতেন। প্রত্যূষের ভাব, প্রাতঃকালের ভাব, মধ্যাহ্নের ভাব, সন্ধ্যার ভাব, নিশীথের ভাব, নিশাবসানের ভাব এ সকলই তাঁহারা যথাসাধ্য স্বরে রীতিমত চিত্রিত করিয়াছেন। সরলভাবের ভিত্তির উপর তাঁহাদের রাগ রাগিণী প্রতিষ্ঠিত। সরল ভাব মানব হৃদয়ের প্রাণ-ঠিক রাখে, সরলভাবে যাহা কিছু করা যায় তাহা লোকের বোধগম্য ও সুখদায়ক হয়। দেখ, ইতর জাতীয়দিগের মধ্যে অনেকে প্রায় যখন কাজকর্ম্ম হইতে গৃহে ফেরে তখন কখন কখন পথে যাইতে যাইতে খরজ হইতে নিম্নকোমল নিখাদও খরজ, পরে রেখাব, পরে মধ্যম, পরে গান্ধার, পরে ষড়জ ও রেখাব পরে গান্ধার, পরে রেখাব এবং শেষে ফের খরজে শেষ;—এইরূপ অপরূপ সরল স্বরকাব্যে মনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে করিতে চলিয়া যায়। তাহাদের মুখনিঃসৃত সেই স্বর কাব্য শুনিয়া বুঝিতে পারি, তাহারা ক্লান্ত হইয়া গৃহে ফিরিতেছে। কখন তাহারা নিশীথে দলবদ্ধ হইয়া সরল ভাবে, খরজ হইতে রেখাবও মধ্যম, পরে পঞ্চম, পরে, কোমল ধৈবত, পরে পঞ্চম, পরে মধ্যম, পরে ফের কোমল ধৈবত, পরে পঞ্চম, পরে মধ্যম পরে গান্ধার ও কোমল রেখাবের ঈষৎ স্পর্শ যুক্ত খরজে শেষ; এইরূপে স্বরকাব্যালাপ করিতে থাকে; তাহাদের সেই দারিদ্র্য অবসাদময় উদাস উল্লসিত সরল স্বরকাব্যে তাহাদের অবস্থার ছবিটী যেন আমাদের নেত্রপথে আবির্ভূত হয়। আরো, নবাব সিরাজউদ্দৌলা সভা মধ্যে যখন কলাবতদিগের নানা কৃত্রিম কৌশলময় সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছিলেন এমন সময়ে দূর হইতে রামপ্রসাদের সরল ভক্তিপূর্ণ হৃদয়নিঃসৃত সঙ্গীত শুনিয়া একেবারে বিমোহিত হইয়া গিয়াছিলেন। সরল সঙ্গীতে দুর্জ্জন সজ্জন হয়; দস্যু দস্যুবৃত্তি ভুলিয়া যায়।

সকল বিষয়ে অকপট ঋজুভাবকে

আমাদের অন্তরের মন্ত্র করা উচিত; তাহা করিলে কর্ম্ম কার্য্যের কণ্টক সমুহ সহজে দূরীভূত হইয়া যায়, কর্ম্মকার্য্য সহজ, মধুর, সুন্দর হয়। প্রাচীন ভারতের অধিবাসীরা বর্ত্তমান ভারতবাসীদিগের অপেক্ষা ঋজুমন্ত্র অনেকটা—প্রাণ ভরিয়া ধারণ করিতেন, মুক্তভাবে সকল বিষয় আবিষ্কার করিতেন—মনুষ্যের যাহা স্বাভাবিক তাহাই বস্তুতঃ তাঁহারা শিরোধার্য্য করিতেন। তাঁহাদের যদি আমরা ভালবাসি, তাঁহাদের অনুকরণ করিতে যদি আমাদের একান্ত বাসনা হয় তাহা হইলে আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য সরল হওয়া। সরল হইয়া তাঁহারা কাজ করিতে চেষ্টা করিতেন, সরল হইয়া তাঁহারা সঙ্গীতের উন্নতি সাধন করিতেন, কোন সঙ্গীতকে একেবারে অবহেলা করিতেন না, সকল সঙ্গীত হইতে সারসংগ্রহে যত্নবান্ থাকিতেন। পরের নিকট হইতে সার—সত্যগ্রহণে তাঁহারা কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহারা নিজে যে জ্যোতিষ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার উপরে, রোমকদিগের নিকটে জ্যোতিষের কিছু সত্য দেখিলেন, অমনি তাহা অকাতরে গ্রহণ করিলেন। সত্যের প্রতি তাঁহাদের কেমন অটল শ্রদ্ধা ছিল। এই মহান জগতের মধ্যে তাঁহারা সত্যের সত্য ব্রহ্মকে সকলের উপর করিয়া সকল বিষয়ের প্রতি মনোযোগ করিতেন। সকল দিক দিয়াই দেখিয়াছি প্রাচীন ভারত মহান সত্যকে হৃদয়ে আগ্রহের সহিত ধারণ করিয়া সকলকেই আপনার উদার ক্রোড়ে রক্ষা করিতে অভ্যাস করিতেন। তাঁহাদের সারল্য সত্যপ্রিয়তার বিষয় ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কতবার স্বীকার করিয়াছেন। সত্যের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকাতেই তাঁহারা উন্নত ছিলেন, সত্যের কত বল! 'ন সত্যাৎ বিদ্যতে পরম্' সত্য হইতে উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই;

> 'সত্যেন সূর্য্যস্তপতি সত্যেনাগ্নিঃ প্রদীপ্যতে।
> সত্যেন মরুতো বান্তি সর্ব্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতং।
> সত্যমাহুঃ পরোধর্ম্মস্তস্মাৎ সত্যং ন লঙ্ঘয়েৎ।'

সত্যের বলে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, সত্যের বলে অগ্নি প্রদীপ্ত হইতেছে, সত্যের বলে মরুত বহিতেছে, সকলই সত্যে প্রতিষ্ঠিত; সত্যকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কহে, সেই হেতু সত্যকে লঙ্ঘন করিবে না। এই সত্যের বলে বলীয়ান হইয়া তাঁহারা সকল বিষয়ের নব নব ভাব সকল সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেন;—সঙ্গীত ধরিয়াছিলেন, সঙ্গীতের ক্রমশঃ কত উন্নতি করিলেন, উন্মুক্ত প্রাণে সঙ্গীতের কত নূতন ভাব সকল সংগ্রহ-পূর্ব্বক নূতন নূতন রাগ রাগিণীর উদ্ভাবন করিলেন। আমাদেরও এইরূপ সত্যপ্রিয়, উন্মুক্ত হওয়া উচিত। মুক্তপ্রাণে তাঁহাদের মত সঙ্গীতের নূতন ভাব সংগ্রহে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু আজকাল এদেশে অনেকেই প্রায় তাঁহাদের প্রতিকূল ভাবেরই অনুসরণ করেন, তাঁহাদের ন্যায় স্বাধীন না হইয়া পুরাতনের প্রতি এক অলস আসক্তি অন্তরে ধরিয়া থাকেন—তাঁহারা সেই পুরাতন সঙ্গীত ছাড়া আর যেন উৎকৃষ্ট সঙ্গীত হইতে পারে না বলিয়া বোধ করেন। এটা তাঁহাদের ভারি ভুল; এই জগতের মধ্যে অনবরত সঙ্গীতের আকর্ষণ চলিতেছে, তাহার বিরাম নাই, আমরা জোর করিয়া তাহার বিরাম সম্পাদন করিব! এ কখন হইতে পারে? ইহা মনে করাই অন্যায়, ইহাতে বর্ত্তমানের হত্যাসাধন করা হয়। তাহা করিলে তো চলিবে না, বর্ত্তমানকে অগ্রে দেখিতে হইবে, তাহাকে মুখ্য করিয়া আমাদের

অতীতের দিকে গৌণদৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রাচীন ভারত তাহাই করিতেন। তাঁহারা কখনো তাঁহাদের সময়কে ভুলিয়া অতীতের দিকে মূঢ়ের ন্যায় চাহেন নাই। বর্ত্তমানের উপর তাঁহারা আগ্রহপূর্ণ—সামর্থ্য-পূর্ণ দৃষ্টি—স্থিতি—প্রাধান্য রক্ষাপূর্ব্বক, শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে অতীতের স্তবস্তুতি করিতেন। তাই, আমাদের অনুচিত যে, আমরা অলসভাবে অতীতের কোলে ক্ষুদ্র শিশুটীর মত চিরদিন মস্তক স্থাপন করিয়া বর্ত্তমানকালকে অক্ষমতার আধার শূন্যবৎ দেখি। এরূপ করিলে আমরা কোন জন্মে যৌবন লাভ করিতে পারিব না, কেবল ক্ষুদ্র শিশুটীর মত দুর্ব্বল, পরাধীন হইয়া থাকিব। এরূপ করিলে আর আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইব না। তাঁহাদের গৌরব রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহাদের প্রতি আমাদিগের শ্রদ্ধা থাকিলে, আমরা আগে যেন আমাদের বৃথা অহঙ্কার, ভাণ দূর করি ও তাঁহাদিগের যথার্থ—খাঁটিপ্রাণ টুকুর অনুকরণ করি, তাঁহাদের কতকগুলি উপর উপর অনাবশ্যক দুর্ব্বল বিষয় লইয়া থাকিলে চলিবে না। সহৃদয় হইয়া তাঁহাদের সবল অনুকরণ চাই,—তাঁহারাও নূতন নূতন সঙ্গীতের উদ্ভাবন করিয়াছেন, আমরাও নূতন নূতন সঙ্গীতের উদ্ভাবন করিব। এই রূপ শক্তিমান অনুকরণেই দেশের মঙ্গল; ইহা করিলেই তবে সঙ্গীতের আবার নব শোভা এ দেশে জাগিবে, তাহার শ্রী ফিরিবে, তাহার উন্নতির দ্বার পুনরায় নূতন আকারে খুলিয়া যাইবে! সব ঈশ্বরের রাজ্য, তিনি পূর্ণ, তাঁহার এই জগত, এই জগতে আমাদের আনন্দের জন্য তিনি সঙ্গীতের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন! তাঁহার দত্ত এই আনন্দদায়ক সঙ্গীতকে কখন গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখা যায়? মন খুলিয়া নানা প্রকারে নানা আকারে সঙ্গীত চর্চ্চা কর, নূতনকে কেন্দ্র ও পুরাতনকে পরিধি করিয়া নানারূপে সঙ্গীত আলোচনা কর দেখিবে তাহা হইলে দেশে তাহার কি মধুর জীবন্ত উন্নতি দেখা দিবে!

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সামাজিক রোগের কবিরাজি চিকিৎসা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এখন কথা হ'চ্চে এই যে, শরীরের যেমন তিনটি প্রধান উপকরণ—বাত পিত্ত কফ, সমাজেরও তেমনি বাত পিত্ত কফ আছে; কি? না সৃষ্টির দল, গতির দল, এবং স্থিতির দল। স্থিতির দল সমাজের শ্লেষ্মা;—শ্লেষ্মা বলো, জল বলো, রস বলো, মেদ বলো, সবই বলিতে পারো, কেবল ভাবটা মনে রাখিলেই হইল; ভাবটা আর কিছু না—নরম ঠাণ্ডা স্থূল এবং ভারভার। বৈদ্য-শাস্ত্রে শ্লেষ্মা তমোগুণ-প্রধান বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যথা "শ্লেষ্মা শ্বেতো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ পিচ্ছিলঃ শীতলস্তথা তমোগুণাধিকঃ" গতির দল সমাজের পিত্ত; পিত্তই বলো আর অগ্নিই বলো—একই কথা; ভাব আর কিছু না—গরম উদ্ধত এবং চঞ্চল। বৈদ্য-শাস্ত্র-মতে পিত্ত অগ্নিরই নামান্তর, যথা,

"নখলু পিত্তব্যতিরেকেনান্যোঽগ্নিরুপলভ্যতে আগ্নেয়ত্বাৎ পিত্তস্য।"

গতির দল সমাজের পিত্ত—সৃষ্টির দল সমাজের বায়ু; সৃষ্টি শব্দের অর্থ এখানে ঐশ্বরিক সৃষ্টি নহে কিন্তু মানসিক সৃষ্টি—ভাবের প্রবর্ত্তনা; যেমন কবির কাব্যরচনা একতরো সৃষ্টি; শিল্পীর শিল্পরচনা আরেকতরো সৃষ্টি যদি তাহা শিল্পীর অন্তরের ভাব হইতে উদ্ভাবিত হইয়া থাকে; বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের নূতন নূতন মনঃকল্পিত সিদ্ধান্ত তৃতীয় আর এক-তরো সৃষ্টি—এ সৃষ্টি ঐশ্বরিক সৃষ্টির উপরে এক প্রকার দাগা বুলানো। সর্ব্বাপেক্ষা খাঁটি সৃষ্টি বাতুলের প্রলাপ দর্শন, কেননা তাহার সহিত বাহ্য জগতের সম্পর্ক অত্যন্ত অল্প, তাহার বারো আনা অংশ দ্রষ্টার মনঃসম্ভূত। জগৎ-সৃষ্টি ঐশ্বরিক ব্যাপার,—তাহার কথা এখানে হইতেছে না; এখানে কেবল মানসিক সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বলা হইতেছে যে, সৃষ্টির দল সমাজের বায়ু। সৃষ্টি কি না ভাবের প্রবর্ত্তনা। বায়ু যেহেতু দেহাশ্রিত সমস্ত ব্যাপারেরই মূল প্রবর্ত্তক, এই জন্য আমি বলি যে, বায়ু সৃষ্টিশীল; সৃষ্টিশীল কিনা প্রবর্ত্তনাশীল।

বৈদ্য-শাস্ত্রের মতে বায়ু প্রবর্ত্তনা-শীলও বটে, গতিশীলও বটে, তাহার সাক্ষী -"দোষধাতু মলাদীনাং নেতা শীঘ্রঃ সমীরণঃ" "নেতা" কিনা প্রবর্ত্তনা-শীল, "শীঘ্রঃ" কিনা গতিশীল। এই স্থানটিতে বৈদ্য-শাস্ত্রের সহিত আমার মতের বারো আনা ঐক্য, চারি আনা অনৈক্য; —বৈদ্য-শাস্ত্র বলেন "বায়ু প্রবর্ত্তনা-শীল এবং গতিশীল, দুইই"; আমি বলি যে, বায়ু প্রবর্ত্তনা-শীল, পিত্ত গতিশীল। বায়ুকে এখানে গতিশীল না বলিয়া প্রবর্ত্তনা-শীল বলিবার প্রধান একটি কারণ এই যে, এখানে ধাতবিক বায়ুর কথা হইতেছে— ভৌতিক বায়ুর কথা হইতেছে না; ধাতবিক বায়ু কি? না ইংরাজিতে যাহাকে বলে Nervous fluid। এটা আপনারা বোধ করি সকলেই জানেন যে, দেশীয় ভাষায় যাহাকে বলে "বায়ু-প্রধান ধাতু" ইংরাজি ভাষায় তাহারই নাম Nervous temperament। ধাতবিক বায়ুর নানা প্রকার গুণ আছে— ইহা আমি অস্বীকার করিতেছি না, আর, তাহার সেই নানাবিধ গুণের মধ্যে একটি গুণ যে, গতি অর্থাৎ চলা-ফেরা, ইহাও আমি অস্বীকার করিতেছি না— আমি বলিতেছি কেবল এই যে, চলা-ফেরা গুণটি ধাতবিক বায়ুর এমন কোনো একটা অনন্য-সাধারণ গুণ নহে যাহা তাহার সজাতির মধ্যে আর কাহারো নাই (রক্তও তো চলে ফেরে); ধাতবিক বায়ুর (অর্থাৎ Nervous fluid এর) বিশেষত্বের পরিচয় লক্ষণ যদি কিছু থাকে, তবে তাহা আপনি চলা ফেরা নহে কিন্তু অন্যকে চালানো ফেরানো। শরীরাভ্যন্তরে যেখানে যতপ্রকার গতি আছে (যেমন হৃৎপিণ্ডের সংকোচ-বিকোচ, নাড়ীস্পন্দন, হস্তপদ পরিচালন ইত্যাদি) সমস্তেরই মূলপ্রবর্ত্তক ধাতবিক বায়ু (কিনা Nervous fluid)। এইটি এখানে সবিশেষ দ্রষ্টব্য যে, গতি স্বতন্ত্র এবং গতির প্রবর্ত্তনা স্বতন্ত্র; গতি অশ্বের ধর্ম্ম — প্রবর্ত্তনা সারথির ধর্ম্ম; অতএব এটা যখন স্থির যে, ধাতবিক বায়ুর ভেদ-পরিচায়ক গুণ গতি নহে কিন্তু গতির প্রবর্ত্তনা, তখন বায়ুকে গতিশীল না বলিয়া প্রবর্ত্তনা-শীল বলাই যুক্তিসিদ্ধ।

বায়ুকে আমি বলি প্রবর্ত্তনা-শীল, পিত্তকে আমি বলি গতিশীল। কেন? না যেহেতু বৈদ্য-শাস্ত্রের মতে "পিত্তব্যতিরেকেনান্যোহগ্নিরুপলভ্যতে" পিত্ত অগ্নিরই নামান্তর; পিত্ত-রূপী অগ্নিকে কে উত্তেজিত করে? না বায়ু; যেহেতু বৈদ্য-শাস্ত্রমতে বায়ু দেহাশ্রিত যাবতীয় ব্যাপারেরই মূল প্রবর্ত্তক। তবেই হইতেছে যে, বায়ু উত্তেজক—অগ্নি উত্তেজিত; বায়ু প্রবর্ত্তক—অগ্নি প্রবর্ত্তিত; বায়ু চালক—অগ্নি চালিত। এখন জিজ্ঞাসা করি যে, গতিশীল কে? যে চালায় সে গতিশীল—না যে চলে সে গতিশীল? সারথি গতিশীল না অশ্ব গতি-শীল? বায়ু প্রবর্ত্তক সুতরাং সারথি-স্থানীয়—পিত্ত প্রবর্ত্তিত সুতরাং অশ্ব-স্থানীয়; কাজেই দাঁড়াইতেছে যে, পিত্ত গতিশীল, বায়ু সৃষ্টি-শীল—কিনা প্রবর্ত্তনা-শীল।

ক্রমশঃ।

প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য চারি টাকা।

সরোজিনী নাটক। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, পঞ্চম সংস্করণ, মূল্য এক টাকা।

পাগলের পাগলামী, প্রথম ভাগ, শ্রীযুক্ত যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মহাদেবপুর, মূল্য চারি আনা।

পাঠকগণকে এই পাগলের পাগলামীর নমুনা দিতেছি:

"মন কাণা তুই কি করিলি।
এই যে গজমতী ত্যাগ করিয়ে কাণা কড়ি কাণে দিলি।
গুরু দিলেন কর্ণভূষণ, জগতের অমূল্য-রতন,
অযতনে হায়রে সে ধন, হেলায় হারাইলি;
পর্লিনাকো এক দিন কাণে, (একবার) ভাবলিনাকো মনে প্রাণে,
দেখলিনা নয়নের কোণে, থাকতে নয়ন অন্ধ হলি।
ডায়মনকাটা নারীর কথা, নিলি কাণে খেয়ে মাথা,
হৃদয়ে তোর রৈল গাঁথা, তত্ত্ব কথা ভুলে গেলি;
মত্ত হ'লি বিষয় সুখে, পাপের পাথর বাঁধলি বুকে,
ঝাঁপ দিলি সংসারকূপে, আপন দোষে ডুবে মলি।
বস্তু বিচার কৈ করিলি, কাঞ্চন ত্যজে কাচ ধরিলি,
সুধা ফেলে গরল খেলি বিষের কৃমি হলি;
জান্‌বি সে দিন আসল নকল, একলা যে দিন হবে বিকল,
বুঝবি সে দিন শমনের বল, ছাড়বে না তোয় পাগল বলি।"

নীতি গ্রন্থ (ভেয়ার ইতিবৃত্ত মূলক), ডাক্তার শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাস ঘোষ প্রণীত—মূল্য পাঁচ আনা।

ফুল (কবিতা ও গান) শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত মূল্য চারি আনা।

সংবাদ।

শ্রীমতী কুমারী ম্যানিং যিনি ভারতবর্ষের শুভ সম্পাদনে কায়মনে তৎপর সংপ্রতি তিনি রেবরেণ্ড বয়সী সাহেবের ব্রাহ্ম সমাজের (Theistic Church) অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন।

আন্দুল, আর্য্য-আত্মোন্নতি সভা। আগামী ১২ই পৌষ শনিবার এই সভার অষ্টম সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে।

ব্রহ্ম-সঙ্গীতের স্বরলিপি।

নাচারী তোড়ী—ধামার।

৫—৫—৪|৫

।২।৩।১´।

॥ সা ঃ-লঃ ঞ্ব্ সা-। । ঙ্গা -। মা -। । পা- ম/০ পা -। মা-ঙ্গা । সা- ঞ্ব্ -ঙ্গা -। -। । -। -। -লা -সা ।

॥ নূ — ত ন —। প্রা — ণ —। দা — — ও, —। প্রা — — — —। — — ণ —।

। লা -। -। সা -। । সা -। ঞা -সা -। । দা -। পা -। । মা - পা - ঙ্গা লা -। ॥

। স — — খা, —। আ — জি — —। সু — প্র —। ভা — — তে — ॥

॥ দা দা -। দা -। । র্সা সা র্লা -না র্সা । সা -। -। -। । দা দা -। দা -। । ঙ্গর্ -। র্লা- র্সা- নর্সা ।

॥ বি ষা — দ —। স ব, ক — র। দূ — র, —। ন বী — ন —। আ — ন — —।

ঞা -। -দা -। । দা -। দা দা -। । পা পা র্সা -। -। । ঞা -দা পা -। । মা -ঙ্গা -। ঙ্গা -। । ঙ্গা -। দা -। -। ।

ন্দে, — — —। প্রা — চী ন —। র জ নী — —। না — শো —। নূ — — ত —। ন — উ — —।

। পা -। -দা -। । মা - পা - ঙ্গা লা -। ॥ ॥

। যা — — —। লো — — কে — ॥ ॥

সঙ্কেতের ব্যাখ্যা।

৫—৫—৪|৫

।২।৩।১´। ৫—৫—৪|৫ আকারটির বাম পার্শ্বে যে সংখ্যাগুলি আছে, তাহার তাৎপর্য্য এই—ধামারের প্রথম তালে ৫ মাত্রা, দ্বিতীয় তালে ৫ মাত্রা ও তৃতীয় তালে ৪ মাত্রা করিয়া থাকে। আকারের দক্ষিণ পার্শ্বে যে ৫-এর অঙ্ক আছে তাহার অর্থ এই, ১ হইতে ৫ সংখ্যা পর্য্যন্ত অতি দ্রুতভাবে আবৃত্তি করিতে যে কাল বিলম্ব হয়, এই গানের প্রতি মাত্রা ততটা কাল স্থায়ী হইবে। নিম্নে যে ।২।৩।১´। অঙ্ক আছে, ইহার অর্থ এই, দ্বিতীয় তালি হইতে এই গানের আরম্ভ ও প্রথম তালিতে সম পড়ে। সমের চিহ্ন=সংখ্যা-অঙ্কের উপরে রেফ। ১´, ২, ৩, এই অনুক্রমে বরাবর তাল পড়িতে থাকিবে। ছেদান্তর্বর্ত্তী সুরগুলি এক এক তালির অন্তর্গত। এক এক কলির শেষে যুগ্ম-ছেদ বসে। একটা কলি শেষ করিয়া পুনরায় যখন আস্থায়ীতে ফিরিয়া গিয়া কোথাও থামিতে হয়, সেখানে শিরোদেশে যুগ্ম ছেদ বসে।

পুরা এক মাত্রার চিহ্ন— া; অৰ্দ্ধ মাত্রায় চিহ্ন= ঃ বিসর্গ। দেড় মাত্রার চিহ্ন=াঃ; স, র, গ, ম, প, ধ, ন এই স্বরাক্ষরগুলিতে া-কার দিলেই এক এক মাত্রা সূচিত হয়। যথা সা=একমাত্রা; সা-া দুই মাত্রা; সা-া-া তিন মাত্রা ইত্যাদি। খণ্ড মাত্রার স্বতন্ত্র চিহ্ন না দিয়া প্রায়ই এক মাত্রার সামিল করিয়া লওয়া হয়—যথা "সঃ নঃ" না লিখিয়া সনা এইরূপ লেখা হইয়া থাকে। কোন সুরের সহিত কোন সুর ঈষৎমাত্র কাল ছুঁইয়া গেলে /০ চিহ্নের দ্বারা তাহা সূচিত হয়।

"আশ"-চিহ্ন স্বরাক্ষরগুলির মধ্যবর্ত্তী ছোট কসি; মীড় চিহ্ন=সুরের নিম্নদেশে বড় কসি।

কোমল র=ল; কোমল গ=ঙ্গ; কোমল ধ=দ; কোমল ন=ঞ। উচ্চ সপ্তকের চিহ্ন=স্বরাক্ষরের উপর রেফ; খাদ সপ্তকের চিহ্ন স্বরাক্ষরের নিম্নে হসন্ত। মধ্য সপ্তকের স্বরাক্ষরে কোন চিহ্নই থাকে না।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ত্রয়োদশ কল্প
প্রথম ভাগ
মাঘ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬২।

৫৮২ সংখ্যা। ১৮১৩ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন।

দ্বিষষ্টিতম সাম্বৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ মাঘ রবিবার প্রাতঃকালের ব্রহ্মোপাসনা শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণে হইবে। ঐ দিন সর্ব্বসাধারণে প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময়ঐস্থানে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিবেন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ।

পঞ্চম উপদেশ—মনোময় কোষ।

(১৮ই চৈত্র, রবিবার, ৬১ ব্রাহ্ম সম্বৎ)

অন্নময় কোষ ছাড়িয়া প্রাণ থাকিতে পারে না; তেমনি প্রাণ ছাড়িয়া মন থাকিতে পারে না। যেখানে মন আছে, সেইখানে প্রাণ আছে; আর উভয়ের আধার জড়ময় কোষ। পশুরাজ্যে (যেমন অশ্ব) যে প্রাণ আছে, সে শরীর গড়াইতে লাগিল; অশ্বের প্রাণ রস ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া অশ্বই প্রস্তুত করিতে লাগিল। কিন্তু যখন সেই অশ্বের প্রাণের উপাদান অন্ন আবশ্যক হইল, তখন আর অশ্ব, স্থাবর পাদপের মত এক স্থানে স্থির থাকিয়াই আহার সংগ্রহ করিতে পারিল না; তাহাকে চলিয়া ফিরিয়া আহার সংগ্রহ করিতে হইল। এইখানে বিস্তর কৌশল—ইহারই জন্য তাহার ইন্দ্রিয় হইল; দেখিয়া শুনিয়া আহার সংগ্রহ করিতে হইবে তাই ঈশ্বর তাহাকে জ্ঞানেন্দ্রিয় দিয়াছেন; তাহাকে চলা প্রভৃতি

নানা কর্ম্ম করিতে হইবে, তাই ঈশ্বর তাহার পদ প্রভৃতি নানা কর্ম্মেন্দ্রিয় করিয়া দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত তাহার প্রাণরক্ষা করিবার জন্য জঠর পাকস্থলী প্রভৃতি মিলিয়া এক প্রাণযন্ত্র তাহার দেহের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে।

অশ্ব প্রভৃতি পশুগণ দেখিয়া শুনিয়া আপনার অন্ন সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিল। সেই অন্ন যখন উদরের মধ্যে গেল, তখনই রস প্রস্তুত হইল। বৃক্ষের প্রাণ যেমন ভূমি হইতে রস সঙ্গ্রহ করিয়া বৃক্ষকে গড়িতে থাকে, তেমনি পশুর প্রাণ আপনার উদর হইতে রস লইয়া পশুকেই গড়াইতে লাগিল। এই প্রাণ থাকাতেই প্রাণময় কোষের মধ্যে মন থাকিতে পারিয়াছে। প্রাণ যদি না থাকে, মনের কার্য্য সব বন্ধ হইয়া যায়। প্রাণের উপরে মন রহিয়াছে; পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতেছে। এই মনোময় রাজ্যই জন্তুরাজ্য; ইহাই জঙ্গম রাজ্য।

তৃণ প্রভৃতি অন্ন, যাহা উদরে স্থান পাইল, তাহাই লইয়া প্রাণ শরীরকে পোষণ করিতে লাগিল। কিন্তু ভাবিয়া দেখ যে, প্রথম যদি তৃণ গুল্ম প্রভৃতি প্রস্তুত না হইত, তবে পশুরা অন্ন সংগ্রহ করিয়া আপনাদিগকে পোষণ করিতে পারিত না। এইখানে লক্ষ্য দেখা যাইতেছে—সূর্য্য না থাকিলে যেমন গাছ প্রভৃতি থাকিতে পারিত না, সেইরূপ গাছ প্রভৃতি না থাকিলে জীব জন্তু থাকিতে পারিত না। ছোট কীট যেমন অল্প রসেই সন্তুষ্ট হয়, তেমনি হস্তী প্রভৃতি বড় বড় পশুদিগের বিস্তর রস আবশ্যক; তাই ছোট ছোট কীটদিগের নিমিত্ত তৃণ প্রভৃতি হইল, আর বড় বড় পশুদিগের নিমিত্ত বড় বড় বৃক্ষ উৎপন্ন হইল। আবার ঈশ্বর বড় বড় পশুদিগকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ হইতে আহার সংগ্রহ করিবার উপযুক্ত অঙ্গও প্রদান করিয়াছেন।

মনোময় কোষেও ক্রমোন্নতি দেখা যায়। প্রথমে কীটাণু; ক্রমে ক্রমে অঙ্গের উন্নতি হইল, মেরুদণ্ডবিহীন জন্তু হইল; ক্রমে আরও উন্নতি, মেরুদণ্ডবিশিষ্ট জন্তুর সৃষ্টি হইল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে মাথার মস্তিষ্কেরও উন্নতি হইতে লাগিল। তৃণ বৃক্ষাদির যেমন ক্রমোন্নতি ও বিচিত্রতা, পশুরাজ্যেও সেইরূপ। এই সকলে ঈশ্বরের জ্ঞানের কেমন স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি যেমন প্রকৃতি রাজ্যে কার্য্যকারণে বদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতেছে, বৃক্ষলতা প্রভৃতি প্রাণীরাজ্য যেমন প্রকৃতিরাজ্যে কার্য্যকারণে বদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতেছে, সেইরূপ পশু প্রভৃতি মনোময় রাজ্যও প্রকৃতিরাজ্যে কার্য্য কারণে বদ্ধ হইয়াই কার্য্য করিতেছে।

যত কিছু বলিতেছি, আর যাহা কিছু বলিব, তাহার বীজ এই যে, ঈশ্বর, তিনি আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছেন; এবং সেই ইচ্ছাতেই সকল জগত নিয়মিতরূপে নিয়ত চলিতেছে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

শান্তিনিকেতনে মঠপ্রতিষ্ঠা।

ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ের বোলপুর নামক ষ্টেশনের অনতিদূরে শ্রীমৎ মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের শান্তিনিকেতন নামে এক সুন্দর উদ্যান আছে। এই উদ্যানের চারিদিকে যোজনব্যাপী সুবিস্তৃত প্রান্তর ধূধূ করিতেছে। মহর্ষি অনেক অর্থ

ব্যয়ে—এই উশর প্রান্তরে বৃক্ষাদি রোপণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই উদ্যানের নির্জ্জনতা ধর্ম্মসাধনের বিশেষ অনুকূল। শ্রীমৎ মহর্ষি অনেক কাল ধরিয়া এই নির্জ্জন কাননে ধ্যান ধারণা অভ্যাস করেন। লোকালয়ের বহুদূরে প্রশান্ত প্রান্তরস্থিত তপোবন চিরকালের জন্য মহর্ষির যোগসাধন এবং তপশ্চর্য্যার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। আজ কয়েক বৎসর হইল মহর্ষি সর্ব্ব সাধারণের নির্জ্জনে ব্রহ্মসাধনের জন্য এই শান্তিনিকেতন উৎসর্গ করিয়াছেন। এবং যাহাতে ব্রহ্মপিপাসুমাত্রেই এখানে থাকিয়া ঈশ্বরে যোজিতচিত্ত হইতে পারেন, তাহার জন্য বিশ্বস্ত অধিকারী নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের হস্তে ব্যয় নির্ব্বাহোপযোগী বিষয় ন্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। মহর্ষির উদ্দেশ্য ইতিপূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ট্রষ্টডীডে অর্থাৎ বিশ্বস্ত অধিকারী নিয়োগ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহার মর্ম্ম ব্রাহ্মসাধারণে অবগত আছেন।

শান্তিনিকেতনে নূতন ব্রহ্মোপাসনা মন্দিরের ভিত্তি-স্থাপন কার্য্য গত বৎসর সুসম্পন্ন হইয়াছিল। এত দিনে মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়াছে। বিগত ৭ই পৌষ ঈশ্বরের প্রসাদে ঐ মঠপ্রতিষ্ঠার কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। এই শুভদিনে শুভক্ষণে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই মন্দির বিচিত্র বর্ণের কাচ ও লৌহে নির্ম্মিত। চারিদিকে প্রস্তরময় সোপানশ্রেণী। উহার পূর্ব্বদিকে উন্নত পঞ্চ চূড়া। ঐ পঞ্চ চূড়ার শীর্ষদেশে "ওঁ" "তৎ" "সৎ ঋতং সত্যং" এই কয়েক-কথা সুবর্ণাক্ষরে দীপ্তি পাইতেছে। গৃহের দ্বার লৌহময়। ফলত মন্দিরে দৃঢ়তা ও সৌন্দর্য্য উভয়ই তুল্য রূপে রক্ষিত হইয়াছে। মন্দিরের বহির্দ্দেশ অপেক্ষা ভিতরের সৌন্দর্য্য মন প্রাণ সমধিক আকর্ষণ করে।

এই মঠ প্রতিষ্ঠাকার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য মহর্ষি ব্রাহ্ম সাধারণকে আহ্বান করিয়াছিলেন। ৬ পৌষ রবিবার অপরাহ্ণে সকলে হাবড়া হইতে যাত্রা করিলেন। যাত্রীর সংখ্যা ৫০ জন হইবেক। সন্ধ্যার পরেই বোলপুরে গাড়ী উপস্থিত হইল। ষ্টেসনে যাত্রীগণের বস্ত্র ও শয্যাদি লইয়া যাইবার জন্য শকট রক্ষিত হইয়াছিল। রেলগাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া কেহ বা পদব্রজে কেহবা শকট আরোহণে শান্তি নিকেতনাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বেই সকলে মহর্ষির উদ্যানে আসিয়া পেঁৗছিলেন। এখানে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সকলকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন।

পরদিন প্রত্যূষেই প্রান্তরের নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিয়া সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ক্রমে মন্দির প্রতিষ্ঠার নির্দ্দিষ্ট সময় আসিয়া পড়িল। সকলে একত্রে মিলিয়া বিনীত ভাবে শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে অট্টালিকা হইতে মন্দিরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। বেহালা হইতে আগত কয়েক জন ব্রাহ্মবন্ধু মৃদঙ্গযোগে "প্রাণ ভরে আজ গান কর, ভবে ত্রাণ পাবে আর নাহি ভয়" গাহিতে গাহিতে অগ্রে চলিলেন। মন্দিরের দ্বারে আসিবা মাত্র কীর্ত্তন থামিল। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ওজস্বিতার সহিত নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠাপত্র পাঠ করিয়া মন্দিরদ্বার ভক্ত সাধকের ও উপাসকের জন্য উদ্ঘাটিত করিলেন।

প্রতিষ্ঠা পত্র।

"অদ্য সর্ব্বসাক্ষী পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের কৃপা স্মরণ পূর্ব্বক এই শান্তিনিকেতন আশ্রমস্থ নূতন ব্রহ্মমন্দিরের দ্বার জাতি বর্ণ অবস্থা নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর ও সকল সম্প্রদায়ের মনুষ্যগণের ব্রহ্মোপাসনার জন্য উন্মুক্ত হইল। এই শান্তিনিকেতনে অপর সাধারণের এক জন অথবা অনেকে একত্র হইয়া নিরাকার এক ব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারিবেন। নিরাকার এক ব্রহ্মের উপাসনা ব্যতীত কোন সম্প্রদায় বিশেষের অভীষ্ট দেবতা বা পশু, পক্ষী, মনুষ্যের বা মূর্ত্তির বা চিত্রের বা কোন চিহ্নের পূজা বা হোম যজ্ঞাদি এই শান্তিনিকেতনে হইতে পারিবে না। কোন ধর্ম্ম বা মনুষ্যের উপাস্য দেবতার কোন প্রকার নিন্দা বা অবমাননা এইস্থানে হইবে না। এরূপ উপদেশাদি হইবে যাহা বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতা ঈশ্বরের পূজা বন্দনাও ধ্যান ধারণাদির উপযোগী হয় এবং যদ্দ্বারা নীতি ধর্ম্ম উপচিকীর্ষা এবং সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধিত হয়। কোন প্রকার অপবিত্র আমোদ প্রমোদ হইবে না। ট্রষ্টডীডের উদ্দিষ্ট আশ্রম-ধর্ম্মের উন্নতির জন্য ট্রষ্টীগণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন, অতিথিসৎকার ও তজ্জন্য আবশ্যক হইলে উপযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ ও স্থাবর অস্থাবর বস্তু ক্রয় করিবেন এবং এই আশ্রম ধর্ম্মের উন্নতির বিধায় সকল প্রকার কর্ম্ম করিতে পারিবেন।"

অনন্তর সকলে মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া সমস্বরে অর্চ্চনা পাঠ করিলেন। তৎপরে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় এবং পণ্ডিত শ্রীঅচ্যুতানন্দ স্বামী বেদী গ্রহণ করিয়া উপাসনা কার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠা কার্য্যের উপযোগী বক্তৃতা করিলেন।

"অদ্য আমরা এখানে এই শান্তিনিকেতনে সবান্ধবে সমাগত হইয়া সুনির্ম্মল শান্তির পরমধাম পরব্রহ্মের উপাসনা-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতেছি। এই শুভ অনুষ্ঠানে আমরা আমাদের আরাধ্য দেবতা সর্ব্বশুভদাতা বিশ্ববিধাতা পরম পুরুষ পরব্রহ্মের প্রসাদ যাচ্ঞা করিতেছি; সেই তাঁহার অমোঘ কৃপাবারি যাচ্ঞা করিতেছি যাহার প্রসাদে শুষ্কতরু মুঞ্জরিত হয় এবং মরু ভূমিতে উৎস উৎসারিত হয়। অদ্য আমরা সকলে মিলিয়া একান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি প্রসন্ন হইয়া এই বিজন প্রান্তর মধ্যে তাঁহার অপার করুণার সাক্ষীরূপে তাঁহার এই উপাসনা মন্দির অটল ভাবে দণ্ডায়মান রাখুন; যেন তাঁহার পূজার পুণ্য-প্রবাহিনী স্রোতস্বতী এখান হইতে অপ্রতিহত বেগে প্রবাহিত হইয়া স্বর্গীয় শান্তি সুধায় নিত্য নিত্য পৃথিবী পবিত্র করিতে থাকে।

হে পরমাত্মন্! এই কোলাহল-পূর্ণ সুখ দুঃখময় জগৎ সংসারে তুমিই আমাদের শান্তিনিকেতন! তুমি সর্ব্বশুভদাতা—মঙ্গলের মূল প্রবর্ত্তক; তাই এই শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠানে সর্ব্বাগ্রে আমরা তোমার প্রসাদ যাচ্ঞা করিতেছি; তোমার এই চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা প্রদীপিত বিশ্ব মন্দিরে এবং তোমার প্রেম-প্রদীপিত হৃদয়-মন্দিরে তোমার অনুপম সুন্দর পবিত্র মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া নিরুপদ্রবে তোমার প্রেমামৃতরস পান করিবার মানসে এখানে যাঁহারা তৃষিত হৃদয়ে আগমন করিবেন,

তোমার সর্ব্বসন্তাপহারী মঙ্গল-চ্ছায়া যেন তাঁহাদের সকল পাপ সকল তাপ সকল শোক দূর করিয়া দেয় এবং এই পবিত্র উপাসনা-মন্দির যেন তোমার সুবিমল প্রেম-সুধার ভাণ্ডারী হইয়া সেই দেব-স্পৃহনীয় অমৃত বারিতে অভ্যাগত ভক্ত-জনের অন্তরাত্মা নিত্য নিত্য পরিতৃপ্ত করিতে থাকে। তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বেদীর পার্শ্বদেশ হইতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। শিবনাথ বাবুর ও নবীন বাবুর বক্তৃতা আমরা যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা এবং প্রিয়নাথ বাবু ও ক্ষিতীন্দ্র বাবুর বক্তৃতা সাধারণের অবগতি জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইল।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর বক্তৃতা।

অনেক দিন হইল আমার দেশে বাস-গৃহের সন্নিকটে দুই চারিজন বন্ধুর সহিত কথোপকথন করিতেছিলাম, এমন সময় এক জন বৃদ্ধা নৈবেদ্য লইয়া উপস্থিত হইল। সে কহিল যে পীড়ার সময় ভগবানকে নৈবেদ্য মেনেছিলাম, তাই আজ নৈবেদ্য লইয়া দেবোদ্দেশে যাইতেছি। সে অজ্ঞ স্ত্রীলোক, এমন স্থান পাইল না যেখানে ভগবানকে নৈবেদ্য দেয়। আমি বলিলাম ঈশ্বরের স্থান সর্ব্বত্রই। ঈশ্বরের স্থান তোমার হৃদয়ের ভিতরে। এইরূপ কথাবার্ত্তার পর চিন্তা হইল সকল দেবতার স্থান আছে, কিন্তু ঈশ্বরের স্থান পাব কোথায়। তৎপরেই মহাত্মা রামমোহন রায়কে মনে পড়িল। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে ঈশ্বরের উপাসনা মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করেন। বর্ত্তমানে অন্যূন ২২০ ব্রহ্মমন্দির ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা এ সময়ে রাজা রামমোহন রায়ের কার্য্যের গুরুত্ব বুঝিতে পারিতেছি না। তাঁহার কার্য্যের গুরুত্ব ভাবী বংশীয়েরা সুস্পষ্ট অনুভব করিবে।

আজিকার মন্দির শুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত স্বভাব ঈশ্বরের পূজার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইল। যে মহাত্মার সাধুভাবে ধর্ম্মবলে এই মন্দির সুনির্ম্মিত হইল, শারীরিক দৌর্ব্বল্য বশতঃ তিনি আজ আমারদের মধ্যে নাই! আমি যখন তাঁহার সহিত ইতিপূর্ব্বে দেখা করিতে যাই, তিনি বলিলেন, "আমি যাইতে পারিব না বটে কিন্তু আমার ছায়া তোমারদের সঙ্গে থাকিবে।"

বিষয়ী লোকেরা বলিবেন, কোথায় ব্রহ্মোপাসনা প্রচার হইতেছে? কি আশা অবলম্বন করিয়া মহর্ষি এত দূরে এত অর্থ-ব্যয়ে এই মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন? আমরা অবিশ্বাসী; কিন্তু এমন দিন আসিবে যখন ঈদৃশ মন্দির-প্রতিষ্ঠার সার্থকতা সকলে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। বিষয়ী লোকের মনে হইতে পারে বটে, কেন এত অর্থব্যয় করি। কিন্তু যিনি ইহার প্রতিষ্ঠাতা তিনি বালক নহেন, যুবা নহেন। তিনি প্রাচীন। তিনি কি আশা অবলম্বন করিয়া এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন? তাঁহার ইহাই বিশ্বাস যে ব্রাহ্মধর্ম্ম সমস্ত ভারতের ধর্ম্ম হইবে। এই জন্য তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি কল্পে প্রচুর ব্যয় করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন।

অনেকে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিদ্রূপ করেন; ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হন। কিন্তু আমরা সাহসের সহিত ব-

লিতে পারি দুই দুই চার যেমন সত্য, ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশে প্রচার হইবে, তেমনই সত্য। বর্ত্তমানে সমস্ত লোকের মনে অশান্তি আসিয়া পড়িয়াছে; সকলেই যেন সত্য ধর্ম্ম জানিবার জন্য ব্যাকুল। প্রচলিত ধর্ম্ম সাধারণের বিশ্বাস আর আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। আমারদের এই ভারতবর্ষে চিরকালই বিরুদ্ধ শক্তি বর্ত্তমান। যখন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠিল, শঙ্করাচার্য্য ভারতে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং নিজ প্রতিভা-বলে বৌদ্ধধর্ম্মকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য যে ভাবে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, আমারদের সে পদ্ধতি অবলম্বন করিলে চলিবে না। আমাদের পথে নূতন চিহ্ন। তাঁহার পদ্ধতি বর্ত্তমানে উপযোগী নহে। শঙ্করাচার্য্য পণ্ডিতমণ্ডলীকে তর্ক যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমানে সাধারণ লোকে ধর্ম্মক্ষেত্রে যোগ দিয়াছে। এখনকার লোক বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য জানিবার জন্য সেরূপ ব্যাকুল নহে। পাশ্চাত্য জগতের বিজ্ঞানের সঙ্গে এদেশে নাস্তিকতা আসিয়া পড়িতেছে। প্রাচীন কুসংস্কার ও নবীন নাস্তিকতার সঙ্গে আমাদিগকে সংগ্রাম করিতে হইবে। জগৎকে দেখাইতে হইবে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে উভয়েরই শান্তি হইতেছে। এমন অনেক লোক আছেন তাঁহারা বিষয় কার্য্যে এমনই ব্যতিব্যস্ত এবং সমস্ত দিন এত বিষয় চিন্তা করেন যে তাঁহাদিগকে রাত্রে ঘুমের ঔষধ সেবন করিতে হয়। এইরূপে তাঁহারা ধর্ম্মের ভয় পরলোকের চিন্তা মন হইতে দূর করিয়া দেন। কিন্তু যখন প্রাণ জুড়িয়া তাপ হইবে তখনই ধর্ম্মের দিকে লোকের মন আকৃষ্ট হইবে এবং ধর্ম্ম প্রচার হইবে।

আমি একদিন প্রাতঃকালে বেড়াইতে গিয়া দেখি, এক পশুর মৃতদেহের উপরে দুই একটি পাখী বসিয়াছে। প্রত্যাবর্ত্তনের সময় দেখি ৫। ৭টি পাখী জমিয়াছে। বৈকালে গিয়া দেখি ৪০। ৫০টি পাখী আসিয়াছে। যাহারা প্রথমে আসিয়াছিল, তাহারা কিছু অপরগুলিকে সংবাদ দিতে যায় নাই। শেষের পাখীগুলি ভাবিল, যখন প্রথমাগত পাখীগুলি মৃতদেহে বসিয়া রহিয়াছে, তখন অবশ্যই তাহারা কিছু পাইয়াছে, এই জন্য তাহারা আপনা হইতে আসিল, তাহাদিগকে আর সংবাদ দিতে হয় নাই।

ব্রহ্মনামে পাপ যন্ত্রণা চলিয়া যায়, আরাম ও শান্তি হৃদয়ে আবির্ভূত হয়; তৃষিত উদ্বিগ্ন ও ভারাক্রান্ত হৃদয় শীতল হইয়া আইসে। ব্রহ্মোপাসনাকে সকলে গৃহে প্রতিষ্ঠিত কর। তদ্ভিন্ন কোন মতেই জয় যুক্ত হইতে পারিবে না।

কতকগুলি লোক নদীর ধারে দণ্ডায়মান হইয়া অপর সকলকে পারে যাইবার জন্য আহ্বান করিতেছে। কিন্তু যাহারা ডাকিতেছে, তাহারা নিজে নৌকায় আরোহণ করিয়া পরপারে যাইতেছে না। এরূপ আচরণে সাধারণের অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা উদ্দীপ্ত হয়। আমরা যেন ব্রাহ্মধর্ম্মকে ঐহিক ও পারত্রিক সম্বল করি। ইহা দ্বারা রিপুদমন হইবে, প্রবৃত্তির প্রতিকূলে আমরা দাঁড়াইতে সমর্থ হইব; সামাজিক দোষ অপসারিত হইবে, দৈনিক জীবন উন্নত হইবে। দুর্গতি ও ক্লেশ চলিয়া যাইবে। সেই বলে দেশ জয় হইবে, চিত্ত আকৃষ্ট হইবে। দৃঢ় বিশ্বাসে মানবের হৃদয় ফিরে। দেশের মধ্যে ঈশ্বরের নাম প্রচারিত হয়। হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রীর বক্তৃতা।

মঙ্গলময় পরমেশ্বরের করুণায় অদ্য এই যে ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল, ইহা স্বজাতীয় পবিত্র ব্রহ্মোপাসনা-মন্দির নির্ম্মাণের ইতিহাসে এই প্রথম অঙ্ক। ঋষিরা যখন আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ পরমাত্মার উপাসনা করিতেন, অরণ্য গিরি কন্দরের মুক্ত স্থানে বসিয়াই তাঁহারা তাহা করিতেন। পূর্ব্বে ব্রহ্মোপাসনা গৃহত্যাগীগণেরই একমাত্র অধিকৃত বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু জ্ঞান, ধর্ম্ম ও অবস্থার উন্নতি সহকারে এখন তাহা ব্রাহ্মসমাজের যত্নে গৃহীরও অধিকারভুক্ত হইয়া সংসারে আগমন করিয়াছে। এখন প্রত্যেক গৃহই ব্রহ্মোপাসনার জন্য উন্মুক্ত এবং প্রত্যেক গৃহী ব্যক্তিই পরব্রহ্মের উপাসনার অধিকারী। কিন্তু গৃহের কোলাহলের মধ্যে থাকিয়া চিত্ত সংযম করা ও নির্ম্মল ব্রহ্ম-সহবাস-সুখ অনুভব করা সকলের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং সংসারীর জন্য সংসারের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়া এমন একটি স্থানের প্রয়োজন যেখানে বসিলে সহজে মনে পবিত্র ভাবের উদয় হয়, চিত্ত সমাহিত ও প্রেম ভক্তিতে সিক্ত হইয়া সেই পরম পিতা পরমেশ্বরের চরণতলে ধাবিত হয় এবং তাঁহাকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। যেমন অন্নবস্ত্রাদি গৃহ-সামগ্রী আহরণের জন্য গৃহের আবশ্যক, সেইরূপ নির্ম্মল শান্তি ও পবিত্র ধর্ম্মভাব উপার্জ্জনের জন্য বিজন প্রদেশে রম্য আশ্রম ও পবিত্র ব্রহ্মোপাসনা-মন্দিরের প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মন্দিরে প্রবেশ করিলে সহজেই মনে হয় যে, "ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্যশঃ" তাঁহার কোন প্রতিমা নাই যাঁহার নাম মহদ্যশঃ। এই মন্দিরে প্রবেশ করিলে সহজে মনে হয় যে, "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ" না তিনি জন্মেন, না তাঁহার মৃত্যু আছে; তিনি কোথাও হইতে আসেন নাই এবং কিছুই হন নাই। এই ব্রহ্মমন্দিরের অধিষ্ঠাতৃ দেবতার করুণা যেমন সকল মনুষ্যের প্রতিই সমান, সেইরূপ সেই এক ব্রহ্মরূপ পরম তীর্থে গমন করিবার জন্য সকল মনুষ্য আপনার উচ্চ নীচ ভাব বিস্মৃত হইয়া এখানে মিলিত হইবেন, এক সঙ্গে সখ্যভাবে কথা কহিবেন, এক সঙ্গে সকলের হৃদয় সকলে জানিবেন এবং এক ব্রহ্মের অনুরাগী হইয়া আপনার অক্ষয় মুক্তির পথে অগ্রসর হইবেন। এই মন্দিরের প্রাঙ্গণ হইতে সম্প্রদায়-বিদ্বেষ দূর হইয়া এবং জন্মার্জ্জিত কুটিল কুসংস্কারসকল চলিয়া গিয়াও স্বজাতি ভাবের ও স্বজাতি প্রেমের কিছুমাত্র খর্ব্বতা হইবে না, বরং আরো উদার বিশুদ্ধ প্রেমে রঞ্জিত হইয়া জাতীয় গৌরবকে বর্দ্ধিত করিবে। অগ্নিহোত্রী বৈদিকের অগ্নির ন্যায় অহরহ এই মন্দিরে জ্ঞান ও পুণ্যের জ্যোৎস্না প্রদীপ্ত থাকিবে।

প্রথমে কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া এই শান্তিনিকেতন আশ্রম এখানে নির্ম্মিত হইয়াছিল হয় তো তাহা অনেকেই জানেন না। পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিমালয়ে তপস্যা করিয়া যখন বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করিলেন ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে মন প্রাণ অর্পণ করিয়া দিবা রাত্র পরিশ্রম করিতে লাগিলেন তখন হইতে এ দেশে তাঁহার নিজের একান্ত সাধনের জন্য একটি নির্জ্জন স্থানের আবশ্যক হয়। তিনি অনেক স্থানের প্রাকৃতিক ভাব পরীক্ষা করিয়া অবশেষে মানব-কোলাহল শূন্য

প্রসারিত নীল আকাশব্যাপী এই উচ্চ ভূমিখণ্ডকে তদুপযোগী মনে করিয়া এখানে এই বনস্পতি লতা পুষ্প শোভিত আশ্রম প্রস্তুত করেন। তিনি সংসারের তীব্রতা এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের অতিরিক্ত পরিশ্রম হইতে আপনাকে বিরাম দিয়া সেই শান্তং শিবং সুন্দরং পরমেশ্বরের শান্তিময় ক্রোড়ের শীতল ছায়ায় বসিয়া অমৃত পান করিবার মানসে মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া ব্রহ্মসাধন করিতেন। ঐ যে সপ্তপর্ণ বৃক্ষতলে শ্বেত প্রস্তরের বেদিকা নিরীক্ষণ করিতেছ, উহাই তাঁহার যোগাসন। আর এই যে নির্জ্জন রম্য উদ্যান ও দিগন্তপ্রসারী ঐ মাঠ, উহাই তাঁহার প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে ব্রহ্মদর্শনের ক্ষেত্র ও বিচরণ ভূমি।

তিনি এখন জরাজীর্ণ শরীরে ব্রহ্মলোকের যাত্রী হইয়া তাঁহার প্রিয়তম পরমেশ্বরের আহ্বানের প্রতি অপেক্ষা করিতেছেন। এই সন্ধিক্ষণে—এই অমৃত মুহূর্ত্তে তাঁহার মনে এই মঙ্গল ইচ্ছার উদয় হইল যে "সংসার তাপে উত্তপ্ত ও বিবিধ কার্য্য ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া আত্মার দীপ্তি প্রচ্ছন্ন হইলে যেখানে গিয়া আমি সে সমস্ত অপনয়ন করিতাম ও অমৃতময়ের প্রেমমুখ সন্দর্শন করিতাম, যেখানে বসিয়া আরাধনা করিলে ঈশ্বরের শান্তং শিবমদ্বৈতং ভাব সহজে আত্মায় প্রতিভাত হয়, সেই স্থানে সাধন ভজন করিয়া আমার ন্যায় যাহাতে ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল চিত্ত অন্যান্য নর নারীও তাঁহার প্রেমমুখ দর্শন করিতে পারেন তাহার পথ মুক্ত করিয়া দিই।" এই ভাবিয়া ইহার তিন বৎসর পূর্ব্বে এই শান্তিনিকেতন আশ্রম তিনি সর্ব্বসাধারণের ব্রহ্মোপাসনার উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছেন। এখন আবার তাহার সঙ্গে এই পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরের যোগ করিয়া দিয়া আশ্রমকে পূর্ণাঙ্গ করিলেন।

অদ্য ৭ই পৌষ। এই দিন ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে একটি বিশেষ দিন। ব্রাহ্ম নাম এবং ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষার প্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়া মহর্ষি স্বয়ং এই দিনে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই শুভ দিনকে এবং সেই কল্যাণকর ঘটনাকে স্মরণ রাখিবার জন্যই অদ্য আমরা সকল বন্ধু বান্ধবে মিলিয়া এই মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসবে ব্রহ্মোপাসনা করিয়া ধন্য হইলাম। আর যাঁহারা এখন হইতে এখানে আসিয়া সাধন ভজন করিবেন তাঁহারাও ধন্য হইবেন। আমাদের বিশ্রুত পূর্ব্বকালের তপোবনেরই সদৃশ এই আশ্রমের প্রভাব। এখানে কোন প্রকার ধর্ম্মবিদ্বেষ বা সম্প্রদায় কোলাহল প্রবেশ করিতে পারিবে না। ঈশ্বর বোধে অচেতন মৃৎ প্রস্তরাদির বা কোন প্রকার প্রতিমূর্ত্তির বা চিহ্নের পূজা এখানে হইবে না। যিনি সকল বিশ্বের স্রষ্টা, পাতা, সকল পাপ সকল জ্বালা যন্ত্রণার নিবারক ও শান্তি মঙ্গলের হেতু জ্ঞান স্বরূপ পরমেশ্বর, পবিত্র মনে তাঁহারই উপাসনা অহরহ এখানে হইতে থাকিবে। চিত্ত কলুষিতকারী কোন প্রকার কুৎসিত আমোদ বা আলাপ করিবার জন্য ইহার দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবে না। হৃদয়বিদারক প্রাণিহিংসা বা আমিষ ভোজন করিয়া এখানকার পবিত্রতা নষ্ট করা হইবে না। এখানকার বায়ু যেমন নির্ম্মল, এখানকার আকাশ যেমন মুক্ত ও বিশাল, সেইরূপ পবিত্র ও ভূমা আনন্দময় পরমেশ্বরের উপাসনা অহরহ হইতে থাকিবে। অতিথি অভ্যাগত জনেরা সম্মানের সহিত গৃহীত হইবেন। শ্রদ্ধার সহিত উপস্থিত হইলে সেই জ্ঞান-পিপাসুকে

ব্রহ্ম-বিদ্যা ও ধর্ম্ম-নীতির উপদেশ দেওয়া হইবে। অদ্য এই যে এতগুলি ধর্ম্মপরায়ণ সাধুভক্ত আসিয়া এখানে এই পরম মহেশ্বরের গুণানুকীর্ত্তন ও তাঁহার চরণতলে প্রার্থনা করিলেন, তাহার বলে ব্রহ্মকৃপা আবির্ভূত হইয়া চিরকালের জন্য এখানে শান্তিবিধান করিতে থাকিবে। এই স্থান ধন্য হইল। এই স্থান গৃহী সন্ন্যাসী সকলের পবিত্র তীর্থ হইল। ইহা ব্রহ্ম সাধনের অতি অনুকূল তীর্থ। হে ধর্ম্মপিপাসু মনুষ্য সকল, তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য এখানে আসিয়া এই মুক্ত আকাশের নীচে, এই শুদ্ধ তপোবনে, সেই শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত-স্বভাব পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হও। তোমাদের জন্য এই শান্তিনিকেতন—এই তীর্থ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিবৃত।

এই শান্তি নিকেতন যথার্থই শান্তির আবাস-ভূমি। যে দিকে চাহিয়া দেখি, সেই দিকেই প্রকৃতির গম্ভীর প্রশান্ত মূর্ত্তি। এখানে সংসারের কোলাহল নাই, কর্ম্মের উন্মত্ততা নাই, শোকের আর্ত্তস্বর নাই, রোগের কাতরধ্বনি নাই। এখানে কেবল শান্তি—শান্তি। এই শান্তিনিকেতনে বাস করিলে অধিবাসীমাত্রেরই চক্ষু সেই শান্তিসমুদ্র পরব্রহ্মের দিকে ধাবিত না হইয়া থাকিতে পারে না। এখানে যখন মস্তকের উপরে কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র স্থিরনেত্রে আমাদিগের প্রতি চাহিয়া আমাদিগের চক্ষুকে সেই জীবনের ধ্রুবতারা পরমেশ্বরের দিকে লইয়া যায়; যখন এই দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তর হৃদয়কে সেই অনন্তস্বরূপ মহান্ পুরুষের প্রতি লইয়া যায়, তখন আর কি মৃত্যুময় সংসারের কোন কথা হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে? সেই সকল কথা এখানে মনে করিতেও যেন সঙ্কোচ আসিয়া উপস্থিত হয়। হৃদয় কেবল ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য, ব্রহ্ম ধ্যানে আপনাকে পূর্ণ করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠে। এইরূপ শান্তিময় স্থানে আসিলেই আমরা যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারি যে

"যোগী জাগে ভোগী রোগী কোথায় জাগে;

ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ রসপান,
প্রীতি ব্রহ্মে যাঁর সেই জাগে।"

ব্রাহ্মেরা যাহাতে এইরূপ তপঃক্ষেত্র নির্জ্জন পবিত্র আশ্রমে থাকিয়া ধ্যানধারণার দ্বারা ব্রহ্মের প্রতি আপনাদিগের আত্মাকে স্থির রাখিতে অভ্যাস করেন, যাহাতে তাঁহারা সংসার কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভের চেষ্টা করেন, তাহারি জন্য আমার পূজ্যপাদ পিতামহ এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং এই মঠ প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। এই আশ্রম এখন হইতে ভগবদ্ভক্ত ব্রহ্মোপাসক সাধু ব্যক্তি মাত্রেরই তীর্থস্থান হইতে চলিল।

যে স্থানেই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই স্থানই আমাদিগের তীর্থস্থান বটে কিন্তু এই শান্তিনিকেতন আমাদিগের বিশেষরূপ তীর্থ—ইহা আমাদিগের প্রত্যেককে, সংসারাতীত পরব্রহ্মে আনিবার, ব্রহ্মসাধন করাইবার এক উপযুক্ত সুন্দর আশ্রম। ব্রাহ্মসমাজ আমাদিগের ধর্ম্মশিক্ষা করিবার স্থান; শান্তিনিকেতন আমাদিগের ব্রহ্মসাধন করিবার স্থান।

ইহা আরও এক কারণে আমাদিগের তীর্থস্থান। ইহা আমার পূজ্যপাদ পিতামহের

তপঃক্ষেত্র ছিল। অন্যদেশের কথা বলিতে পারি না; আমাদের দেশে, এই ধর্ম্মপ্রধান ভারতবর্ষের মধ্যে যে যে স্থানে সাধু পুরুষগণ ধর্ম্মসাধন করিয়াছেন, সেই স্থানই তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। সেইরূপ এই শান্তিনিকেতনের নির্জ্জনতার মধ্যে কত বৎসর বাস করিয়া আমার পিতামহ-দেব ব্রহ্মসাধন করিয়াছিলেন, তাই ইহা ব্রহ্মোপাসকদিগের তীর্থস্থান হইবে, আশা হয়। হরিদ্বার, কাশী, সেতুবন্ধরামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থস্থান এখন আর আমাদিগের তীর্থস্থান বলিয়া মনে হয় না—সেই সকল স্থান মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতি নানা পৌত্তলিক ভাব সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। আমাদিগের বাহ্যাড়ম্বর-রহিত ব্রহ্মোপাসনা করিবার জন্য, নির্জ্জনে পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগ-সাধন করিবার জন্য একটা ব্রহ্মতীর্থস্থানের অভাব ছিল; এখন হইতে সেই অভাব ঘুচিয়া গেল।

এই ব্রহ্মতীর্থ সম্বন্ধে আর একটী বিষয় বিশেষ উল্লেখ যোগ্য আছে। তাহা কি, না, ইহার অসাম্প্রদায়িকতা। এই যে প্রতিষ্ঠাপত্র পাঠ করা হইল, এই প্রতিষ্ঠাপত্র হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে উদারতা, অসাম্প্রদায়িকভাব যতদূর পারা যায় রক্ষিত হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টরূপে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, জাতি, বর্ণ, অবস্থা নির্ব্বিশেষে সকল লোকেই এখানে আসিয়া ব্রহ্মসাধন করিতে পারিবেন। এই ব্রহ্মতীর্থ সম্বন্ধে কোন জাতির অথবা কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের আপত্তি করিবার কথা নাই। ভারতের প্রত্যেক অধিবাসীকে জিজ্ঞাসা কর দেখিবে যে, তাহারা সকলেই ব্রহ্মকে ভগবান্, সকলের প্রভু বলিয়া স্বীকার করিয়া পরে সাম্প্রদায়িক দেবতার পূজা করে। যে জাতির মধ্যে ধর্ম্ম আছে, সেই জাতি ঈশ্বরকে সকল দেবতার অধিদেবতা স্বীকার করিয়া পরিমিত দেবতার পূজা করে। সুতরাং ব্রহ্মতীর্থে আসিবার বিরুদ্ধে আপত্তি কোন জাতি-বিশেষ বা কোন সম্প্রদায় বিশেষের পক্ষেই সম্ভবে না। ব্রহ্মই আমাদিগের একই পিতা; আমরা সকলেই সন্তান। তাঁহার চক্ষে বিজাতীয় স্বজাতীয়, ব্রাহ্মণ শূদ্র, ধনী দরিদ্র সকলেই সমান; তিনি সকলের প্রতি সমান স্নেহদৃষ্টি রাখিয়াছেন। এই ব্রহ্মতীর্থেও সকল জাতির, সকল বর্ণের, সকল অবস্থার লোকেরই সমান অধিকার। এখন আমাদিগের উচিত যে, আমরা মধ্যে মধ্যে তীর্থ-দর্শনে আসিয়া তীর্থ-দর্শনের ফললাভ করিয়া সংসারে প্রতিগমন করি। শাস্ত্রকারগণ তীর্থদর্শনের ফল অতি মহান্ অতি উচ্চ বলিয়া বলিয়াছেন।

সর্ব্বশেষে আমরা এই আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পরমেশ্বরের নিকট এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি যে, তিনি আমাদিগের প্রতি সুপ্রসন্ন থাকুন, তিনি সুপ্রসন্ন থাকুন।

"হংসাঃ শুক্লীকৃতা যেন শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ।
ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন সদেবস্বাং প্রসীদতু॥"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।

এই শান্তিনিকেতনের পূর্ব্বাবস্থার বিষয় অনেকে অবগত নহেন। সুপ্রকাণ্ড নদীর বেগ দেখিয়া মনে হয় না যে তাহারই গর্ভে আবার নগর সংস্থাপিত হইবে। শ্রুত হওয়া যায় ইহা নরহিংসার স্থান ছিল। যেখানে গেলে চিত্ত প্রশান্ত হয়, ধর্ম্মের ভাব জাগ্রত হইয়া উঠে, সেই এই শান্তি-

নিকেতনের সপ্তচ্ছদ বৃক্ষের তলদেশ খনন করিতে গিয়া অসংখ্য নরকঙ্কাল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

পরোপকারের অপেক্ষা আর ধর্ম্ম নাই "নোপকারাৎ পরো ধর্ম্মঃ"। অন্নদান বস্ত্রদান ও ধনদানাদি বহুপ্রকার উপকারের কার্য্য আছে; কিন্তু ধর্ম্মদানের তুল্য উপকার আর নাই, শাস্ত্রে ভূমিদানাদিকে মহাদান বলে; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে ধর্ম্মদানই প্রকৃত প্রস্তাবে মহাদান। ধর্ম্মই মনুষ্যের জীবন ও ধর্ম্মই মানবের পরম ধন। গন্ধহীন পুষ্প আর ধর্ম্মহীন মনুষ্য দুই সমান ও দুই অশ্রদ্ধেয়। আমাদিগের এই ব্রাহ্মধর্ম্ম আর আর সকল ধর্ম্মের বীজ ও জীবন-স্বরূপ, যে ধর্ম্মে এই পরম ধর্ম্মের মূলবীজ নাই তাহা লবণবিহীন ব্যঞ্জনের তুল্য। এই ভারতবর্ষের অনেক লোক নানা রূপ দান করিয়া অশেষ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন সত্য বটে কিন্তু শাক্যসিংহ চৈতন্য রামমোহন রায় ইঁহারদের ন্যায় কেহই কীর্ত্তিভাজন হইতে পারেন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এ দান চির কালের জন্য অক্ষয় কীর্ত্তি হইয়া থাকিবে। ধনদানের তারতম্য হইলে দাতার উপর লোকের দ্বেষ ঘৃণা উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মদানের এমনই মহিমা যে যিনি ধর্ম্মদান করেন তাঁহার উপরে সাধারণের শ্রদ্ধা ভক্তি ও সকলের সঙ্গে তাঁহার সখ্যতা জন্মে। ইহারই জন্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আমারদের এত প্রিয় এবং এই শান্তিনিকেতন যাহা তিনি সাধারণের হিতার্থে উৎসর্গ করিলেন তাহা আমারদের নিকট এত গুরু এত মহৎ। বিশেষতঃ ধনাদি দান করিয়া লোকের আশার নিবৃত্তি করিতে পারা যায় না। যথা

"নিঃস্বোবষ্টি শতং শতীদশশতং লক্ষং সহস্রাধিপঃ লক্ষেশঃক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ। চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতিঃ ব্রহ্মাস্পদং বাঞ্ছতি ব্রহ্মা-বিষ্ণুপদং পুনঃ পুনরহো আশাবধিং কোগতঃ।"

কিন্তু ধর্ম্মধন প্রাপ্ত হইলে লোকে সর্ব্বদাই পূর্ণ পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া মহা তৃপ্তি লাভ করিতে থাকে। অপিচ দানে ধন ক্ষয় হইতে পারে, কিন্তু ধার্ম্মিকের ধর্ম্মভাব ধর্ম্মদানে আরও জাগ্রত ও প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্ম-জ্ঞান ও ধর্ম্মভাব অন্যকে দান করিবার ইচ্ছা সাধারণের অনুকরণীয়। তাঁহার এই দান স্মরণ করিয়া আইস আমরা প্রতিজনে ঈশ্বরের প্রীতি ও দয়া অনুভব করি।

অনন্তর ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া প্রতিষ্ঠা কার্য্যের উপসংহার করিলেন—

হে পরমাত্মন্! তুমি মঙ্গলময় কৃপা-সিন্ধু অখিল বিধাতা; তুমি আমাদিগকে তোমার শান্তিনিকেতনের পথে নিয়তই আহ্বান করিতেছ। সংসারারণ্যের ভয় বিপদের মধ্যেও তুমি তোমার শান্তিনিকেতনের পথ আমাদিগের জন্য উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছ; দুঃখ দুর্দিনের মধ্যেও তুমি তোমার শান্তিনিকেতনের আলোক আমাদের নয়ন সমক্ষে স্থির প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছ। পথি-মধ্যে যখন আমরা সুখসম্পদের কুসুমাস্তরণে মোহ নিদ্রায় অচেতন থাকি, তখন তুমি মাতার ন্যায় আমাদের পার্শ্বে থাকিয়া পুষ্পাচ্ছাদিত ফণীর দংশন হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছ। তোমাকে ছাড়িয়া আমরা আর কোথায় গিয়া শান্তি লাভ করিব! এ হৃদয়ের সমস্ত ধন তোমারি— অদ্য আমরা আমাদের হৃদয়ের সমস্ত ভাণ্ডার নিঃশেষিত করিয়া প্রীতি ভক্তি

কৃতজ্ঞতা তোমার চরণে ঢালিয়া দিতেছি তোমার প্রসাদ-বারিতে আমাদের সমস্ত অভাব পূর্ণ কর; যেন তোমার অমৃত বারিতে পরিপ্লুত হইয়া আমাদের অন্তর হইতে প্রেমের উৎস সহস্র ধারায় উৎসারিত হইয়া তোমার চরণ পুনঃ পুনঃ প্লাবিত করিতে থাকে।

অদ্য তুমি আমাদিগকে এখানে আনয়ন করিয়া কত না শান্তি এবং কল্যাণ বারিতে প্লাবিত করিতেছ; তাহাতে অদ্য আমরা পবিত্র এবং কৃত-কৃতার্থ হইয়া তোমার চরণে ভক্তিভরে প্রণিপাত করিতেছি, তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গীত কার্য্যে যোগদান করিয়া উপাসক মণ্ডলীকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।

উদ্যানের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত সপ্তচ্ছদ বৃক্ষের তলে মর্ম্মরনির্ম্মিত এক বেদী আছে। এখানে বসিয়া মহর্ষি শান্তিনিকেতনে অবস্থান কালীন ঈশ্বরে মনঃসমাধান করিতেন। উপাসনান্তে সাধক বৃন্দের দৃষ্টি সেই দিকেই নিপতিত হইল। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি কয়েক জন বন্ধু সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। বৃক্ষের স্কন্ধ দেশে "কর তাঁর নাম গান" ধাতু ফলকে লিখিত দেখিয়া তাঁহারদের হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িল। দশ পনর জন সাধক মিলিত হইয়া হৃদয় খুলিয়া "কর তাঁর নাম গান" এই গীতটি গাহিতে আরম্ভ করিলেন।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় স্থানীয় অধ্যাপকগণের বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল। তাঁহারা সকলেই উপাসনার সময় মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহাদিগকে যোগ্যতা অনুসারে পাথেয় ও বিদায় প্রদান করিলেন। পণ্ডিত মণ্ডলী ব্রহ্মোপাসনার গম্ভীর ও শান্ত ভাব দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন।

এদিকে দেখি শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত আর দুই চারি জন বন্ধুর সহিত সপ্তচ্ছদের নিম্নে বেদীর পার্শ্বদেশে স্তিমিতলোচনে ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। এই মর্ম্মর বেদী, শান্তিনিকেতন উদ্যান, এই নূতন মন্দির যে কি ভাবে কিরূপ দৃষ্টিতে জন সাধারণ ভবিষ্যতে অবলোকন করিবেন, তাহার পূর্ব্বাভাস পাইয়া হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইতে লাগিল। দিবা অবসান হইতে চলিল, অথচ উদ্যানের নিভৃত-দেশস্থ প্রস্তরবেদী ক্ষণকালের জন্য জনশূন্য—সাধকশূন্য দেখিলাম না। মহর্ষির সাধন-স্থান বলিয়া যেন সে কি আদরের সামগ্রী, পবিত্রতার আকর, ধর্ম্মভাবের উদ্দীপক।

বেলা দুইটার সময় ভক্তিভাজন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, দশ বার জন ব্রাহ্ম বন্ধুর সহিত কলিকাতা হইতে সমাগত হইলেন, এবং ক্ষণকাল বিশ্রামান্তে আহারাদি করিলেন।

সূর্য্য অস্তমিত হইল, ক্রমে উপাসনার সময় নিকটে আসিয়া পড়িল। দূরাগত সাধক সজ্জনকে মন্দিরের মধ্যে স্থানদিয়া মন্দিরের দ্বার অবারিত করা হইল। লোকাধিক্যে মন্দিরের বাহিরে তিলমাত্র স্থান অবশিষ্ট রহিল না।

প্রথমেই ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিলেন। প্রতাপ বাবু নিজে ব্রাহ্মসমাজের একজন পুরাতন লোক, তাঁহার বক্তৃতাতেও আমরা তাঁহার ভূরিদর্শনের বিলক্ষণ

পরিচয় পাইয়াছি। তাঁহার বক্তৃতা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বক্তৃতা।

আজকার এই আনন্দ উৎসবে দুই এক কথা বলিবার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। আমিও আহ্লাদের সহিত নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছি। এই সুন্দর স্থানে প্রশস্ত প্রান্তরের মধ্যে—এই উপাসনা গৃহে জ্যোতির্ম্ময় পরমেশ্বরের আবির্ভাব। এখানে তাঁহার প্রকাশ কি স্বাভাবিক। এখানে আসিলে চিত্ত আপনা হইতেই তাঁহার দিকে ধাবিত হয়। সমস্ত দিন আপনারা এখানে আনন্দে যাপন করিলেন। যে মহাত্মার ধর্ম্মানুরাগে আমরা সকলে আহূত হইয়া আসিয়াছি, এই স্থান তাঁহার সাধনার চিহ্নস্বরূপ। তাঁহার ধর্ম্মসাধন সম্বন্ধে অধিক বলিতে হইবে না। যদি মনুষ্যের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে তবে তাহা মহাত্মাদিগের দৃষ্টান্তে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মোন্নতির মূলে যে দুইটি কথা আছে, সে বিষয়ের আমি প্রসঙ্গ করি। প্রথমত প্রকৃতির প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ। আমরা শুনিয়াছি ঋক্-বেদের উৎপত্তি, প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ হইতে। সূর্য্য চন্দ্র জল স্থল চিরকালই রহিয়াছে, কিন্তু ভাবুক বংশ এক্ষণে লুকায়িত হইয়াছে। সেই লুকায়িত বংশের মধ্যে যখন দুই একজন দাঁড়াইয়া উঠেন, তখন তাঁহারা আমারদের ভক্তি—প্রেম আকর্ষণ করেন। আমরা যাঁহার আহ্বানে এখানে আসিয়াছি, তিনি সেই জাতীয় লোক। মঙ্গলময়ের সৌন্দর্য্যের প্রতি তাঁহার অনুরাগ যার পর নাই অধিক। আমরা চন্দ্র সূর্য্য দেখিয়াছি; কিন্তু ইহা দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ের ভাব এত উজ্জ্বল হইয়াছে, যে প্রকৃতি তাঁহার ঈশ্বরকে দেখিবার পথ হইয়াছে। তাঁহার কাছে যদি আমারদের শিক্ষার বিষয় থাকে, তবে তাহা প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরকে অনুভব করা। এই জড় সামান্য উপকরণে নির্ম্মিত। কিন্তু এই স্বভাবের ভিতর কত সত্য কত ভাব কত গভীরতা, তাহা ভাবুকই বুঝিতে পারেন। দেবেন্দ্রনাথ তাহাই উপার্জ্জন করিয়াছেন। আমরা যে কয়েকজন ব্রাহ্মসমাজে নাম লেখাইয়াছি তাহার মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে সকলেরই অগ্রণী।

কেহ কেহ বলেন ঈশ্বরকে দেখা যায় না; ইহা সত্য বটে; কিন্তু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা যায় সূর্য্যের ভিতর কি ব্রহ্মের আবির্ভাব নাই? যখন সূর্য্য বর্ণের সাগরে চারি দিককে ভাসাইয়া উঠিতে থাকেন, তখন কাহার অন্তরে ঈশ্বরের ভাব না জাগরূক হয়! যখন সূর্য্য বিশাল সমুদ্রের জলরাশিতে নিমগ্ন হইতে থাকেন তখন জড় সূর্য্যে মহাচৈতন্য মহাপ্রাণ মহাভাব কে না উপলব্ধি করে? তখন ক্ষণ কালের জন্য চিন্তা করিলে কত উচ্চ আশা কত ভাব কত প্রেম মনে জন্মিতে থাকে। তাহাকে তোমরা কি কোন জড় পদার্থ বলিবে যাহা দেখিয়া তোমার আনন্দ হয় প্রেম জাগ্রত হইয়া উঠে। তাহার মধ্যে মহাচৈতন্য মহাপ্রাণ মহাভাব ঈশ্বর বাস করিতেছেন। তিনি জড়ের মধ্যে এমনই প্রদীপ্ত এমনই জাগ্রত, যেমন তোমার জড় শরীরের মধ্যে আত্মা। যাহার হৃদয়ের ভিতরে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহার নিকটে মহাচৈতন্য মহাপ্রাণ পরমেশ্বর, জড়পদার্থের মধ্যে আপনার রূপ প্রকাশ করেন। তাহার নিকট জড় জড় থাকে না। ঋক্‌-বেদে চন্দ্র সূর্য্য বায়ু অগ্নি লইয়া পূজা; তোমরা কি

ইহাকে বাহিরের চন্দ্র সূর্য্য বায়ু অগ্নির পূজা বলিবে? প্রাতঃকালের ভিতর এমন এক মহাচৈতন্য—নীলাকাশের ভিতর এমন এক আত্মবিকাশ—জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর ভিতর এমন এক সমাচার আছে, তাহা যে শ্রবণ করে, জড় তাহার নিকট চৈতন্যময়, প্রাণময়, মহাভাব-পূর্ণ হইয়া উঠে। জড়ের মধ্যপথে কত রসজ্ঞতা, গম্ভীর জ্ঞান ও দর্শন রহিয়াছে, সেই সমুদয়েরই উপকরণ বাহ্যবস্তু। বাহ্যবস্তুর ভিতরে যে এমন সজীবতা আছে, তাহা যে অনুভব করিয়াছে সেই বলিতে পারে।

যাঁহার প্রেমনিমন্ত্রণে আমরা এখানে আসিয়াছি তাঁহার দৃষ্টান্ত এই যে, বাহিরের বস্তু—বাহিরের বস্তু নহে। ইন্দ্রিয় অপদার্থ নহে। জড়ে মহা প্রকৃতি মহা ভাব মহাপ্রাণ মহাচৈতন্য রহিয়াছেন; যাহার পরিচয় পাইলে অশান্তি ও তাপের কারণ থাকে না। মহর্ষির জীবন-ইতিহাস শেষ পরিচ্ছেদে আসিয়াছে। তাঁহার দৃষ্টান্ত এক্ষণে আমারদের সকলেরই আদর্শ! আমার প্রথম কথা এই।

দ্বিতীয় কথা। লোকে কেবল স্বভাব দেখিয়া ভাবুক হয় না; কিন্তু স্বভাবের গুণ দেখিয়া হয়। প্রকৃতি গভীর রহস্যময় বটে, কিন্তু চন্দ্র সূর্য্য দেখিয়া ব্রহ্মপিপাসা মেটে না। যিনি মন স্থির করিতে পারেন তিনিই সফলকাম হন। আমি এক সময় মহর্ষির সহিত নৌকাযোগে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম তিনি অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া ৪টার সময় হইতে ৮টা পর্য্যন্ত আকাশে সূর্য্যপ্রকাশের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু আমাদের মনের স্থিরতা নাই, হৃদয়ে আস্থা নাই। যে সূর্য্য আজ প্রশান্তভাবে কিরণরাজি বিকীর্ণ করিতেছেন, কাল হয়ত তাহা ঝড়ে সমাচ্ছন্ন হইল। যে বায়ু আজ সুমন্দ হিল্লোলে বহমান, কাল হয়ত তাহা প্রবল বেগে বহিয়া তোমার ঘরের ছাদ ভাঙ্গিল, তোমার প্রিয়জন সকলকে জলে নিমগ্ন করিয়া ফেলিল, বৃক্ষ লতা সমূহকে ধরাশায়ী করিল। যে বায়ুর হিল্লোলে তোমার শরীর শীতল হয়, কালই তাহা হইতে নগর গ্রাম উৎসন্ন হইয়া যায়। অতএব যদিও ধর্ম্মের পক্ষে প্রকৃতি মহদুপায় বলিতে পারি, কিন্তু স্থিরতা সূর্য্যও দেয় না, ফুলও দেয় না। প্রজ্ঞা কোথা হইতে পাওয়া যায়? এখানে আবার মহর্ষির দৃষ্টান্ত। তিনি স্বভাব হইতে যেমন ভাব গ্রহণ করেন, তেমনি আবার মহামান্য ঋষিবাক্য হইতে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য উপার্জ্জন করেন। আজ কাল ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে তোমারদের মারাত্মক অশ্রদ্ধা। বলদের সম্মুখে লালবর্ণ কাপড় ধরিলে যেমন সে লাফাইয়া উঠে,সংস্কৃত শ্লোক পাঠে তেমনি তোমরা উদ্দাম হইয়া উঠ। কিন্তু যে পর্য্যন্ত ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত,ধার্ম্মিকদিগের দৃষ্টান্ত, নীতির ভাব তোমাদিগকে আহ্বান না করিবে, সে পর্য্যন্ত দেশসংস্কার, ধর্ম্মপ্রচার সর্ব্বৈব মিথ্যা, কেবল বক্তৃতার ছড়াছড়ি মাত্র।

যদি ব্রহ্মলাভ, ব্রহ্মপ্রসঙ্গ, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মামৃত রসপান করিতে চাও, শ্রদ্ধাবান হইয়া ঋষিবাক্য অনুসরণ কর।

ধর্ম্মগ্রন্থ বা ধার্ম্মিক মাত্রেই যে দোষের অতীত, এমন নহে। কিন্তু পূর্ব্বমত পূর্ব্ব দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি হয় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারেও তেমনি। ধর্ম্মপ্রচার দেশ সংস্কার করিতে যাও কর, কিন্তু যদি জ্ঞানালোকে মুক্তিলাভ করিতে যাও, তবে এই পুরাতন

ভারতবর্ষে যে সাধনার স্রোত চলিয়া আসিয়াছে, যে ধর্ম্মের জ্যোতি নক্ষত্রের ন্যায় ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে, তাহারই অনুসরণ কর।

দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় স্বাধীনচেতা লোক আর নাই। কিন্তু তথাপি শাস্ত্রবাক্য হৃদয়ে রক্ষা করিতে তিনি চিরকালই যত্নশীল।

আমি অধিক কথা আর বলিতে চাহি না। আমাকে বক্তৃতা করিতে এখানে আহূত করা হয় নাই। তবে এই মাত্র বলি যে প্রকৃতিকে মন্দির জানিয়া চন্দ্র সূর্য্যকে সঙ্গী করিয়া সাধন কর। তোমার উদ্যানের ফুল তাঁহার চরণে অর্পণ কর। তোমার উদ্যান-সরোবরের পবিত্র জলে তাঁহার চরণতল ধৌত কর। প্রকৃতির ভিতরে তাঁহাকে দর্শন কর। প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র মধ্যে জীবনের চিরসখাকে দর্শন করিয়া রত্নহারের ন্যায়, স্বর্গধামের সোপানের ন্যায় ঋষিবাক্য সকলকে ধারণ কর। ব্রহ্মানুরাগে উন্মত্ত হও এবং সেই দলের লোক হও যিনি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে তোমারদের পিতা হইয়া অদ্যাপিও জীবিত রহিয়াছেন।

পরমপিতা! তোমার প্রকৃতির মধ্যে সত্য গ্রহণ করিতে আমাদিগকে শিক্ষা দাও। ঋষিবাক্য দিয়া আমারদের আত্মাকে প্রস্তুত কর। আমরা সকলে মিলিয়া তোমার পদপ্রান্তে এই প্রার্থনা করি। তোমাকে আমরা বারবার নমস্কার করি।

পরে সঙ্গীত হইয়া উপাসনা আরম্ভ হইল। রাত্রিকালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বেদী অধিকার করেন। উদ্বোধন উপাসনা বক্তৃতা একাকী তাবতই সম্পন্ন করেন। উপাসনার সময় স্তোত্র ও "অসতোমা সদ্গময়" পাঠে সাধারণে যোগ দিয়াছিলেন। শিবনাথ বাবুর বক্তৃতা বিলক্ষণ হৃদয়গ্রাহী ও সময়োচিত হইয়াছিল। তাঁহার উদ্বোধন ও বক্তৃতা আমরা নিম্নে প্রকাশিত করিলাম।

শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর উদ্বোধন।

স্থানমাহাত্ম্য বলিয়া এরূপ একটা জিনিস আছে যেখানে আমরা যাই, সেই স্থানে সেইরূপ ভাবেরই উদয় হয়। বাজারে স্বার্থপরতা উপার্জ্জনস্পৃহা ও বিষয়বুদ্ধি। বিদ্যামন্দিরের বায়ুতে বিদ্যা। সেখানে গেলে মন সন্তুষ্ট হয়, জ্ঞান-পিপাসা বর্দ্ধিত হয়। তেমনি এই শান্তিনিকেতনে যে কোন্ ভাব জাগিয়া উঠিল, তাহা আমাকে বলিয়া দিবার অপেক্ষা করিতেছে না। এইখানে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নির্জ্জন সাধন করিয়াছেন। আরামকাননের জন্য—ক্রীড়া কৌতুকের জন্য এই স্থান উৎসর্গ করা হয় নাই। ধর্ম্মার্থীগণের ধর্ম্মসাধনের জন্য ইহা উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। এই শান্তিনিকেতনে মহাত্মার সাধনের স্মৃতি পড়িয়া আছে। এখানে আমরা সংসারের সকল চিন্তা ভুলিয়াছি। প্রাতঃকাল হইতে ধর্ম্মভাব ক্রমিকই জাগ্রত হইতেছে। আজ উদ্বোধনের প্রয়োজন নাই। মহাত্মার নাম মহাত্মার সাধন সেই শুদ্ধবুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনার জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত করিয়াছে। আজ সকলে সেই মহাত্মার পবিত্রভাব চিন্তা করুন—স্মরণ করুন। এবং সকলে মিলিয়া সেই অতিপবিত্র অতিমহান পরমেশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত হউন।

শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রীর বক্তৃতা।

মহর্ষির জীবনের দুইটি গভীর কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু এখনও আর একটি কথা অবশিষ্ট আছে। যাঁহারা তাঁহার

ব্যাখ্যানমালা মনোযোগ করিয়া পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা অনুভব করিয়া থাকিবেন, তিনি একটি কথা বিশেষ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অন্যান্য কথা তিনি তত সুস্পষ্টরূপে বলিয়া উঠিতে পারেন নাই।

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্।”

যিনি অনিত্যের মধ্যে নিত্য, চেতনের মধ্যে একমাত্র চৈতন্য স্বরূপ, যিনি এক হইয়া তাবতের কাম্যবস্তু বিধান করিতেছেন, তাঁহাকে যে ধীরেরা আত্মস্থ করিয়া জানে তাহারদের শাশ্বত শান্তি হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না। (৭১ শ্লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম)। মহর্ষি বলেন প্রকৃতি—বাহ্য জগৎ তাঁহার অনুরূপ, কিন্তু আত্মার মধ্যে তাঁহার স্বরূপ সম্ভোগ করিতে হইবে। আত্মার মধ্যে পরমাত্মা দর্শন করা, তাঁহার সর্ব্বোচ্চ ভাব। ইহারই জন্য তিনি হিমালয়ে গমন করেন। শান্তিনিকেতনে বাস করিয়া নির্জ্জন সাধন করেন। তিনি নির্জ্জনতার প্রিয় ছিলেন। তিনি বলেন ব্রহ্মকে দর্শন করিবার জন্য সংসার ছাড়িতে হইবে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন “ব্রহ্মনিষ্ঠোগৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ। যৎ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তৎ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ”। ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ গৃহস্থ হও এবং যে যে কর্ম্ম কর তাহা পরব্রহ্মে সমর্পণ করিও! বিষয়ের কোলাহল, কার্য্যের উদ্বিগ্নতার মধ্যে যদি বেড়ান যায় এবং তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া না যায়,তবে ধর্ম্মভাব কোথা হইতে উদ্দীপ্ত হইবে।

ঋষিবাক্য ও প্রকৃতির শোভা মনুষ্যের মনকে মুগ্ধ করে। এই কারণে সাধনের সময় সাধকেরা একান্তে বাস করিতেন। শাক্যসিংহ ৬ বৎসর কঠোর সাধনে সিদ্ধিলাভ করেন। নির্জ্জনে সাধন আর সজনে প্রচার। তিনি ঘোর বৈরাগ্যে প্রখর ব্রহ্মচর্য্যে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুরস্কার স্বরূপ পরিশেষে সত্যকে দেখিতে পাইলেন এবং প্রচারের জন্য ব্যস্ত হইলেন। মহম্মদ নির্জ্জনে দুই বৎসর কাল সাধন করিলেন। যখন সিদ্ধ হইলেন, তিনি মনুষ্যের মধ্যে সত্য প্রচার করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ঈশা কেবল মাত্র যে ৪০ দিন সাধন করিয়াছিলেন এমন নহে। তিনি প্রথমাবস্থা হইতেই ধর্ম্মের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। যাঁহার আহ্বানে আমরা এখানে সকলে আসিয়াছি তিনি পূর্ণ দুই বৎসর কাল হিমালয়ে বাস ও নির্জ্জনে সাধন করিয়াছেন। সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরকে সাধনা দ্বারা অর্জ্জন করিতে হইবে। তাঁহাকে লাভ করিয়া উপাসনার সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইবে। যদিও আমরা সংসারকে ছাড়িব না, তথাপি আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে নির্জ্জনে সাধন করিতে হইবে, আত্মার মধ্যে তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে। অতীব সত্য কথা, যিনি বলেন তাঁহাকে ছাড়িয়া শাশ্বত সুখ আর কিছুতে মিলে না, তাপিত হৃদয় আর কিছুতে শীতল হয় না, মর্ম্মস্থানের বেদনা আর কিছুতে যায় না। এই জন্য মধ্যে মধ্যে নির্জ্জন বাস—নির্জ্জন সাধনের আবশ্যক। মঠপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কি? মহাত্মা মহর্ষি দেখিয়াছেন যে নির্জ্জন সাধনের আবশ্যক। দরিদ্র সাধকের জন্য এরূপ স্থানের প্রয়োজন। যেখানে আমি নিজে সিদ্ধি লাভ করিয়াছি সেখানে অপরে সাধন করুক এবং সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হউক। ইহাই তাঁহার কামনা।

এইরূপে যখন প্রকৃতির মধ্যে প্রকৃতির প্রাণ, আত্মার মধ্যে আত্মার প্রাণ এবং ঋষিদিগের বাক্যে ঈশ্বরের স্বরূপ দেখিব, তখন এই ত্রিবিধ সাধনে ঈশ্বরকে লাভ করিতে সমর্থ হইব। ঈশ্বর এই ত্রিবিধ সাধনের ভাব আমারদের আত্মাতে মুদ্রিত করিয়া দিন।

হে আত্মার আত্মা সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর! তোমাকে সত্যভাবে প্রাণের প্রাণরূপে না দেখিলে চিত্ত পরিশুদ্ধ হয় না। তুমিই শান্তিনিকেতন, যখন আমরা পাপে পড়িয়া ম্লান হইব, তখন যেন তোমাকে দেখিয়া সকল তাপ দূর করিতে সমর্থ হই। প্রকৃতির মধ্যে যেন আমরা তোমাকে দেখি। সাধকের বাক্যে যেন তোমার পরিচয় পাইয়া কৃতার্থ হই। তোমার নিকট আমারদের এই প্রার্থনা।

এবেলাও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গীতে যোগদান করিয়া সর্ব্বসাধারণকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন।

এইরূপে দিবসব্যাপী উৎসবের অবসান হইল। হৃদয়ের ভার কিছু কালের মত যেন অন্তর্হিত হইল। শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে কি আতিথ্য-সৎকারে, কি অন্যাবিধ আয়োজনে কোন বিষয়ে যাত্রীবর্গের লেশমাত্র কষ্ট হয় নাই। এ সকলই ভগবানের কৃপায়।

উৎসবের উদ্বোধন।

শুভদিন আসিতেছে। আনন্দের কোলাহল শোনা যাইতেছে। উৎসবের বসন্ত বায়ু হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া শীতল করিতেছে। হৃদয়-কাননে ধর্ম্মবৃক্ষের প্রেম, ভক্তি, প্রীতির পাতাগুলি সংসারানলের প্রচণ্ড উত্তাপে শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল বটে কিন্তু উৎসবের বসন্ত বায়ু ব্রহ্মোৎসবের বার্ত্তা সঙ্গে লইয়া প্রবাহিত হওয়াতে সেগুলি পুনরায় সজীব হইবার উদ্‌যোগ হইতেছে। এই সময়ে আমাদের প্রাণপক্ষী সেই প্রাণের প্রাণকে দেখিবার জন্য কাতরস্বরে কি ডাকিবে না? এই সময়ে একবার সকলে আপনাপন অন্তরে ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখ যে, কি শুভ দিনের আগমন। মহাত্মা রামমোহন রায় ১১ই মাঘে বঙ্গদেশের কি পরম শুভদিনের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। যৎকালে বঙ্গদেশের জনসমাজ ক্রিয়াকলাপের বাহ্যাড়ম্বরে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে ও পূর্ব্বতন আর্য্য ঋষিগণের চিরসঞ্চিত ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সেই দুর্দ্দিনের সময়ে মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রহ্মোপাসনাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া বঙ্গদেশের তমোরাশি নাশ করিয়া পরম কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। সেই ব্রহ্মোপাসনার মহোৎসবের দিন প্রায় উপস্থিত। আর আমাদের মোহনিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকা কর্ত্তব্য নহে। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" উত্থান কর মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রত হও। আর কত কাল অজ্ঞানান্ধকারে পড়িয়া থাকিবে? আর বিষয় গরল পান করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িও না ও মৃত্যুর পাশে বদ্ধ হইয়া চির কালের সম্বলকে হারাইও না। সকলে জাগ্রত হও, মোহপাশকে ছিন্ন কর ও মৃত্যুকে পরাজয় করিয়া অমৃত লাভের জন্য অগ্রসর হও। অজ্ঞানই আমাদের মৃত্যু, এই মৃত্যু হইতে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় ব্রহ্মজ্ঞান। চিরদিন জ্ঞান ভক্তির সহিত ব্রহ্মোপাসনা পরিত্যাগ করিয়া ঘটপট পরমাণু লইয়া শুষ্ক হৃদয়ে অবস্থান করিলে, সুখ শান্তিলাভ করিতে পারিবে না ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে না পারিয়া অমৃতলাভে বঞ্চিত হইবে।

অনেক দিন হইতে আমরা ব্রহ্মচর্য্য ভুলিয়া গিয়া সংসারের বিষয়গরল পান করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছি। দুর্দ্দান্ত রিপুগণের আক্রমণে সংসারের পথে ভ্রমণ করিতে করিতে পাপের কণ্টকে অঙ্গ সকল ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। এই আগামী ব্রহ্মোৎসব রূপ আনন্দসাগরে মগ্ন হইলে ভগবানের কৃপাবারিতে ক্ষত সকল ধৌত

হইয়া যাইবে এবং তোমরা অকৃত অমৃত লাভে মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবে। বিষয় গরল হইতে রিপুগণের আক্রমণ হইতে ও মৃত্যু হইতে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় ব্রহ্মোপাসনা।

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়"

জীব কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে, তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" আমাদের আত্মার সম্বল। সকলে তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য ও তাঁহার উপাসনার জন্য প্রস্তুত ও যত্নবান হও। সদাচার-সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর এবং শ্রদ্ধান্বিত-চিত্তে প্রীতি-পূর্ব্বক তাঁহার আনন্দময় অমৃতময় পদে যুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা কর তাহা হইলে সংসারের সকল জ্বালা, সকল তাপ নির্ব্বাণ হইবে, পাপের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবে ও মৃত্যুকে পরাজয় করিয়া অমৃতত্ব লাভে সক্ষম হইবে। যে মানব ব্রহ্মোৎসবে আপনার প্রাণকে মাতাইতে পারে ও তাঁহাকে হৃদয়ে দর্শন করিবার জন্য ও তাঁহার প্রেমামৃত পান করিবার জন্য ব্যাকুল অন্তঃকরণে তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত হয়, সেই মানবই পরম কৃপাময় পরমেশ্বরের কৃপায় দুঃখ জ্বালা হইতে, পাপতাপ হইতে সংসারের উত্তপ্ত অনল হইতে ও মৃত্যু-মুখ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহার চির শান্তিময় অমৃতময় ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়া থাকে। আমরা ঈশ্বরের কৃপার পাত্র, তাঁহার কৃপা ভিন্ন আমাদের আর অন্য উপায় নাই। যাহাতে আমরা তাঁহার উৎসবে যোগ দিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে পারি ও তাঁহার পদে যুক্ত হইয়া শান্তি সুখ লাভ করিতে পারি, তাহার সময় আসিতেছে। এ সময় যেন বৃথা চলিয়া না যায়। তাঁহার কৃপার প্রতি নির্ভর করিয়া উৎসবের জন্য প্রস্তুত হও ও তাঁহার দর্শনলাভ করিবার জন্য ভক্তিভরে তাহার নিকট প্রার্থনা কর তাহা হইলে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুংস্বাং।"

যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে লাভ করে। পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করেন। ভগবানকে যে মানব না চায়, তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য ভক্তি-ভরে তাঁহাকে যে না ডাকে, তিনি তাঁহার কাছে প্রকাশিত হন না। তাঁহাকে যে চায়, তাঁহাকে দেখিবার জন্য যে কাতর হয়, তিনি তাহার কাছে প্রকাশিত হন।

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্। অসতোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্ম্মাঽমৃতং গময়। আবিরাবীর্ম্মএধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্॥

হে মঙ্গলময় প্রভো! উৎসবের দেবতা! নাথ! তোমার মহোৎসব আসিতেছে। দেব! তুমি আমাদের প্রাণকে জাগাও। দয়াময়! দয়া করিয়া আমাদিগকে অসত্য হইতে, মোহান্ধকার হইতে মৃত্যুমুখ হইতে ও পাপের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া তোমার জ্যোতির্ম্ময় অমৃতময় ক্রোড়ে আশ্রয় দাও। নাথ! আমরা তোমার সাহায্য না পাইলে তোমার দিকে অগ্রসর হইতে পারি না, তোমার প্রেমের হস্ত আমাদিগকে স্পর্শ না করিলে আমরা সজীব হইতে পারি না। প্রভু! তুমি আমাদিগকে কৃপা কর, তুমি দয়া করিয়া আমাদের অন্তরের মোহাবরণ দূর করিয়া আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হও। তুমি আমাদের দর্শন দাও, আমরা তোমার প্রেমমুখ দেখি ও তোমার পূজা করি। হে পতিতপাবন দীনশরণ! তুমি ভিন্ন আমাদের আর অন্য আশ্রয় নাই। তুমি আমাদের ইহকালের আশ্রয় ও পরকালের গতি। ভগবান! তুমি যে আমাদের পরম পূজনীয় সম্ভজনীয় বরণীয় দেবতা। তোমার উপাসনাই আমাদের প্রাণ, তোমার কৃপাই আমাদের পরম সম্বল। দয়াময় পিতা! তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর যে তোমার মহোৎসবে আমরা তোমার উপাসনা করিয়া তোমার নাম-গান করিয়া ও তোমার জ্যোতির্ম্ময় প্রেমময় মুখ দর্শন করিয়া জীবনকে চরি-

তার্থ করি ও ধন্য হই এবং তোমার প-দেতে যুক্ত হইয়া সুখ শান্তি লাভ করি।

THE RELIGION OF LOVE INTENDED FOR ALL SECTS AND CHURCHES

BY A HINDU.

(Continued from the last number)

CHAPTER III.

Of the Purpose of Existence and of Divine Communion.

1. Religion or in other words, getting bound again to God, is the purpose of existence. God, after creating us, hath, to serve his inscrutable purposes, cast us down to a great distance from Him, though always abiding in us as the Soul of the soul and it delighteth Him to see us gradually advancing towards Him, and after attaining Him partaking of His nature, when, as sons of the Immortal and heirs of immortality, we obtain the Life Eternal. Life Eternal can be obtained even here on this earth when we obtain freedom from all desires.

2. Religion means the abnormal man becoming the normal man. Mastery over nature is normal for man; slavish subjection to nature is abnormal.

3. Religion may be otherwise defined as the sigh of the visible for the invisible, of the finite for the infinite. It may also be otherwise defined as the aspiration of the imperfect after the perfect, ever growing, never to be fully satisfied.

4. But the best definition of religion remaineth to be given. It is the return of the son to the father. It is the return of a child of the house gone astray to the house. It is the return of a lover to the beloved, his "own heart's home," after a long separation and after much secret weeping and lamentation.

5. Perennial and all-absorbing communion with God is the said return, but we should not enjoy it neglecting the duties of life, or in other words, neglecting the work with which the Father has entrusted us for execution during our sojourn here on earth. Communion is no preventive of work. On the contrary, perennial communion giveth zest to work.

6. The principal element of the Religion of Love is love of God and all others are but its branches. The love of man should be based on the love of God who requireth such love. The lover wanteth to be united with his beloved. Hence the necessity of communion. He wanteth nothing more from the beloved but his company. He wanteth nothing from the beloved but the beloved. He wanteth none or nothing but the beloved.

7. Perennial communion with God is the only means of attaining true felicity here on earth. The soul findeth no rest until it resteth in God. He is her best goal, her best prosperity her best world to live in and her best joy. He is the eternal festival of the mind.

8. Worms as we are, what greater favor can God shew to us than the gift of his most exalted and most sweet company? He extendeth this mercy to the meanest worm if it know Him in the slightest degree.

"The spirit of the worm beneath the sod.
By love and worship blends itself with God."

9. They say: 'Pray without ceasing" It would be better for them to say: "Commune without ceasing." Communion is better than prayer though prayer should not be neglected:

"Rapt into still communion which transcends
The imperfect offices of prayer and praise."

10. Communion with God is the beginning of religion, communion with God is its middle; communion with God is its end.

11. Demosthenes being asked what is the first requisite of an orator, answered, "delivery"; on being asked what is the second requiste, answered "delivery"; on being asked, what is the third requiste, said "delivery again". As delivery is in oratory, so communion with God is in religion. What is the best means of extricating ourselves from the bonds of sin? Communion with God. The company of the Absolutely Noble maketh us noble. What is the best means of extricating ourselves from worldly misery? Communion with God. What is the best means of attaining perpetual felicity? Communion with God. We should not practise religion for the sake of felicity, for that would be barter and traffic but felicity of itself cometh with religion.

12. The best communion with God is communion with Him as the Soul of the soul

and therefore our nearest and dearest. He is nearer to ourselves than we are to ourselves. Father, Mother, Friend, Husband of the soul are the terms usually applied by man to God, but they are done so in an allegorical sense. God is not exactly our father, or our Mother or our Friend or Husband, but that He is the Soul of the soul is scientifically true. Though those terms i e Father, Mother Friend, Husband of the soul are allegorical, they very aptly express our sweet relationship with God and we have every right to use them. Among these allegorical designations, the Husband of the Soul is the best. The soul resembleth a woman in its weakness and helplessness and frailness and its tendency to depend upon a higher being and, like a creeper, to twine itself around the same. The best communion with God, however, is communion with him as the Soul of the soul, as the nearst and the dearest.

13. The next best communion with God is seeing God is all things and all things in God. Seeing God in all things meanth seeing Him as holding together every thing and all things, and seeing all things in Him meaneth seeing all things as held fast by Him. He is the support of the universe. In Him all things live, move and have their being.

14. As the lark ascendeth to the sky leaving the earth far behind, so the soul of the lover of God ascendeth to the heaven of His presence leaving the world far behind. As the lark in its flight findeth no end to the sky, so the soul of the lover of God findeth no end to the infinite heaven of God's presence. When he is in this state, he suddenly returneth to his own soul and feeleth therein the presence of the Sacred Inmate of the soul and is ravished with the sight. He is far, He is near He is to be seen as seated in the heart. In short, always feel the presence, and then thou shalt be truly happy. Cherish the consciousness of the Presence in the soul with the utmost care as a woman doth the fœtus in her womb.

15. He who seeth Him as seated in the soul, his is perpetual peace, it is of no other. He who seeth Him as seated in the soul, his is perpetual felicity, it is of no other. The great God in whom the soul is seated is our object of worship.

16. Perennial communion with God is no bar to worldly business. As in the time of worldly business, the consciousness of the circumambiency of infinite space is always present, so in the time of worldly business, the consciousness of the circumambiency of God, who filleth all space with His nectareous presence, can ever be present.

17. Communion and work can go hand in hand. As a female dancer, with a pitcher full of water on her head, singeth and danceth according to the difficult rules of music and dancing preventeth the water in the pitcher on her but head from being spilt, so the wise man doth not forget God, the Giver of salvation, even when transacting worldly business with attention to the minutest details. He is "his own heart's home." His heart is there always fixed in the waking state or in dreams.

18. Engaged in divine communion, perform works faithfully and attentively without fondness for worldly objects and expectation of the fruits of your deeds.

19. You have right only to works and not to their fruits, that is, to their success. Fruits are in the hands of God. We should concentrate our whole love upon God. Love is not concentrated upon God when it is directed to fruits of works.

20. Nature's beauty in solitary places is a great aid to divine communion. It is better to retire to such places for days or months. Oh! how canst thou renounce the boundless store of charms which nature affordeth thee as aids to divine communion, and hope to be forgiven? We rise from nature up to nature's God. When thou seest the picture, remember the painter. Can there be any royal pomp equal to that which decketh the sky at the time of sunset? It is the pomp of the King of kings. Oh! how glorious and beautiful is Nature! Both God and nature invite us to joy in their company. Shall the carking cares of that contemptible thing, the world, prevent us from enjoying it? No, we should, on the contrary, plunge ourselves freely into that ocean of joy and take a hearty dive.

21. The God devoted man, if he lose sight of God even for a little while, suffereth pain. A lover of God, while in this condition, composed a song which, if translated, would run to the following effect: "Ah! who shall bring Him back to me? What need have I of life when deprived of the Source of life? I know all the pleasures of this life. I have no need of those pleasures and those riches. Ah! who shall bring Him back to me."

22. Commune without ceasing.

23. Work without ceasing.

28. Stationed in communion, work.

অশুদ্ধ শোধন।

গতবারের পত্রিকাতে ব্রহ্মসঙ্গীতের স্বরলিপি দেখ। "আজি" এই কথার "জি" অক্ষরটী যে "এ" সুরের নিম্নে বসিয়াছে, সেই "এ"স্বরের নিম্নে খাদ্‌স্বর বুঝাইবার জন্য হসন্ত (এ্) বসিবে।

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ।

ষষ্ঠ উপদেশ—বিজ্ঞানময় কোষ।

(২৩শে চৈত্র, রবিবার, ৬১ ব্রাহ্ম সম্বৎ)

অসীম আকাশে গ্রহগণ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল; পৃথিবী জলে স্থলে বিভক্ত হইয়া গেল; পরিমিত রূপে বৃষ্টি হইতে লাগিল; ক্রমে ক্রমে পৃথিবী জীবের আবাসভূমি হইল এবং স্থাবর জঙ্গম উৎপন্ন হইল। অন্নময় কোষের মধ্যে প্রাণ কার্য্য করিতেছে; আবার মনোময় কোষ পশুপক্ষী, প্রাণকে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের নিয়মে চলিতেছে। শরীর ছাড়িয়া প্রাণ থাকিতে পারে না; অন্ন ব্যতীত প্রাণ শরীরকে পোষণ করিতে পারে না। আবার শরীর না থাকিলে, প্রাণ না থাকিলে মন থাকিতে পারে না। অন্নময় ও প্রাণময় কোষে মন কার্য্য করে। বৃক্ষলতা জীব জন্তু প্রভৃতি সকলেতেই প্রাণ কার্য্য করিতেছে; কিন্তু ইহার অতিরিক্ত পশুদিগের মন আছে। কিন্তু এই সকল ধাবিত হইয়া, নিযুক্ত হইয়া কার্য্য করিতেছে; সকলই যন্ত্রস্বরূপ হইয়া যন্ত্রীর ইচ্ছায় চলিতেছে। ইহাই সৃষ্টির শেষ তাৎপর্য্য হইল না, ইহাতেই ঈশ্বরের চরম লক্ষ্য সিদ্ধ হইল না। তাঁহার লক্ষ্য জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি। শরীরে প্রাণ ও প্রাণে মন দিয়া তাহার উপরে ঈশ্বর এক জ্ঞানবিন্দু স্থাপন করিলেন; আপনার অনন্তজ্ঞান—সেই গভীর অনন্তজ্ঞান, তাহা হইতে এক বিন্দু জ্ঞান প্রসব করিয়া মনুষ্য-শরীরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই জ্ঞানবিন্দুতে তিনি বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মবৃত্তি-মূলক বিজ্ঞান দিলেন এবং জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের শক্তি প্রদান করিলেন। কাম, ক্রোধ, লোভ, লজ্জাভয়, স্নেহভক্তি, দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি যে সকল মানসিক ভাব, ঈশ্বর তাহা জ্ঞানের অধীন করিয়া দিলেন। জ্ঞান যখন আপনাকে আপনি জানে, তাহার নিকটে তাহার আত্মত্ব প্রকাশ পায়; সেই আত্মাতে বিজ্ঞান আছে এবং তাহার স্বাধীন ইচ্ছা আছে। ইহারই জন্য সে বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ। ঈশ্বর যিনি, তিনি অজ আত্মা, অনন্ত-জ্ঞান পূর্ণ পুরুষ। এই অজ আত্মা

বিজ্ঞানাত্মার স্রষ্টা, পাতা প্রতিষ্ঠা। বিজ্ঞানাত্মাই বিজ্ঞানময় কোষ এবং সেই বিজ্ঞানময় কোষের মধ্যে অন্তর্যামীরূপে তাঁহার প্রতিষ্ঠা আনন্দময় পূর্ণপুরুষ রহিয়াছেন। "হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং" বিজ্ঞানজ্যোতির্ম্ময় কোষে নির্ম্মল নিরবয়ব ব্রহ্ম বিরাজমান আছেন।

জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় দিয়া ঈশ্বর মনুষ্যের শরীর কি সুন্দররূপে গঠন করিয়া দিলেন। স্ত্রীপুরুষের যে শরীর, সে কি সুন্দর! ঈশ্বরের ইহাও ইচ্ছা যে তাঁহার সৃষ্টিতে সৌন্দর্য্য বর্ষণ করিবেন,তাই তিনি সৌন্দর্য্য বর্ষণ করিলেন। সূর্য্য চন্দ্র দেখ, বৃক্ষ লতা দেখ, অশ্ব প্রভৃতি পশু দেখ, কি সৌন্দর্য্য ছাইয়া রহিয়াছে। সকলের অপেক্ষা মনুষ্যের—স্ত্রীপুরুষের শরীরে দেখ, কি অনুপম সৌন্দর্য্য দিয়াছেন। আবার শরীরকে কেমন আত্মার উপযোগী করিয়াছেন; সেই উপযোগিতা ভাবিতে গেলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। হস্তের একটী বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ না থাকিলে হস্তের কার্য্য অতি সংক্ষেপ হইয়া পড়িত। জন্তুরা তৃণগুল্ম আহার করিবে, তাহাদের মস্তক নিম্নমুখ হওয়া আবশ্যক, তাই তাহাদিগের মস্তক নিম্নমুখ হইল; কিন্তু মনুষ্যের চক্ষু উপরের দিকে চাহিবে, দেখিবে অনন্ত আকাশ, তাই ঈশ্বর মনুষ্যের শরীর জ্ঞানের উপযুক্ত উন্নত শরীর করিয়া দিয়াছেন।

জ্ঞান বলিলেই তাহার ইচ্ছা চাই—জ্ঞানের শক্তি ইচ্ছা। জড়ের শক্তি কার্য্যকারণে বদ্ধ হইয়া গতিতে প্রকাশ পায়, কিন্তু জ্ঞানের শক্তি ইচ্ছা। এই ইচ্ছা লাভ করাতে মানুষ স্বাধীন হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতির ইচ্ছা নাই। প্রথমে প্রাণপঙ্ক (protoplasm) সৃষ্ট হইল, তাহার পরে বৃক্ষলতা সৃষ্ট হইল; পরে জলজন্তু পশুপক্ষীর সৃষ্টি হইল। এইরূপে ক্রমে প্রথম মনুষ্য স্ত্রীপুরুষ সৃষ্ট হইল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা আপনাদিগকে পোষণ করিতে না পারিয়াছিল, যতক্ষণ তাহারা স্বীয় ইচ্ছামতে কার্য্য করিতে অক্ষম ছিল ততক্ষণ পৃথিবীই তাহাদিগের মাতা ছিল। যখন তাহাদিগের শরীর উপযুক্ত হইল, তখন তাহারা আপনাদিগের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে লাগিল; আপনার অভাব আপনাকেই পূরণ করিতে হইল। ঈশ্বর প্রথমে এমন স্থানে মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যেখানে প্রচুর ফল বিদ্যমান ছিল। যখন সেই প্রথম মনুষ্যের জ্ঞান প্রস্ফুটিত হইল, যখন 'আমি' বলিয়া জানিল, তখন সে আপনার ইচ্ছানুসারে ফল আহরণ করিতে লাগিল। ক্রমে বিজ্ঞানের প্রভাবে বুদ্ধি চালনা করিয়া সকল অভাব পূরণ করিতে লাগিল; ক্রমে ক্রমে জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। প্রথমে সে ফল মূল খাইয়া পুষ্ট হইল, তাহার পরে তাহাকে পশুদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া আহার সংগ্রহ করিতে হইল। এমন স্তর দেখা গিয়াছে, যেখানে সকল প্রকার সংসারের প্রয়োজনীয় উপকরণই প্রস্তর নির্ম্মিত—এইখানে দেখিতেছি বিজ্ঞানের কার্য্য ভালরূপ আরম্ভ হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে। এই প্রস্তরস্তরের অনেক পরে লৌহ-অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং তখন অগ্নির আবিষ্কার হইয়াছে। মানুষ এই অবস্থায় অনেক উন্নত হইয়াছে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

দ্বিষষ্টিতম সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১১ মাঘ রবিবার ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬২।

প্রাতঃকাল।

প্রথমে অর্চনা হইলে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া এই বক্তৃতা পাঠ করিলেন।

ঈশ্বরকে প্রার্থনা কর—লাভ করিবে।

আজ আমাদিগের ব্রহ্মোৎসবের দিন। আজ আমাদিগের মহা আনন্দের দিন। এই উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বয়ং ব্রহ্ম; তিনি আজ এখানে, আমাদের সম্মুখেই উপস্থিত আছেন, তাই আজ এখানে এত আনন্দ, এত উৎসব-কোলাহল; তাই আজ দেখিতেছি যে, সকলেরই মুখে আনন্দের বিমল প্রভা প্রকাশ পাইতেছে—নিরানন্দ এস্থান হইতে বহু দূরে পলায়ন করিয়াছে। আজ বাহিরেও যেমন পত্র পুষ্পাদি দ্বারা সমস্ত সুসজ্জিত করা হইয়াছে, আমরা আমাদের আত্মাকেও সেইরূপ পবিত্রতা ও প্রীতি-পুষ্পের দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আজ দুঃখশোক, পাপতাপ সকলই ভুলিয়া গিয়া; আজ নিরানন্দরূপ ধূলিরাশি গাত্র হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া অন্তত ক্ষণকালের জন্যও আনন্দ-সাগরে অবগাহন করিতে এই উৎসব-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি।

আমরা যখন চাহিয়া দেখি যে, এই এতগুলি বন্ধুজনে ব্রহ্মোৎসব উপভোগ করিবার জন্য, ব্রহ্মের উপাসনায় যোগ দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন, তখন হৃদয় আনন্দে ভরিয়া যায়। এই শুভ ১১ই মাঘে ব্রাহ্মসমাজ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মসমাজের তখনকার অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। বোধ হয় উপস্থিত সভ্যদিগের কাহারই অবিদিত নাই যে নানা গুরুতর বিপদ অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মসমাজ প্রথম স্থাপিত হয়। কিন্তু যখন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল, তখনও তাহার বিপদের অবসান হয় নাই। [illegible]নও কেহ জাতিচ্যুত হইবার ভয়ে ব্রাহ্ম সমাজের ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহস করিত না। সেই একদিন গিয়াছে; আর আজ দেখি যে, শত শত লোকে ব্রহ্মোৎসব দেখিবার জন্য আকুল। ঈশ্বরের কেমন করুণা প্রকাশ পাইতেছে।

যে ঈশ্বরের কৃপাবলে এতটা পরিবর্ত্তন হইতে পারিয়াছে, তাঁহারই করুণার উপর নির্ভর করিয়া আমরা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি যে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবেই হইবে। পারমার্থিক সত্য যাহা কিছু, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম; অতএব সত্যের জয় হইবে না, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবে না তো জয় হইবে মিথ্যার? "সত্যমেব জয়তে নানৃতং" সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার জয় হয় না। আমরা যখন মিথ্যার প্রশ্রয়দান করিয়া জয়লাভের আশা করি, তখন ইহা মনে থাকে না যে, সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর আপনার ন্যায়রাজ্য হইতে মিথ্যাকে দূর করিয়া সকল দুরাশাই নির্ম্মূল করিবেন। তবে তাঁহার উদ্দেশ্য এই যে আমরা নিজে ইচ্ছা পূর্ব্বক সত্যের পথ অবলম্বন করি।

ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, প্রেমস্বরূপ পরব্রহ্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রহ্মকে কেন্দ্র করিয়া জ্ঞানের অটল ভিত্তির উপরে দণ্ডায়মান আছে; ইহার বিস্তার প্রীতির উপর। ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত জ্ঞানের বিরোধ নাই। কোন ধর্ম্ম মনুষ্যপূজা করিতে বলে, কোন ধর্ম্ম বা

ভূত পূজা আর কোন ধর্ম্ম বা মূর্ত্তিপূজার আদেশ করে। এই সকল ধর্ম্ম, পুস্তকাদি দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়াছে, প্রকৃত সত্য সকল মনুষ্যপূজা প্রভৃতি কুসংস্কারের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া উপধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত জ্ঞানের বিরোধ নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মের পুস্তক ঈশ্বরের রচিত এই সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ড ও মানবাত্মা। বিশ্বকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া, আত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া যতই জ্ঞানলাভ হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহাই আদরের সহিত স্বীকার করিবেন। অনন্তজ্ঞান ঈশ্বরের জ্ঞানকে যে ধর্ম্ম সীমাবদ্ধ করিতে যায়, সে ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মও উন্নত আকার ধারণ করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নত ভাব সকল আমাদের সকলেরই অন্তরে অবিনশ্বর অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে; জ্ঞানের কার্য্য সেই সকল ধর্ম্মভাবকে উদ্দীপিত করা। ইহারি জন্য বলিতেছি যে, জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মও উন্নত আকার ধারণ করিবে। জ্ঞান ও প্রীতির পূর্ণ আদর্শ স্বয়ং ঈশ্বর; এই জন্য জ্ঞান ও প্রীতির উন্নতিও অনন্তকালব্যাপী। ব্রাহ্মধর্ম্মও যখন এই জ্ঞান ও প্রীতির উপরেই দণ্ডায়মান, তখন ব্রাহ্মধর্ম্মেরও উন্নতি অনন্তকালব্যাপী। এই উন্নতির অর্থ, ইহা নহে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল পরিবর্ত্তিত হইবে কিন্তু অনন্তকাল ধরিয়া আমাদের আত্মার অন্তরস্থিত ধর্ম্মভাব সকল একে একে জাগ্রত হইয়া উঠিবে। আমাদের আত্মা যতই ধর্ম্মভাবে পরিপুষ্ট হইবে, ততই আমাদিগের জীবজন্তুতে দয়া ও মনুষ্যে প্রীতি বর্দ্ধিত হইবে; ততই আমরা মানবের ভ্রাতৃভাব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইব এবং ততই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত হইবে। কিন্তু ঈশ্বর-প্রীতিই এই সকলেরই অবলম্বন। ইহারি জন্য আমি পুনরায় বলিতেছি যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবেই হইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের স্রোত, সত্য ভাবের স্রোত কি চিরকালের জন্য কেহ প্রতিরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে? কখনই নহে। এই স্রোত একদিন সমস্ত জগতের মরুভূমিকে ডুবাইয়া দিয়া শস্যশ্যামলা করিয়া তুলিবে। চারিদিকে চাহিয়া দেখি, চীন, জাপান, জর্ম্মাণি, ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ভারতবর্ষ —নানা স্থানেই ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎস খুলিয়া গিয়াছে। এই সকল উৎস হইতে এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু এমন এক দিন আসিবে, যে দিন এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত মিলিত হইয়া এক মহাস্রোতে পরিণত হইবে এবং সসাগরা পৃথিবীকে প্লাবিত করিয়া দিবে। এই দিনের কথা স্মরণ করিলেই আমাদের আত্মা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে; এই দিন দেখিবার জন্য সময়ে সময়ে আমাদের কত-না স্পৃহা জন্মে।

কিন্তু বন্ধুগণ, বর্ত্তমানকালের অবস্থা দেখিয়া আমাদিগের কি মনে হয় না যে এই দিন আসিতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে? তবে আমরা ইহা বলিতে পারি যে, করুণাময় পরমেশ্বর এই শুভ দিন অতিশীঘ্র আনয়ন করিবার অধিকার ও ক্ষমতা আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। আমরা সকলেই যদি এই অধিকার ও ক্ষমতার উপযুক্ত ব্যবহার করি, সত্যধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করি, ঈশ্বরেরই নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মপথে চলি, তবেই আমরা আমাদের আত্মাতে ঈশ্বরকে তাঁহারই প্রসাদে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে সক্ষম হইব; তাঁহার প্রসাদের নির্ঝর আমাদের মস্তকে বর্ষিত

হইবে। বর্ত্তমান কালে ধর্ম্মের প্রতি কেমন এক অশ্রদ্ধার ভাব আসিয়া সমাজের গুরুতর অনিষ্ট সাধন করিতেছে। আমাদিগের কর্ত্তব্য যে আমরা সকলেই দৃঢ়প্রযত্ন হইয়া হৃদয় হইতে এই অশ্রদ্ধার ভাবকে দূর করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ধর্ম্মের বিমল ভাব গ্রহণ করি এবং ঈশ্বরের সত্তাতে আত্মাকে পূর্ণ রাখি। যে দিন জগতের লোকে ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইবে, ঈশ্বরকে আত্মার একমাত্র উপাস্য দেবতা করিবে, সেই দিনে, সেই শুভদিনে এই জগত হইতে দণ্ডভয় তিরোহিত হইবে; প্রীতিশাসনের প্রভাবে মর্ত্ত্যলোক স্বর্গলোক হইয়া যাইবে।

ঈশ্বরের প্রসাদে জীবনকে কৃতার্থ করিতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহার প্রকাশ—তাঁহার প্রশান্ত আবির্ভাব আত্মাতে অনুভব করিতে ইচ্ছা করিলে আমাদিগের নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে চলিবে না। আমরা যত্ন করিব না, নিশ্চেষ্ট ভাবে অলসভাবে কাল যাপন করিব আর ঈশ্বরের প্রসাদ যাচ্ঞা করিব—ইহা করিলে চলিবে না। ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইলে বিশেষরূপ সাধনা করিতে হইবে। অশ্রুবারিতে হৃদয়ের পাপতাপ ধৌত করিয়া ব্যাকুল ভাবে তাঁহাকে প্রার্থনা করিতে হইবে।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যোন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্॥

অনেক উত্তম বচন দ্বারা, বা মেধা দ্বারা, অথবা বহু শ্রবণ দ্বারা এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না; যে সাধক তাঁহাকে প্রার্থনা করে, সেই তাঁহাকে লাভ করে। পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। কেবল বাক্যের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না। মন তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না; তখন বাক্যই বা কি প্রকারে তাঁহাকে বলিতে পারিবে? বাক্যও তাঁহাকে বলিতে পারে না। মন তাঁহাকে মনন করিতে গিয়া নিরস্ত হয়। আমরা হয়তো ব্রহ্ম-জ্ঞান সম্বন্ধে পঠিত বা শ্রুত অনেক কথা শুকপক্ষীর ন্যায় আওড়াইয়া যাইতে পারি; আমরা হয়তো ঈশ্বরের সম্বন্ধে নানা তত্ত্বকথা বলিয়া, বক্তৃতা করিয়া সকলের সমক্ষে আমাদের ধার্ম্মিকতার পরিচয় দিতে পারি, কিন্তু যদি ঈশ্বরকে বাস্তবিক হৃদয়ে একটীবারও অনুভব করিতে চেষ্টা না করি; যদি তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন না করিয়া তাঁহার মঙ্গলস্বরূপ প্রেমস্বরূপ অবগত না হই; ব্রহ্মজ্ঞানকে হৃদয়ঙ্গম না করি, ব্রহ্মতত্ত্ব সকল প্রত্যক্ষ অনুভব না করি, তবে সহস্র বক্তৃতা দ্বারা আমরা নিজেও ব্রহ্মের পথে যাইতে পারিব না সুতরাং অপর কাহাকেও ব্রহ্মপথের পথিক করিতে পারিব না। "যদি তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত অনুরাগ ও যত্ন না থাকে; তবে প্রবল মেধাই থাকুক, আর প্রচুর উপদেশবাক্যই শ্রুত হউক, কিছুতেই তাঁহাকে লাভ করা যায় না। যিনি পিপাসাতুর পথিকের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া একান্তে তাঁহাকে প্রার্থনা করেন, তাঁহারই সন্নিধানে পরমাত্মা আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন।"

ঈশ্বর সকলেরই আত্মারূপ উজ্জ্বল পবিত্র সিংহাসনে সমাসীন রহিয়াছেন; কিন্তু আমরা যখন বিষয়-কোলাহলে মত্ত থাকিয়া, ধনমানের অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত থাকিয়া তাঁহার ধীর সুমন্দ্র আহ্বানের প্রতি মনোযোগ প্রদান না করি, তখন তাঁহার আবির্ভাব আমাদিগের নিকটে সুস্পষ্ট-

রূপে প্রতিভাত হয় না। যে সাধকের প্রাণ সেই স্নেহময়ী জননীকে না দেখিয়া আকুল হইয়া উঠে; যে সাধকের প্রাণ সেই প্রাণের প্রাণকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না; পরমেশ্বরের জন্য যাঁহার 'প্রাণের টান' হইয়াছে, তাঁহারই নিকট সেই মঙ্গল-স্বরূপ পরমপুরুষ আপনার মঙ্গলমূর্ত্তি প্রকাশ করেন। যখন আমরা প্রাণের সহিত, হৃদয়ের সহিত বলিতে পারিব যে "ঐহিকের সুখ যত জানি তায়, কাজ নাই সে সুখে সে ধনে, হারায়ে জীবন-শরণে জীবনে কি কাজ আমার," তখনই, আমরা জানিবার পূর্ব্বেই, তিনি আমাদের আত্মাতে আবির্ভূত হইয়া শূন্যকে পূর্ণ করিবেন। আহা তাঁহার কি করুণা! আমরা প্রার্থনা করিবার পূর্ব্ব হইতেই সেই দেবদেব আমাদের অভাব বুঝিয়া পৃথিবীকে ধনধান্যে পূর্ণ রাখিয়াছেন, নদী সমুদ্রকে অগাধ জলের আধার করিয়া দিয়াছেন, আমাদিগকে বায়ুর সাগরে বেষ্টিত রাখিয়াছেন। আবার যখন আমাদের আত্মাতে তাঁহাকে লাভ করিবার প্রকৃত অভাব উপস্থিত হইবে, তখন সেই ভক্তবৎসল পিতা কি দেখা না দিয়া থাকিতে পারিবেন? আমাদের তর্কের কি প্রয়োজন? একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই জানিতে পারি যে, তাঁহাকে হৃদয়ের সঙ্গে ডাকিলে তিনি স্বয়ং আপনাকে দিয়াও শূন্য হৃদয় পূর্ণ করেন কি না।

ব্রহ্মসাধন যদিও অত্যন্ত কঠিন, তথাপি আমাদিগের নিরাশ হইবার কিছুমাত্র কারণ নাই। আমাদিগকে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্মসাধন করিতে হইবে। যখন অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষা করিতে আমাদিগের কত পরিশ্রম, কত অধ্যবসায়, কত আত্মচেষ্টা আবশ্যক হয়, তখন যে বিদ্যা সকল বিদ্যার ভিত্তিভূমি, যে বিদ্যা সর্ব্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠা, সেই ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্ত করিতে আমাদিগের কত-না পরিশ্রম, কত-না অধ্যবসায় আবশ্যক। আমাদিগের চেষ্টা থাকিলে ঈশ্বরের করুণা আমাদিগের সহায় হইবে। আমরা যদি ধর্ম্মপথে থাকিতে প্রাণপণ পরিশ্রম করি, তবে ধর্ম্মই আমাদিগকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যাইবেন। আমরা যদি ঈশ্বরের পথে আত্মচেষ্টায় একপদও অগ্রসর হই, তবে তিনি স্বয়ং আমাদিগের হস্তধারণ করিয়া সহস্রপদ অগ্রসর করিয়া দিবেন। তাঁহার এমনই করুণা, আমাদিগের উন্নতির জন্য তিনি এমনই সচেষ্ট।

আমাদিগের এই ব্রহ্মোৎসব তাঁহার করুণার বিশেষ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এমনও সময় গিয়াছে, যখন ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলে জাতিনষ্ট হইবার বিলক্ষণ ভয় ছিল— সময়ে সময়ে বিরোধী পক্ষের হস্তে প্রাণনাশের পর্য্যন্ত ভয় হইত। রামমোহন রায় তখন পণ্ডিতদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা কেবলমাত্র শ্রবণ করাইবার উদ্দেশে, ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত থাকিলেই তাঁহাদিগকে উপযুক্তরূপে অর্থদান করিয়া সন্তুষ্ট করিতেন। কিন্তু আজ আর এক কাল আসিয়াছে। আর সেই সঙ্কোচ ভাব নাই। এখন সকলেই ব্রহ্মোৎসবে যোগদান করিবার জন্য আকুল। ইহাতে সেই দেবাধিদেবেরই মহিমা, তাঁহারই করুণা প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার এই করুণার উপরে নির্ভর করিয়াই আমরা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় হইবেই হইবে। আমাদের সমকালেই হউক, কি পরেই হউক, ইহার জয় হইবেই— ইহার অগ্নিস্রোতকে কেহই বন্ধ করিতে

পারিবে না। এখন যদি আমরা এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে সাদরে গ্রহণ করি, এবং জীবনে পরিণত করি, তবে আমরাই ইহার শুভ ফল প্রত্যক্ষ করিব; যাঁহার প্রসাদে আমরা বিদ্যা, বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রভৃতি সকলই পাইয়াছি, তাঁহার আদিষ্ট পথে চলিয়া আমরা আপনারাই কৃতার্থ হইব এবং ভবিষ্যদ্বংশের অনন্ত উন্নতিলাভের পথ উন্মুক্ত দেখিয়া আনন্দিতচিত্তে ঈশ্বরকে অহরহ ধন্যবাদ প্রদান করিতে থাকিব।

তাঁহার করুণা আমরা, আমাদিগের প্রত্যেকের জীবনে কত-না প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমাদিগকে তিনি যে আত্মা দিয়াছেন এবং এই আত্মাকে যে তাঁহার সহবাসের অধিকারী করিয়াছেন, ইহা কি তাঁহার কম দয়া? এই যে আকাশে আমাদিগের এই সৌর জগতের ন্যায় কত শত জগৎ ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, ভাবিয়া দেখিলে আমাদিগের ক্ষুদ্রতা কেমন স্পষ্ট উপলব্ধি হয়—তখন আমরা যেন কোথায় লুক্কায়িত হইয়া পড়ি। কিন্তু সকলের প্রভু সেই ঈশ্বরের কৃপা লাভ করিলে "পঙ্গুর্লঙ্ঘয়তে গিরিং" পঙ্গু যে, সেও উন্নতশৃঙ্গ পর্ব্বত সকল অতিক্রম করিতে পারে। আমরা ক্ষুদ্র হইয়াও মহান্ হইয়াছি; তাঁহারি প্রসাদে তাঁহাকে জানিবার অধিকারী হইয়াছি—ইহা অপেক্ষা আর কিসে আমরা মহান্ হইতে পারি? "তাঁহাকে জানা অপেক্ষা আমাদিগের জন্মের সার্থক্য আর কিসে হইতে পারে? তিনি যে আমাদিগকে তাঁহাকে জানিবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন, ইহা তাঁহার সকল কৃপার প্রধান কৃপা। আমরা এই ক্ষুদ্র তিমিরাবৃত পৃথিবীর জন্তু হইয়া সকলের অতীত, সত্যসুন্দর মঙ্গল পুরুষকে জানিতেছি, ইহা অপেক্ষা আমাদিগের সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে?" তাঁহাকে যদি না জানিলাম, তাঁহার প্রেমে মগ্ন না রহিলাম, ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাচরণ না করিলাম; তবে আমাদের কি হইল? অপূর্ণ স্বভাবে প্রেম স্থাপন করিয়া কি প্রেমের সার্থক্য হইতে পারে? আমাদিগের যতটুকু শক্তি আছে, সেই অনুসারেই যদি আমরা ঐকান্তিক অধ্যবসায় সহকারে সেই পূর্ণস্বরূপ পরমেশ্বরকে জানিতে চেষ্টা করি, তাঁহাতেই প্রীতি স্থাপন করিতে শিক্ষা করি এবং তাঁহারই প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে যত্নবান্ হই, তবে তাহাতেই আমাদিগের উন্নতি—অনন্তকালেও আমরা এই উন্নতির পথ হইতে বিচ্যুত হইব না। যে আত্মা তাঁহার কণামাত্র কৃপাবারি হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিবে, তাহারই অনন্ত উন্নতি—সেই আত্মা সুন্দর হইতে সুন্দরতর বেশ ধারণ করিবে।

আমাদের সম্মুখে বসন্তকাল উপস্থিত। যাঁহার ইচ্ছাতে প্রভাতের উদীয়মান সূর্য্য আপনার কিরণচ্ছটায় পূর্ব্বগগনকে রঞ্জিত করে; প্রভাতের সুগন্ধবাহী সুশীতল সমীরণ যাঁহার মঙ্গলবার্ত্তা স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যলোকে আনয়ন করিয়া ভূলোকের সহিত দ্যুলোকের মিলনসাধন করে, তাঁহারই ইচ্ছাতে এই বসন্তকালে বৃক্ষ সকল পুরাতন জীর্ণ পত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন পত্রপুষ্পে শোভমান হয়। এই জন্য বসন্তকালকে প্রকৃতির উৎসবকাল বলা যায়। আজ আমাদিগেরও উৎসব—ব্রহ্মোৎসব আসিয়াছে; এই ব্রহ্মোৎসব আমাদের সকলেরই হৃদয়ে আনন্দবিধান করিতেছে। আমরা এখন কি করিব? আমরা কি কেবল উৎসব প্রাঙ্গনকে সুসজ্জিত করিব? না, তাহা নহে। আমাদিগের

এই উৎসব বিশেষভাবে আত্মার উৎসব; এই কারণে আমরা আত্মাকেও আজ নূতন সজ্জায় সুসজ্জিত করিব। আমরা আজ পুরাতন বৎসরের জড়তা ও মলিনতা অন্তর হইতে দূর করিয়া আত্মাকে ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে চির-নূতন উৎসাহ ও চির-নূতন উদ্যমের দ্বারা পূর্ণ রাখিব। এইরূপ আত্মাকে, শরীরকে ও মনকে পুরাতনের মৃতপ্রায় অবস্থা হইতে নূতনের জীবন্ত অবস্থাতে আনয়ন করিতে পারিলে, তবেই ব্রহ্মোৎসবের সার্থকতা হইবে।

আমরা জানি যে, ব্রহ্মের নামে সকলেই আজ নবোৎসাহে উৎসাহী হইবেন, নববলে বলীয়ান্ হইবেন; কেবল যাঁহারা বৈষয়িক ব্যাপারে নিতান্তই মত্ত থাকিয়া আত্মাকে মৃতপ্রায় ও অসাড় করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারাই আজ আনন্দরাশির দ্বারা বেষ্টিত থাকিলেও ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন না। যেমন শুষ্ক বৃক্ষ পত্রপুষ্প-শোভিত হয় না, সেইরূপ শুষ্ক হৃদয়ও অমৃতময়ের অমৃতবারিতে সিক্ত না হইলে আর বিকসিত হয় না।

হে পরমাত্মন্! আজ এই উৎসবের দিনে হৃদয়কে প্রশস্ত করিয়া দাও,আত্মাকে উন্নত করিয়া দাও। হে আনন্দস্বরূপ! আজ আমাদের সকলেরই আত্মা যেন তোমার সহবাস-জনিত বিমলানন্দ উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হয়। আমাদের শরীরে বল দাও, মনেতে উৎসাহ দাও, আত্মাতে শক্তি দাও যে, তোমার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম ভারতের দেশে দেশে, নগরে নগরে, গৃহে গৃহে প্রচার করিয়া সুবিশাল এই ভারতবর্ষে এক সুদৃঢ়ভিত্তি ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিতে কৃতকার্য্য হই। আমাদিগের এই প্রার্থনা সফল কর।

চন্দ্রতপন যাঁহার অহরহ আরতি করিতেছে, ভূলোক ও দ্যুলোক যে দেবদেবের চরণবন্দনা করিতেছে, যে দিন ভারতের প্রতি গৃহ হইতে তাঁহার আরতি-গীত সকল উত্থিত হইবে, সেদিন কি শুভদিন! হে দয়াময়! এই দরিদ্র ভারতবর্ষে সেই শুভদিন সত্বরেই প্রেরণ কর—সেই শুভদিন প্রেরণ কর। আমাদের আর অন্য কোন প্রার্থনা নাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় নিম্নোক্ত প্রকারে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।

আজ চারিদিকে কিসের এত আনন্দ কোলাহল। আজ কোথা হইতে উদ্যম উৎসাহে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রোগে আকুল শোকে কাতর এই পরাধীন ভারতে কে আবার নূতন প্রাণের সঞ্চার করিয়া দিল। কিসের নিমিত্ত এই পবিত্র উৎসব আমোদে সকলে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। পাপী পুণ্যবান ধনী দরিদ্র কিসের জন্য আজ আত্মবিস্মৃত হইয়া অনুরাগভরে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছেন।

আজিকার এই শুভদিনে শুভলগ্নে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় অরণ্যের ঋষিগণ-পরিসেবিত একেশ্বরবাদ সজন নগরে আনয়ন করিয়াছিলেন, স্বর্গের সোপান—মুক্তির দ্বার জনসাধারণের নিকটে উন্মুক্ত করিয়াছিলেন, জড়বাদ অবতারবাদ ও মূর্ত্তিপূজার কঠিন নিগড় হইতে অমর আত্মার বন্ধন মোচন করিয়াছিলেন তাই ১১ মাঘের পবিত্র প্রাতঃকাল আমাদিগের এত প্রিয়,অদ্যকার প্রাতঃসূর্য্যের উদয় এত

তৃপ্তিপ্রদ। বহুকাল পরে আমাদিগের পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম কুসংস্কারের মোহজাল, কল্পনার প্ররোচনা তুচ্ছ করিয়া, ঈশ্বরের মঙ্গল আশীর্ব্বাদ বহন করিয়া, আমাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছেন। অদ্যকার দিনে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসাদে মানবাত্মা আপনার পরম কল্যাণ চরম গতি দেখিতে পাইল। তাহার মোহ-আবরণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। কারামুক্ত বন্দী মুক্তির দিন স্মরণ করিয়া যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, তেমনি আজ আমাদের মানসবিহঙ্গ দিব্য আকাশে প্রেমচন্দ্রকে দর্শন করিয়া উল্লসিত হইয়া উঠিতেছে। সে আনন্দ তাহার হৃদয়ের ক্ষুদ্র বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে। মনুষ্যকে জানাইয়া তাহার তৃপ্তি নাই, ব্যাকুলতার পরিসমাপ্তি নাই, তাই অমৃতভোজী দেবতাগণকে তারস্বরে আহ্বান করিয়া বলিতেছে

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আয়ে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

হে অমৃতের পুত্র সকল, তোমরা সকলে শ্রবণ কর, আমি সেই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি।

যাঁহার কৃপায় আমরা আত্মার পরিসেব্য সত্য ধর্ম্ম লাভ করিয়াছি এই প্রশান্ত প্রাতঃকালের সৌন্দর্য্যে তাঁহার স্নিগ্ধ গম্ভীর ভাব সন্দর্শন কর। এই লতাপল্লবমণ্ডিত উপাসনাক্ষেত্রে তাঁহার উজ্জ্বল প্রকাশ সকলে জীবন্তরূপে অনুভব কর। যিনি পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা, পাপের একমাত্র মোচয়িতা, ভয়াবহ সংসার-সমুদ্রের একমাত্র তরণী তাঁহার বিশেষ করুণা সকলে আজ প্রত্যক্ষ কর। তিনিই আমাদের উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। "মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে" দেবতারা তাঁহাকে আপনাদের কেন্দ্রগত করিয়া নিত্যকাল উৎসব আমোদ উপভোগ করিতেছেন। আইস, আমরা তাঁহাকে ঘিরিয়া প্রীতিচন্দনচর্চ্চিত হৃদযথালভার ভক্তিপুষ্পহার তাঁহার চরণতলে অর্পণ করি। আইস, তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া জীবনের সার্থক্য সম্পাদন করি।

পরিশেষে ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এইরূপ প্রার্থনা করিলেন।

সম্বৎসরের পর আবার আমরা আমাদের এই উৎসবক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়া জগতের অধিদেবতা এবং আমাদের হৃদয়ের অধিদেবতা আত্মার অন্তরাত্মা পরমাত্মার পূজা করিয়া অদ্য কত না আনন্দ উপভোগ করিতেছি। যিনি আমাদের কাহাকেও এক মুহূর্ত্ত কালও বিস্মৃত নহেন তাঁহাকে আমরা স্মরণ করিতেছি—যিনি আমাদিগকে নিয়তই চক্ষে চক্ষে রক্ষা করিতেছেন তাঁহার প্রতি আমরা ধ্যানচক্ষু উন্মীলন করিতেছি—যাঁহার প্রেম আমাদের আত্মার অমৃত জীবন, অদ্য আমরা সবান্ধবে সপরিবারে একত্র হইয়া তাঁহার চরণে প্রীতি-পুষ্প বিকীর্ণ করিতেছি—আজ আমাদের আনন্দের সীমা কি?

বর্ষে বর্ষে আমাদের উপর তাঁহার এই যে প্রসাদবারি বর্ষিত হয়, ইহা দেবস্পৃহনীয় অমৃতবারি। অতএব হে ভ্রাতৃগণ, যাহাতে তাহা আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ পায়, তাহার জন্য প্রস্তুত হও; মন হইতে বিষয় কামনা পরিমার্জ্জন করিয়া অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ প্রীতি জাগাইয়া তোলো; আমাদের জন্য আজ আমাদের পরমারাধ্য পরম দেবতার প্রসাদামৃত-ভা-

দ্বার কবাট প্রসারিত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে; তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সুবিমল প্রেমরসামৃত পান কর এবং কৃতার্থ হও।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের সকল অবস্থায় আমাদের আত্মাতে অধিষ্ঠান করিয়া সম্মুখের পথ হইতে রাশি রাশি অমঙ্গল দূর করিয়া দিতেছ—আমাদের আত্মাকে শরীর মনের দুর্গের অভ্যন্তরে অতীব যত্নের সহিত পরিপোষণ করিতেছ—আমাদের অন্তঃকরণে জ্ঞানধর্ম্ম প্রীতিভক্তির বীজ অঙ্কুরিত করিয়া আমাদের সম্মুখে অনন্ত উন্নতির পথ প্রসারিত করিয়া দিতেছ—তোমার সেই সকল অনুপম করুণা স্মরণ করিয়া অদ্য আমরা সকলে মিলিয়া প্রণত মস্তকে তোমার চরণে প্রীতি ভক্তি কৃতজ্ঞতার পুষ্পরাশি বিকীর্ণ করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাদের সাম্বৎসরিক পূজা গ্রহণ কর;

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সায়ংকাল।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় নিম্নোক্ত বাক্যে সকলকে জাগ্রত করিয়া তুলিলেন।

অসীম যাঁহার করুণা, অনুপম যাঁহার দয়া যিনি আমারদের সকলের সম্ভজনীয় মহান্ পুরুষ, যিনি আমারদের ইহকালের নেতা, পরকালের সম্বল, অমর আত্মার একমাত্র অবলম্বন, তিনিই আমারদের অদ্যকার উৎসবক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তাঁহার অনুপম স্নেহকরুণা পিতৃভাব মাতৃবাৎসল্য আজ সকলে এখানে জাজ্বল্যতররূপে অনুভব কর। যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য শত শত নর নারী হাহাকার করিতেছে, তাঁহাকে এই শোভার আগার পবিত্র উপাসনামণ্ডপে দেদীপ্যমান দেখ। যাঁহার কৃপায় ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র আলোকে চারিদিক জ্যোতিষ্মান হইতেছে, ভ্রমপ্রমাদ কুসংস্কারের রাজত্ব তিরোহিত হইতেছে, মানব আত্মা গতিমুক্তির সোপান পাইতেছে, শুষ্ক মরুময় আত্মাতে যাঁহার প্রসাদে প্রেমের প্রস্রবণ উৎসারিত হইতেছে, তাঁহার দিকে আজ একবার প্রীতিভরে দৃষ্টিপাত কর। তাঁহার চরণে মস্তক অবনত কর। আজিকার শুভদিনে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকাশে কুসংস্কারের গগনব্যাপী ঘোর অন্ধকার তিরোহিত হইয়াছিল, সত্যের বিমল জ্যোতি চারিদিকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, একেশ্বরবাদের স্বর্গীয় ভেরী ভারতক্ষেত্রে বহুদিন পরে নিনাদিত হইয়াছিল, ধর্ম্মের দিকে সত্যের দিকে সকলের নয়ন মন আকৃষ্ট হইয়াছিল, এই জন্য সেই পবিত্র দিন স্মরণ করিয়া আমারদের এই উৎসব আয়োজন।

সেই সত্যধর্ম্মা পবিত্র পরমেশ্বর আমারদের এই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রেরয়িতা। তিনি যেমন মহান তাঁহার দান এই ধর্ম্মও তেমনি উদার। যাঁহার কৃপায় এই সত্যের বিজয় নিশান ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইল, সত্যের বিমল প্রভায় উদ্ভাসিত এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মকে যিনি আত্মার অবলম্বন করিয়া দিলেন, যাঁহার কৃপায় এই পতিত ভারতে প্রেমের বন্যা—সত্যের স্রোত প্রবাহিত হইল, আজ তাঁহার স্নেহকরুণা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতার গুরুভারে মস্তক কি তাঁহার নিকট সহজেই অবনত হইবে না? অদ্যকার উপাসনার জন্য কি আবার উদ্বোধন চাই। এই যে তিনি আমারদের আত্মার অন্তরে বর্ত্তমান। এই যে তিনি আমারদের প্রীতি-

পূজা গ্রহণের জন্য এখনই এখানে উপস্থিত। বিষয়চিন্তা হইতে মনকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া আইস আমরা তাঁহাকে অন্তরে বাহিরে দর্শন করি। শ্রদ্ধাভক্তি কৃতজ্ঞতার বিকসিত পুষ্প তাঁহার চরণে অর্পণ করি, তাঁহার মধুর নাম গ্রহণ করিয়া মনুষ্য জন্মের সাফল্য সম্পাদন করি।

পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি এইরূপ প্রার্থনা করিলেন।

হে৷ ত্রিভুবননাথ; স্মরণে হয় আনন্দ; আজি এই পবিত্র উৎসবের দিনে তুমি ঘন ঘন স্মরণ পথে জাগিতেছ। আমরা উপযুক্ত না হইলেও তুমি আমাদের হৃদয়ের লৌহময় কবাট ভেদ করিয়া তথায় প্রবেশ করিয়াছ। আমরা সহজে আজ তোমাকে হৃদয়ের মধ্যে পাইয়া উৎসাহের সহিত আহ্লাদের সহিত বলিতেছি, "তুমিই বন্ধু তুমি নাথ, নিশি দিন তুমি আমার। তুমি সুখ তুমি শান্তি, তুমি হে অমৃত পাথার। তুমি ত আনন্দ লোক জুড়াও প্রাণ নাশ শোক; তাপহরণ তোমার চরণ অসীম শরণ দীন জনার"। তুমি কৃপা করিয়া আজ হৃদয় অধিকার করিয়াছ, তোমার গুরুভারে অবনত হইয়া আমরা তোমাকে প্রণাম করিতেছি। তুমি তোমার মঙ্গল হস্ত আমাদের মস্তকে অর্পণ কর। আমরা বিগতপাপ, বিগততাপ ও বিগতশোক হই। তুমি আশীর্ব্বাদ কর যেন অনুক্ষণ আমরা তোমার সহচর অনুচর হইয়া থাকি। একটুখানি পরিমিত স্থানকে এখন তোমার উৎসবভূমি বলিয়া বোধ হইতেছে, যেন তোমার প্রসাদে সমস্ত জগৎকে তোমার উৎসবক্ষেত্র বলিয়া অনুভব করিতে পারি। এখন এই পরিমিত কালটুকু তোমার উৎসবের সময় বলিয়া বুঝিতেছি, কিন্তু নাথ, প্রার্থনা, যেন চিরজীবন এই দেবদুর্লভ উৎসব-সুধা পান করিতে পাই। তোমা বিহীনে যে জীবন সে মৃত্যুসমান, কে সে মৃত্যু যাতনা সহ্য করিবে! পরিত্যাগ করিও না, হে অনাথনাথ! তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না। এ ঘোরতর সংসারে তুমি পরিত্যাগ করিলে কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিব। তুমি সংসারের বিপত্তি হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর—তুমি পাপ তাপ হইতে রক্ষা কর। চারিদিকে অন্ধকার ঝঞ্ঝাবাত ও বজ্রাঘাত—তার মধ্যে তোমার অভয় ক্রোড়ই অভেদ্য দুর্গ—সেই দুর্গে তুমি আমাদিগকে আশ্রয় দাও। এখানে এমন স্নেহ নাই, যাহা চিরজীবন আমাদিগকে পালন করিতে পারে। এমন আশ্রয় নাই, যাহা চিরজীবন আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে—এমন প্রেম নাই যাহা চিরজীবন আমাদের হৃদয়পদ্মকে প্রস্ফুটিত করিতে পারে। এ সংসারে সবই ক্ষণভঙ্গুর। এখানে কাহারও উপর নির্ভর করা যায় না। তুমি আমাদের ভগ্ন হৃদয়কে তোমার মৃতসঞ্জীবনী শক্তি দ্বারা রক্ষা কর। এ সংসারের ভীষণমূর্ত্তি দেখিয়া আমরা বড় ভীত হইয়াছি। "এ পরবাসে কে রবে হায়! কে রবে এ সংশয়ে এ শোকে সন্তাপে, হেথা কে রাখিবে দুঃখ ভয় সংকটে—তেমন আপন কেহ নাহি,এ প্রান্তরে রে।" হে পরমেশ্বর,হে পিতামাতা, তুমিই কেবল আমাদের আপনার। তোমার মত আপনার আর কে আছে? তুমি আমাদিগকে এই অন্ধকার সংসারের পরপারে উত্তীর্ণ কর। হে জ্যোতির জ্যোতি! তুমি জ্যোতির্ম্ময়রূপে সকল সময়ে আমাদের

হৃদয়কে আলোকিত করিও। তুমি আমাদের জ্ঞান-চক্ষু ভক্তিচক্ষু ও বিশ্বাস-চক্ষু প্রস্ফুটিত কর। সেই চক্ষে আমরা যেন তোমার বিশ্ব দেখিয়া বলিতে পারি, "আসীন সেই বিশ্বশরণ তাঁর জগৎ মন্দিরে" সেই চক্ষে আমরা যেন তোমাকে আমাদের আত্মার মধ্যে আপনার আশ্রয়রূপে দেখিতে পাই। হে গুরুর গুরু পরম গুরু পরমেশ্বর! আমরা শুনিয়াছি, যে তোমাকে প্রীতি পূর্ব্বক ভজনা করে, তুমি তাহাকে এমন বুদ্ধি দান কর, যদ্দ্বারা সে তোমাকে লাভ করিতে পারে।

আমরা তোমারি করুণার উপর নির্ভর করিয়া—তোমাকে ডাকিতেছি, তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমাদিগকে এমন শক্তি দাও যাহাতে তোমার জ্বলন্ত সত্তা আত্মার মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারি। তুমি কৃপা করিয়া যে উপদেশ দিবে, তাহা যেন আত্মার অভ্যন্তরে শুনিতে পাই। তোমার আদেশ যতই কঠোর হউক না কেন, তাহা যেন পালন করিতে পারি। আমরা নিজে দুর্ব্বল। আমাদের আর বল কোথায়—তুমি আমাদের দুর্ব্বলতা পরিহার কর। নাথ! পার্থিব বস্তু কখনই আমাদিগকে চিরসুখী করিতে পারে নাই। কখন যে পারিবে তাহার কোন আশা নাই। অতএব চির আনন্দের কারণ যে তুমি, তুমি আমাদিগকে তোমার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ করিয়া রাখ। আমরা সংসার-কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া, মোহ-কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া প্রশান্ত চিত্তে তোমাতে অবস্থিতি করিবার জন্য তোমার নিকট আসিয়াছি, তোমার চরণ প্রান্তে আমাদিগকে একটু স্থান দাও। ঐ চরণের সুশীতল ছায়া ভিন্ন জুড়াইবার স্থান—ত্রিভুবনে আর কোথাও নাই। হে জগৎ গুরু—তুমি আমাদিগকে তোমার মধুর ধ্যানধারণায় নিযুক্ত কর। তুমি আমাদিগকে তোমার সহিত যোগযুক্ত হইতে শিক্ষা দাও। যখন অনন্যমনে আমরা তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিব—তখন পৃথিবীর কোন আকর্ষণ যেন আমাদিগকে তোমা হইতে বিযুক্ত করিতে না পারে। তুমি স্নেহের আকর, প্রেমের সাগর, তুমি আমাদিগকে গ্রহণ কর। তুমি আমাদিগকে পবিত্র কর, আমাদের সকল প্রকার চাঞ্চল্য দূর কর। তুমি যেমন শান্তস্বরূপ আমরা যেন তেমনি শান্ত হইয়া তোমাতে ডুবিতে পারি। হে পরমেশ্বর, যতদিন বাঁচিয়া থাকিব ততদিন তুমি আমাদের জীবনকে শান্তিময় কর। পরে জন্মের মত যখন চক্ষু মুদ্রিত করিব তখন কৃপা-নাথ, কৃপা করিয়া তোমার সেই আনন্দ-ধামে স্থান দিও যেখানে—পাপ নাই, তাপ নাই, শোক নাই, কোন প্রকার বিরহবেদনা নাই—কেবলি যোগানন্দের উৎস উৎসারিত হইতেছে—প্রেমানন্দের উৎস উৎসারিত হইতেছে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরে ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিম্নোক্ত বিষয়টী পাঠ করিলেন।

ব্রাহ্মের আরাধ্য দেবতা।

পরম মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের প্রসাদে আবার আমরা এখানে সবান্ধবে সমাগত হইয়া তাঁহার পূজার বিমলানন্দ উপভোগ করিয়া কৃতপুণ্য হইতেছি। এই শুভ অবসরে—পরমাত্মার প্রসাদামৃতের ভাণ্ডার যখন আমাদের চতুর্দ্দিকে উন্মুক্ত রহিয়াছে—ভগবদ্ভক্ত সাধু সজ্জনে যখন সভামণ্ডপ পরিপূর্ণ হইয়াছে—এই শুভ অবসরে—হে ভ্রাতৃগণ! আইস আমরা

আমাদের অনন্ত জীবনের পাথেয় সম্বল হৃদয় ভরিয়া যত পারি সংগ্রহ করিয়া লই।

অনন্ত জীবনের পথ—আত্মার অনন্ত উন্নতির পথ—জ্যোতির্ম্ময় অমৃত নিকেতনের পথ; ব্রহ্মজ্ঞানের আলোক যে পথের প্রদর্শক এবং ব্রহ্মরসামৃত যে পথের উপজীবিকা!

মঙ্গলালয় পরমাত্মা আমাদের বিশুদ্ধ জ্ঞানে আপনার সত্য সুন্দর মঙ্গল ভাব যেরূপ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাই আমাদের আত্মার আলোক; সেই আলোকেই পূর্ব্বতন ঋষিরা তাঁহাকে সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মরূপে অন্তরে উপলব্ধি করিতেন; এবং সেই আলোকেই আমরা তাঁহাদের সেই সকল মহাবাক্যের অর্থ এতদিনের পরে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহাদের সহিত সমস্বরে বলিতেছি যে,

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং।

সকল ঈশ্বরের সেই পরম মহেশ্বর সকল দেবতার সেই পরম দেবতা,

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং।

সকল পতির পতি সেই বিশ্বাধিপতি পরাৎপর পরম পুরুষকে আমরা আমাদের আরাধ্য দেবতা বলিয়া জানি।

পূর্ব্বতন ঋষিরা এইরূপ বলিয়াছেন; কিন্তু এক্ষণে কি আশ্চর্য্য—কৃতবিদ্য পণ্ডিতেরাও অজ্ঞানের আদর বাড়াইয়া তাহার আধিপত্য বিস্তার (এবং সেই সঙ্গে আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার) করিবার অভিপ্রায়ে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, মনুষ্য অতিশয় দুর্ব্বল জীব—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মের উপাসনা তাহার সাধ্যের অতীত! হায়! ইহাদের মতে সত্যস্বরূপের উপাসনা করিতে মনুষ্যকে বারণ—মনুষ্য তবে অসত্য মনঃকল্পিত পদার্থের উপাসনা করুক্! জ্ঞানস্বরূপের উপাসনা করিতে মনুষ্যকে বারণ—মনুষ্য তবে অজ্ঞান জড় পদার্থের উপাসনা করুক্! অনন্তস্বরূপের উপাসনা করিতে মনুষ্যকে বারণ—তবে মনুষ্য—আজ আছে কাল নাই—এখানে আছে ওখানে নাই—এই পর্য্যন্তই সীমা তাহার অধিক নহে—এইরূপ পরিমিত পদার্থ সকলের উপাসনা করুক্! অসত্যের উপাসনা করিয়া অসত্য হইয়া যা'ক্—অজ্ঞানের উপাসনা করিয়া জড়বৎ হইয়া যা'ক্—নশ্বর অন্তবৎ পদার্থের উপাসনা করিয়া অন্ত হইয়া যা'ক্;—ইহাই তবে মনুষ্যের পরম বাঞ্ছনীয় চরম গতি! এরূপ যাঁহারা বলেন তাঁহাদের জানা উচিত যে, মনুষ্য দুর্ব্বল জীব এ কথা যেমন সত্য, পরমাত্মা দুর্ব্বলের বল এ কথাও তেমনি সত্য; মনুষ্য দেবতা নহে এ কথা যেমন সত্য, মনুষ্য অমৃতের অধিকারী এ কথাও তেমনি সত্য। তাঁহাদের জানা উচিত যে, পরমেশ্বর মনুষ্যের আত্মাকে একেবারেই নিঃসহায় ছাড়িয়া দেন নাই—পরন্তু তাহার আত্মার অভ্যন্তরে একটি অতীব আশ্চর্য্য অন্তশ্চক্ষু উন্মেষিত করিয়া দিয়াছেন—পূর্ব্বতন ঋষিরা যাহার নাম দিয়াছেন আত্মপ্রত্যয়। সেই আত্মপ্রত্যয়ে পরমাত্মা সত্যং জ্ঞানমনন্তং রূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। পরমাত্মার এই যে বিশুদ্ধ প্রকাশ ইহার প্রবেশ-দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া—মনুষ্য—অমৃতের পুত্র মনুষ্য—যাহার তাহার কথায় যে সে কল্পনার দ্বারে মস্তক অবনত করিবে—বিশুদ্ধ জ্ঞানের জ্যোতির্ম্ময় পথ ছাড়িয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন কল্পনার প্রলোভন্ এবং বিভীষিকার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইবে—ইহাই কি বিদ্বান্ এবং বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতগণের সার

সিদ্ধান্ত ?—তাহা যদি হয় তবে, ধিক্ তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধি পাণ্ডিত্য ! ধিক্ তাঁহাদের উপদেশ বাক্য !

সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেরই জয়—অসত্যের জয় কখনই না—ইহা জানিয়াও জ্ঞানবান্ মনুষ্য যে, কেমন করিয়া সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃত্রিম দেবতার উপাসনায় ব্রতী হয়,জানিয়া শুনিয়াও চক্ষু থাকিতে অন্ধ হয়—ইহা অতীব আশ্চর্য্য। অজ্ঞান মূর্ত্তি-উপাসকদিগের তো কথাই নাই—এমনও সব বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত আছেন যাঁহারা মনুষ্যত্ব বলিয়া একটা মহাজীব কল্পনা করিয়া সেই মনঃসম্ভূত দিবাস্বপ্নকে সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মের স্থলাভিষিক্ত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হ'ন না।

কিন্তু ঈশ্বরের করুণা অপার! তিনি লোকভঙ্গ নিবারণার্থে সেতুস্বরূপ হইয়া সমস্ত ধারণ করিতেছেন। কি অজ্ঞ কৃষক কি বিদ্বান্ পণ্ডিত সকলেরই জন্য তিনি পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক উভয়বিধ জীবনের সম্বল পূর্ব্ব হইতে আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন। এ জ্ঞান যেমন আপামর সাধারণ সকলেরই মনে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল আছে যে এক জ্যোতিষ্মান্ প্রতাপবান্ সূর্য্য দিন রাত্রি ঋতু সম্বৎসর সমস্তেরই মূলাধার ; ইহাও তেমনি দেদীপ্যমান যে,এক সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বান্তর্যামী ধর্ম্মাবহ পরমেশ্বর সমস্ত জগতের মূলাধার; তিনি রাজার রাজা, পিতার পিতা এবং সকল ঈশ্বরের পরম মহেশ্বর। বুদ্ধি যেমন সকল মনুষ্যের সাধারণ সম্পত্তি, আত্মপ্রত্যয়ও তেমনি সকল মনুষ্যের সাধারণ সম্পত্তি; কিন্তু "সকলেরই বুদ্ধি আছে" ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, সকলেই বিজ্ঞান-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ; তেমনি সকলেরই আত্মপ্রত্যয় আছে ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, সকলেই ব্রহ্মবিদ্যায় পারদর্শী। বিজ্ঞান শাস্ত্র অনেকেরই নিকটে অপরিচিত থাকিতে পারে, কিন্তু সংসার নির্ব্বাহের উপযোগী বিষয়-বুদ্ধি ন্যূনাধিক পরিমাণে সকলেরই আছে ; তেমনি ব্রহ্মবিদ্যা অনেকেরই নিকটে অপরিচিত থাকিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম-নির্ব্বাহের উপযোগী ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই অন্তঃকরণে ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রজ্জ্বলিত আছে।

মনুষ্য এক দিকে পৃথিবীর জীব আর একদিকে অনন্ত-উন্নতিশীল আত্মা। নশ্বর পার্থিব উপকরণের আয়োজনের জন্য তাহার যেমন বিষয়-জ্ঞানের প্রয়োজন, অবিনশ্বর স্বর্গীয় উপকরণের আয়োজনের জন্য তাহার তেমনি ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন। করুণাময় পরমেশ্বর তাই মনুষ্যের অন্তঃকরণে দুই বিভিন্ন-মুখী বৃত্তি সংযোগ করিয়া দিয়াছেন ;—বিষয়জ্ঞানের বৃত্তি—বুদ্ধি;এবং ব্রহ্মজ্ঞানের বৃত্তি—আত্মপ্রত্যয়। বুদ্ধি বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের বিষয়রাজ্য হইতে পরিমিত সত্যসকল সংগ্রহ করে, আত্মপ্রত্যয় অতীন্দ্রিয় জগৎ হইতে বুদ্ধির অতীত মহান্ সত্য-সকল সংগ্রহ করে। বুদ্ধি এবং আত্মপ্রত্যয় দুইই মনুষ্য জাতির সাধারণ সম্পত্তি, আর, দুয়েরই রীতিমত বিকাশ শিক্ষার উপরে, সঙ্গের উপরে, সামর্থ্যের উপরে এবং সাধনের উপরে নির্ভর করে। যাঁহারা মনে করেন যে, বুদ্ধিই জ্ঞানের একমাত্র দ্বার সেটি তাঁহাদের বড়ই ভুল। এমন-সকল অপরিচ্ছিন্ন মহান্ সত্য আছে যাহা বুদ্ধি সহস্র হাতবাড়াইয়াও নাগাল পায় না—অথচ আত্মপ্রত্যয়ে যাহা ধ্রুবরূপে স্বপ্রকাশ। আমরা—যেমন-স্পষ্ট দেখিতেছি যে, এ দেশ এইখানে ওদেশ ঐখানে, তেমনি-

স্পষ্ট জানিতেছি যে, প্রত্যেক দেশ অনন্ত আকাশের প্রসারিত ক্রোড়ে অবস্থিতি করিতেছে; যেমন স্পষ্ট জানিতেছি, যে পৃথিবীর কোনো স্থানই শূন্য আকাশ মাত্র নহে—জানিতেছি যে, সকল স্থানই অদৃশ্য ভৌতিক শক্তিতে পরিপূর্ণ; তাহার মধ্যে আবার কোনো কোনো স্থান জৈবিক শক্তিতে, কোনো কোনো স্থান জৈবিক এবং মানসিক দ্বিবিধ শক্তিতে, কোনো কোনো স্থান জৈবিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক ত্রিবিধ শক্তিতে পরিপূর্ণ; তেমনি আমরা সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতেছি যে, অসীম আকাশ শূন্য আকাশ নহে তাহা সত্যং জ্ঞানমনন্তং পরমাত্মার সত্তা এবং শক্তিতে পরিপূর্ণ। আমরা যেমন স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতেছি যে, জীবাত্মা শরীরের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াও আমাদের প্রতিজনের নিগূঢ় অভ্যন্তরে অধিষ্ঠান করিতেছে, তেমনি স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতেছি যে, পরমাত্মা অসীম আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়াও তিনি আমাদের আত্মার নিগূঢ় অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন।

আত্মপ্রত্যয়ের মতো ব্রহ্মজ্ঞানের এমন সহজ পথ থাকিতেও লোকে যে, তাহা পরিবর্জ্জন করিয়া অন্যান্য জটিল পথ অবলম্বন করে, তাহার কারণ আর কিছু না—ভক্তিমান্ অজ্ঞানী এবং ভক্তিহীন বিজ্ঞানী এই দুই দলের দুইরূপ অভ্যস্ত সংস্কার। ভক্তিমান্ অজ্ঞানীরা আত্মপ্রত্যয়ের পথে দণ্ডায়মান হইয়াও চিরাভ্যস্ত সংস্কারের বিরুদ্ধে সে পথ পরিমার্জ্জন করিতে সংকুচিত হ'ন; এই জন্য তাঁহারা পরমাত্মাকে সর্ব্বব্যাপী এবং সচ্চিদানন্দ স্বরূপ জানিয়াও, সেই আত্মপ্রত্যয়-গোচর মহাসত্যকে বুদ্ধি-গ্রাহ্য পরিমিত সত্যের সহিত একীভূত করিয়া অমূর্ত্ত পুরুষের মূর্ত্তি-কল্পনায় প্রবৃত্ত হ'ন। ইহাঁরা আত্মপ্রত্যয়ের স্বচ্ছ পথ হইতে কল্পনার জঞ্জাল সকল পরিমার্জ্জন না করিয়া ক্রমিকই আরো উপর্য্যুপরি জঞ্জালের উপর জঞ্জাল আনিয়া জড়ো করেন। ও দিকে, ভক্তিহীন বিজ্ঞানীরা অনাদ্যনন্ত মহান্ সত্যের বিরুদ্ধে পরিমিত সত্যের পক্ষ সমর্থন করিতে গিয়া, আত্মপ্রত্যয়কে উচ্ছেদ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন; তাঁহারা মনে করেন যে আত্মপ্রত্যয় গেলেই বুদ্ধি নিষ্কণ্টক হইবে! এটা তাঁহারা দেখেন না যে, আত্মপ্রত্যয়কে উচ্ছেদ করিয়া বুদ্ধিচর্চ্চায় যত্ন সমর্পণ করা, আর, বৃক্ষের মূল উচ্ছেদ করিয়া শাখাতে জল সিঞ্চন করা, দুইই সমান। ইহাঁরা ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিদিগের দুইটি মহাবাক্যের একটি শিরোধার্য্য করেন, আর একটি দেখিয়াও দেখেন না; পরমাত্মা বুদ্ধির অতীত এইটিই কেবল ইহাঁরা শিরোধার্য্য করেন কিন্তু তিনি যে, আত্মপ্রত্যয়ের গোচর, ইহা তাঁহারা দেখিয়াও দেখেন না। কে এমন নির্ব্বোধ যে, দুরূহ বিজ্ঞান শাস্ত্র করায়ত্ত করিতে পারিলেন না বলিয়া সেই খেদে তিনি বুদ্ধিবৃত্তিকে কোনো কার্য্যেরই নহে মনে করিয়া প্রয়োজনীয় বিষয়-কার্য্যেও বুদ্ধিপরিচালনায় ক্ষান্ত হ'ন! কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনেকানেক কৃতবিদ্য পণ্ডিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারিলেন না বলিয়া সেই খেদে তাঁহারা আত্মপ্রত্যয়কে কোনো কার্য্যেরই নহে মনে করিয়া সাধ করিয়া অতলস্পর্শ সংশয়-সাগরে ঝম্প প্রদান করেন!

কিন্তু ঈশ্বরের করুণা অপার! তিনি আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরণ করিয়া এইরূপ অজ্ঞান-সুলভ এবং বিজ্ঞান-সুলভ

দ্বিবিধ ভ্রমের উভয় সঙ্কট হইতে আমাদিগকে নিরাপদে রক্ষা করিতেছেন। ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মেরা তাই আত্মপ্রত্যয়ের বিমল জ্যোতিতে অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান এবং ব্রহ্মানন্দরসপান করিয়া প্রাণ খুলিয়া বলেন

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি শান্তং শিবমদ্বৈতং।

এই নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং এই একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা এই দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং এই পরাৎপর পরম দেবতা, ব্রাহ্মদিগের একমাত্র আরাধ্য দেবতা। যিনি আত্মপ্রত্যয়ের শুভ্র জ্যোতিতে এই সর্ব্বাধিপতি এবং সর্ব্বাশ্রয় মহান্ দেবতাকে আত্মার আত্মা-রূপে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া প্রীতি ভক্তি কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার আরাধনা করেন তাঁহাতে হৃদয় সমর্পণ করেন, তাঁহার ভাবের আলোকে পথ দেখিয়া চলেন, তিনি তাঁহার প্রসাদামৃত এবং প্রেমসুধায় আত্মাতে প্রাণ পাইয়া উঠিয়া আনন্দে কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা করেন—আনন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন,আনন্দে উন্নত লোকে গমন করিয়া পরমাত্মার নূতন নূতন রাজ্যে নূতন নূতন মহিমা অবলোকন করেন এবং নূতন নূতন ভাবের রসাস্বাদন করিতে করিতে উন্নতি পথে অগ্রসর হ'ন। তাঁহার আরাধ্য দেবতা যেমন সত্য—তাঁহার আরাধনাও তেমনি সত্য—তাঁহার আনন্দও তেমনি সত্য! তিনিই অন্তরের সহিত বলিতে পারেন যে, সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেরই জয় হয়—মিথ্যার কথনই না।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

রাগিণী ইমন্‌কল্যাণ—তাল সুরফাঁকতাল।

নমঃ শঙ্করায়,মহেশ,ভবনায়ক,অনাদি, ধাতা
আনন্দরূপ সর্ব্বব্যাপী।

মহাব্যোমে অগণন গ্রহতারা ধায় তোমার ভয়ে, তুমি পিতা নিখিল কারণ, তব অন্ত কোথা?

সন্তাপ-নিবারণ, ভব-সমুদ্র-তারণ, মনপাবন, বিভু, ত্রিলোক-শুভদাতা।

ত্রিভুবন-চরাচর-প্রাণ তুমি, হে প্রভো, ভক্তবৎসল, দয়াল, দীনবন্ধু, সেবকে বিতর তোমার প্রসাদ।

রাগিণী ইমন—তাল আড়াঠেকা।

এ মোহ আবরণ খুলে দাও দাও হে।
সুন্দর মুখ তব দেখি নয়ন ভরি,
চাও হৃদয় মাঝে চাও হে।

মান্দ্রাজি ভজন।

প্রণমামি অনাদি, অনন্ত, সনাতন, পুরুষ;
নিখিল জগত-গতি, পরম-গতি, মহান্,
ভকত-জীবন-ধন;
ভূমা, প্রভু, পরম-ব্রহ্ম, পরমায়ণ, কারণ,
শরণাগত-বৎসল,পূর্ণ সত্য,সকল দুখ-বারণ।

ভব-জলধি-তরণ, শরণ, অতি পবিত্র,
শুভ-নিধান, অজর, অভয়, অবিনাশী।

সুর-নর-বন্দন, জগ-চিত-রঞ্জন, ভব-ভয়-ভঞ্জন,বিতর কৃপা।

দীন-নাথ,করুণাময়,সুন্দর,প্রেম-সিন্ধু,মধুময়,
নাহি উপমা, নাম-রূপ-গুণ-অতীত, চিন্ময়,
অন্তরে তোমার আসন।

সাহানা—কাওয়ালি।

দশ দিশি কি বা আজি মধুময়
হৃদয়-নাথেরে হৃদয়ে হেরিয়া।
সুবিমল পরশে হরষে মাতি
প্রাণ-বিহঙ্গ ওঠেরে গাহি,
মন-অলি পিয়ে অমিয়া,
প্রেম-উৎস ছুটীল উচ্ছ্বাসিয়া।

সুরট—ঠেওট।

দরশন দাও হে প্রভু এই মিনতি।
তব পদ-আশে হৃদয় সদাই আকুল অতি।
তুমি মম জীবন, প্রাণের প্রাণ,
তোমা বিনা প্রভু নাহি কোন গতি।

রাগিণী কর্ণাটি তিলক কামোদ—তাল তেওরা।

বিঘ্নহরণ, প্রভু, শান্তিদাতা, পাতা, করুণাসিন্ধু, প্রেমাধার, হৃদয়সখা, জগজ্জন-গুরু, মহান্।

অখিল-ধারণ,পরম কারণ,পতিতপাবন, সনাতন, বিভু, সফল কর মম প্রাণ হৃদিমন, কর হে আনন্দসুধাদান।
সকল শুভদাতা, অনন্ত-মঙ্গল-আকর
যাচি তব দ্বারে, দাওহে চিত্ত-প্রসাদ, প্রেম বিমল,
শুভকর বিদ্যা দাও চরণ প্রান্তে স্থান।

নিসাসাগ—ঝাঁপতাল।

দেহি হৃদয়ে সদা শান্তি-রস প্রভু হে,
তব অমৃত কর-পরশে দুঃখ-যাতনা কর দূর,
সুখ বিমলতর বিতর প্রভু হে।
দেহি প্রভু প্রেম-ধন, দারিদ্র্য কর হরণ,
তব চরণে দেহি শরণ, এই ভিক্ষা করিহে।

সুরট—চৌতাল।

বাজে সুতানে সুন্দর এই বিশ্ব-যন্ত্র অনন্ত গগনে,
শ্রবণে শুনি সে ধ্বনি ভুলি আপনে।
কত রবি শশি তারক, কত গ্রহ উপগ্রহ,
অহরহ চলে তালে তালে,
আহা কি বা সবে বাঁধা প্রেম-বন্ধনে।
ছয় ঋতু কত ছন্দে, ছয় রাগ গাহে আনন্দে,
সুর-তরঙ্গে বহে সমীরণ, পুলকিত তরুগণ,
হরষিত বিহঙ্গম, বিকশিত কুসুম-রাজি বন উপবনে।
কে গো তুমি অন্তরালে থাকি
খুলিলে অনন্ত সংগীত-লহরী,
এ বিশ্ব মাঝে উৎসব-আনন্দ উথলিল,
প্রেম-সিন্ধু প্লাবিল নিখিল ভুবনে।

মান্দ্রাজি ভজন।

অন্তরের ধন, প্রাণ-রঞ্জন, স্বামি।
এসেছি হেথা আজি তোমারি আশে।
প্রেম-চন্দ্র! তোমা হেরি দুখ-ঘন দূরে যায়
বিমল জোছনা ভায়, আনন্দ বিকাশে।
সুন্দর মূরতি হেরিয়ে বিস্মিত মোহিত আমি;
সঙ্গীত শুনি অন্তরে, সুধাময় তব বাণি।

রাগিণী সিন্ধু—তাল একতালা।

শূন্য প্রাণ কাঁদে সদা প্রাণেশ্বর,
দীনবন্ধু দয়াসিন্ধু,
প্রেম বিন্দু কাতরে কর দান।
কোরোনা সখা কোরোনা
চির-নিষ্ফল এই জীবন,
প্রভু জনমে মরণে তুমি গতি,
চরণে দাও স্থান।

রাগিণী জয়জয়ন্তী কোকব—তাল ঝাঁপতাল।

নিকটে নিকটে থাক হে নাথ, তারণ,
পতিত-পাবন, অধম-উদ্ধারণ!
তুমিই মম জ্ঞান, তুমিই মম ধ্যান
তুমি মম সাধন।

আশীর্ব্বাদ।

গত ১৪ মাঘ শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নিকট স্বদেশ ও বিদেশের বহুসংখ্য ব্রাহ্ম সমাগত হইয়াছিলেন এই শুভ সমাগমে তিনি তাঁহাদিগকে যে আশীর্ব্বাদ করেন নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

এই দীনহীন বঙ্গদেশের অবস্থা নিরীক্ষণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। বলহীন, বীর্য্যহীন, দীনদরিদ্র বঙ্গবাসীদিগকে ভারতবর্ষের আর সকলেই অনাদর করে। মাতার যেমন দুর্ব্বল পুত্রের উপর অধিক স্নেহদৃষ্টি, ঈশ্বরেরও এই বঙ্গবাসীদিগের প্রতি সেইরূপ স্নেহদৃষ্টি। এখানে আমাদের আর কেহই সহায় নাই—তিনিই

একমাত্র সহায়। এমন যে উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মধর্ম্ম, সেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে তিনি বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন। দেবসেব্য ব্রাহ্মধর্ম্ম—পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠধর্ম্মকে ঈশ্বর বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন। ইহাতে তাঁহার কত দয়া, কত করুণা প্রকাশ পাইতেছে। তোমরা সকলে সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিকারী হইয়াছ। তোমরা ইহাকে প্রাণপণে রক্ষা কর। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি বঙ্গদেশে স্থান না পায়, তবে আর এদেশের উন্নতির কোন উপায় থাকিবে না। তোমরা ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রাণপণে রক্ষা কর—ব্রাহ্মধর্ম্ম তোমাদিগকে রক্ষা করিবে। ইহাকে যদি অবহেলা কর, তোমাদিগের আর দুর্গতির সীমা থাকিবে না।

ব্রাহ্মধর্ম্মের দেবতা ব্রহ্ম; ব্রাহ্মধর্ম্মের ধর্ম্ম তাঁহার আদেশ। তিনি আমাদের হৃদয়ে অনুক্ষণ তাঁহার ধর্ম্ম-আদেশ প্রেরণ করিতেছেন। সেই আদেশ আমাদের বিজ্ঞানে স্ফূর্ত্তি পায়। সেই আদেশানুযায়ী যে কর্ম্ম করে, সেই ধর্ম্মিষ্ঠ, বলিষ্ঠ হয়। তাঁহার শরণাপন্ন হও; তাঁহাকে সযত্নে হৃদয়ে রক্ষা কর, তাহা হইলে তোমাদিগের মধ্যে যে ভীরু, তাহার ভয় থাকিবে না; তোমাদিগের মধ্যে যে দুর্ব্বল, সে সবল হইবে, তোমাদিগের মধ্যে যে অনাথ সে সনাথ হইবে। তাঁহার শরণাপন্ন হও; তিনি শরণাগত-বৎসল। প্রাণপণে ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা কর; প্রেমস্বরূপ ব্রহ্মেতে প্রেম অর্পণ কর। আনন্দমনে বিমল হৃদয়ের প্রীতি-কুসুম দিয়া তাঁহাকে পূজা কর। নিয়ত তাঁহার ধর্ম্ম-আদেশ পালন কর।

যাঁহার ভয়ে বায়ু বহিতেছে, যাঁহার ভয়ে সূর্য্যচন্দ্র চলিতেছে, তিনি তোমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন, তোমাদিগের শুভ ইচ্ছাতে বলসঞ্চার করুন; তোমাদিগকে সৎপথে ধর্ম্মপথে লইয়া যাউন, এই আমার হৃদ্গত আশীর্ব্বাদ।

১৪ই মাঘ, ৬২ ব্রাহ্ম সম্বৎ ১৮১৩ শক।

শব্দব্রহ্ম সাধন।

(১১ মাঘ উপলক্ষে কোন দর্শক ব্রহ্ম-সঙ্গীত শুনিয়া নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন।)

সুধাধবলিত বৃহৎ সৌধ—মধ্যে সহস্রাধিক মানব, সকলেই স্থির ও গম্ভীর, সকলেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব অনির্বাচ্য শব্দ-ব্রহ্মের আবির্ভাব প্রতীক্ষা করিতেছে। এমন সময় শুনা গেল—

"নমঃ শঙ্করায় মহেশ ভবনায়ক অনাদি ধাতা—" প্রাণের প্রাণ শব্দ ব্রহ্ম কর্ণপথে প্রবেশ করতঃ প্রাণে গিয়া মিশিল, তাপ পাপ ভুলিয়া গেলাম, ব্রহ্মানন্দ কি তাহা বুঝিতে পারিলাম, সমাধিস্থ হইলাম, জগৎ ভুলিয়া গেলাম।

পুনরাবর্ত্তন—পুনরাবির্ভাব—

"নমঃ শঙ্করায় মহেশ ভবনায়ক অনাদি ধাতা—" শুনিয়া সমাধি ভাঙ্গিল, ব্যুত্থিত হইলাম। তখন মনে হইল, আমি যেন ব্রহ্মলোকে গিয়াছিলাম, তথা হইতে ঋষিলোকে আসিয়াছি। মনে হইল, যেন ব্যাস যাজ্ঞবল্ক্য, সামগ জৈমিনি প্রভৃতি ঋষি সামগানে মন প্রাণ মগ্ন করিয়া শব্দব্রহ্মে অবস্থিতি করিতেছেন।

মনোমধ্যে ঘোর আন্দোলন হইতে লাগিল। কত কথাই যে মনে আসিল তাহার ইয়ত্তা নাই। বিশেষতঃ মহাযোগী যাজ্ঞবল্ক্যের ও পতঞ্জলির নিগূঢ় উপদেশ সমস্তই মনে আসিল। পতঞ্জলি একদিকে অষ্টাঙ্গ যোগ ও অপর দিকে ঈশ্বর-প্রণিধান সমানরূপে স্থাপন করিয়া বলিতেছেন—

"ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা।" হয় দুঃসম্পাদ্য অষ্টাঙ্গযোগ অবলম্বন কর, না হয় ঈশ্বর-প্রণিধান-তৎপর হও। অষ্টাঙ্গযোগ যাহা করিবে, একমাত্র ঈশ্বর-প্রণিধান তাহাই করিবে। উভয়ই সমবল ও সমান পথ। মহাযোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন,

"যথা বিধানেন পঠন্ সামগায়মবিচ্যুতম্।
সাবধান স্তদভ্যাসাৎ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥" *

যাঁহার চিত্তবৃত্তি নিরাকার অবলম্বনে পরাঙ্মুখ তিনি সাবধানে সামগান অবলম্বন করুন। অষ্টাঙ্গযোগ, ঈশ্বরপ্রণিধান, গানযোগ, তিনই ব্রহ্মগমনের পথ; পথ সত্য, পরন্তু গানযোগ সর্ব্বাপেক্ষা সুগম্য।

"শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।"

শব্দব্রহ্মউপাসক অল্পায়াসে ব্রহ্মলাভ করিতে পারে।

অষ্টাঙ্গযোগের ষষ্ঠ ভূমিকায় ধ্যান, তাহা নিরাকার পক্ষে অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিরাকার সাধনে প্রবৃত্ত হইতে গেলে দীর্ঘকালব্যাপী কঠোরতর চেষ্টায় নেতি নেতি ক্রমে অর্থাৎ নিষেধমুখী সাধনে বৃত্তিলয় করার চেষ্টা করিতে হয়, পরন্তু তাহা সংসারী জীবের পক্ষে নিতান্ত দুঃসম্পাদ্য। ঈশ্বরপ্রণিধানও সহজ নহে। অবিচ্ছেদে ধারাবাহী ক্রমে যাবজ্জীবন ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া থাকিতে হইবেক, ক্ষণকালের নিমিত্তও চিত্ত হইতে ঈশ্বরকে অপসারিত করিতে পারিবে না, গমন উপবেশন শয়ন আহার বিহার নিদ্রা, অর্জ্জন ব্যয় রক্ষণ, কোনও কার্য্যে আত্মকর্ত্তৃত্ব রাখিতে পারিবে না, সমুদায় কার্য্যে সমুদায় দৃশ্যে ও সমুদায় ভাবে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে হইবেক, তবেই তোমার ঈশ্বরপ্রণিধান সিদ্ধ হইবেক। যখন তাহা পাকা হইবে তখন তোমার প্রতি প্রকৃত ঈশ্বরানুগ্রহ হইবেক। তখন তোমার আত্মার নিরাকারত্ব সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইবেক। সুতরাং ঈশ্বরপ্রণিধানব্রত সহজ নহে। দুঃসম্পাদ্য ঈশ্বরপ্রণিধান ও অষ্টাঙ্গ যোগ অপেক্ষা শব্দব্রহ্ম উপাসনা বা গীতযোগ অপেক্ষাকৃত সুগম। গীতে যে ভাব অধ্যারোপিত থাকে চিত্ত সেই ভাবেই নিমগ্ন হয়, সমাধিস্থ বা একাগ্রীকৃত হয়। ব্রহ্মভাব অধ্যারোপিত থাকিলে কাজেই ব্রহ্মভাবে নিমগ্ন, সমাধিপ্রাপ্ত বা একাগ্রীকৃত হয়, স্বরবিন্যাসের নাম গীত, স্বরের মূল ধ্বনি, ধ্বনির মূল শূন্য, তাহা নিরাকার। শব্দ, সুর বা ধ্বনি, এ সকলের নিরাকারে উৎপত্তি ও নিরাকারে লয়। মধ্যে যে পুষ্টভাব তাহাও অমূর্ত্ত সুতরাং নিরাকার। অথচ আনন্দঘন। সেই কারণে ঋষিরা বলেন, শব্দব্রহ্মোপাসনা নিরাকার উপাসনা তাহা শব্দাশ্রয় শূন্য অবলম্বনে উপাসনা সুতরাং নিরাকার।

আগে আগে ভাবিতাম, গীত কেবল সাময়িক চিত্ত বিনোদের নিমিত্ত সৃষ্ট,কিন্তু এখন দেখিতেছি গীতই নিরাকার উপাসনার উৎকৃষ্ট উপায়। ব্রহ্মভাবানুবিদ্ধ গীত অজ্ঞকেও অলক্ষ্যে বা অজ্ঞাতসারে ব্রহ্মপ্রাপ্তি করায়, পরন্তু অজ্ঞ তাহা বুঝিতে পারে না। জ্ঞানী বুঝিতে পারেন, তাই তাঁহারা গীতকে উৎকৃষ্ট উপাসনাঙ্গ বলিয়া অবধারণ করেন। গীতে যে বস্তু অধ্যারূঢ় হয়, গীত চিত্তকে সেই বস্তুতেই সমাহিত করে ও সেই বস্তুতেই ভালবাসা জন্মায়, ইহা দেখিয়া ঋষিরা সাধনসঙ্গীতকে পৃথক

* যস্য পুনশ্চিত্তবৃত্তি র্নিরাকারাবলম্বতয়া সমাধৌ নাভিরমতে তেন শব্দব্রহ্মোপাসনং কার্য্যমিত্যাহ যথেতি। স্বাধ্যায়াবগতমার্গানতিক্রমেণ সামগায়ং সামগানং অবিচ্যুতং অস্খলিতং সাবধানঃ সামাধ্বন্যনুস্যূতব্রহ্মৈকাগ্রচিত্তবৃত্তিঃ পঠন্ তদভ্যাসবশাৎ তত্র নিষ্ণাতঃ শব্দাকারশূন্যোপাসনেন পরং ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি।

প্রকারে উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে কু-ভাবের গান ও অন্য রসোদ্দীপক স্বরাদি বাদ দেওয়া আছে। এ বিষয়ে সামগানই শ্রেষ্ঠ, পরন্তু তাহা জানা না থাকিলে অথবা তাহা ভাল না বুঝিলে লৌকিক গানও অবলম্বনীয়। যে সকল গান উপাসনায় প্রয়োজ্য সে সকল গান যাগ্যবল্ক্যের শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

"অপরান্তকমুল্লাপ্যং মদ্রকং মকরীং তথা।
ঔবেণকং সরোবিন্দুমুত্তরং গীতকানিচ॥
ঋগ্‌গাথা পাণিকাদক্ষ-বিহিতা ব্রহ্মগীতিকা।
গেয়মেতত্তদভ্যাসকরণাৎ মোক্ষসংজ্ঞিতম্॥" *

অপরান্তক, উল্লাপ্য, মদ্রক, মকরী, ঔবেণক, সরোবিন্দু, উত্তর, এই সকল প্রকরণাখ্য মহাগীত ও ঋগ্‌গাথা, পাণিকা, দক্ষবিহিতা, ব্রহ্মগীতিকা, এই সকল মহা গীতিকা ব্রহ্মভাবানুবিদ্ধ (গ্রথিত) করিয়া গান করিবেক। এই সকলের অভ্যাস চিত্তের একাগ্রতা অভ্যাস দ্বারা ব্রহ্মপ্রবণতা আনয়ন করে।

উপরোক্ত শব্দগুলি এক এক গান জাতির প্রাচীন নাম। অপরান্তক কাহাকে বলে, উল্লাপ্য কাহাকে বলে? এ সকল বিবরণ সঙ্গীতশাস্ত্রে দ্রষ্টব্য। ফল কথা, বৈরাগ্যে ভোগে ও ঈশ্বরোপাসনায় ভিন্ন ভিন্ন স্বররাগনিষ্পাদিত গানজাতি থাকার ব্যবস্থা দেখা যায়। স রি গ ম প ধ নি, এই সাত স্বর নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ও নির্দ্দিষ্ট রসে প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা আছে।

"স-রী বীরেঽদ্ভুতে রৌদ্রে ধোবীভৎসে ভয়ানকে।
কার্য্যৌ গনীতু করুণে হাস্য শৃঙ্গারয়োর্ম্মপৌ॥"

ষড়জ ও ঋষভ অদ্ভুত ও রৌদ্র রসের ব্যঞ্জক, ধৈবত বীভৎস ও ভয়ানক রসের বোধক। গান্ধার ও নিষাদ করুণ ও শান্ত রসের উদ্বোধক এবং মধ্যম ও পঞ্চম হাস্য ও শৃঙ্গার রসের উদ্দীপক। এই জন্যই ঐ ঐ রসের আবির্ভাবকে ঐ ঐ স্বর অংশীকৃত করিয়া অর্থাৎ ঐ ঐ স্বরকে অংশস্বর করিয়া তদনুসারে গানের জাতি ও রাগাদির ব্যবস্থা করা হয়।

প্রাপ্তি স্বীকার।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্র নাথ বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। আমরা এই গ্রন্থের ভূমিকা পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। ইহাতে প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা এই পুরাণকে মহাপুরাণ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে। আজকাল প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের উপর অনেকেরই আদর। পুরাণপাঠে অনেকেরই প্রবৃত্তি দেখা যায়। আশা করি এই ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ পাঠ করিয়া অনেকেই তৃপ্ত হইবেন।

ক্রনলজিকাল টেবেল। সচরাচর এইরূপ পুস্তককে আদালতী ভাষায় যন্ত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ইহাতে ইংরাজী ১৮৯১ শাল হইতে ১৯০০ শাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক মাস ও প্রত্যেক দিনের অনুরূপ বাঙ্গলা, ফস্‌লী, বিলায়তী, হিন্দী ও হিজরী সন তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার সংকলনকর্ত্তা পণ্ডিত প্রাণনাথ সরস্বতী। ইহা বিষয়ী ও আইন ব্যবসায়ীদিগের বিশেষ প্রয়োজনীয় হইবে সন্দেহ নাই।

* যস্য পুনর্বৈদিক্যাং গীতৌ চিত্তং নাভিরমতে তেন লৌকিকগীতানুস্যূতব্রহ্মোপাসনং কার্য্য মিত্যাহ অপরান্তকমিত্যাদি। অপরান্তকোল্লাপ্য মদ্রক মকরৌবেণকানি সরোবিন্দু সহিতঞ্চ উত্তরং ইত্যেতানি প্রকরণাখ্যানি সপ্তগীতানি চ শব্দাৎ আসারিত বর্দ্ধমানতাদি মহাগীতানি গৃহ্যন্তে। ঋগ্‌গাথা প্রভৃতয়ো গীতিকা ইত্যেতদপ্যপরান্তকাদি গীতজাতং অধ্যারোপিতব্রহ্মভাবং মোক্ষসাধনত্বাৎ মোক্ষসংজ্ঞিতং মন্তব্যম্। অত্র চ তালাদিভঙ্গভয়াৎ চিত্তবৃত্তেঃ ব্রহ্মৈকাগ্রতায়াঃ সুকরত্বাৎ অনায়াসেনৈব মুক্তিঃ।

ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।
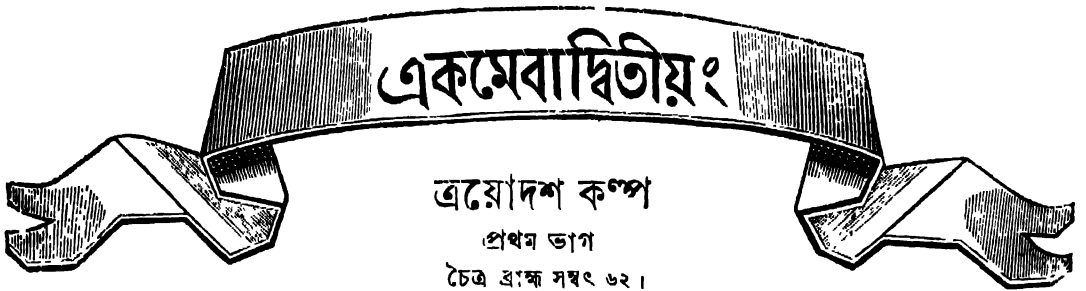
শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের উপদেশ।

সপ্তম উপদেশ—আর্য্য জাতি।

(৩০ শে চৈত্র, শুক্ল চতুর্থী, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১)

মনুষ্যের নানা প্রকার মৌলিক গঠন (type) আছে—মঙ্গোলীয়, ককেশীয়, নিগ্রো ইত্যাদি। ইহাতেই বোধ হয় যে, স্থানে স্থানে বিভিন্ন প্রকার মনুষ্য সৃষ্ট হইয়াছিল। হিমালয়ের উত্তরে যে সমভূমি, সেখানে অনেক লোকের বসতি ছিল এবং তাহাদিগের মধ্যে কতকটা উন্নতিও হইয়াছিল; কৃষি বাণিজ্য বিস্তার হইয়াছিল; দেবতার উপাসনাও সেখানে চলিত ছিল—সূর্য্যের উপাসনা হইত, চন্দ্রের উপাসনা হইত। ক্রমে যখন তাহাদিগের মধ্যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইল, তখন তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে নানা প্রকার বিরোধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ায়, তাহারা দলে দলে চারিদিকে বহির্গত হইয়া পড়িতে লাগিল; কোনও দল ইউরোপে চলিল, কোনও দল বা পারস্য দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিল; কোনও দল হিমালয় ভেদ করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া বসতি করিল। পারস্যদেশীয় ও এদেশীয়দিগের মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া একটা বিবাদ ছিল—প্রধানতঃ দেব ও অসুর লইয়া; পারসীকগণ দেব শব্দকে অসুর অর্থে এবং অসুর শব্দকে দেবতা অর্থে প্রয়োগ করে। এই দুই জাতির মধ্যে যেমন উপাসনার সাম্য ছিল, বিবাদও তেমনি প্রবল ছিল।

ভারতবর্ষে যাহারা আসিল, তাহারাই আর্য্য নামে খ্যাত হইল। যখন হিমালয়ের উত্তরে সকলে অবিচ্ছিন্ন ভাবে বাস করিত, তখনও আর্য্য নাম ছিল; কিন্তু ভারতবর্ষেই আর্য্য নামের কিছু বিস্তার হইয়াছে। আর্য্যেরা যখন এখানে প্রবেশ করিল, তখন তাহারা প্রথমে সিন্ধুনদীর তীর দিয়া, পরে হিমালয়ের নিকট দিয়া গঙ্গা বাহিয়া আসিতে লাগিল। ব্রহ্মাবর্ত্ত হইল সিন্ধুনদীর তীর, আর্য্যাবর্ত্ত হইল গঙ্গানদীর তীর। বেদেতে যেমন সিন্ধুনদীর প্রশংসা আছে, সেইরূপ সিন্ধুনদীর পরে গঙ্গানদীরও প্রশংসা আছে; সরস্বতীর কথাও আছে—সরস্বতী নদী

এখন শুকাইয়া গিয়াছে। এই তিন নদীই বেদে প্রশস্ত। বেদেতে নর্ম্মদা, কাবেরী প্রভৃতি নদীরও উল্লেখ আছে। ব্রহ্ম-শব্দের এক অর্থ বেদ; এই বেদের যে স্থানে প্রথম ও অধিক আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই স্থানের নাম হইল ব্রহ্মাবর্ত্ত। ব্রহ্মাবর্ত্তেতেই ঋষিগণ ঋগ্বেদের মন্ত্র রচনা করিয়াছেন; প্রথম যুদ্ধ বিগ্রহের কথা ঋগ্বেদেই দেখিতে পাই। যখন ভারতবর্ষে আর্য্যেরা আসিয়াছিল, তখন এখানে যে একেবারে কোন প্রকার উন্নতি হয় নাই তাহা নহে; তখন এখানেও লৌহনির্ম্মিত বাটী প্রভৃতি দেখা গিয়াছিল।

আর্য্য ও পূর্ব্ববাসীদিগের মধ্যে প্রভেদ এই ছিল যে, আর্য্যেরা গৌরবর্ণ এবং এখানকার লোকেরা কৃষ্ণবর্ণ। বেদেতে পূর্ব্ববাসীদিগকে কৃষ্ণবর্ণ বলা হইয়াছে। আর্য্যেরা যখন এদেশে আসিয়া এদেশবাসীদিগকে তাহাদিগের ভূমি হইতে তাড়াইয়া দিয়া বসতি করিতে লাগিল, তখন তাহারা নিম্নভূমি হইতে পর্ব্বত পাহাড়ে গিয়া বসতি করিল। সময়ে সময়ে তাহারা নিম্নভূমিতে আসিয়া আর্য্যদিগের প্রতি দৌরাত্ম্য করিতে বিরত ছিল না; আর্য্যেরা হোম যাগ করিত, তাহারা তাহাতে বিঘ্ন উৎপাদন করিত। এই জন্য আর্য্যেরা পূর্ব্ববাসীদিগকে দস্যু নামে অভিহিত করিত। যুদ্ধেতে আর্য্যদিগের অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত দেখা যায়—আর্য্যেরা বিপক্ষদিগের ত্বক্‌ ছিঁড়িয়া ফেলিত, এরূপ বর্ণনাও বেদে দেখা যায়। ক্রমে ক্রমে আর্য্যেরা দস্যুদিগকে পরাস্ত করিয়া দাস করিয়া ফেলিল। তাহারাও ক্রমে অনুগত হইল, সেবা করিতে লাগিল—সেবা তাহাদিগের ধর্ম্ম হইল। পাছে দাসগণ উন্নত হয়, এই জন্য আর্য্যেরা তাহাদিগকে বেদে অধিকার দেয় নাই; ইহা আপনাদিগের নিজস্ব করিয়া রাখিয়াছিল। বেদে এমন কথা আছে যে,দাসদিগের মধ্যে যে বেদ পাঠ করে বা শ্রবণ করে, তাহার জিহ্বা কাটিয়া দিবে, কর্ণ কাটিয়া দিবে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আর্য্যদিগের সহিত দাসকন্যাদিগের বিবাহ প্রচলিত হইয়াছিল; আর্য্যগণ দাসকন্যাদিগকে বিবাহ করিতে পারিত কিন্তু দাসেরা আর্য্যকন্যাদিগকে বিবাহ করিতে পারিত না। এইরূপ সঙ্কর বিবাহে আর্য্যদিগের দোষ হইত না এবং এইরূপ বিবাহ চলিত হওয়াতেই আর্য্য ও দাসদিগের মধ্যে ঘোর বিবাদ অনেকটা শান্ত হইল।

ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছেন, তাহা জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি। এই উন্নতির নিদর্শন আর্য্যদিগের মধ্যে যাহা হইয়াছে, তাহাই বলিতেছি—তাহাদিগের মধ্যে উন্নতি হইয়াছে কত। প্রথম যখন ফলাহার ও মৃগয়া করিয়া বেড়াইত, আর যখন আর্য্যাবর্ত্ত হইল, তুলনা করিয়া দেখ যে কত উন্নতি হইল। ঈশ্বরের সৃষ্টির লক্ষ্যই এই যে জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতি।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

ব্রহ্মসঙ্গীতের স্বরলিপি।

সংকেত-ব্যাখ্যা।

ছেদের দ্বারা তালি-বিভাগ হইয়াছে। প্রত্যেক তালি বিভাগের প্রথম সুরের উপরে তালি পড়ে। প্রত্যেক ৩ তালি-বিভাগের মধ্যে পর-পর ৪, ২, ৪টি করিয়া মাত্রা আছে। খুব দ্রুতভাবে ৪ পর্য্যন্ত আবৃত্তি করিতে

যত সময় লাগে, ততটা কাল প্রত্যেক মাত্রার স্থায়িত্ব। প্রতি তাল-বিভাগের প্রথম সুরের উপর ১´, ২, ৩ এই অনুক্রমে তাল পড়ে। ১´ অর্থাৎ প্রথম তালে সম পড়ে। এই সমস্ত, শিরোদেশস্থ তালাঙ্ক দ্বারা সূচিত হইয়াছে। যে সুর ঈষৎ ছুঁইয়া যায় তাহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অক্ষরে লিখিত। /০ আনা চিহ্ন সুরের পরে বসাইলে যাহা বুঝায় ইহাতেও তাহাই বুঝায়।

এক মাত্রার চিহ্ন=।; দুইটি স্বরাক্ষর একত্র করিয়া যখন শেষের অক্ষরটিতে আকার বসে তখন তাহার অর্থ এই, উহার প্রত্যেক সুর অর্দ্ধমাত্রা কালস্থায়ী—দুইটি মিলিয়া এক মাত্রা হইয়াছে। হ্ম=কড়ি মধ্যম। যে কলি শেষ হইলে পুনরায় আস্থায়ী হইতে আরম্ভ করিতে হয় সেই কলির শেষে যুগল-ছেদ বসে। আস্থায়ীতে ফিরিয়া গিয়া যেখানে থামিতে হয় সেই স্থানের শিরোদেশে যুগল ছেদ বসে। ঐখানে থামিয়া আবার অন্তরা প্রভৃতি ধরিতে হয়।

"হ্রা-বৃ-হ্রা" এই চিহ্নের অর্থ এই যে, ধ্বনির প্রথমে হ্রাস, পরে বৃদ্ধি, পরে পুনরায় হ্রাস—এক কথায়, ধ্বনির স্ফীতি। "বৃ-হ্রা"র অর্থ, ধ্বনির প্রথমে বৃদ্ধি, পরে হ্রাস। অন্যান্য চিহ্নের জন্য গত পৌষ মাসের পত্রিকা দেখ।

ইমন কল্যাণ—সুরফাঁকতাল।

৪—২—৪ ৩

।১´।২।৩।

(হ্রা-বৃ-হ্রা) ॥

॥ ^প^না ^ন^ধা -া -পা। পা -া। ধা ধহ্মা -পা পা। পা হ্মা -গা গরা। গা মা। গরা -গা রা সা।

॥ ন মঃ— —। শং —। ক রা — য়। ম হে — শ। ভ ব। না — য় ক।

।সা পা -া পা। পা -হ্মা। গা -মা -গা -মা। না -া নধা -া। পা -পহ্মা। গা -মা -রা গা।

।অ না — দি। ধা —। তা — — —। আ — ন —। ন্দ, —। রূ — — প।

।ধা -া পা -া। -রা -গা। রা -া সা -া॥ পা ধা -পা র্সা। -া র্সা। র্সা র্সা র্সা র্সা। র্সা না ধা -া।

।স — র্ব —। — —। ব্যা — পী —॥ ম হা — ব্যো। —মে। অ গ ণ ন। গ্র হ, তা —।

।ধা -া। ^ধ^র্সা -া র্সা না। ধা -র্সা না ধা। পা -া। র্গা র্গা র্রা র্রা। -র্গা র্গা র্রা র্সা। র্সা -না।

।রা —। ধা — য়, তো। মা — র, ভ। য়ে —। তু মি, পি তা। — নি খি ল। কা —।

(বৃ-হ্রা)

।-র্সা -া র্সা র্সা। র্সা না ^ন^ধা -া। র্সা -া। -া -া -া -না। ধা -না -র্সা -না। ^ধ^না -ধা।

।— — র ণ। ত ব, অ —। স্ত —। — — — —। কো — — —। থা —।

(বৃ-হ্রা) (বৃ-হ্রা)

। ^প^-ধা -পা -হ্মগা -হ্মা॥ ^প^র্সা -া ধা -া। পা হ্মা। গা -মা গা গা। গা রা রাগরা। -পা -া।

।— — — —॥ স — ন্তা —। প, নি। বা — র ণ। ভ ব, স মু। — —।

।গা গা গা রা। সা সা সা -া। -া -ন্‌া। সা ধ্‌া সা সা। সা রা -া রা। রা গরা। গা -মা -া -গা।

।দ্র, তা র ণ। ম ন পা —। — —। ব ন, বি ভু। ত্রি লো — ক। শু ভ। দা — — —।

।-রা -া -গা -া। রা -ন্‌া। -রা -া -সা -া। গা গা পা ধা। ধপা র্সা। র্সা র্সা র্সা -া।

।— — — —। তা —। — — — —। ত্রি ভু ব ন। চ রা। চ র প্রা —।

।-া র্সা র্রা র্রা। র্সা -া। র্সা র্সা -া -া। র্গা -া র্রা র্সা। র্সা না। ধা না -া ধপা।

।— ণ তু মি। হে —। প্র ভো — —। ভ — ক্ত, ব। ৎস ল। দ য়া — ল।

।পা -া পা পা। -া রা। সা -ধা ধা ধা। ধা ধা ধা ধহ্মা। র্সা -া। র্সা -া না ধা। ধা -না -র্সা -না।

।দী — ন, ব। — ন্ধু। সে — ব কে। বি ত র, তো। — —। মা — র, প্র। সা — — —।

(বৃ-হ্রা)

।ধনা -ধা। ^প^-ধা -পা -হ্মগা -হ্মা॥॥

দ —। — — — —॥॥

বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজ।*

ধর্ম্মসাধনের সহায়—বিবেক ও বৈরাগ্য।

"আহা কে দিবে আনিয়ে তাঁরে ?
হারায়ে জীবনশরণে জীবনে কি কাজ আমার ?
ঐহিকের সুখ যত জানি তায়, কাজ নাই সে সুখে, সে ধনে;
হারায়ে জীবনশরণে জীবনে কি কাজ আমার ?"

আমি সেই হৃদয়ের প্রিয়তমকে কোথায় ছাড়িয়া আসিয়াছি; আর যে তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না। কে তাঁহাকে আমার নিকট আনিয়া দিতে পারে ? হে প্রিয়তম, তোমার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, তুমি আমাকে ছাড়িয়া দূরে রহিয়াছ ? আকাশ, তুমি আমার প্রিয়তমকে কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছ, ফিরাইয়া দাও। চন্দ্র সূর্য্য, তোমরা আমার তমোনাশক হৃদয়ের চন্দ্রকে কোথায় লইয়া গিয়াছ, ফিরাইয়া দাও; তারকাগণ, তোমরাই বা সেই নয়নতারাকে কোথায় রাখিয়াছ, একবার দেখাইয়া দাও। আমি তাঁহাকে কেবল একটীবার মাত্র দেখিতে চাই। জীবনের একমাত্র অবলম্বন, সেই প্রেমময় পরমেশ্বরকে হারাইয়া আমার এই ছার জীবন রাখিবার কি প্রয়োজন ? তাঁহাকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিতে চাই-ও না। যদি এই জীবন সেই প্রাণনাথের পবিত্র চরণে সমর্পণ করিতে না পারিলাম, তবে আমার এই তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ জীবনে কি প্রয়োজন ? তাঁহাকে যদি এই জীবনে না দেখিতে পাইলাম, তবে আর এই জীবন রাখিতে চাই না—আমার মৃত্যু হউক।

এই মর্ত্ত্যধামের যত কিছু সুখ, সকলই জানি, আমার সে সুখে প্রয়োজন নাই। এখানে সুখ কোথায় ? সকলেই সুখের প্রত্যাশায় এই সংসার-মরুভূমির মধ্যে অনবরত দিশাহারা লক্ষ্যশূন্য হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে; কিন্তু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, শুনিবে যে, তাহারা সুখের অন্বেষণে বাল্যকাল হইতে ব্যস্ত এবং এখন তাহারা বৃদ্ধ হইতে চলিয়াছে, তথাপি এখনও সুখ খুঁজিয়া পায় নাই। এই মর্ত্ত্যধামের মধ্যে কি কেবল ভোগবিলাসেই সুখ হয় ? তাহাই যদি হইবে, তবে প্রচুরসম্পত্তিশালী লোকে ভোগবিলাসে নিমগ্ন থাকিয়াও আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হয় কেন ? জানি এই মরণশীল জগতের যে সকল বস্তু, তাহাতে সুখ নাই—সুখ নাই। সুখের উৎসের নিকটে, অমৃতের প্রস্রবণের নিকটে যাইলে তবে সুখ পাইব—তবে বিন্দুপরিমিত অমৃত পাইয়াও অমর হইতে সক্ষম হইব। "ঐহিকের সুখ যত জানি তায়, কাজ নাই সে সুখে সে ধনে।"

আমি এখন চাই কেবল সেই প্রিয়তম পরমেশ্বরকে; আত্মা অন্য কিছুতেই তৃপ্তি মানিতেছে না। আমি আমার অন্তরসখা প্রাণনাথ পরমেশ্বরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেছি না। কিন্তু তিনি কোথায় ? কোন্ স্থানে তাঁহার শ্রেষ্ঠ আসন ? কোথায় যাইলে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইব ? আমার এই প্রশ্নের উত্তরে সমস্ত বিশ্বচরাচর সুমন্দ্র গম্ভীর ধ্বনিতে প্রত্যুত্তর দিতেছে—

"হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং।"

আত্মাই তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় শ্রেষ্ঠ আসন। চন্দ্র সূর্য্য বলিতেছে "আমাদিগের নিকটে অতি অল্পই জানিতে পারিবে, তুমি আপনার আত্মার অন্তরে তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা কর, তবেই সফলকাম হ-

* গত বলুহাটী ৩৪ সাম্বৎসারিক উৎসব উপলক্ষে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক বিবৃত।

হইবে।” অসীম আকাশে অগণ্য গ্রহ নক্ষত্রগণ সেই দেবাধিদেবের মহৎ যশ ঘোষণা করিয়াও বলিতেছে “আমাদিগের নিকট অতি অল্পই জানিতে পারিবে; তুমি আপনার আত্মার আসনে নিস্তব্ধ সমাসীন সেই পরমদেবকে দেখিতে ইচ্ছা কর, তবেই সফলকাম হইবে।” আত্মাই তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় শ্রেষ্ঠ আসন।

কিন্তু সেই আত্মার আত্মাকে, আত্মাতে সমাসীন দেখিবার জন্য দুইটী উপায় আবশ্যক। সেই দুইটী উপায় বৈরাগ্য ও বিবেক। এই দুইটী উপায়ের সাধন না করিলে আত্মজ্ঞান কিছুতেই উজ্জ্বল হইতে পারে না। এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, বৈরাগ্য ও বিবেক এই দুইটী উপায়ই বা কি প্রকার এবং ইহাদিগের সাধনই বা কি উপায় অবলম্বন করিলে হইতে পারিবে।

প্রথম বৈরাগ্য—বৈরাগ্য কি? বৈরাগ্যের অর্থ রাগরাহিত্য অর্থাৎ আসক্তিরাহিত্য। স্ত্রী পুত্র, বিষয়বিভব, কোন ক্ষণভঙ্গুর সাংসারিক বিষয়ে আসক্তি, তদ্গতচিত্ততা না থাকাই বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্য দুই প্রকারে দেখা দিতে পারে—(১) সংসারত্যাগ, (২) সংসারে স্থিতি। ইহাদিগের মধ্যে অনাসক্ত হইয়া সংসারে স্থিতিই অধিকতর প্রার্থনীয়। হৃদয়ের মধ্যে যদি প্রকৃত বৈরাগ্য আসিয়া থাকে, তবে সংসারে থাকিলেও অনাসক্তি থাকিতে পারে; আর যদি হৃদয়ে বৈরাগ্য না আসিয়া থাকে, তবে সংসারেই থাকি আর অরণ্যেই থাকি, আমার পক্ষে উভয় স্থানই প্রলোভন-সঙ্কুল। উভয়ের মধ্যে গৃহে থাকিয়া গার্হস্থ্য প্রতিপালন করাই শ্রেয়স্কর। কারণ গৃহস্থ হইয়া পরোপকার প্রভৃতি কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ইহারি জন্য সুস্পষ্টরূপে বলিয়া দিয়াছেন

“ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি।”

কেবল সন্ন্যাসের দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

“তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরণ্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥”

অতএব আসক্তি-রহিত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান কর; কারণ পুরুষ আসক্তি-রহিত হইয়া কর্ম্ম করিলেই পরম পদ প্রাপ্ত হয়।

এতক্ষণে বুঝিলাম যে বৈরাগ্য কি, না হৃদয়ের অনাসক্তভাব। এখন দেখা যাউক যে বিবেক কি প্রকার। আত্মার অন্তরে এমন একটী আলোক আছে, যাহা শত সহস্র কুটিলতা ভেদ করিয়াও বিদ্যুতের ন্যায় প্রকাশিত হয়। ইহা সত্যের জ্যোতি। যাঁহার আত্মা পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত, তাঁহার আত্মাতে এই সত্যের জ্যোতি সূর্য্যের ন্যায় চিরবিরাজিত। সকল বিষয়েরই দুইটী দিক আছে—এক ভাব, দ্বিতীয় অভাব। আত্মার ঈশ্বর-স্পৃহারও দুইটী দিক আছে। বৈরাগ্য ইহার অভাবের দিক এবং বিবেক ইহার ভাবের দিক। বৈরাগ্য আসিয়া বলিয়া দিল যে, সংসার অনিত্য; মৃত্যুর পরে সংসার আমাদিগের সঙ্গে যাইবে না অতএব সংসারে আসক্ত হওয়া মনুষ্যের উপযুক্ত নহে। আত্মা যখন বৈরাগ্যের এই বাক্যে সংসারের অনিত্যভাব উপলব্ধি করিল, সংসার যখন আর আত্মার তৃপ্তিস্থান হইতে পারিল না, তখন আত্মার এক মহা অভাব আসিয়া পড়িল। এত-

দিন সংসারই তাহার একমাত্র অবলম্বন ছিল; কিন্তু এখন বৈরাগ্য আসিয়া এই অবলম্বন-রজ্জু ছিন্ন করিয়া দেওয়াতে আত্মার অত্যন্ত ব্যাকুলতা আসিয়া পড়িল;—সে কোথায় যাইবে, কাহার আশ্রয় লইবে, কাহার নিকটে যাইলে শান্তিলাভ করিতে পারিবে, এই সকল চিন্তায় আত্মা আকুল হইয়া পড়িল। তখন বিবেক আসিয়া তাহাকে সাহস প্রদান পূর্ব্বক বলিতে লাগিল যে, "এত আকুল হইবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; মনুষ্যের, সংসারের মঙ্গলময়ী জননীকে ছাড়িয়া, কেবল সংসারে পরিতৃপ্তি হইতে পারে না; মনুষ্যের আত্মা অবিনশ্বর সুতরাং ইহা নশ্বর ধূলিরাশিতে চিরকাল তৃপ্ত থাকিতে পারে না, তাহার তৃপ্তিস্থান সংসারের অতীত সেই আনন্দধাম 'জরা নাহি, শোক নাহি, মরণ নাহি যে লোকে'। এখন হইতে আর সংসারে আসক্ত থাকিও না; সংসারে নির্লিপ্তভাবে অবস্থান করিয়া সেই শুভ্র সত্যস্বরূপ সুন্দর পরমপুরুষের প্রেমমুখ দেখিতে থাক—তোমার শোকতাপ হৃদয়-ভার সমস্ত দূর হইয়া যাইবে।" বৈরাগ্য অভাব আনয়ন করে, বিবেক সত্যের বিমল জ্যোতি দ্বারা সেই অভাব পূর্ণ করিয়া দেয়।

সেই বৈদিক কালে, যখন আর্য্য ঔপনিবেশিকগণ নূতন নূতন স্থান অধিকার করিয়া, নূতন নূতন জাতিদিগকে পরাজিত করিয়া সংসার-সর্ব্বস্ব হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময়ে কতকগুলি উন্নতমনা ঋষিরা সংসারে তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া অরণ্যে যাইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা করিতে লাগিলেন এবং সাধারণের মধ্যে সংসারাসক্তি প্রবল দেখিয়া ও তাহাদিগের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রবেশ করানো অসাধ্যসাধন বিবেচনা করিয়া এই স্থির করিলেন যে, যাঁহারা সংসারের মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া, সমুদয় মানমর্য্যাদা বিষয়বিভব প্রভৃতি নানা ভোগসুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া অরণ্যে বাস করিতে পারিবেন, তাঁহাদিগেরই ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার, উপনিষদে অধিকার; তাঁহারা আদেশ করিলেন যে, "অরণ্যে তদধীয়ীত" উপনিষদে নিহিত ব্রহ্মোপদেশ অরণ্যেই পড়িতে হইবেক। কিন্তু সেই বৈদিক কালের অনেক পরে, যখন জ্ঞানের অধিকতর চর্চ্চা হইল, যখন তত্ত্বজ্ঞানী ব্রহ্মবাদীগণ ঈশ্বরের সহিত সংসারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বুঝিলেন, তখন তাঁহারা বলিলেন

> "ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
> যদ্‌যৎকর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত, তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥"

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হইবেন; যে কোন কর্ম্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন। ইহাই ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের ধর্ম্ম, তাই ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, "মাতা পিতা, ভ্রাতা ভগিনী ও স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি পরিবারগণের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেক না। সেই সম্বন্ধ মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বর হইতে সংঘটিত হইয়াছে; তাহার উচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য নহে। গৃহস্থ হইয়া সেই সম্বন্ধ রক্ষা করিবেক। তাঁহাতেই যোজিতচিত্ত হইয়া সংসার-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেক। সম্পৎ কালে তাঁহারই অনুগত হইয়া চলিবেক, বিপৎকালে তাঁহারই শরণাপন্ন হইবেক। শরীর পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিবে, কিন্তু আত্মা পরমাত্মাতে অবস্থিত থাকিবে। কর্ম্মের সময় তাঁহাতে থাকিয়াই কর্ম্ম করিবে; বিশ্রামের সময় তাঁহাতে থাকিয়াই বিশ্রাম করিবে। এইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইবে।"

ব্রাহ্মধর্ম্মের এক অতি মহান্ আশা আছে এই যে, এমন দিন আসিবে, যখন এই মর্ত্ত্যধামবাসী লোকেরা দণ্ডভয়ে নহে, কিন্তু আপনাদিগের হৃদয়ের প্রীতিতে ব্রহ্মের প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া এখানেই স্বর্গ আনয়ন করিবে। এই আশা কিসের উপরে স্থাপিত? ইহা একটী সুদৃঢ় বিশ্বাসের উপরে স্থাপিত। ব্রাহ্মধর্ম্ম স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, "ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে নিহিত আছে, সকলের আত্মাতেই ব্রহ্মের অনন্ত মঙ্গলভাব অবিনশ্বর অক্ষরে লিখিত আছে। বিশ্বকার্য্যের আলোচনা দ্বারা তাহা প্রজ্জ্বলিত করিলেই অনন্ত মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরকে দর্শন পাই। ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার জন্য দেশবিশেষ, কি কালবিশেষ কি জাতিবিশেষের অপেক্ষা নাই।" এক কথায় এই, সকলেরই অন্তরে বৈরাগ্য ও বিবেকের মূল নিহিত আছে—তাহাতে জলসিঞ্চন করিয়া তাহাদিগকে বৃক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ জলসিঞ্চন করা ব্রাহ্ম সমাজের এক প্রধান কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মসমাজের ইহা কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ কি এই কর্ত্তব্য সাধনে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন? ব্রাহ্মসমাজ যদি এই কর্ত্তব্য সাধনে হৃদয়ের সমুদয় শক্তি অর্পণ করিতেন, তাহা হইলে তাহার আজ কত না উন্নতি দেখিতাম। ব্রাহ্মসমাজের জন্য কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিলে প্রথমেই নেতৃত্বপদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জ্জন দিয়া আসিতে হয়—নহিলে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মসাধনের প্রথম উপায় বৈরাগ্য হইতে বহুদূরে পড়িতে হইবে; এবং বৈরাগ্য না আসিলে প্রকৃত বিবেকের পরিবর্ত্তে মায়াবিবেক আসিয়া এই নেতৃত্বাকাঙ্ক্ষাকে বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট করে। নেতৃত্বাকাঙ্ক্ষা রাজনৈতিক প্রভৃতি সাংসারিক বিষয়ে তত অনিষ্টকর না হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের, কেবল ব্রাহ্মসমাজের নহে, সকল ধর্ম্মসমাজেরই ইহা গুরুতর অনিষ্ট সাধন করে। সত্যের দিকে আত্মার দৃষ্টিকে সুসংযত করিয়া না রাখিলে নেতৃত্বের তুচ্ছ আশা প্রভৃতি সাংসারিক ধূলিরাশি সেই দৃষ্টিকে মলিন করিয়া দিবে এবং পারমার্থিক বিষয়ে অধিকদূর অগ্রসর হইতে দিবে না। ব্রহ্মের প্রতি হৃদয়ের প্রীতিকে উন্নত করিব এবং ব্রহ্মের প্রিয়কার্য্য বলিয়াই ধর্ম্মকার্য্য করিব। কর্ম্মফলের প্রতি আমাদিগের উৎকণ্ঠা যেন না থাকে। আমরা ভাল কাজ ভাল বলিয়াই কবির, কিন্তু তাহার জন্য আমাদের সম্পৎ হইবে, কি বিপদ্ হইবে, সেদিকে যেন আমাদের আদৌ লক্ষ্য না থাকে—কর্ম্ম করিব আমরা, ফল দিবেন ফলদাতা সেই মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বর; তিনি আমাদের পিতা, তিনি আমাদের মাতা—তিনি এমন ফল দিবেন, যাহা অনন্তকালের জন্য আমাদের মঙ্গলজনক হইবে; অতএব মাতৃক্রোড়ে শিশুসন্তানের ন্যায় আমরা যেন সেই প্রেমময়ী জননীর প্রেম মুখ দেখিতে থাকি এবং নির্ভয়ে তাঁহার প্রিয়কার্য্য শুভকর্ম্ম সম্পাদনে রত থাকি। ব্রহ্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তিগণ ঈশ্বরপ্রীতিকাম হইয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সকল সাধন করিতে থাকিলেই ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি এবং তাহা না করিয়া সাংসারিক ফলকামনায় হৃদয়কে পূর্ণ করিলেই ব্রাহ্মসমাজের অবনতি।

হে পরমাত্মন্, তুমি যেমন আমাদিগের হৃদয়ের দেবতা, তেমনি তুমি ব্রাহ্মসমাজেরও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; তুমি আমাদিগের পাষাণ হৃদয় বজ্র দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া বিশুদ্ধ

প্রীতি ঢালিয়া কোমল কর। তুমিই এক মাত্র সকলের নিয়ন্তা, তুমি আমাদিগের সকলেরই হৃদয়ে এমন ইচ্ছা ও ক্ষমতা প্রকাশ করাইয়া দাও যে, আমরা সকলেই যেন ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিসাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া ব্রাহ্মসমাজের যথার্থ উন্নতিসাধন করিতে পারি; ব্রাহ্মসমাজ হইতে তোমাকে জানিতে পারিয়া যে দৈবঋণ গ্রহণ করিয়াছি, আমাদিগের জীবনকে প্রকৃত ব্রাহ্মজীবনে পরিণত করিয়া সেই ঋণের অন্ততঃ বিন্দুমাত্রও যেন পরিশোধ করিতে পারি; আমরা যেন কৃতজ্ঞতা সহকারে ব্রাহ্মসমাজ কৃত প্রভূত উপকার স্মরণ করিয়া তাহার পর্ব্বতের তুল্য গুরুভার বহন করিতে যত্নবান্ হই। আমরা অতি দুর্ব্বল; তুমি দুর্ব্বলের সহায়—তুমি আমাদিগের এই শুভসংকল্পে বল প্রেরণ কর এবং আমাদিগের শরীর, মন ও আত্মায় উপযুক্ত ক্ষমতা প্রদান কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজ।*

প্রাতঃকাল।

ব্রাহ্মধর্ম্মের বিস্তার।

"সত্যমেব জয়তে" সত্যই জয়লাভ করে; "নানৃতং" মিথ্যা জয়লাভ করিতে পারে না। সত্য, পারমার্থিক সত্য যাহা কিছু, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম জয়লাভ করিবেই করিবে। সত্য যাহা, তাহা চিরকালই থাকিবে—তাহার বিনাশ নাই, চাই আমরা গ্রহণ করি আর চাই নাই করি। মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিলেন ভাস্করাচার্য্য; তবে তাঁহার পূর্ব্বে কি মাধ্যাকর্ষণ ছিল না? ছিল, কিন্তু ভাস্করাচার্য্যের পূর্ব্বে কেহ সেই সত্যের অনুসন্ধানে যান নাই; ভাস্করাচার্য্য সত্যের অনুসন্ধানে পরিশ্রম করিলেন এবং সেই পরিশ্রমের ফললাভ করিলেন। সেইরূপ ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্যধর্ম্ম; ইহা পূর্ব্বেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকিবে। পূর্ব্বে এক সময়ে ইহার প্রচার হইবার উপক্রম হইয়াছিল কিন্তু নানা কারণে তাহা হইতে পারিল না। বৌদ্ধ ধর্ম্মের ঘোর বিপ্লব হইতে রক্ষা করিবার জন্য তদানীন্তন ব্রহ্মবাদীগণ ব্রহ্মজ্ঞানকে নানাপ্রকার কাল্পনিক আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার করিলেন। তাহার ফল অতীব শোচনীয় হইল। সকলে ব্রহ্মকে পরিত্যাগ করিয়া মূর্ত্তিপূজাই আরম্ভ করিল এবং তাহার ফলে নানা প্রকার কুসংস্কার সমুদয় ভারতের সুবিমল গগনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ভারতবর্ষ দুর্দশার চরম সীমায় উপস্থিত হয়, এমন সময়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় আবার ব্রহ্মজ্ঞানের পতাকা উড্ডীন করিয়া মূর্ত্তিপূজাকে পরাস্ত করিলেন। পূর্ব্বকার ব্রহ্মজ্ঞান বর্ত্তমানকালের উপযোগী হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম হইয়াছে।

ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ; ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্যধর্ম্ম। অতএব সত্য কথা, সত্য ব্যবহার ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন। যাঁহারা সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কদাপি সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন না। আমি মনে জানিলাম এক, মুখে বলিলাম আর—তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম হইল না। আমি মনে জানিলাম এক, মুখে বলিলাম তাহাই কিন্তু কার্য্যে করিলাম আর—তাহাও ব্রাহ্মধর্ম্ম হইল না। আমি যাহা সত্য বলিয়া জানিব, তাহাই প্রচার করিব

---

* শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক [illegible]।

এবং তাহাই অনুষ্ঠানে পরিণত করিব, ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশ। আমি যদি জানি ব্রহ্মোপাসনাই শ্রেষ্ঠ; দয়াময় পরমেশ্বর ব্যতীত আমার আর মুক্তি নাই, ইহা যদি প্রকৃতই আমার হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহা হইলে অপরকে কি ব্রহ্মোপাসনার বিরুদ্ধে উপদেশ দিতে পারি, না, আপনারই গৃহ্য সামাজিক অনুষ্ঠান সমূহে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন কাল্পনিক দেবতাকে পূজা করিতে পারি? আজ কাল হিন্দু কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই বুঝিয়াছেন যে ব্রহ্মোপাসনাই একমাত্র মুক্তির উপায়; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তাঁহারা বহুদিন হইতে প্রচলিত প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েন। তাঁহারা এই আপত্তি উত্থাপন করেন যে, মূর্ত্তিপূজা দুর্ব্বল অধিকারীদিগের নিমিত্ত; তাঁহারা দুর্বল অধিকারী অতএব তাঁহারা মূর্ত্তিপূজাই করিতে থাকিবেন। তাঁহাদিগকে আমি এই বলিতে চাহি যে, যখন তাঁহারা এরূপ তর্ক করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তখন ব্রহ্মকে অন্ততঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণেও জানিয়াছেন। অবশ্য, ব্রহ্মকে কেহই সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারে নাই এবং পারিবেও না। কিন্তু ঈশ্বর আমাদিগের আত্মার অন্তরে তাঁহাকে জানিবার এক শক্তি দিয়াছেন, তাহা দ্বারাই আমরা তাঁহাকে জানিতে পারি; এবং সেই শক্তি যতই পবিত্রতা, আত্মচিন্তা প্রভৃতি দ্বারা পরিপুষ্ট করিব, ততই তাঁহাকে আত্মাতে অধিকতর অনুভব করিতে সমর্থ হইব। এই সকল জানিয়াও যদি তাঁহারা নিতান্তই আপনাদিগকে দুর্বল অধিকারী অতএব মূর্ত্তিপূজারই উপযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহা হইলে আমাদের বলিবার অধিক কিছু থাকে না; এই মাত্র বলিতে পারি যে, তাঁহারা ব্রহ্মচিন্তা করেন না বা করিতে চাহেন না। ব্রহ্মজ্ঞানের প্রথম প্রচারস্থান এই ভারতের অধিবাসীর পক্ষে ইহা অত্যন্ত লজ্জার কথা। সত্যধর্ম্ম গ্রহণ বিষয়ে এইরূপ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিবার ফলও ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। এমনও শুনিয়াছি যে, যেখানে সাধারণ লোকের প্রশংসাভাজন হইতে পারা যাইবে, এমন স্থানে কোনও কৃতবিদ্য ব্যক্তি বলিলেন—হিন্দুধর্ম্মের মূর্ত্তিপূজাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; আবার সেই তিনি, আপনার কতিপয় কৃতবিদ্য বন্ধুবর্গের মধ্যে, যেখানে নাস্তিকতা সমর্থন করিলে জ্ঞানবীরের সম্মান পাওয়া যাইবে, সেইখানে বলিলেন—ধর্ম্মই যখন নাই, তখন হিন্দুধর্ম্ম কোথায়? আমাদিগের মধ্যে ধর্ম্মের বন্ধন কিরূপ শিথিল হইয়া যাইতেছে এবং তাহার সঙ্গে আমরাও কিরূপ অবনতির স্রোতে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছি, তাহা এই দৃষ্টান্তে কেমন প্রকাশ পাইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ, কৃতবিদ্য সম্প্রদায় আজকাল প্রত্যক্ষভাবে মূর্ত্তিপূজা সমর্থন করিতে না পারিয়া আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহারা বলেন যে, ব্রহ্ম সর্ব্বময় অতএব মূর্ত্তিপূজা করিলেও ব্রহ্মপূজাই হয়। ইহা কদাপি যুক্তিসঙ্গত নহে। ব্রহ্মকে সর্ব্বময় বিশ্বাস করিলে তাঁহারা বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তির পূজা করেন কেন? বিশেষ মূর্ত্তিতে ঈশ্বরের আবির্ভাব অধিকতর হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে অনন্ত পরমেশ্বর সীমাবদ্ধ হইয়া পড়েন। ব্রহ্ম সর্ব্বময় অর্থে এই যে, ব্রহ্মের সত্তাকে আশ্রয় করিয়াই সকলের সত্তা।

যাই হৌক, যাঁহারা যুক্তির দ্বারা স্বীয় ভ্রমপূর্ণ মত দাঁড়াইতে পারে না দেখিয়া একস্থানে এক কথা, অপর স্থানে আর এক কথা বলেন, তাঁহাদিগের কথাকে হিন্দুধর্ম্ম বলিব, না, যে ধর্ম্ম পূর্ব্বতন ঋষিদিগের অমূল্য রত্ন ব্রহ্মজ্ঞানকে স্থিরতর রাখিতে পারিয়াছে, তাহাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম? এই ব্রাহ্মধর্ম্ম, যাহা প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম, যাহা হিন্দুধর্ম্মের সার, তাহাকে লোকে এখনও চিনিতে পারে নাই। আমরা তাহাতে নিরাশ হই নাই; ব্রহ্মকে সর্ব্বস্ব—প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করিতে পারে, এমন লোকের সংখ্যা অল্প হইলেও আমাদের আশা নির্ব্বাপিত হয় নাই এবং হইবে না। আমরা সকলের অন্তর্য্যামী সেই পরমেশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিতে পারি যে, ক্রমে তাঁহার ইচ্ছাতে সমস্ত জগতে ব্রহ্মনামের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া কুসংস্কার প্রভৃতি সমুদয় আবর্জ্জনা একেবারে ভস্মীভূত করিয়া দিবে।

এই ব্রহ্মনামের অগ্নি সমস্ত জগতে প্রজ্বলিত হইবার কি আর অধিক বিলম্ব আছে? না। এই অগ্নি প্রজ্বলিত হইবার পূর্ব্ব লক্ষণ সকল আমরা এখন চতুর্দ্দিকেই দেখিতে পাইতেছি। সকল স্থান হইতেই ধূম নির্গত হইতেছে। ভাবিতে কি এক অপূর্ব্ব ভাব আসিয়া উপস্থিত হয় যে, কখন্ সেই বিদ্যুৎপুরুষের কৃপাকটাক্ষ আমাদের অন্তরে নিপতিত হইবে, আর সহসা চারিদিক হইতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবার সংবাদ পাইব।

ইংলণ্ডে শ্রীযুক্ত চার্লস বয়সী আপনার সমুদয় অর্থ সমুদয় শক্তি এই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে নিয়োগ করিতেছেন; সম্প্রতি কুমারী শ্রীমতী ম্যানিং ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা যেমন হিন্দুশাস্ত্র হইতে এবং জাতীয় ভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছি, সেইরূপ শ্রীযুক্ত বয়সীপ্রমুখ ইংরাজেরাও বাইবেল হইতে এবং তাঁহাদের জাতীয়ভাবে Theism অথবা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। কয়েক মাস গত হইল, ডাক্তার স্পিনার (Dr. Spinner) জাপান হইতে ব্রাহ্মসমাজের বিষয় জানিতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে জাপানে এখন একেশ্বরবাদের প্রবল স্রোত চলিয়াছে এবং চীনদেশেও কংফুশীয় ধর্ম্মের পুনরুত্থান (Revival of Confucianism) বলিয়া একেশ্বরবাদ প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ডাক্তার স্পিনার স্বয়ং জর্ম্মাণি দেশীয় এবং উদার খৃষ্টীয় (Liberal Christian) সম্প্রদায়ভুক্ত। এই উদার খৃষ্টিয়ানগণ যিশু খৃষ্টকে কেবল ধর্ম্মগুরু (religious teacher) বলিয়া স্বীকার করেন এবং জর্ম্মানি দেশে এই সম্প্রদায় ক্রমিকই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। এই মুহূর্ত্তে সেখানে কুড়ি হাজার লোকে যিশুখৃষ্টকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করেন না—তাঁহাকে সৎধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করেন। ইহা কি আমাদিগের পক্ষে কম আশাপ্রদ! আবার কোথায় ভারতবর্ষ আর কোথায় আমেরিকা—সেই সুদূর আমেরিকাতেও ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভাব ব্যাপ্ত হইতেছে। গত ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে রামমোহন রায়ের স্মরণার্থে যে সভা হইয়াছিল, সেই সভায় আমার শ্রদ্ধেয় আত্মীয় শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন যে, তিনি আমেরিকার যুক্তরাজ্যের বোষ্টন (Boston) নগরে তাঁহার অবস্থান কালে (Theism) অথবা একেশ্বরবাদের প্রভাব আশ্চর্য্য অনুভব করিয়াছিলেন; সেখানে

অধিকাংশ লোকেই ব্রহ্মোপাসক এবং এখনও কোন ভারতবর্ষীয় সেখানে গিয়া রামমোহন রায়ের স্বদেশীয় বলিলে বিশেষ সম্মান লাভ করে।

যেমন বিদেশে ব্রহ্মজ্ঞান ব্যাপ্ত হইবার এই সকল সূত্রপাত দেখিলাম, সেইরূপ আমাদের এদেশেও দৃষ্টিপাত করিলে তাহার সূত্রপাত দেখিতে পাইব। হড়া, আন্দুল প্রভৃতি নানা গ্রামের অধিবাসীগণ আপনাদিগেরই যত্নে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে উদ্‌যুক্ত হইয়া আমাদিগের শ্রদ্ধাভাজন হইতেছেন। আজ যে সমাজে দাঁড়াইয়া বলিতেছি, এই ব্রাহ্মসমাজও এবিষয়ে কত না সহায়তা করিতেছে। আমাদের এই সমাজ দরিদ্র নহে; ইহা লোক সংখ্যায় দরিদ্র হইতে পারে, অর্থ বিষয়েও দরিদ্র হইতে পারে কিন্তু তথাপি ইহা দরিদ্র নহে—ইহা সেই পরমধন পরমেশ্বরকে লাভ করিয়া ধনী—ইহার আর অন্য ধনের আবশ্যক কি? তিনিই সমুদায় অভাব পূর্ণ করিবেন। আর সেই আদিকাল হইতে ব্রহ্মজ্ঞানের বিরোধী পক্ষের সংখ্যাই অধিক চলিয়া আসিতেছে, কারণ অধিকাংশ লোকেই ব্রহ্মকে ছাড়িয়া সংসারে একান্ত আসক্ত হইয়া পড়ে। তাই বলিয়া, আমি পুনরায় বলিতেছি যে যাঁহারা ঈশ্বরের কৃপা অবগত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নিরাশ হইবার কিছুমাত্র কারণ নাই।

সম্প্রতি ইংলণ্ডীয় ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক বক্তৃতা হইয়া গিয়াছে। সেখানেও দেখি একইরূপ অবস্থা—অনেকে ইহাতে গোপনে যোগ দেন; অনেক খৃষ্টীয় প্রচারক কর্ম্ম হারাইবার ভয়ে ইচ্ছাসত্ত্বেও ইহাতে যোগ দিতে পারেন না। আবার অনেকে, সময়ে সময়ে বাইবেলের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলা হয় বলিয়া, যোগ দেন না। কিন্তু সভাপতি মহাশয় বলিতেছেন যে এই সকল দেখিয়া ভীত হইলে চলিবে না; কোন প্রকার দোষ বা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বলিতে ক্ষান্ত থাকিলে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি হইবে না; উন্নতি হইবে কিসে?—

"It can only be done by publishing to the world our faiths, glorying in them proclaiming their superiority to all other known creeds—attacking what is base and false in other religious, and waging a continuous warfare in defence of the truth, as we ourselves see it. Such. humanly speaking, are the only means by which we can hope to obtain wide acceptance of our beliefs.

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে চিরকাল অবিশ্রান্ত ভাবে সংগ্রাম করিতে হইবে, তবে সকলে সত্যগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইবে। আমাদিগের জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মকে দেখাইতে হইবে, তবে সকলে ইহার জীবন্ত প্রভাব দেখিয়া ইহাকে গ্রহণ করিবে। এই কঠোর সংগ্রাম করিবার বল পাইব উপাসনা এবং ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভরের ভাব হইতে। আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্মুখে পড়িয়া; আমরা কর্ম্ম করিয়া যাইব। ইহার ফল আমরা দেখিতে পাই বা না পাই, তাহার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলে চলিবে না; ঈশ্বর যখন উপযুক্ত বোধ করিবেন, তখনই আমাদিগের আত্মাতে আবির্ভূত হইবেন। আমরা যেন আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা না করি।

হে পরমাত্মন্! তুমি কাহাকে কোন্ পথ দিয়া তোমার কাছে লইয়া যাও, তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। তুমি এই সমাজস্থ সুহৃদ্বর্গের হৃদয়ে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ রোপণ করিয়াছ, এখন

তাহাতে তোমার করুণাবারি বর্ষণ করিয়া তাহা বৃক্ষে পরিণত কর। এমন আশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর যেন এই সমাজ একদিন শতসহস্র লোকের আশ্রয়স্থল হইয়া দাঁড়ায়; সকলেই যেন ইহার সুশীতল ছায়াতে বিগতপাপ, বিগততাপ হইয়া সংসারের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হয়।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সায়ংকাল।

ব্রহ্মোপাসনা প্রচারই ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য। *

পল্লীগ্রামের অন্তরে এই ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইয়াছে দেখিয়া হৃদয়ে যে কি আনন্দ হইতেছে, তাহা বলিতে পারি না। ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র ভাব সকল পল্লীগ্রামের মধ্যেও প্রবেশ করিয়াছে দেখিয়া হৃদয়ে আনন্দ ধারণ হয় না। নর নারীগণ সকলেই যখন সেই একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের জয়ঘোষণা করিবে, সে দিন কি আনন্দের দিন হইবে। হিমালয়ের শেষপ্রান্ত হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত, সিন্ধুনদ হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত—সমস্ত ভারতবর্ষ যখন ব্রহ্মের জয়গানে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে, যখন বিশকোটি ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাপ্রসারিত হৃদয় হইতে ব্রহ্মমহিমা গান সকল শ্রদ্ধা-প্রীতি-গদ্গদস্বরে উত্থিত হইয়া তাঁহার পবিত্র সিংহাসনের নিকট যাইতে থাকিবে, সে দিনের কথা স্মরণ করিলে শরীরে কি রোমাঞ্চ হয় না, আত্মায় কি অপূর্ব্ব বল আইসে না?

উপনিষদের কালে আমাদের এই আশা অনেক পরিমাণে সফল হইতেছিল; তখন ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ব্রহ্মজ্ঞানের স্রোত প্রবাহিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে আশা সফল হইল না। যেমন একমুখী গভীর স্রোতস্বতীকে বিভিন্ন মার্গে প্রবাহিত করিয়া দিলে সেই স্রোতস্বতীর স্রোত আর সেরূপ তীব্র থাকে না এবং সেই ভিন্নমার্গপ্রস্থিত নদীশাখাগুলিও সেরূপ গভীর হয় না,—পঙ্কিল হইয়া উঠে, সেইরূপ উপনিষদের পরবর্ত্তী দেশহিতৈষী লোকেরা পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞানের গভীর স্রোতকে মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতি নানা বিভিন্ন মার্গে প্রবাহিত করিতে নানা কারণে বাধ্য হইয়াছিলেন। যদিও এইরূপ উপায় তখনকার প্রবল নাস্তিকতাকে কতক পরিমাণে বাধা দিতে সক্ষম হইয়াছিল, কিন্তু ইহার ফলে ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানের স্রোত শুষ্ক হইয়া যাইতে লাগিল এবং সমস্ত ভারতবর্ষ মরুভূমি হইবার উপক্রম হইল।

ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্য করুণা! তিনি ঠিক উপযুক্ত সময়ে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করিলেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় শাখাস্রোতের মুখবন্ধ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের স্রোতকে পুনরায় একমুখী করিতে চেষ্টা করিলেন; ঈশ্বর তাঁহার এই শুভকার্য্যের সহায় হইলেন—তিনি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিতে কৃতকার্য্য হইলেন। তাঁহার মস্তকের উপর দিয়া কত যে বিঘ্নবিপত্তির ঝটিকা চলিয়া গিয়াছে, তাহা কে গণনা করিবে? তিনি এই সমস্ত বিঘ্নবিপদ অতিক্রম করিয়াও বেদবেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞানের এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর কয়েক বৎসর ব্রাহ্মসমাজে

* শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বিবৃত।

উন্নতির স্রোত কতকটা বন্ধ হইয়াছিল। তখন সকলেই ভাবিয়াছিল যে এইবারেই বুঝি ব্রাহ্মসমাজ গেল। কিন্তু একবার যখন ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্মনামের জয়পতাকা ভারতের মুক্ত গগনে উড্ডীন করিতে সক্ষম হইয়াছে, তখন আর ইহা মৃত্যুমুখে যাইতে পারে না—ইহা অমৃতের নাম লইয়া অমর হইয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের সেই ঘোর দুরবস্থার সময় পূজ্যপাদ পিতামহদেব সেই বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়া ব্রহ্মনামের জয়ঘোষণা করিবার জন্য সমুদয় ভারতবর্ষকে আহ্বান করিলেন এবং চারিদিক হইতে সেই আহ্বানের প্রত্যুত্তরও আসিতে লাগিল। আবার তাঁহার অবসর গ্রহণ করিবার পর হইতে ব্রাহ্মসমাজের খরস্রোত একটু মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে। তাহা বলিয়া আমাদের নিরাশার কোনই কারণ নাই। আমরা যখন দুইবার দুইবার ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের হস্ত প্রসারিত দেখিতে পাইলাম তখন তৃতীয় বারই বা কেন তিনি ব্রাহ্মসমাজকে উদ্ধার না করিবেন? এ বিষয়ে সন্দেহ হওয়াই আমাদিগের পাপ। আমরাও যদি আবার যথার্থ প্রাণের সহিত, হৃদয়ের সহিত ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য দৃঢ়সংকল্প হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমরাও ব্রাহ্মসমাজের উপর ঈশ্বরের সুবিমল প্রসাদ প্রত্যক্ষ অনুভব করিব। আজই যদি আমরা উৎসাহ পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে মনোযোগী হই, এই মুহূর্ত্তেই ঈশ্বর আমাদিগের হৃদয়ে এক মহান্ বল প্রদান করিবেন; সেই মহান্ বলের প্রভাবে আমরা সকল দেশকে একত্রিত করিব, সকল জাতিকে একত্রিত করিব এবং তখন মর্ত্ত্যলোকবাসী আমাদিগের দ্বারা সেই দেবদেব পরব্রহ্মের এরূপ জয়ঘোষণা হইতে দেখিয়া দেবলোক হইতে দেবতারা আনন্দিত হইবেন এবং আমাদিগের প্রতি অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিবেন।

এখন আমাদিগের প্রশ্ন এই যে, ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য কি? ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তব্য কি—এই প্রশ্নের উত্তরে আমি এই বলি যে, সকলপ্রকার শুভ কার্য্যই ব্রহ্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তি মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু আমার বিবেচনায় তাঁহাদিগের প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য মূর্ত্তিপূজা, মনুষ্যপূজা প্রভৃতি নানা পরিমিত বস্তু বা মনুষ্য বা দেবদেবীর পূজার পরিবর্ত্তে সেই দেবাধিদেব অনন্তদেবের পূজা প্রতিষ্ঠিত করা। অনেক ব্রাহ্মের মতে এ কার্য্য পূর্ব্বেই নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে; তাঁহারা বলেন যে ব্রাহ্মধর্ম্মকে এড়াইয়া অনেকে যাইতে পারে কিন্তু কেহই তাহাকে অন্যায়, অযুক্তি-পূর্ণ বলিতে সাহসী হইবেক না। বাস্তবিক-ই কি, এক কথায় যাহাকে ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠা বলা যাইতে পারে, তাহা হইয়া গিয়াছে? সে দিকে কি আমাদের কোন প্রকার কার্য্য করিবার নাই? না, তাহা নহে। পূজ্যপাদ পিতামহ দেব কোন প্রতিনিধি সভায় বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার সময়ে যে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহার পরে স্থূল পৌত্তলিকতার পরিবর্ত্তে সূক্ষ্ম পৌত্তলিকতা অথবা আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতা উপস্থিত হইবে। এখন আমরা প্রায়ই ব্রহ্মজ্ঞানের বিপক্ষে দণ্ডায়মান দেখি এই আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতাকে। ইহাকে আমরা মায়া-ব্রহ্মজ্ঞান বলিলেও বলিতে পারি।

যাই হোক্, মূর্ত্তিপূজা রক্ষা সম্বন্ধে প্র-

ধানতঃ কয়েকটী যুক্তি ও তাহার উত্তর প্রদর্শিত হইতে পারে। (১) ব্রহ্ম বাক্য-মনের অগোচর, সুতরাং তাঁহার উপাসনা অসম্ভব এবং এই কারণে রূপগুণবিশিষ্ট কোন বস্তুকে জগতের কর্ত্তা বলিয়া উপাসনা করা কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, যদি কোন ব্যক্তি বাল্যকালে পিতৃহীন হয়, সে যেমন সম্মুখস্থ যে কোন বস্তুকে পিতা বলিয়া গ্রহণ করে না কিন্তু পিতার উদ্দেশে কর্ম্ম করিবার কালে এই বলিয়া কর্ম্ম করে যে, "যিনি আমার জন্মদাতা, তাঁহার উদ্দেশে কর্ম্ম করিতেছি", সেইরূপ ঈশ্বর বাক্য-মনের অগোচর হইলেও আমরা তাঁহাকে জগতের স্রষ্টা পাতা বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারি এবং তাঁহার উপাসনাও করিতে পারি।

(২) পিতৃপিতামহগণ যে মতানুসারে কার্য্য করিয়া এতকাল কাটাইয়াছেন, তাহা ত্যাগ করা আমাদিগের পক্ষে কি শোভা পায়? ভাল হউক, মন্দ হউক, কেবল পূর্ব্ব পুরুষেরা এক প্রথা পালন করিয়া গিয়াছেন বলিয়া নির্ব্বিচারে স্বীকার করা মনুষ্য-ধর্ম্মের বহির্ভূত। আমরা সদসৎ বিচার করিবার জন্য পরমেশ্বরের প্রসাদাৎ বুদ্ধিবৃত্তি সকল লাভ করিয়া পশুদিগের অপেক্ষা উন্নত পদে উঠিয়াছি—মনুষ্য নামের গৌরব লাভ করিয়াছি। আমরা সেই বুদ্ধিবৃত্তির এতটুকুও পরিচালনা না করিয়া নিতান্ত নিশ্চেষ্ট অলসভাবে পশুদিগের ন্যায় জীবন যাপন করিব? আর ইহাও তো আমাদিগের মধ্যে দেখা যায় যে, কেহ শাক্ত ছিলেন, বৈষ্ণব হইলেন, কেহ বৈষ্ণব ছিলেন, শাক্ত হইলেন; কেহ মূর্ত্তিপূজার পক্ষপাতী ছিলেন, পরমহংস হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিতে লাগিলেন। ইহাতে আমরা দেখিতেছি যে বিচার পূর্ব্বক যাহা ভাল বলিয়া বিবেচনা হইবে, তাহা গ্রহণ করায় কোন দোষ নাই—প্রত্যুত তাহাতেই আমাদিগের মনুষ্যত্ব। "যুক্তিহীন-বিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে" অযৌক্তিক বিচারের দ্বারা ধর্ম্মহানি হয়।

(৩) অনেকে বলেন যে, সংসারীর পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে না, কারণ সংসারীর অন্তরে সু ও কু-য়ের ভেদজ্ঞান থাকে—পঙ্ক চন্দনে অভেদজ্ঞান হয় না। এই তর্ক অতি অসম্ভব ও অযৌক্তিক। এই ভেদজ্ঞান না থাকিবে কেন? ঈশ্বর আমাদিগের অন্তরে এই প্রকার পার্থক্য-জ্ঞান দিয়াছেন। পূর্ব্বতন ঋষিদিগের কথা ভাবিয়া দেখ, তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াও জলকে জলের কার্য্যেই ব্যবহার করিয়াছিলেন, অগ্নিকে অগ্নির কার্য্যেই ব্যবহার করিয়াছিলেন; জলকে অগ্নি বলিয়া অথবা অগ্নিকে জল বলিয়া ব্যবহার করেন নাই। আর এক কথা এই যে, যদি কোন কল্পিত দেবতাকে জগতের কর্ত্তা বলিয়া পূজা করিলে পঙ্ক-চন্দনে সমজ্ঞান হয় না, তবে ব্রহ্মকে জগতের কর্ত্তারূপে পূজা করিলেই বা কেন ঐরূপ ঘোর অনিষ্টকর অভেদজ্ঞান হইবে? ব্রহ্মজ্ঞানীর সমদৃষ্টি এইরূপ নহে। তবে তাহা কি, না, সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি; অর্থাৎ যে প্রকার আচরণে আমার কষ্ট হয়, অন্যের প্রতি সে প্রকার আচরণ না করা ইত্যাদি। নিজের দুঃখে যেমন আমার হৃদয়ে কষ্ট হয়, সেইরূপ অন্যের দুঃখ দেখিলেও আমার হৃদয় ব্যথিত হইবে; নিজের সুখে যেমন আমার হৃদয়ে আনন্দ হয়, সেইরূপ অপরের সুখেও আমার হৃদয় আনন্দ অনুভব করিবে—কারণ আমরা সকলেই সেই

এক পিতার সন্তান, আমরা সকলেই সেই এক স্নেহময়ী জননীর করুণার দ্বারা লালিত পালিত। ব্রহ্মপরায়ণ সাধুদিগের ইহাই সমদৃষ্টি।

(৪) শাস্ত্রে সাকার উপাসনার কথা আছে, অতএব সাকার উপাসনা কর্ত্তব্য। ইহার উত্তরে এই বলিতে পারি যে, যাঁহারা এই যুক্তি দেখান, তাঁহারা একটু অনুধাবন পূর্ব্বক দেখিলেই জানিতে পারিবেন যে শাস্ত্রকারগণ দুর্ব্বল অধিকারীর সুবিধার নিমিত্ত ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করিয়াছেন মাত্র—

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥"

মূর্ত্তিগুলি ব্রহ্মের রূপ কল্পনা মাত্র, এইরূপ যুক্তি দেখাইয়া বর্ত্তমান কালে কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের অনেকে ভারতবর্ষে বিশেষতঃ এই বঙ্গদেশে আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতা আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহারা হয়তো অনন্ত আকাশের সৌন্দর্য্যে সেই অনন্ত পুরুষের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতেছেন; তাঁহারা হয়তো অকূল সাগরের মহান্ সৌন্দর্য্যের মধ্যে সৌন্দর্য্যের কারণকে বুঝিতেছেন; তাঁহারা হয়তো সন্ধ্যাকালে অকূল প্রান্তর-মধ্যবাহিনী স্রোতস্বতীর উপকূলে বসিয়া গভীর প্রশান্তির মধ্যে সেই অনন্ত শান্ত পুরুষের শান্ত মহিমা অনুভব করিতেছেন; কিন্তু যদি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তাঁহারা এখনও কেন পৌত্তলিক অনুষ্ঠান করিতেছেন, কেন তাঁহারা ব্রহ্মের পরিবর্ত্তে তাঁহারই এক কল্পিত প্রতিমূর্ত্তিকে গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা করিয়া রাখিয়াছেন, তখনই তাঁহারা নির্ব্বিচারে উত্তর দিবেন যে, তাঁহারা এখনও ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হন নাই। যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াও আপনাদিগকে নিতান্তই অনধিকারী বিবেচনা করিয়া পূর্ব্বাপর-প্রচলিত পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে নিমগ্ন থাকিবেন, তাঁহাদিগকে আর আমরা কি বলিব? তাঁহারা আপনারাই স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা উন্নতির পথ দেখিতে পাইলেও সে পথ অবলম্বন করিবেন না। তাঁহারা যে সকল শাস্ত্র মানিয়া এইরূপ কথা বলেন, সেই সকল শাস্ত্র কি বলিতেছেন দেখুন—

"যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেব স দেবানাং।"

শ্রুতি।

যে পরমাত্মা ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসনা করে এবং বলে যে এই দেবতা অন্য ও আমি অন্য, উপাস্য উপাসক হই, সে অজ্ঞান ও দেবতাদিগের পশুরূপে গণ্য হয়। যাঁহারা মূর্ত্তিপূজার পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি যে, তাঁহারা সেই সকল প্রতিমূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলেন অথবা ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া তাহাদিগের পূজা করেন। তাঁহারা প্রতিমূর্ত্তিগুলিকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিতে পারিবেন না, কারণ সে সকল তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক প্রস্তুত হয়, সুতরাং তাঁহাদিগেরই সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন। আর বাস্তবিকও তাঁহারা ইহা বলেন না। যদি তাঁহারা প্রতিমূর্ত্তিকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি মাত্র বলেন—তাহাও হইতে পারে না; কারণ অপরিমিত ও অতীন্দ্রিয় পরমেশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি কদাপি পরিমিত ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না।

যখন তাঁহারা দেখেন যে, তাঁহাদিগের এই সকল উত্তর যুক্তির আলোকে খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গেল, তখন তাঁহারা আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহারা বলেন যে, যেহেতু মূর্ত্তিগুলি

ব্রহ্মের রূপকল্পনামাত্র এবং যেহেতু ব্রহ্ম সর্ব্বময়—তিনি সকলেতেই আছেন, এই হেতু মূর্ত্তিপূজা করিলেই ব্রহ্মপূজা সিদ্ধ হয়। তাঁহারা যদি ব্রহ্মকে সর্ব্বময় বলিয়া জ্ঞান করেন, তবে বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তি পূজা করিবার প্রয়োজন হইত না এবং যদি বলেন যে সেই বিশেষ বিশেষ মূর্ত্তিতে মন্ত্রবলের দ্বারা ঈশ্বরের অধিকতর আবির্ভাব হয়, তবে তাহার উত্তর এই যে, ঈশ্বর যিনি, তিনি ন্যূনাধিক্য ও হ্রাসবৃদ্ধি দ্বারা পরিমিত হইতে পারেন না।

এতক্ষণে দেখাইলাম যে যুক্তি দ্বারা মূর্ত্তিপূজা সমর্থন করা যাইতে পারে না এবং আমাদিগের শাস্ত্রকারগণ মূর্ত্তিপূজার ভূয়োভূয়ঃ নিন্দাবাদ করিয়া ব্রহ্মোপাসনারই শ্রেষ্ঠতা ও কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু এখন আমাদিগের মধ্যে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে যে এই ব্রহ্মোপাসনাই কি কেবলমাত্র প্রচার করিব এবং তাহাই যদি করি, তবে কি প্রকার উপায়ে তাহা করিতে চেষ্টা করিব? ইহার উত্তরে আমি নিঃসংশয়ে বলিব যে প্রথমে ব্রহ্মোপাসনাই প্রচার করিয়া প্রত্যেক কর্ম্মে, প্রত্যেক অনুষ্ঠানে দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে ব্রহ্মকে, যিনি সকলের অন্তর্য্যামী, সেই ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠিত কর; তাঁহারই চরণে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করিতে শিক্ষা কর এবং শিক্ষা দাও। আমাদিগের ব্রহ্মকে কেন্দ্র করিয়া সকল কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা উচিত। ব্রহ্মপরায়ণ সাধু ব্যক্তিমাত্রেরই কেন্দ্র ব্রহ্ম এবং সমুদয় সংসার পরিধি। কেন্দ্রচ্যুত হইয়া কার্য্য করা আমাদিগের কদাপি কর্ত্তব্য নহে। আমরা কেন্দ্রচ্যুত হইয়া কার্য্য করিলে কোন কার্য্যেরই ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে পারিব না—কোন কার্য্যই স্থায়ী হইতে পারিবে না; সকল কার্য্যেই ঘোর বিশৃঙ্খলতা আসিয়া উপস্থিত হইবে।

আমরা সমাজসংস্কার করিতে যাই, রাজনীতিসংস্কার করিতে যাই অর্থাৎ আমরা সমাজকে রাজনীতিকে নিতান্ত সংকীর্ণভাবের পরিবর্ত্তে একটু মুক্ত ভাব দিতে যাই; কিন্তু যখন আমরা মুক্ত স্বভাব ব্রহ্মকে আদর্শ করিতেছি না, সত্যস্বরূপকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে অগ্রসর হই না তখন কিসের বলে, কিসের উপর নির্ভর করিয়া সংস্কার করিতে প্রস্তুত হইব? সমাজকে মুক্ত করিব—কতটা মুক্ত করিব? আমার নিজের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, তবে আমি কোথা হইতে মুক্তভাবের আদর্শ (Ideal) পাই? আমি সমাজকে মুক্ত করিব—মিথ্যা হইতে; লইয়া যাইব কোথায়?—মুক্ত সত্যের দিকে। কিন্তু এই সত্যের আদর্শ কোথায় পাই? আমরা দেখি যে আমাদিগের আত্মা সীমাবদ্ধ হইয়াও অসীমের দিকে ছুটিয়া যায়; নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্য দেখিয়া তাহাদিগের আদি কারণ এক মহান্ সত্যের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়—তখনই আত্মপ্রত্যয়ের দ্বারা বুঝিতে পারি যে এই সীমাবিশিষ্ট জগতের পশ্চাতে এক অনন্ত সত্যস্বরূপ মহান্ পুরুষ আছেন। আমরা যে কোন সংস্কার করিতে যাই না কেন, তাহা এই সত্যস্বরূপ শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব পূর্ণপুরুষকেই আদর্শ করিয়া করিতে হইবে। ইহারি জন্য বলিতেছি যে অগ্রে ব্রহ্মকে হৃদয়ে ধারণ করিবার চেষ্টা পাও, তবে সকল প্রকার উন্নতি, সকল প্রকার সংস্কার সহজসাধ্য হইয়া উঠিবে। ইহা না হইলে উন্নতির ভিত্তিই দাঁড়াইতে পারিবে না। অতএব আইস, আমরা বদ্ধপরিকর হইয়া আজ হইতেই ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিতে যত্নবান্ হই। আমরা

যদি আমাদের স্বদেশের মঙ্গলকামনা করি, আমরা যদি আমাদের আত্মার মঙ্গলকামনা করি, তবে আমরা যেন কোন প্রকার ভয়ে ভীত না হইয়া ব্রহ্মনামের জয়ঘোষণা করিয়া কায়মনোবাক্যে সকলের হৃদয়ে ব্রহ্মনাম অঙ্কিত করিয়া দিবার চেষ্টা করি। সেই মুক্ত পুরুষের স্বাধীনভাব যদি হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়, তবে আমরা অচিরাৎ সকল বিষয়েই স্বাধীনতা লাভ করিতে সক্ষম হইব।

কিন্তু এইবারে আর একটী প্রশ্নের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। সে প্রশ্নটী এই যে, কি উপায়ে ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করিতে চেষ্টা করিব? এবিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে যে জাতীয় ভাবের উপযোগীরূপেই প্রচার করা সর্ব্বোত্তম উপায়? আমি যদি কতকগুলি মুসলমানের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিতে গিয়া কোরাণের পরিবর্ত্তে হিন্দুশাস্ত্র হইতে দৃষ্টান্ত দেখাই, তাহা ভাল, অথবা আমি যদি কোরাণ হইতে দৃষ্টান্ত দিই, তাহা ভাল? আমি যদিও উভয় পক্ষেই একই ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় বলিতেছি কিন্তু যদি বাস্তবিক সেই মুসলমানের অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞান প্রবেশ করাইবার আমার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে শেষোক্ত উপায়ই যে প্রশস্ত উপায়, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্রও নাই। সেইরূপ খৃষ্টীয়দিগের মধ্যে বাইবেল প্রভৃতি তাহাদিগের উপযুক্ত উপায়ের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করা আবশ্যক। আমরা হিন্দু, হিন্দু পরিবারে বেষ্টিত, হিন্দু আচার ব্যবহারে লালিত পালিত; তখন স্বজাতীয়ের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিতে গেলে হিন্দুর উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। আমরা পূর্ব্বতন ঋষিদিগের জ্ঞানভাণ্ডার মনুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্র সকলকে অবমাননা পূর্ব্বক কর্ম্মনাশা নদীর জলে নিক্ষেপ না করিয়া, তাহার মধ্য হইতে সার সত্যগ্রহণে সচেষ্ট হইব এবং সেই সত্য সকল দেশীয় শাস্ত্রের মধ্য দিয়া, দেশীয় ভাবের মধ্য দিয়া প্রচার করিলে সর্ব্বসাধারণে আগ্রহের সহিত ধারণ করিবে। দেখ, শঙ্করাচার্য্য তাঁহার মতকে সম্পূর্ণ দেশীয়ভাবে প্রচার করিয়া কতদূর কৃতকার্য্য হইলেন। এদেশের শাস্ত্রে যখন উন্নত মত সকল প্রচার করিতেছে, তখন সে সকল শাস্ত্রকে একেবারে ত্যাগ করিবার প্রয়োজন কি? অল্পে অল্পে তাহার সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। আমরা "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" প্রভৃতি অতি মহান্ সত্যবাক্য সকল কত পূর্ব্ব হইতে পাইয়াছি, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। এ সকল আমরা বিজাতীয় ধর্ম্ম অনুকরণ করিয়া প্রাপ্ত হই নাই। তবে কেন আবার আমাদের পবিত্র ধর্ম্মকে বিজাতীয় ভাবে পঙ্কিল করিয়া তুলিব। ধর্ম্মের মধ্যে বিজাতীয় ভাব বিজাতীয় আচার ব্যবহার বলপূর্ব্বক প্রবেশ করাইলে ধর্ম্ম বিকৃতভাব ধারণ করে। কিন্তু তাই বলিয়া বিজাতীয়ের গুণ মোটেই গ্রহণ করিব না, তাহা নহে; তাহাও গ্রহণ করিব দেশীয় ছাঁচে ফেলিয়া। যদি আমাদের এই ভারতের আবালবৃদ্ধ নরনারী বিজাতীয় পরিচ্ছদ ধারণ করে, তাহাতে বিকৃত ফল উৎপাদন করিবেই। আমাদের খাঁটি দেশীয় পরিচ্ছদ (ধুতিচাদর) কর্ম্মক্ষেত্রের অনুপযোগী বলিয়া কি বিজাতীয় পরিচ্ছদ সর্ব্বাঙ্গীণ অনুকরণ করিতে হইবে? তাহা কদাপি নহে। উহাদের পরিচ্ছদের উপযোগিতাটুকু আমাদের দেশীয় পরিচ্ছদের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া লও; দেশীয় ছাঁচে গড়াইয়া তোল।

এখন আমাদের প্রশ্নের উত্তরে এই বুঝিলাম যে ব্রহ্মোপাসনা প্রচারই ব্রাহ্মদিগের প্রথম এবং প্রধান কর্ত্তব্য এবং তাহা আমাদিগকে দেশীয় ভাবের মধ্য দিয়াই করিতে হইবে। আইস, আমরা আজ হইতেই পূর্ব্বতন মুনি ঋষিদিগের বহু সহস্র বৎসরের কঠোর তপস্যালব্ধ ব্রহ্মজ্ঞানকে অবহেলা না করিয়া, প্রত্যুত তাহা হৃদয়ে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারে আত্মসমর্পণ করি। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য আমাদিগকে সংসার পরিত্যাগ করিতে হইবে না, কর্ম্মকাজ পরিত্যাগ করিতে হইবে না—কেবল ব্রহ্মেতে লক্ষ্য স্থির করিয়া সকল শুভকর্ম্ম করিতে হইবে। এই সংসারের মধ্যে থাকিয়াও উপদেশের দ্বারা, সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা এবং আপনার আপনার জীবনের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের জীবন্ত প্রভাব দেখাইয়া ইহার প্রচার কার্য্যের সহায়তা করিব। আমরা যেদিন হইতে ব্রাহ্মনাম গ্রহণ করিয়াছি, সেই দিন হইতে এই গুরুতর ভার আমাদের প্রত্যেকের স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে। আমরা যেন কেবলমাত্র প্রচারকদিগের অপেক্ষায় বসিয়া না থাকি; ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মের যথাযুক্ত অনুষ্ঠান করিলেই অচিরাৎ তাঁহারই প্রসাদে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইব। এই উন্নতির সীমা নাই—এই দীর্ঘপথের অন্ত নাই।

হে পরমাত্মন্! তোমারি কৃপায় আমরা তোমাকে জানিয়াছি এবং দেখ, এই বন্ধুবর্গে মিলিত হইয়া তোমার মহিমা ঘোষণা করিতে আমাদের অন্তরে কি আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ইচ্ছাতে তুমি বলপ্রেরণ কর—ইহা যেন আজি এই একদিনের জন্য স্থায়ী না হয়। তোমার নিকটে যখন এই পথ লইয়া যাইবে, তখন কেন আমরা এই আনন্দের পথে না যাইয়া নিরানন্দ সাগরে ভাসমান হই? তুমি আমাদের এই ভারতবর্ষের চিরন্তন দেবতা, তুমি আমাদের এই ব্রাহ্মসমাজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; তুমি আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়েশ্বর; আমরা জানি যে, তোমার নিকটে প্রার্থনা করিলে আমরা নিরাশ হইব না। তাই হে দেবদেব পরমেশ্বর, আমরা সকলে যোড়হস্তে তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি আমাদিগের এই ভারতভূমি হইতে অধর্ম্মের ভাব বিদূরিত করিয়া দাও এবং আমাদের শরীর, মন ও আত্মায় এ প্রকার বলপ্রদান কর যাহাতে তোমার কথা দ্বারা সকলের ধর্ম্মভাব আকর্ষণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। আমাদিগের ধর্ম্মভাব বর্দ্ধিত হউক, এই আশীর্ব্বাদ প্রদান কর। ইহা ভিন্ন আমাদের অন্য কোন প্রার্থনা নাই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

হরিসেনামণ্ডলী কর্ত্তৃক শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্যের প্রতি প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রের প্রত্যুত্তর।

হে প্রিয়দর্শন বসন্তকুমার-প্রমুখ হরিসেনামণ্ডলি,

যে প্রকার সহৃদয় বাক্যে আমার হৃদয়ে সন্তোষ প্রদান করিলে, তাহাতে আমি অতীব আনন্দ লাভ করিলাম। কিন্তু আমার এই বাক্য শ্রবণ কর যে, আমি রাজাও নহি, ঋষিও নহি; আমি সেই মহান্ দীপ্যমান করুণাময় প্রভুর একটি পদাবনত ক্ষুদ্র আজ্ঞাকারী ভৃত্য। আমি যখন সংসারের অকূল সাগরের ভয়ানক তরঙ্গের মধ্যে ভাসিতেছিলাম, তখন তিনিই সেখান হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া, আমার দুর্ব্বল হস্ত ধারণ করিয়া এতদূর পর্য্যন্ত আনিয়া রাখিয়াছেন। আমি সেই প্রেমময়ের স্নেহহস্ত আর কখনই ছাড়িব না। তিনি আমাকে সেই ভয়ানক সাগর হইতে উদ্ধার না করিলে আমি এত দিনে মহা বিনাশ প্রাপ্ত হইতাম। ধন্য জগদীশ্বর, ধন্য তোমার করুণা! তুমি অজস্র কৃপাবারি নিয়ত আমার মস্তকে বর্ষণ করিতেছ। তোমার যে একটি দেববাণী আমার হৃদয়ে পৌঁছিয়াছে, তাহাই আমার এই সুখদুঃখময় সংসারে জীবন। তুমি আমাকে অনন্তকাল তোমার সহচর অনুচর করিয়া রাখিবে, তোমার এই আশ্বাস বাক্যের কখনই অন্যথা হইবে না।

আমার রক্ত এখন নিস্তেজ হইয়াছে শরীর এখন দুর্ব্বল হইয়াছে—তাহা একবারেই পরাধীন হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু আমার আত্মা প্রপঞ্চোপশম শান্ত মঙ্গল স্বরূপ পরমাত্মাতেই স্থিত হইয়া রহিয়াছে। তিনিই আমার পরম গতি, তিনিই আমার পরম সম্পৎ, তিনিই আমার পরলোক, তিনিই আমার পরম আনন্দ।

ঈশ্বর তোমাদের কল্যাণ সাধন করুন তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া তোমরা কুশলে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ কর। হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি প্রস্ফুটিত করিয়া দিনান্তে নিশান্তে তাঁহার পূজা কর। তাঁহার নিকটে শুভ বুদ্ধি ও ধর্ম্মবল প্রার্থনা কর—তিনি মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং; তাঁহাকে ভয় কর, তবে আর লোকের থাকিবে না। তিনি স্নেহের আকর, প্রেমের সাগর—তাঁহাকে প্রীতি কর, তাহা হইলে সকলের প্রিয় হইবে। বিপদে পড়িয়া, রোগে শোকে কাতর হইয়া তাঁহার নিকটে ক্রন্দন কর, তিনি তোমাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন, তোমাদিগের অশ্রুজল মার্জ্জনা করিবেন। পাপে পতিত হইলে সেই পতিতপাবনের নিকট সন্তপ্তচিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা কর—এমন কর্ম্ম আর করিব না, এই কথা মনের সহিত বল—তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন—পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। যখন সম্পদ হিল্লোলে বিচরণ করিবে, তখন তাঁহাকে ভুলিও না। সেই সময়ে তোমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা তাঁর সিংহাসনের প্রতি উত্থিত হউক। তাহা হইলে আর ক্ষমতার প্রতি আর অভিমান থাকিবে না। প্রিয় শিষ্যগণ, তোমাদের প্রতি আমার এই উপদেশ, তোমাদের প্রতি আমার এই আশীর্ব্বাদ।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

১০ই ফাল্গুন, ৬২ ব্রাহ্মসম্বৎ, ১৭৮৩ শক।

প্রশ্নোত্তর

(ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা ও মনুষ্যের স্বাধীনতা)

পূজনীয় শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক মহোদয়ের

শ্রীশ্রীচরণ সরোজেষু।

মহাত্মন্—

বহুদিন যাবৎ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় একটী তর্ক মনে উপস্থিত হইয়া ক্রমেই যেন অদৃষ্টবাদিত্বে আমার বিশ্বাস বদ্ধমূল হইতেছে। ত্রয়োদশ কল্প প্রথম ভাগ "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকার "ঈশ্বরের ত্রিকালজ্ঞতা ও মানবাত্মার স্বাধীনতা এই প্রবন্ধটিতে আমার তর্কের মীমাংসা প্রাপ্ত হওয়ার আশায় বড় পিপাসু হইয়া প্রবন্ধটি পড়িতে লাগিলাম কিন্তু তাহাতে কিম্বা আপনার মন্তব্যতেও কিছুই না পাইয়া হতাশ হইলাম। সদয় হইয়া আগামী বারের তত্ত্ববোধিনীতে বিশদ উত্তর দানে আমার ভ্রমান্ধকারটী বিদূরিত করিলে পরোপকৃত, প্রীত ও চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হইব।

যাহা কিছু হইয়াছে হইতেছে বা হইবে সকলই ঈশ্বর জানেন; যে কোন সৃষ্ট পদার্থ সম্বন্ধে যাহা হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে, তাহা ঈশ্বরের অবিদিত নহে। যাহা তাঁহার জানা তাচ্চেয়ে কম বা বেশী কিছু হয় নাই, হইতেছে না বা হইবে না। মানব যাহা করে বা করিবে তাহা অবশ্যই ঈশ্বরের অবিদিত নহে। মানবের কার্য্য সম্বন্ধে ঈশ্বরের যতদূর জানা তাচ্চেয়ে সে অণুমাত্রও কম বা বেশী করিতে পারে না, অতএব স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে মানব যাহা করে (ভাল মন্দ যাহাই হউক) তাহা সে না করিয়াই পারে না। পাপ, পুণ্য, ভাল, মন্দ, দুই প্রকার কার্য্যের দুইটী বিশেষ নাম মানব দিয়াছে। যে যতটুক পাপ বা পুণ্য করিতে বাধ্য তাহাই সে করে (অর্থাৎ না করিয়া পারে না) পাপই হউক বা পুণ্যই হউক, তাহাতে কিছুই আসে যায় না—সকলই ঈশ্বর দত্ত; মঙ্গলময় ঈশ্বরবিহিত পাপ পুণ্য উভয়ই মঙ্গল জনক। অমুক ধার্ম্মিক বা অমুক পাপী এর অর্থ এই—ইহারা ঈশ্বরের জ্ঞান ও ইচ্ছা দ্বারা বাধ্য হইয়া বিশেষ বিশেষ কার্য্য করে বলিয়া মানব বিশেষ দুইটী ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়াছে।

১৫ কার্ত্তিক
১২৯৮ বাঙ্গালা।

শ্রীচরণানুগত—
শ্রীপ্রসন্নকুমার গুপ্ত।
মৌলবী বাজার দক্ষিণ শ্রীহট্ট।

একথা সত্য যে, ঈশ্বর পাপী পুণ্যাত্মা সকলকেই মঙ্গলের পথে চালাইতেছেন

—একথা খুবই সত্য; কিন্তু প্রশ্ন এখানে তাহা নহে;—প্রশ্ন এই যে, ঈশ্বর কিরূপে মনুষ্যকে ধর্ম্মপথে চালাইতেছেন? যেরূপে তিনি পৃথিবীকে চালাইতেছেন—সেইরূপে কি তিনি মনুষ্যকে উত্তরোত্তর ধর্ম্মপথে চালাইতেছেন? পৃথিবীকে তিনি ভৌতিক বল দ্বারা চালাইতেছেন; কিন্তু ভৌতিক বল দ্বারা কাহাকেও কি কখনো ধর্ম্মপথে পরিচালন করা সম্ভবে? বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তি প্রভৃতি কি কাহাকেও জোর করিয়া গিলাইয়া দেওয়া যায়—না অসৎ ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করিয়া সৎলোক করিয়া তোলা যায়? পিতা যেমন চায় যে পুত্র ইচ্ছা করিয়া ভাল পথ অবলম্বন করুক্; ঈশ্বর তেমনি চা'ন যে মনুষ্য ইচ্ছা করিয়া ভাল পথে চলুক; এই জন্য মনুষ্যের জ্ঞান ইচ্ছা এবং প্রেম এই সকল আধ্যাত্মিক শক্তি যাহাতে অল্পে অল্পে প্রস্ফুটিত হয়, তাহার তিনি নানা রূপ বিধি ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখন বক্তব্য এই যে আপন ইচ্ছায় ধর্ম্মপথে চলা'র নামই স্বাধীনতা। তুমি যদি জোর করিয়া একজনকে ধার্ম্মিক করিয়া তুলিতে যাও তবে তাহার নাম ভৌতিক বলপ্রয়োগ; আর, তুমি যদি একজনকে সাধু দৃষ্টান্ত এবং উপদেশ দ্বারা লওয়াইয়া ধর্ম্মপথে প্রবৃত্ত কর, তবে তাহার নাম আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগ; ভৌতিক শক্তি স্বাধীনতার হন্তারক, কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তি স্বাধীনতার পরিপোষক। ঈশ্বর আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা তাঁহার ধর্ম্মরাজ্য চালাইতেছেন; তাই পাপী ব্যক্তি কোন না কোন সময়ে ইচ্ছা পূর্ব্বক পাপপথ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্য-পথ অবলম্বন করিবে, ইহা ঈশ্বর জানিতেছেন; পাপী ব্যক্তি ভৌতিক বল দ্বারা বাধ্য হইয়া নহে, কিন্তু ইচ্ছা পূর্ব্বক পাপ পথ পরিত্যাগ করিবে—এইখানেই স্বাধীনতা। এখন, স্বাধীনতা কাহাকে বলে, সে বিষয়ে অনেক রূপ মতভেদ হইতে পারে। কেহ বলিতে পারেন যে, কোনো কিছু দ্বারা পরিচালিত না হওয়ার নামই স্বাধীনতা কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, [illegible]প স্বাধীনতা একটা মনঃকল্পিত ব্যাপা[illegible] কেন না, যে ব্যক্তি কোনো কিছু [illegible]াই চালিত না হয়, তাহা দ্বারা কো[illegible]কার্য্যই সম্ভবে না। মনুষ্য জ্ঞান ধর্ম্ম [illegible]তি অন্তর্নিহিত মহদ্ভাব দ্বারা চালিত [illegible]ইলে বিষয়-শৃঙ্খল হইতে যেরূপ স্বাধীন[illegible] উপলব্ধি করে তাহাই প্রকৃত পক্ষে [illegible]ধীনতা। যিনি এইরূপ ভাবে কার্য্য [illegible]রেন তিনিই স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ হৃদয়[illegible] করেন। [illegible]ইরূপ স্বাধীনতা ঈশ্বরের [illegible]ইর চরম উদ্দেশ্য, তাহার সাক্ষী সৃষ্টির ম[illegible] এরূপ স্বাধীনতা কেবল মনুষ্যেরই [illegible]রাভূষণ, আর কোনো জীবের নহে। [illegible]নে এই একটি কথা উঠিতে পা[illegible] যে, পাপী ব্যক্তি তবে এই বলিয়া ম[illegible] প্রবোধ দি'ক্—আমি এখন তো পাপ[illegible]রণ করি, পরিণামে ঈশ্বর আছেন। [illegible]াপ যদি মনুষ্যের স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্ম হইত [illegible]া হইলেই এ কথার অর্থ থাকিত; [illegible]ন্তু পাপ একটা রোগ বিশেষ; কো[illegible] মনুষ্যই ঈশ্বরের নিয়মের বিপরীতে [illegible] রোগকে অধিক কাল আলিঙ্গন করি[illegible] সুস্থ থাকিতে পারে না; ইহকালেই [illegible]ক্ আর পরকালেই হউক্— এক না এক[illegible]য়ে তাহাকে বিকৃতির পথ পরিত্যাগ ক[illegible] প্রকৃতির পথে আসিতেই হইবে—ইচ্ছাপূর্ব্বক আসিতে হইবে। কখন্ কে কি[illegible]ণালীতে প্রকৃতির পথে ফিরিয়া আ[illegible] স্বাধীন ইচ্ছার সহিত তাঁহার ইচ্ছা[illegible]যোগ দিবে, তাহা তিনি আদ্যোপান্ত স্পষ্টই জানিতেছেন; আর তাঁহার সেইরূ[illegible] জানাই আমাদের স্বাধীনতার মূল কা[illegible]। অতএব ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক শক্তি এব[illegible] সর্ব্বজ্ঞতা মনুষ্যের স্বাধীনতার বিরোধী [illegible]ওয়া দূরে থাকুক তাহা মনুষ্যের স্বাধী[illegible]তার পরিপোষক। যেহেতু ঈশ্বর [illegible]ধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারাই আধ্যাত্মিক জগ[illegible] চালাইতেছেন, ভৌতিক শক্তি দ্বারা নহে।

সং।